মুহাম্মদ ইব্রাহীম



জীবনস্মৃতিতে মানুষ দেশ বিজ্ঞান

প্রথম খণ্ড

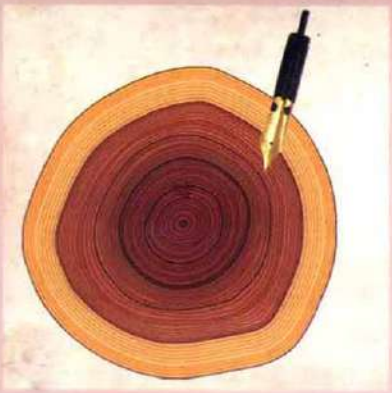

এই আত্মজীবনীর ব্যাপ্তিকাল ১৯৪৯ থেকে শুরু করে নব্বই দশকের প্রথম দুএক বছর পর্যন্ত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ ও দেশ বিভাগ-পরবর্তী কালের রেশ থেকে শুরু করে জমজমাট একটি পারিবারিক পরিমণ্ডলে (পরবর্তী কালের নোবেলবিজয়ী কিশোর ইউনূসও যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ) শিশুর বালক হয়ে ওঠার মনকাড়া সব বর্ণ-গন্ধ-শব্দের অভিজ্ঞতা এতে এসেছে, স্কাউটিঙের সুবাদে ওই সময় দূরপ্রাচ্যের নানা দেশের অভিজ্ঞতাও। খুব রাজনীতি-সচেতন পারিবারিক আবহে সেদিনের দেশের ঘটনাবলি— চুয়ান্নর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন, অবশেষে প্রজাতন্ত্রী পাকিস্তান, আইয়ুব খানের মার্শাল ল ইত্যাদি এখানে খুব জাজ্বল্যমানভাবে এসেছে। ওই বাল্যকালেই আপনমনে বই পড়ে লেখক টুকটাক জিনিস দিয়ে তাঁর নিজের গড়ে তোলা 'ল্যাবোরেটরি' নিয়ে ব্যস্ত। বিজ্ঞানের কথা জানা আর অন্যকে জানানোতে তাঁর আনন্দ—তাই কলেজে গিয়েই সাহস করে প্রকাশ শুরু করে দেশের প্রথম বিজ্ঞান মাসিক পত্রিকা 'বিজ্ঞান সাময়িকী'। এখানেই আত্মজীবনীর প্রথম খণ্ডের শেষ। দ্বিতীয় খণ্ডে ছাত্র আন্দোলন, ভিপিগিরি, প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধকালীন সংগ্রাম এসবে দেশের ভাবনার সঙ্গে অব্যাহত থাকে বিজ্ঞান ভাবনা— দেশে ও বিদেশে। আটাত্তর সনে বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্রের (সিএমইএস) প্রতিষ্ঠা করে এ-ভাবনাকে তিনি সংগঠনে রূপ দেন। এসবের মধ্যে জাগরণী কাজের, লেখার, টেলিভিশন অনুষ্ঠানের নানা সৃজনশীল অভিজ্ঞতাকে লেখক জীবনস্মৃতিতে এমন বিস্তারিত আনন্দের কথায় এনেছেন যাতে সবকিছুর চমৎকার এক কথাচিত্র আঁকা হয়ে গেছে। এসবই সব সময় তাঁর অন্তরে বাঁশি বাজিয়েছে আর বিজ্ঞানমুখী এক নতুন তারুণ্য গড়াতে এর অবদান তাঁকে অনুপ্রেরণা দিয়েছে।

ISBN : 978 984 91858 0 2

জীবনস্মৃতিতে
মানুষ দেশ বিজ্ঞান

জীবনস্মৃতিতে

মানুষ দেশ বিজ্ঞান

[প্রথম খণ্ড]

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

উৎসর্গ

আমার মেজভাই ইউনূস ভাইকে (নোবেল বিজয়ী) একেবারে শৈশব থেকে আজ অবধি আমার জীবনে প্রধান রোল মডেল হিসেবে জেনেছি। আমার বোধ হবার পর থেকেই তাঁর নিজের জীবনের বিচিত্র দৃষ্টান্তগুলো কতভাবে যে আমার জীবনকে প্রভাবিত করেছে তা এই বইয়ের পাঠক পদে পদে নিজেই অনুভব করবেন। শুরু থেকে জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ ও উৎসাহ আমার জন্য মূল্যবান পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। আমার জীবনস্মৃতির এই বইটি তাই তাঁর প্রতি উৎসর্গ করলাম।

ভূমিকা

ছোটবেলা থেকে যে কোন আত্মজীবনী পড়তে আমার কাছে ভাল লেগেছে—যখনই পেয়েছি পড়ে শেষ করেছি। বিখ্যাত-অখ্যাত নির্বিশেষে নানা মানুষের নিজের লেখা জীবন-কাহিনী আমার আগ্রহ জাগায়—যদিও অখ্যাতদের আত্মজীবনী পাই কালেভদ্রে। এমনকি কুখ্যাতরাও এর থেকে বাদ যায়না—যেমন হিটলারের 'মাইন ক্যাম্ফ' (আমার সংগ্রাম)। এই ভাল লাগার কারণ কী তা কখনো খুব স্পষ্ট করে বুঝিনি। যাদের জীবনটাই খুব বর্ণিল, অথবা যাদের লেখায় সাহিত্য-গুণ রয়েছে তাদের আত্মজীবনীর আকর্ষণটি বোধগম্য। কিন্তু সাদামাটা ভাবে লেখা কম বর্ণিল জীবন-কাহিনীও তো আমার ভাল লাগে। হয়তো এজন্যই ভাল লাগে যে সব জীবনে প্রচুর গল্প আছে, আর এই সব সত্যিকার জীবন নিয়ে গল্প; আরো বড় কথা—গল্পগুলো শুনছি এর প্রত্যক্ষদর্শীর কাছ থেকে অথবা এর প্রাথমিক শ্রোতার কাছ থেকে, এক রকম তরতাজা থাকা অবস্থায়। অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিজে গল্পের কুশীলবদের একজন, প্রায়শ নিজেই নায়ক বা নায়িকা। তাছাড়া অতীতের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলোতে, অথবা অন্য রকম এক জীবনের রোমান্সের ভেতর নিয়ে যেতে এর যে সক্ষমতা—তাও বা কম কিসের? নানা আত্মজীবনীর পাঠক হওয়াটাই আমাকে আত্মজীবনী লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে। ভেবেছি হয়তো বা এধরনের কারণে অন্যদেরও ভাল লাগবে আমার স্মৃতির গল্প পড়তে, আমার নানা সময়ের অনুভূতির শরীক হতে।

নিজের জীবনস্মৃতি আমাকে সব সময় ভাল সঙ্গ দিয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আনন্দও দিয়েছে। ছোটবেলার স্মৃতিগুলো ভাইবোনদের আসরে স্মরণ করিয়ে প্রায়ই দারুণ মজা পাই—আরো পরের স্মৃতিগুলো বন্ধুদের আসরে। এসব অবশ্য খণ্ড খণ্ড স্মৃতি যা হঠাৎ হঠাৎ মনে পড়ে যায়। কিন্তু আরো ধারাবাহিক ভাবে মাথার মধ্যে যেন রয়েছে একটি গোটা সিনেমার রীল—লিখতে গিয়ে দেখলাম জীবন কাহিনীটি সিনেমার মতই যেন পর্দায় ভেসে ওঠছে। সিনেমার দর্শকের মতো যা

দেখেছি, সেদিনের নিজের মধ্যে যে সব চেতনার অনুরণন লক্ষ্য করেছি—তাই লিখেছি। এর নানা পর্যায়ে যাদের দেখেছি, যাদের সাথে মিশে বা যাদের কথা তখন শুনে মনে দাগ কেটেছিল; যে দেশকে নিয়ে কখনো উচ্ছসিত হয়েছি, উদ্বুদ্ধ হয়েছি, আবার কখনো নিরাশ হয়েছি; যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা পড়ে অন্তরের বীণা বেজে ওঠেছে, আনন্দ অনুভব করেছি, কাজের প্রেরণা পেয়েছি; এ সবের পুনদর্শনটি খুব তৃপ্তিকর। পাঠকের জন্য তা মেলে ধরতে পেরে যে আনন্দ পেয়েছি তা অতুলনীয়।

সব গল্পের একটি মূল সুর থাকে, হয়তো সব জীবনেরও তা থাকে। যদি আমার জীবনের গল্পেও তা খুঁজতে চাই তা হলে হয়তো নানা বিচিত্র বিষয়ে জানতে চাওয়া আর জানাতে চাওয়ার একটি আকুলতা তাতে সব সময় একটি আবহ সংগীতের কাজ করেছে। এটিই খুব ছোটবেলায় আমাকে বড়দের কথা গেলার অভ্যাস করিয়েছে, এটি বইয়ের নেশা ধরিয়েছে, এটিই আবার দ্রুত বিজ্ঞানের দিকে নিয়ে গিয়েছে। তাই আমি ঘুরে-ফিরে এসবের মধ্যে মনের খোরাক খোঁজার চেষ্টা করেছি। তবে জানার বিষয়কে সংকীর্ণ ভাবে দেখিনি—নজর গেছে সব কিছুর দিকে; এমনকি বিজ্ঞানকেও ইতিহাসের সঙ্গে, সাহিত্যের সঙ্গে, সমাজ-সেবার সঙ্গে মিলিয়ে নিতেই বরং বেশি আনন্দ হয়েছে। এ কারণেই আমার জীবনস্মৃতিতে মানুষ দেশ বিজ্ঞান একাকার হয়ে এক রকম মূল সুরের কাজ করছে—বইয়ের শিরোনামটিও তাই সেভাবে দিয়েছি।

হ্যাঁ, খুঁটিনাটির প্রতি আমার একটু দুর্বলতা আছে—কারণ আমার মনে হয়েছে আসল গল্প ওই খুঁটিনাটির মধ্যেই। বড় ব্রাশে যা আঁকা হয় তা হয়তো তথ্য হিসেবে অনেকেরই জানা রয়েছে—ইতিহাসের কথা, রাজনীতির কথা, স্কুল-কলেজের কথা, দেশ-বিদেশের কথা। কিন্তু মজাটি হলো ওই খুঁটিনাটি পর্যবেক্ষণে, বর্ণ-গন্ধ-শব্দের সূক্ষ্ম অনুভূতিতে। তাই এমনকি বেড়াতে যাওয়ার কথা আমার জন্য নেহাত বেড়ানো ছিলনা, বিদেশে থাকা নেহাত সেখানে বাস করা ছিলনা; মন বলতো—ওই নতুনকে বুঝবো, ওই বিদেশকেও বুঝবো। তাই সব সময় অল্প কথাতে গল্প শেষ করা হয়নি, কথাচিত্রের ক্যানভাসটি সাদা কালোতে সরল না হয়ে আলো-ছায়ার ছোপ-ছাপে অধিকতর বাঙময় হতে চেয়েছে। জীবন কাহিনীর নানা জায়গায় একটি মূল সুর হিসেবে বিজ্ঞান এসেছে বলে তারও কিছু খুঁটিনাটি বাদ দেয়ার কথা মনে হয়নি—কারণ বাদ দেয়া মানে বঞ্চিত করা। যেখান থেকে আমি মজা পেয়েছি তার থেকে অন্যকে বঞ্চিত করা কেন? গল্প চলেছে কালানুক্রমিক, কিন্তু তার মধ্যেও এক একটি বিষয়কে খুঁটিনাটিতে নেবার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে কারণ তা আমার অন্তরের বাঁশিকে বেশি বাজিয়েছে অথবা আমার জীবনে বড় ভূমিকা নিয়েছে বলে। বিষয়গুলোকে তাই নানা অধ্যায়ের শিরোনামে বাঁধা হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ একেবারে শুরুতে 'সেই সব প্রথম অনুরণনে' ছোট্ট শিশুর আবছা স্মৃতিতে শৈশব-খেলাধুলায় দ্বিতীয়

মহাযুদ্ধ ও দেশ বিভাগের রেশের প্রবেশ ঘটেছে; 'চুয়ান্নোর রাজনীতির ছোঁয়াতে' ছোটদের কাছেও যুক্তফ্রন্ট একভাবে ধরা দিয়েছে; 'আমার ল্যাবোরেটরিতে' বালক-বিজ্ঞানীর যথেষ্ট মনোযোগে টুকিটাকিকে যন্ত্রে রূপ দেবার মজাটুকু ধরবার চেষ্টা করা হয়েছে; স্কুল থেকে কলেজে যাওয়া সেদিন কত বড় পরিবর্তন ছিল তা কলেজগামী সেই কিশোরের মনস্তত্ত্ব 'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেনে' বর্ণনা না করলে ঠিক বোঝানো যেতনা। বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্র-আন্দোলন, প্রবাসে স্বাধীনতা সংগ্রাম, নতুন দেশ গড়ার আকাঙ্খা—এসব 'আইয়ুব-শাহী ধ্বংস হোক', 'ভিপির ডায়েরি', 'মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশ' ইত্যাদি বেশ কিছু অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে আমার নিজের মত করে নিজস্ব বিনীত প্রচেষ্টাগুলোর কাছে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। ওই সব কিছুতে কখনো দর্শক হিসেবে, কখনো নিজের ভুবনের কর্মী হিসেবে খুঁটিনাটিতেই গল্পের কথাগুলোকে আনার চেষ্টা করেছি।

মনে রাখতে হবে সব গল্প সেদিনের—সেদিনের কথা, সেদিনের ভাবা, সেদিনের চেতনা ও অনুভূতি; এমনকি যে থিওরিগুলো দিয়ে তখন তা বিশ্লেষণ করেছি সেগুলোও সেদিনের। পরে যদি নতুন ভাবে কিছু চিন্তা করেও থাকি সেজন্য পেছনে গিয়ে ওই সব অনুভূতিতে হাত দেবার কোন অধিকার আমার নেই; আজকের থিওরি খাটিয়ে সেদিনের ভাবনাকে পরিবর্তনেরও সুযোগ নেই। সেদিনের বর্ণ-গন্ধ-শব্দ যেভাবে ধরা দিয়েছে সেভাবেই চলেছে আমার জীবনের গল্প। এর বাইরে গিয়ে আমি বড় জোর যাত্রা পালার সূত্রধারের মত মাঝে মাঝে এর সঙ্গে কিছু পূর্ব-কথা যোগ করেছি—আজকের পাঠকের কাছে ঘটনার পটভূমি ধরিয়ে দেবার জন্য। একটি জিনিস হয়তো পাঠকের চোখে পড়বে একেবারে শৈশবের প্রসঙ্গে থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত আমি এতে প্রায়শই গানের কলি ব্যবহার করেছি—কখনো গানের বেশ কয়েক লাইন। এটি আমার অভ্যাসের কারণে করেছি। আমার স্মৃতির অনেকখানি জুড়ে রয়েছে এই গান—যতটা না গান গাওয়ার জন্য তার চেয়ে বেশি গুণ গুণ করে মনের মধ্যে বাজানোর জন্য। ওই ছন্দ, ওই সুর ছাড়া আমার স্মৃতির কথা এগোতে চায়না। যদি পারতাম তা হলে শুধু গানের কথাগুলো নয় সুরটুকুকেও অঙ্গীভূত করতাম এই স্মৃতিকথায়। আসলে যখন লিখছিলাম তখন বেশ শব্দ করেই প্রাসঙ্গিক গানগুলো গাইছিলাম—তাতে সব কিছু আমার সহজে মনে পড়ছিলো।

জীবনস্মৃতিটি আমার হলেও এর রঙ্গমঞ্চটি কিন্তু আমার নয়, আমার চেয়ে তা অনেক অনেক বড়। আমার ভূমিকা প্রধানত দর্শকের ও কথকের মাত্র। কখনো কখনো যে ছোটখাট ভূমিকা-অভিনয়ের সুযোগ এতে পেয়েছি আমার জন্য অবশ্য সেগুলোও ছিল মহা উৎসাহে মাথা ঘুরিয়ে দেবার মতো—তরুণদের নিয়ে আমার কাজের সাফল্য দেখে মনে হয়েছে এই নিয়ে বিশ্ব জয় করতে চলেছি। এমনটি এখনো মনে হয়, তাই আত্মবিশ্বাস নিয়ে জীবন-পথে চলতে পারছি, আর এত খুঁটিনাটি সমেত আমার গল্পটি শোনাতে সাহস করছি। এ গল্প যদি কিছুক্ষণের জন্য

হলেও পাঠককে আনন্দ দিতে পারে, তাকে আমাদের ওই দিনগুলোতে নিয়ে যেতে পারে, আমাদের অভিজ্ঞতার ভাগ দিতে পারে তাহলে এই শোনানো সার্থক হবে।

বই আকারে প্রকাশিত হবার বেশ কিছু দিন আগে এর বিভিন্ন অংশ বিশেষ বাংলাদেশের ছয়টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ঈদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিলো—'কালের কণ্ঠ,' 'বাংলাদেশের প্রতিদিন', 'মানবজমিন', 'সকালের খবর', 'অন্যদিন' এবং 'সাপ্তাহিকে'। পরে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত দৈনিক 'আজাদীতে' প্রতি সপ্তাহে একবার সম্পাদকীয় পাতায় এটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকাগুলোর কর্তৃপক্ষের কাছে আমি এ জন্য কৃতজ্ঞ। এভাবে প্রকাশিত হবার ফলে আংশিক ভাবে পড়েছেন এমন অনেক পাঠকের সাধুবাদ পেয়েছি, দু'একটি তথ্যগত সংশোধনও পেয়েছি যা শুধরে নিয়েছি। ভাল লেগেছে দুই ধরনের পাঠকের মধ্যে এর আদর দেখে। আমার কিছুটা সমসাময়িক যাঁরা, এ লেখার মাধ্যমে নিজেদেরও পুরানো দিনগুলোতে ফিরে যেতে পেরে তাঁরা আনন্দ পেয়েছেন। আবার নতুন প্রজন্মের যাঁরা তাঁদের ভাল লেগেছে অতীতের অজানা জগতকে আবিষ্কার করে—কারণ বড় জোর মোটা দাগের রাজনৈতিক ইতিহাসের মাধ্যমে কিছু কথা শুনে থাকলেও সে যুগের হাসি-কান্না, উচ্ছাস, প্রযুক্তি এ সব অনেক কিছু তাদের কাছে রহস্যময়। অনুজ প্রতিম প্রকাশক মাওলা ব্রাদার্সের স্বত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হক দারুণ উৎসাহে এটি প্রকাশনার কাজ তার হাতে নিয়ে সব সময়ের মতো তার সমর্থন জানিয়ে দিয়েছে।

আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. ভূঁইয়া ইকবাল দুই খণ্ড বইয়ের পুরো পাণ্ডুলিপিটি পড়ে অত্যন্ত যত্ন সহকারে বানান ইত্যাদি মার্জনা করেছেন, ভাষা-রীতিতেও কিছু কিছু ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। আরো বড় কথা এটি নিয়ম করে পড়তে গিয়ে যেখানে যেখানে বিশেষ মজা পেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে আমাকে ফোন করে সেটি নিয়ে উচ্ছসিত আলাপ করেছেন। এরকম অনেক বার আমি তাঁর কাছ থেকে ফোন পেয়েছি। এই পরিশ্রম, এই উৎসাহের জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। আমার অন্য কয়েকজন বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যরা বইটি লিখতে যেভাবে উৎসাহ দিয়েছেন তার জন্যও আমি কৃতজ্ঞ।

জানুয়ারি ২০১৬

মুহাম্মদ ইব্রাহীম

সূচিপত্র

সেই সব প্রথম অনুরণন ১৩
আপন স্কুল থেকে আসল স্কুল ৪৭
স্কুল জীবনের শুরু ৬৪
সদা প্রস্তুত ১০০
চুয়ান্নোর রাজনীতির ছোঁয়া ১২৮
'এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি' ১৪৩
দেব পাহাড়ের উপরে-নীচে ১৬০
বিশালত্বের পাঠশালা ১৭৮
প্রজাতন্ত্র মোবারক ১৯৩
আমার ল্যাবোরেটরি ২১০
কমন রুমের ঐ পারে ২২৯
প্রাচী ২৬৭
প্রবেশিকা ৩১৩
লেডিজ এ্যাণ্ড জেন্টেলমেন ৩৩৩
বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্ম ৩৫৪
পদার্থবিদ্যার আকর্ষণ ৩৭৩
আলোকচিত্র ৩৯৩

সেই সব প্রথম অনুরণন

প্রথম কী মনে পড়ে

জীবনের প্রথম দু-তিন বছরে স্মৃতির ওই আবছা সময়টিতেও দু-একটি ঘটনা এমন ভাবে মনে পড়ছে যাকে নিজের স্মৃতি মনে না করে উপায় নেই। এমনি একটি আদিতম স্মৃতি খুব সম্ভব বছর তিনেক বয়সের। এর মধ্যে আমার পিঠাপিঠি বোন টুনুর জন্ম হয়েছে, সে মায়ের দুধ খাচ্ছে, অথচ আমি এত বড় হয়েও এখনো মায়ের দুধ ছাড়িনি। একদিন শহরের বাড়ির ছাদের কোনায়—যেখানে বিকেলে মা আমাদের নিয়ে বসতেন, তাঁর কোলে বসে মায়ের দুধ খেতে গিয়ে খুব তেতো মনে হলো। 'দুধ তিতা', এই বলে সেই যে মায়ের দুধ ছেড়েছি আর খাইনি। ছাদের কোণে একটু খানি উঁচু করা যে জায়গাতে মা বসেছিলেন সেটি সহ পুরো দৃশ্যটি যেন মনে করতে পারছি। পরে শুনেছি কোন মতেই দুধ ছাড়াতে না পারলে স্তনে 'মুসাব্বির' নামে এক তেতো জিনিস লাগিয়ে নিরুৎসাহিত করাটি নিয়ম ছিল। বস্তুটি যে কী তা অবশ্য কখনো জানতে পারিনি।

প্রায় সমসাময়িক আরেকটি স্মৃতি হলো আব্বা আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে বাসা থেকে গ্রামের বাড়ি যাচ্ছেন। চট্টগ্রাম-কালুরঘাট বাসের 'বাহার সিগন্যাল' (জানালি হাট রেল স্টেশনের আউটার সিগন্যাল) ষ্টপেজে নেমে আমরা তিনজন শুকনা মৌসুমের খালি জমির ওপর পায়ে হাঁটার দাগ ধরে হেঁটে চলেছি—আব্বা, নিশিকাকা ও আমি। নিশিকাকা যোগী সম্প্রদায়ের হিন্দু, আব্বার নিত্য সহচর, তাঁর কাজকর্ম করেন—তবে একরকম ঘনিষ্ঠ বন্ধুও। এমন আসা যাওয়া প্রায়ই হলেও ওই দিনের স্মৃতিটুকু এত স্পষ্ট মনে থাকার কারণ হলো নিশিকাকার কাঁধে ছিল আমাদের নতুন কেনা একটি দেয়াল ঘড়ি। পনরো মিনিট পর পর মিউজিক্যাল সুন্দর ঘণ্টা ধ্বনি তুলে এটি ইতোমধ্যে আমার যাবতীয় মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিল। একটু হেঁটেই ক্লান্ত হচ্ছিলাম বলে কিছুক্ষণ পর পর আমি আব্বার কোলে চড়ছিলাম, আর নামছিলাম; আর ঘড়িটি বরাবর নিশিকাকার কাঁধে।

বোঝাই যাচ্ছে ওই সময় আমাদের গ্রামের বাড়িটিকে সাজিয়ে গুছিয়ে সমৃদ্ধ করা হচ্ছিল, কারণ তখন আমরা গ্রামে থাকছি। এই সমৃদ্ধ করার প্রক্রিয়াতেই একটি আয়োজন শুরু হয়েছিল একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন তৈরির—যার জন্য একটি সেপটিক ট্যাঙ্কও। অর্ধ নির্মিত এখনো ছাদবিহীন দুই কামরা বিশিষ্ট ওই সেপটিক ট্যাঙ্কে বৃষ্টির পানি জমে ছিল; তাতে বেশ কিছু ব্যাঙাচির খেলা আমাকে দারুণ ভাবে আকৃষ্ট করেছিল। অনেক্ষণ ধরে নিবিষ্ট মনে দেখছি কিছু ব্যাঙাচি কী ভাবে নাচানাচি করে এক কামরা থেকে ছিদ্রপথের প্রবাহে অন্য কামরায় যাওয়ার চেষ্টা করছে। ছোট জীবজগতের প্রতি এই প্রাথমিক আকর্ষণের স্মৃতিটিও আমার সব চেয়ে পুরোনোগুলোর একটি।

মহাযুদ্ধের নানা রেশ

১৯৪৫ সনের একেবারে শেষ ভাগে যখন আমার জন্ম তার মাত্র মাস চারেক আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। আসলে আমার জন্ম গ্রামের বাড়ি হাটহাজারি থানার বাথুয়াতে হবার কারণই ছিল তার বেশ কিছু আগে জাপানি বোমার ভয়ে পরিবারের শহর ছেড়ে গ্রামে চলে যাওয়া। চট্টগ্রামের ব্যবসায়িক কেন্দ্র খাতুনগঞ্জের কাছে বক্সীর হাটে আমাদের দোকান ও বাসা। ঠিক তার কাছেই আব্বার এক বন্ধুর বাসার দেয়াল ভেঙ্গে পড়েছিল বোমার বিস্ফোরণে। তা ছাড়া খাতুনগঞ্জে হামিদউল্লা মিয়ার বাজারে মরিচের ঝুড়িতে বোমা পড়ে তা বিস্ফোরিত না হয়ে মরিচ সহ মাটিতে দেবে গিয়েছিল। তারপর তো আর শহরে পরিবার রাখা যায়না। গ্রামের বাড়ি শহরের বেশ কাছে। আব্বা বাসে আসা যাওয়া করে দোকান করতেন, কখনোবা সাইকেলে। যুদ্ধশেষে আমরা শহরে ফিরে এসেছিলাম। কিন্তু পরে আবার দীর্ঘ দিন গ্রামেও থেকেছি।

আমার শৈশবে তাই মহাযুদ্ধের অনেক রেশ থেকে গিয়েছিল। যুদ্ধের চিহ্ন হিসেবে সবচাইতে বাস্তব জিনিসটি ছিল বাসার ছাদে কিছু ফুলের টব। যুদ্ধের পর পর অনেক পরিত্যক্ত মিলিটারি সরঞ্জাম পানির দরে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। আব্বা সেখান থেকে কিছু বোমার খোল কিনেছিলেন—টব হিসেবে ব্যবহারের জন্য। বিমান থেকে ফেলার পর যেই পজিশন করে বোমা পড়ে, টব হিসেবে তাকে বসানো হয়েছিল তার ঠিক উল্টো পজিশন করে লেজের তিনটি পাখনার (ফিন) উপর—বাতাসের মধ্য দিয়ে বোমার পতনকে মসৃণ করার জন্য যেগুলো থাকে। চোঙার মত ওপরের দিকে বড় হয়ে যাওয়া বোমার খোলটির মধ্যে মাটি ভরা হয়েছিল। কেন জানিনা নিচে ছোট একটি ছিদ্রও ছিল যার মধ্য দিয়ে টবের অতিরিক্ত পানি ঝরে যেতে পারতো।

মহাযুদ্ধের থেকে-যাওয়া বাস্তব নমুনাগুলোর চেয়ে এ সম্পর্কে গল্পের রেশ ছিল আমাদের কাছে অনেক বেশি প্রিয়। আমি এ সম্পর্কে সব চেয়ে বেশি গল্প শুনেছি আমাদের বাসার বাবুর্চি আশার বাপ দাদুর কাছে; তিনি আমাদের গল্প

দাদুও ছিলেন। তাঁর বাড়ি সাতকানিয়ায়, আরাকান রোডের (চট্টগ্রাম-কক্সবাজার রোড) পাশে। বলা হয় বাংলার মোগল সুবাদার শাহ সুজা তাঁর ভাই আওরঙ্গজেবের সৈন্যবাহিনীর তাড়া খেয়ে আরাকানে পালাবার সময় এই রাস্তা নির্মিত হয়েছিল। এ কাহিনী সত্য হলেও সেই রাস্তার অস্তিত্ব এত দিনে বিলীন হয়ে এসেছিল। বর্তমান আরাকান রোডকে দ্রুত উপযুক্ত করে নিয়েছিল বৃটিশরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রয়োজনে। বার্মা দখল করে জাপানিরা তখন ভারত আক্রমণের পাঁয়তারা করছে। সে জন্যই তারা চট্টগ্রামে বোমা বর্ষণ করছিল। জাপানি সৈন্য সমাবেশ করার আশঙ্কা ছিল আরাকান-চট্টগ্রাম সীমান্তে, যেমনটি আক্রমণ হয়েছিল মণিপুরের ইম্ফলে (১৯৪৪)। সেই আশঙ্কা থেকেই মিত্রবাহিনী দ্রুত এ সীমান্তে সৈন্য ও অস্ত্রের যোগান বাড়িয়ে চলেছিল। চট্টগ্রাম-দোহাজারি রেল লাইনটিও এজন্য দ্রুত গড়ে তোলা হয়—দোহাজারিতে শঙ্খ নদীতে বাধা পেয়ে ওখানে তৈরি হয় রেইল-হেড। নদী পার হয়ে বাকি পথ সৈন্যরা অতিক্রম করেছে আরাকান রোড দিয়ে একেবারে আরাকান সীমান্ত পর্যন্ত। আশার বাপ দাদু খুব নাটকীয় ভাবে আরাকান রোড ধরে নানা ধরনের সামরিক বাহনে সৈন্য চালনার বর্ণনা দিতেন। একই কথা ঠিক এইভাবে বহুবার বলেছেন : '...যেদিন কালোরা যেত শুধু কালোরাই যেত—একেবারে কুচকুচে কালো (এই ফ্রন্টের যুদ্ধে ইস্ট আফ্রিকান কয়েকটি রেজিমেন্টও ছিল)। সেদিন গোরারা যেত সেদিন শুধু গোরাই যেত সব ধবধবে সাদা। এক মুহূর্তের জন্য বিরাম নেই—সৈন্যের গাড়ি, কামানের গাড়ি চলছে তো চলছেই...'। বহুদিন পর কলেজে পড়ার সময় চার্চিলের চার খন্ডে লেখা 'দি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার' বইটিতে এই সেক্টরে সৈন্য সরবরাহের জন্য 'রেইল-হেড দোহাজারি' প্রসঙ্গে তিনি যা লিখেছেন তার সঙ্গে আশার বাপ দাদুর বর্ণনার যথেষ্ট সঙ্গতি খুঁজে পেয়েছি। আমার বড় বোনের (বুবু) শ্বশুরবাড়ি চট্টগ্রামের শহরতলি বাদুরতলাতে। তাঁদের বাড়ির ঠিক সামনে পুকুরের পাড়ে এসে আরাকান রোডটি একটি কড়া বাঁক নিয়েছে। শৈশবে বহুবার বুবুর বাসার লোকদের বলতে শুনেছি সে সময় দলে দলে সাহেব সৈন্যরা মোটর সাইকেল এত জোরে চালাতো যে এই বাঁকে তাল রাখতে না পেরে পুকুরে গিয়ে পড়তো—অনেক মোটর সাইকেল নাকি ওই পুকুরে জমেছে। আমার শিশু ভাবনায় মনে হতো ওই পুকুরে নামতে পারলেই অনেকগুলো মোটরসাইকেল খুঁজে পেতাম।

যুদ্ধের আর এক ধরনের গল্প নানা জনের মুখে মুখে তখন ছিল। তা হলো রেঙ্গুনে ও আকিয়াবে জাপানি বোমা নিক্ষেপ হলে, এবং বার্মা জাপানিদের হাতে পড়ার উপক্রম দেখা দিলে, দলে দলে সেখানকার অভিবাসী চট্টগ্রামের মানুষদের হেঁটে দেশে ফেরার করুণ কাহিনী। সবারই কোন-না-কোন আত্মীয়স্বজন এই 'ইভেক্যুই'দের অন্তর্ভুক্ত ছিল, আমাদেরও ছিল। সেখানে সেই অরাজকতার সুযোগে বর্মি দস্যুরা (বলা হতো মগরা) পথে পথে কীভাবে তাদের আক্রমণ করে

কচুকাটা করেছে, সর্বস্ব কেড়ে নিয়েছে এটি সেই কাহিনী। আমার শিশু মনে বিশেষভাবে দাগ কেটেছিল শুধু কলাগাছের শাঁস (চাটগেঁয়ে ভাষায় বলে বকলি) চিবিয়ে চিবিয়ে কেমন করে তাঁরা বেঁচে এসেছেন তার গল্প। আমাদের গ্রামে বিষয়টি এমন উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিল যে এর তিক্ত স্মৃতির সুযোগে বহুদিন পরেও গ্রামে মাঝে মাঝে রব উঠতো মগ দস্যুরা আরাকান রোড ধরে আমাদের গ্রামের অদূরে বামনা হাট পর্যন্ত চলে এসেছে মানুষ কাটতে কাটতে। এই বামনা হাট'টি যে কোথায়, কতদূরে তা কখনো আমার জানা হয়নি। আশার বাপ দাদুর তখন শেখানো আর একটি জিনিস আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে। আরাকানের রোহিঙ্গাদের চাটগেঁয়ের সঙ্গে আমাদের চাটগেঁয়ে শব্দ ও বলার ভঙ্গিতে কী রকম পার্থক্য তা তিনি মজা করে বলে দেখাতেন। দাদুর শেখানো সেই রোহিঙ্গা টানে আমি এখনো কিছু কথা বলতে পারি। যেমন তাঁর একটি উদাহরণ ছিল : 'বড়দা তুমি আমি একত্র হবো' এই কথাটি আমরা বলি 'বদ্দা তুঁই আঁই অত্তর অইয়ম' আর রোহিঙ্গারা বলে 'বদ্দা তুঁইয়ে মুঁইয়ে দলা অইয়ম'।

তবে শিশুদের যুদ্ধের রোমাঞ্চ গল্পেই থেমে যাবে কেন। শৈশবে বেশ কিছুদিন পর্যন্ত আমরা ছোট ভাইবোন ক-জনের মধ্যে এ নিয়ে কয়েকটি খেলা আমরা বানিয়ে নিয়েছিলাম। 'গাড্ডা' মে ঢুকো' নামে একটি খেলার প্রবক্তা ছিল কাজের ছেলে ইসলাম—মোটামুটি যার শাসনেই আমাদের দিন কাটতো। সে দাবি করতো যে সে আগে (যুদ্ধের সময়) আসামের ডিগবয়ে থাকতো যেখানে আমাদের গ্রামের অনেক মানুষ তেলের রিফাইনারিতে কাজ করতো। জাপানি বিমান সেখানে প্রায়ই হানা দিত আর সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে গর্তে (ট্রেঞ্চে) আশ্রয় নিতে হতো। ইসলামের এসব দাবির সত্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন তোলার কারণ বা সুযোগ আমাদের ছিলনা। বোমা ফেলার জন্য শত্রু বিমান মাথার ওপর এসে পড়ার আগেই রাডারের পর্দায় তা টের পেয়ে যায় বিমান আক্রমণ প্রতিরক্ষা বাহিনী। ওরা যখন বিমান বিধ্বংসী কামান দাগার জন্য প্রস্তুত হয় সাধারণ বেসামরিক জনগণকে রক্ষার জন্য সচল হয় সিভিল ডিফেন্সের মানুষেরা। তারা চারদিকে সাইরেন বাজিয়ে দিত সবাইকে সতর্ক করে দিতে—সবাই যেন দ্রুত ভূমিতে গর্ত করা আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে চলে যায়। সতর্ক করার জন্য এই সাইরেন বাজানো হতো বার বার শব্দের ওঠা-নামা করিয়ে। অনেকে আশ্রয় নিতে গড়িমসি করতো বলে সিভিল ডিফেন্সের লোকেরা তাদেরকে মুখেও বার বার অনুরোধ করতো আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যাবার জন্য। যতক্ষণ বোমা পড়তো, বিস্ফোরণ ঘটতো, চারদিকে মারাত্মক সব লোহার টুকরা ছড়িয়ে পড়তো ততক্ষণ ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হলেও গর্তের মধ্যে মানুষ নিরাপদ থাকতো। তাড়া খেয়ে আক্রমণকারী বিমান ফেরত গেলে এবং আপাতত বিপদ দূর হলে বাজতো অন্য রকম 'অল ক্লিয়ার' সাইরেন—এবার শব্দ একটানা, ওঠা-নামাহীন, একঘেঁয়ে, যেন কোন তাড়া নেই। তখন সবাই গর্ত থেকে বের হয়ে আসতে পারতো। আমাদের খেলাটি ছিল নাক ও মুখের অদ্ভুত ওঠা-নামা করা

শব্দে ইসলাম বিমান আক্রমণের সাইরেন দিত, আর আমরা সবাই ব্যস্ত সিভিল ডিফেন্স কর্মীদের মত বলতে থাকতাম 'গাড্ডামে ঢুকো' 'গাড্ডামে ঢুকো'...। একই সঙ্গে আমাদেরকে চৌকির তলা সহ নানা জায়গায় ঢুকে পড়তে হতো। আমার প্রিয় কৌশল ছিল আপাদমস্তক লেপ মুড়ি দিয়ে দেয়া। যতক্ষণ না একটানা 'অল ক্লিয়ার' সাইরেন সে না বাজাত ততক্ষণ ওখান থেকে বের হওয়ার নিয়ম ছিলনা।

শহরের বাসা

আমার জন্মের কিছুদিন পরেই আমাদের পরিবার আবার শহরে ফিরে আসে—যদিও এর পরও মাঝে মাঝে সবাই গ্রামের বাড়ি গিয়ে কিছুদিন থেকে আসতাম। তাছাড়া চান্দগাঁয়ে নানার বাড়ির গ্রামেও আমাদের নিয়ে মা এভাবে কাটিয়ে আসতেন। তবে চট্টগ্রাম শহরের বক্সীর হাট রোডের সেই দোকান এবং বাসাটিই ছিল আমার ও ছোট ভাইবোনদের শৈশবের কেন্দ্রবিন্দু, (শেফালি ঘোষের 'বক্সীর হাইট্টা ফানর খিলি তারে বানাই খাবাইতাম' গানটির কল্যাণে অনেকে হয়তো এই রাস্তাটির কথা শুনেছেন)। শুধু দোকান ও বাসা নয়, এটি একটি ছোটখাট কারখানাও ছিল—স্বর্ণালঙ্কার তৈরির কারখানা; সবই খুব ছোট্ট পরিসরে। শুনেছি আমি যখন খুব ছোট তখন এটি একেবারেই ছোট ছিল। আমার জ্ঞান হবার পর অন্তত বাসার দিকটা দোতালা হওয়াতে দোতলায় 'মায়ের কুল', 'রেডিয়ো কুল', এবং 'বড় কুল' এই তিনটি কামরা (চাটগেঁয়ে ভাষায় কুল মানে কামরা); তাছাড়া মায়ের রান্নাঘর ও সিড়ির কাছে খানিকটা জায়গায় পাটি বিছিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আর ছিল সেই ছাদ—ছোট্ট এক চিলতে ছাদ, কিন্তু তাই ছিল আমাদের শিশুদের বিশাল জগত—পাখি দেখার, আকাশ দেখার, আর আশপাশের প্রকৃতি দেখার এবং মুক্ত হাওয়ায় খেলাধূলা করার। মায়ের কুলটি মায়াময় হয়েছিল মায়ের শিল্পকর্মের স্থান হিসেবেও। রেডিয়ো কুলে হয়তো এক কালে একটি রেডিয়ো ছিল, কিন্তু আমার জ্ঞান হবার পর থেকে তা আর ছিলনা, ওটি ছিল নেহাত শোয়ার ঘর। বড় কুলটি ছিল সব চেয়ে বড় আর তা ছিল দিনে আমরা শিশুদের খেলাঘর এবং রাতে এক সঙ্গে শোয়ার ঘর। আমার পুরো শৈশব জুড়ে থাকা এই আবাসটি জীবনের বহু আনন্দ-বেদনার স্মৃতি, বহু রহস্য ও বহু মুগ্ধতার লীলাভূমি হিসেবে আজও মাথার মধ্যে গেঁথে রয়েছে।

এর একটি বিস্তৃতিও ছিল নিচের তলায় সামনে দোকানে, তার পেছনে আমাদের পড়ার জায়গায়, তারও পেছনে স্বর্ণকার কারিগরদের কারখানায়। ওখানেও ছিল আমাদের জন্য অনেক অনেক রহস্য। আর ওই যে আশার বাপ দাদু—(এবং নানা সময়ে তাঁর বদলে অন্য কোন বাবুর্চি ও কর্মী) তাঁর অধীনে ছিল আর একটি রান্নাঘর—বারান্দার মত এক চিলতে জায়গায়—প্রধানত দোকানের কর্মচারীদের খাবার তৈরির জন্য, যাদের মধ্যে আমার খালু, মামা এঁরাও এক এক

সময়ে ছিলেন। পরে আমরাও সবাই এই রান্নাঘর থেকেই খাবার খেতাম, বাবুর্চির রান্নায়। একই বাসায় আলাদা থাকতেন আমার চাচারা—বড় চাচারা আলাদা দোকানদারী করতেন একই দোকানের একটি অংশে। ছোট চাচারা ছাত্র ছিলেন, অনেকটা আমার বড় দুই ভাইয়ের সমসাময়িক। সবাই মিলে বৃহত্তর পরিবারটি নেহাত কম বড় ছিল না—একেবারে শিশু অবস্থা থেকেই আমরা সব সময় একটি জমজমাট আড্ডার পরিবেশে ছিলাম—সেটি আমার শিক্ষায় ও বেড়ে ওঠায় বড় প্রভাব রেখেছিল। এমনকি বণিক সম্প্রদায়ের যে হিন্দু কারিগরদের টুকটাক শব্দের মধ্যেই আমরা থাকতাম—তাঁরা ছিলেন আব্বার ঘনিষ্ঠ বন্ধুস্থানীয়। আমাদের শিশুদেরও খুব কাছের এবং শ্রদ্ধার মানুষ ছিলেন তাঁরা। তাঁদের কাছ থেকেও অনেক শিখেছি।

বাড়ির আর একটি জায়গা যেখানে সময় কাটানো ছিল আমাদের জন্য খুবই মজার—তা হলো দোতলায় বড় কূলের সামনের সরু রেলিং দেয়া বারান্দা। সেখান থেকে নির্বিঘ্নে রাস্তার যাবতীয় কর্মকাণ্ড দেখা যায়। আর তার নিচে দোকানের সামনের বারান্দাটি তো একেবারে রাস্তার শামিল—সেখানে যতক্ষণ আছি সে তো রাস্তার ও দোকানের সঙ্গে প্রায় একাকার হয়েই আছি। ও-তো রাস্তা নয়, বরং আমাদের শিশুদের কাছে রীতিমত জীবনের রঙ্গমঞ্চ—প্রত্যেক মুহূর্তে অভিনীত হয়ে চলেছে নিত্যনতুন মজার মজার নাটক। অনেক সাধারণ পথচারীদের মধ্যে বিশেষ ভাবে আমাদের নজর কাড়তো নানা ভঙ্গির নানা আওয়াজের ফেরিওয়ালা, ভিক্ষুক, সাধু-সন্ন্যাসী, এবং পাগল। তাছাড়া পণ্যবাহী ট্রাক, রাস্তার জ্যাম, ঝগড়া-গালাগালি এসবতো চলতেই থাকতো।

আমাদের দোকানের বারান্দার কিনারাতেই বসতেন একটি বাক্সের ওপর পান-বিড়ির দোকান নিয়ে তরুণ মোহাম্মদ—আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তিনি আমাদের আপন লোক ছিলেন, রাতে তাঁর বাক্সটি আমাদের দোকানের ভেতরেই রাখতেন। মোহাম্মদের দোকান থেকে আমাদের দোকানে নিত্য পান-বিড়ি-সিগারেট সরবরাহ হতো বিশেষ বিশেষ ক্রেতাদের জন্য। তা ছাড়া রাস্তায় প্রচুর মানুষ তাঁর খদ্দের হতো। আমি অনেক অলস সময় সেই কেনা-বেচা দেখতাম। একটি লম্বা সরু দড়ির আগাটি সারাদিন খুব মৃদু ধিকি ধিকি আগুনে জ্বলতো—বিড়ি বা সিগারেট ওখানে লাগিয়ে মুখে টান না দিলে বোঝাই যেতো না যে ওখানে আগুন আছে। জ্বলতে জ্বলতে দড়ির দৈর্ঘ খুব ধীরে কমে আসতো বটে, কিন্তু দিনের মধ্যে শেষ হতো না। মোহাম্মদের পানগুলো ছোট ভেজা লাল শালু কাপড় দিয়ে ঢেকে তাজা রাখা হতো, মাঝে মাঝে তাতে পানিও ছিটানো হতো। মোহাম্মদ যে নিপুণতার সঙ্গে পানের খিলি বানাতেন তা মনোযোগ দিয়ে দেখতাম—সযত্নে চুন লাগানো হতো সেই সঙ্গে খয়ের; তারপর সুপারি, কখনো অনুরুদ্ধ হলে জর্দা মেশানো হতো। পুরো পান, অর্ধেক পানের খিলি হতো। বিড়ির ক্রেতা বেশি ছিল, সিগারেটের এতটা নয়। তবে বেশ কয়েক রকমের সিগারেট

ছিল—কাঁচি (সীজার্স), বগা (কিং স্টর্ক), পাশিং শো (পাসিং শো—হ্যাট পরা মানুষের ছবি) এগুলোই বেশি চলতো, আর দামি সিগারেট ক্যাপস্টান (জাহাজের নোঙ্গর বাঁধার খুঁটির ছবি), আর গোল্ড ফ্লেক (বেশ কয়েকটি স্বর্ণ মুদ্রার ছবি)। এগুলোর প্যাকেটের ছবির খুঁটিনাটি আমার খুব পরিচিত ছিল, কারণ ওগুলোকে তাসের মত কেটে নিয়ে আমরা এক রকমের তাস খেলতাম। মোহাম্মদের দোকানে আমার সব চেয়ে আগ্রহের পণ্যটি ছিল সোডা ওয়াটার। চট্টগ্রামের সিনহা এণ্ড কোম্পানির তৈরি এই কার্বনেটেড ওয়াটার মিষ্টি গ্যাসওয়ালা পানি—আজকের কোকা কোলা ইত্যাদির দেশীয় পূর্বসূরি। আগ্রহের অনেকখানি কারণ যন্ত্র দিয়ে এর ছিপি খোলার সময় ফস্ করে শব্দ হতো, আর বোতল ছাপিয়ে ফেনা ফুলে উঠতো। কালেভদ্রে এর স্বাদ নেবার সুযোগও হতো।

রাস্তার ধার ঘেঁষে বারান্দায় প্রায় স্থায়ীভাবে থাকা আর একটি হকার দোকানের আমি নিত্য দর্শক ছিলাম; সেটি হলো আমাদের দোকানের এক দোকান পর বাদশা মিয়া সওদাগরের বারান্দায় ফকির খলিফার দোকান। তাঁর নামটিই ফকির ছিল নাকি চেহারার জন্য ফকির বলা হতো তা কখনো জিজ্ঞেস করিনি। তিনি তাঁর মতই প্রাচীন একটি পায়ে-চালানো সেলাই মেশিনে শুধু টুপি সেলাই করতেন চৌকির মত সামান্য উঁচু একটি পাটাতনের ওপর একটি টুলে বসে। সামনে দু'টা টুল থাকতো, খালি থাকলে তার একটিতে বসে আমি তাঁর কাজ দেখতাম। লম্বা চুল ও দাড়িতে তাঁকে ফকিরের মতই মনে হতো, ওই চুলের উপরে থাকতো তাঁরই তৈরি একটি টুপি। তাঁর তৈরি সব টুপিই সাধারণ সাদা কাপড়ের টুপি, কিনারায় দিকে সাদা সুতাতেই একটু কাজ করা। এই টুপিই আমার আব্বা, মামা, খালু পরতেন, অন্য অনেকেও পরতেন—তাই বেশ চাহিদা ছিল। ঈদের সময়, বলতে গেলে পুরো রোজার মাস ফকির খলিফা অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতেন—রাত দিন কাজ করতে হতো তাঁকে। ফকির খলিফার দোকানের সামনে আরো একজনকে প্রায়ই দেখতাম—তিনি হলেন রহমতউল্লাহ নামের ফাইফরমাশ খাটার এক তরুণ। সাধারণত টুলের ওপর বসে থাকতেন, আশে পাশের দোকানদাররা চা আনতে বা এরকম কোন কাজে তাঁকে লাগাতেন। তাঁর বোধ হয় কিছুটা মানসিক প্রতিবন্ধিতা ছিল যে কারণে কেউ কিছু বল্‌লে তিনি তা পুনরাবৃত্তি করতেন। যেমন অনেকেই এসে বলতো 'এই রহমতউল্লাহ, কেমন আছ?' তিনি খুব বিনীত ও শান্ত ভাবে বলতেন 'এই রহমতউল্লাহ, কেমন আছ'। 'ভাত খেয়েছে তো?' রহমতউল্লাহ ওভাবেই বলতেন 'ভাত খেয়েছো তো'। অন্যরা নিজে লেফ্‌ট রাইট করে পা ফেলে তাঁরও তা করার কারণ ঘটাতো। এমন শান্ত সাদাসিধা ও পরিশ্রমী মানুষটিকে এভাবে কষ্ট দেয়া হতো।

রাস্তার নিত্য রঙ্গমঞ্চে চটকদার মানুষ ছিল নানা ফেরিওয়ালারা—প্রধানত তাদের বিচিত্র পণ্য ও তা নিয়ে হাঁকের কারণে। আমার কাছে বেশি প্রিয় ছিল কাঁধে একটি বাঁশের দুদিকে দুটি খাঁচা ঝুলিয়ে তাতে কবুতর বিক্রি হেঁটে হেঁটে।

খাঁচার ভেতর কবুতরগুলো দেখা যেত—কবুতরওয়ালা হাঁক দিত 'কইতুরের বাচা', চাটগেঁয়ে ভাষায় বাচা মানে বাছা যা আদর করে ছোট শিশুদেরকেও সবাই বলতো। আব্বা প্রায়ই বলতেন আমি নাকি খুব ছোট বেলায় আধো আধো বোলে বলতাম : 'কইতুরের বাচাও বাচা, আঁইয়ো (আমিও) বাচা'। আমাদের দোকানের ঠিক সামনেই রাস্তা থেকে বের হয়েছে একটি গলি যার মধ্যে কাঠকয়লা ওয়ালারা বসতো। সে সময় চুলা ইত্যাদি জ্বালাবার জন্য এবং ওই এলাকায় স্বর্ণের কাজের জন্য ফারনেস জ্বালাতে কাঠকয়লার খুব ব্যবহার ছিল। কাঠকয়লার গুড়োকে ঝোলা গুড়ের বাইন্ডার দিয়ে মেখে শক্ত করে খুব ছোট কাবাবের আকৃতির 'টিক্কা' তৈরি হতো। এগুলো হুঁক্কা বা ডাবার তামাক পুড়তে কলকের মধ্যে ব্যবহার করা হতো—অনেক্ষণ ধরে জ্বলতো। টিক্কাওয়ালা হাঁক দিয়ে যেতো 'টিক্কা লইবা লও টিক্কা'। কথার চেয়েও হাঁকের ব্যতিক্রমধর্মী আওয়াজটিই ছিল হকারদের প্রধান আকর্ষণ। একটি রিক্সা ভ্যান গাড়িতে একজন পাঠান কিসমিস, বাদাম, আখরোট ইত্যাদি শুকনা ফল বিক্রি করতো—নাকি সুরে তার উর্দু-বাংলা মেশানো হাঁক ছিল 'পাকিস্তানি মেমা সে ভা'—বোঝানো হতো পাকিস্তানি মেওয়া আছে ভাই। আর একজন একটি খুব লম্বা বাঁশের সঙ্গে নানা পণ্য ঝুলিয়ে তা কাঁধে নিয়ে ঘুরতো 'হরেক মাল এক আনা, চুলের ফিতা এক আনা, ঘটি বাটি এক আনা' ইত্যাদি বলে। তাঁর হাঁকের শেষ কথাটিতে খুব দীর্ঘ পাজামার নেয়ার দেখিয়ে বলতো 'উম্মা রেম্মা (মাগো মা) কদ্দূর লম্বা এক আনা'। এক আনায় বিক্রি হতো আর একটি জিনিস—খুবই জড়ানো কণ্ঠে এর বিক্রেতা বলতো 'এ-ক আনার পঁচিশ উয়া সুঁচ' (পঁচিশটি সুঁচ), সে যুগের তুলনায়ও যথেষ্ট সস্তা ছিল বৈকি। ষোল আনায় হতো এক টাকা। চার পয়সায় এক আনা। এক আনা, দু'আনা, চার আনা (সিকি) এবং আট আনার (আধুলি) মুদ্রা ছিল। এক পয়সা, দু পয়সারও ছিল। এক পয়সার মুদ্রার মাঝখানে ছিদ্র ছিল বলে কিছুটা তুচ্ছার্থে আমরা একে বলতাম 'কানা পইসা'। ছিদ্র থাকার একটি সুবিধা ছিল দোকানদাররা একটি খাড়া শলাকার মধ্যে ছিদ্রের সুযোগে একটির পর একটি পয়সা ঢুকিয়ে রেখে এক সঙ্গে অনেক পয়সা জমিয়ে রাখতে পারতো। নানা বিচিত্র পণ্যের মধ্যে একটি ছিল নেহাত ছোট্ট ব্যক্তিগত যত্ন নেবার জিনিস—কিন্তু বিক্রেতার পোষাক ও তার হাঁকের কারণে খুবই মজার। এর হকার মাঝবয়সী হয়েও পরতেন ঢোলা একটি হাফ প্যান্ট, গায়ে গেঞ্জি এবং মাথায় গুর্খা সৈন্যের টুপির মত একটি কিনারাওয়ালা টুপি। বিক্রি করার হাঁক ছিল 'কান কুরকুরানি ভাল ভাল জিনিস—দাঁতের কানের ইনজেকশান'। এটি কানের ময়লা পরিস্কার ও দাঁত খিলান—একের ভেতরে দুই যন্ত্র, উভয়েই ইঞ্চি দুয়েক লম্বা সরু শক্ত তারে তৈরি। একটির আগা চ্যাপটা করে অতি ক্ষুদ্র কোদালের আকৃতিতে রূপ দেয়া যা দিয়ে কানের ময়লা পরিস্কার করা যায়, আর অন্যটির আগা চ্যাপটা করে দাঁতের খিলানে রূপ দেয়া হয়েছে। ছোট্ট আংটা দিয়ে উভয়ে সংলগ্ন; দাম দুই আনা।

উশকো খুশকো চুল দাড়ি নিয়ে সগির পাগলা হেঁটে হেঁটে বিক্রি করতেন শীতের গরম কাপড়—নানা কোট, এমন কি ওভার কোটও; গরম কালেও বিক্রি করতেন তা। শীত-গ্রীষ্ম নির্বিশেষে তাঁর পরনেও থাকতো একটি ওভারকোট—বাকি কোটগুলো তাঁর হাতে বা কাঁধে। 'বারো টাকা, বারো টাকা, বারো টাকা'—বলতে বলতে তাঁকে এক বার দেখতাম বক্সীর হাট রোডের এদিক থেকে ওদিকে যেতে, আবার ওদিক থেকে এদিকে। তাঁর সব কোটের দাম বারো টাকা।

যে ফেরিওয়ালাদের আমরা আরো একটু ঘনিষ্ঠ ভাবে লক্ষ্য করতাম তারা হলো খাবারের ফেরিওয়ালা। আমার আগ্রহ বেশি ছিল আইসক্রীমওয়ালার প্রতি। দু'রকমের আইসক্রীমওয়ালা ছিল। কেউ কেউ চাকার উপর ঢাউস বাক্সের মত আইস বক্স ঠেলে বেড়াতো—'আইসক্রীম, আইসক্রীম' বলতে বলতে। কোম্পানির নাম ছিল 'মোগল আইসক্রীম'। আইসক্রীম হতো শুধু দুরকমের। উভয়ে লম্বা চ্যাপ্টা কাঠির উপর লাগানো প্রিজম আকৃতির, ধরার জায়গাটি ছাড়া আগাগোড়াটি আইসক্রীম। এক আনা দামেরটি একটু শক্ত বেশি, কারণ এতে আইস বেশি, ক্রীম কম; তাই কাঠির উপর আইসক্রীম টেকে বেশি। দু'আনা দামেরটিতে ক্রীম বেশি তাই একটু নরম, দ্রুত খেয়ে নিতে হয়, তবে স্বাদ অনেক ভাল। একই জিনিস অন্য আইসক্রীমওয়ালারা বয়ে বেড়াত দুহাতে দুটি বড় মুখওয়ালা বড় থার্মোফ্লাস্কে। কাঁধে বাঁশের দুই প্রান্তে ঝোলানো দুটি বড় হাঁড়ি নিয়ে চলতো মাডাওয়ালা—'মাডা, মাডা' হাঁক দিয়ে; চাটগেঁয়ে ভাষায় মাডা মানে ঘোল। তার এক হাড়িতে থাকতো ঘোল, আর অন্যটিতে পানির ভেতর ডোবানো ছোট ছোট কাচের গ্লাস। কেউ খেতে চাইলে রাস্তার পাশে বোঝা নামিয়ে হাড়ি থেকে গ্লাস বের করে ঘোল দিত, খাওয়ার পর ওই পানি দিয়ে একটু ধুয়ে আবার হাড়িতে গ্লাস রেখে দিত। দু'জন মিষ্টান্ন বিক্রেতার প্রতি আমার বেশি পক্ষপাতিত্ব থাকতো। তাদের একজন বয়সে তরুণ, প্যান্ট পরা, গলার ডাকে জোর বেশি—'শন পাপড়ি, শন পাপড়ি' ডাকে মাতিয়ে তুলতো। অন্যজন বয়োবৃদ্ধ, শার্ট ও ধুতি পরা, গলায় ঝোলানো তাঁর কাচ দেয়া ছোট টিনটি বুকের উপর থাকতো। তিনি খুবই অস্ফুষ্ট স্বরে বলতেন 'পেড়া, ভাল খাবার'—যে কথা খুব কাছে না গেলে ভাল করে শোনা যেতনা। তাঁর পেড়া নামের মিষ্টিটি গোলাকার হাতঘড়ি আকৃতির, ওপরে একটি তারা চিহ্ন স্টাম্প করা থাকতো—স্বাদ সন্দেশের মত চমৎকার। নির্দিষ্ট জায়গায় নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বসতো বলে খাবারের যে বিক্রেতাকে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করতে পারতাম তাঁর অবদান 'বাদশা মিয়ার খানা'। বিকেলের দিকে আমাদের দোকানের ঠিক পাশের বদিউর রহমান সওদাগরের দোকানের সামনে একটি বড় ডেগচিতে তৈরি হয়ে আসতো এটি। মূলত পেঁয়াজ মশলা ইত্যাদি দিয়ে রান্না করা চানা বুট—সযত্নে চামচ সহ ছোট ছোট প্লেটে পরিবেশন করা হতো। কিছুক্ষণ পর পরই বিশেষ সুরে হাঁক আসত 'বাদশা মিয়ার খানা, চলে গেলে আর পাবানা'—সেই সঙ্গে ডেগচির ঢাকনাটি

সামান্য তুলে এমন কায়দায় ঝন ঝন শব্দে ডেগচির উপর আবার ফেলে দেয়া হতো যে তা বেশ কয়েক মুহূর্ত অনুরণন সৃষ্টি করে বিশেষ পারকাশন মিউজিক তুলতো। এই হাঁক, এই মিউজিক, আমাদের খুব পরিচিত ছিল। সত্যি সন্ধ্যার পর পর ওই বিরাট ডেগচিটি খালি হয়ে আসতে দেখতাম।

দোতলার বারান্দার আমাদের ওই পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে স্পষ্ট ভাবে দেখা যেত রাস্তার উল্টা দিকের দোকানের ক্রেতা বিক্রেতাদেরকেও। অবশ্য একটি বড় সময় কাটতো আমাদের নিজেদের দোকানে ক্রেতাদের মধ্যে বসে, অথবা গদিতে আব্বা ও অন্যান্য বিক্রেতার মধ্যে বসে।

দোকানের গদি মানে পেছনে পুরু লোহার তৈরি কয়েকটি পূর্ণ দৈর্ঘ সিন্দুক আলমারি, ডালা খোলার পর যা সুন্দর ভাবে সাজানো নানা রকম স্বর্ণালঙ্কারের একটি একটানা পটভূমি রচনা করতো। এখানে একের সঙ্গে অপরটি খাপ খাইয়ে সুন্দর বিন্যাসে থাকতো হার, চেইন, দুল, বালা, চুরি ইত্যাদি। আর সামনে একটানা কাচের শো-কেইস—যার ভেতরেও নানা অলঙ্কার সাজানো। দুপাশের দেয়ালেও কিছু শো-কেইস ছিল যাতে অলঙ্কার খুব একটি থাকতোনা তবে রূপার তৈরি কাপ, শীল্ড ইত্যাদি থাকতো। শো-কেইসের সামনে ক্রেতাদের জন্য দুই সারি চেয়ার দেয়া থাকতো। সামনের সারিতে বসেই সাধারণত তাঁরা অলঙ্কার দেখতেন, পছন্দ করতেন। তবে অনেক সময় বিয়ের বাজার ইত্যাদির জন্য একই ক্রেতার সঙ্গে বেশ ক'জন সঙ্গী থাকতেন—তাঁরা পেছনের সারিতে বসতেন; সবার মধ্যে অবশ্য আলাপ পরামর্শ সারাক্ষণ চলতো। অলঙ্কারগুলো মেয়েদের হলেও তাঁরা সবাই অবশ্য হতেন পুরুষ। শো-কেইসের উপর সোনা মাপার নিক্তিগুলো থাকতো কাচের বাক্সের মধ্যে, যাতে ফ্যানের বাতাসে মাপতে অসুবিধা না হয়। অনেকে পুরোনো অলঙ্কার নিয়ে আসতেন, বিক্রি করতে অথবা ওটা ভেঙ্গে নতুন কিছু গড়াতে। আব্বা ও অন্যান্যরা সেই সোনা কষ্টি পাথরে ঘষে এর গুণাগুণ নির্ণয় করতেন—মূলত কত খাদ আছে তাই বোঝার চেষ্টা হতো। কুচকুচে কালো ছোট মসৃণ কষ্টি পাথরের ওপর এভাবে বিভিন্ন শেইডের সোনালি দাগগুলো পড়ে পাথরটি আমার কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে পড়তো। বড় বিয়ের বাজার আসলে ক্রেতাদেরকে আপ্যায়ন করা হতো। বয়স্ক মুরব্বিদের জন্য ধূমপানের হুকা আসতো, অন্যদের জন্য সাধারণত মোহাম্মদের দোকানে থেকে পান বিড়ি ইত্যাদি চেয়ে নেয়া হতো, কখনো বা সিগারেট। কিছুটা আধুনিক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ক্রেতা হলে আব্বা নিজেই ক্যাপস্টান সিগারেটের টিন বের করে তাঁদের সামনে ধরতেন। টিন থেকে সিগারেট নিয়ে খাওয়াটি বেশ অভিজাত ব্যাপার ছিল। পছন্দ করা নিয়ে, বা কী রকম জিনিস কিনবেন তা নিয়ে অনেক সময় বিয়ের পার্টির সদস্যদের মধ্যে মতান্তর দেখা দিত। সেক্ষেত্রে আব্বা, বা দোকানের অন্যান্যরা তাঁদেরকে পরামর্শ দেবার চেষ্টা করতেন। আব্বাকে বেশ মান্যগণ্য করতেন বলে অনেক ক্রেতাকে দেখতাম আব্বার হাতেই তাঁদের বিরোধ নিষ্পত্তির ভার দিতেন।

আমি ছিলাম বক্সীর হাট রোডের আমাদের আশপাশের যাবতীয় কর্মকান্ডের অতি আগ্রহী ও মনোযোগী দর্শক। এ ছিল আমার পাঠশালা শুরুর আগের পাঠশালা—যেখানে পাঠ নির্বাচনে আমার ছিল একচ্ছত্র স্বাধীনতা।

পরিবারের ছোট শিশুটি হিসেবে

বক্সীর হাট রোডের এত মানুষ, এত ভীড় তার মধ্যে কিন্তু আমাদের শিশু-সাহচর্য বেশি ছিলনা—সেটি পেতাম শুধু গ্রামে থাকার সময়। আমার বড় দুই ভাই বড়দা (সালাম) মেজভাই (ইউনূস, পরবর্তী কালের নোবেল বিজয়ী) যথাক্রমে দশ ও পাঁচ বছরের বড়—তাই তাঁরা ওই অর্থে শিশুগোষ্ঠী থেকে তখনই একটু আলাদা—ইতোমধ্যেই কিছুটা অভিভাবক গোছের হয়ে উঠেছেন। আর কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের কার্যক্রম হয়ে পড়েছে আমার ধ্যানজ্ঞানের প্রধান আকর্ষণ। সবার বড় বোন বুবুর (মমতাজ) বিয়ে হয়ে গেছে (বাল্য বিয়ে) আমার জন্মের আগেই। ছোট গোষ্ঠীতে তখনকার মত ছিলাম শুধু আমি ও পিঠাপিঠি ছোট বোন টুনু; পরে ছোট ভাই আইয়ুব একটু বড় হয়ে আমাদের দলে যোগ দিলে আমার চার-পাঁচ বছরের মধ্যে আমরা দলে ভারি হলাম। পরবর্তীকালে আব্বা, বড়দা, আশার বাপ দাদু—এরকম অনেকের মুখে বার বার একটি কথা শুনেছি, আমার জন্ম নাকি পরিবারে অস্বাভাবিক আনন্দের সৃষ্টি করেছিল। এর একটি কারণ বছর পাঁচেক পরিবারে নতুন কোন শিশু আসেনি, এবং আর একটি কারণ যুদ্ধের অবসানে আবার সব কিছু শান্ত, স্বাভাবিক হয়ে পড়েছিল, পরিবার শহরের বাসায় ফিরে আসতে পেরেছিল। সবাই নাকি আমাকে কোলে কোলে রেখে নানা কথা বলতো, নানা কথা শেখাবার চেষ্টায় থাকতো। আনন্দ ও আদরের একটি বাস্তব প্রমাণ আমি সামান্য বড় হবার পর সব সময় দেখতাম—এটি খুবই দামি একটি বিলাতী প্যারাফুলেটরের ধ্বংসাবশেষ যা আমাদের ছাদে পড়ে ছিল। কলকাতার বিখ্যাত ডিপার্টমেন্ট স্টোর ওয়াসেল মোল্লার দোকান থেকে এটি আমার জন্য কেনা হয়েছিল। কিন্তু জ্ঞান হবার পর এটি কখনো আমি অভগ্ন দেখিনি এবং উপভোগ করতে পারিনি; কারণ বড়দা সালাম ভাই নাকি এটিকে বেপরোয়া ভাবে তাঁর গাড়ি হিসেবে ব্যবহার করে আগেই এর দফা রফা করে দিয়েছিলেন।

বড় ভাই দু'জন আমার ধ্যানধারণার কেন্দ্রে পরিণত হবার আগে পর্যন্ত এই কেন্দ্রটি অত্যন্ত প্রবল ভাবে প্রোথিত ছিল মায়ের (সুফিয়া খাতুন) সঙ্গে, এবং কিছুটা আব্বার (দুলা মিয়া) সঙ্গে। খুব স্বল্প প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ করেও আমার মায়ের স্বশিক্ষার শিকড়টি আমাকে মোহিত ও রহস্যাচ্ছন্ন করে রাখার মত যথেষ্ট গভীর ছিল। পরে বুঝেছি এর অনেকটাই ছিল বাড়িতে পারিবারিক শিক্ষা। তাঁর সঙ্গে সবচেয়ে একান্ত সময়টি কাটতো বিকেল থেকে ছাদের ওপর—টুনুর সঙ্গে ভাগ করে। আমাদের ক্রমাগত প্রশ্নের তিনি জবাব দিতেন অত্যন্ত আকর্ষণীয় ভাবে। সঙ্গে সঙ্গে অনেক নীতিকথা বলতেন, কী উচিত কী উচিত নয় এগুলোও

বলতেন—অনেক সময় ছড়া বা কবিতা আবৃত্তি করে। "সুসময়ে অনেকে বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেউ-কারো নয়"—এরকম অনেক চরণ তাঁর কাছে বার বার শুনে শুনে ওই যে প্রথম মুখস্ত হয়েছে কখনো আর ভুলিনি। ছাদের ওপরে ঘটতো বলে আমাদের অনেকগুলো তাৎক্ষণিক প্রশ্ন হতো আকাশ নিয়ে। বিকেল হলেই বাদুড়গুলো সব একই দিকে কোথায় যায়—তাঁর উত্তর আমাদের দক্ষিণ দিকেই রয়েছে বিরাট 'মুরা' বা জঙ্গল—সারা দিন কাজ কর্ম করে ওরা সেখানে বাড়ি যায়; অধিকাংশ পাখির বাড়ি ওখানে, যদিও আমাদের বাসার আশপাশে গাছের ওপরও কাকের বাসা দেখতাম। রাতে প্রায়ই ওই দক্ষিণ দিক থেকে আসা শেয়ালের সমস্বরে ডাক ওখানকার মুরা সম্পর্কে আমাদেরকে সজাগ করে দিত। আমার মনে সাধ জাগতো একদিন মুরায় গিয়ে ওসব দেখবো। সন্ধ্যার সময় পশ্চিমের আকাশে লাল নীল রঙের ছোপ লাগে কেন। মা বলতেন লাল রঙগুলো হলো হোসেনের রক্ত, আর নীল হলো বিষের রঙ—হাসানকে বিষ খাওয়ানো হয়েছিল। এক নাগাড়ে আকাশ সে সময় যত দেখেছি এরপর সারা জীবনেও একাদিক্রমে তা করতে পেরেছি কিনা সন্দেহ। হঠাৎ হঠাৎ একটা তারা ছুটে যেতে দেখে (উল্কাপাত) আমাদের প্রশ্নে মায়ের উত্তর ছিল শয়তানকে দোররা মারা হচ্ছে। কারবালার কাহিনী, আদম-হাওয়াকে শয়তানের প্ররোচনা—এগুলো ইতোমধ্যেই মায়ের কাছ থেকে ভাল ভাবেই জানা। তাই তাঁর তাৎক্ষণিক উত্তরগুলোর রেফারেন্স পেতে আমার দেরি হতোনা। নানা রকম ধর্মীয় কাহিনী, তারামণ্ডল ইত্যাদি নিয়ে মিথোলজি, পরী রাক্ষস ইত্যাদি নিয়ে রূপকথা, ঈশপের গল্পের মত নীতি কাহিনী—এসব নানা বিষয়ে গল্পের কোন অভাব ছিলনা মায়ের। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনতাম। এর কোন কিছু নিয়ে প্রশ্ন করলে এড়িয়ে যেতেন না—নিজের মত করে একটি থিওরি খাড়া করতেন ব্যাখ্যা করার জন্য। একদিকে গল্প শোনার এবং অন্যদিকে অনুসন্ধিৎসা প্রকাশের ও তার জবাব পাওয়ার অভ্যাসটি গড়ে তুলেছিলেন আমার মা। অল্প কিছুদিন পর বই থেকে যা মেটাবার আগ্রহটি মনের মধ্যে পাকা হয়ে গিয়েছিল তার প্রথম সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন আমার মা নিজেই তথ্যের উৎস হয়ে। ছাদ থেকে গল্প গড়াত বিছানায় ঘুমাবার আগে পর্যন্ত—আমাকে ও টুনুকে দু'পাশে শুইয়ে চলতো গল্প। এ নিয়ে টুনুর সঙ্গে আমার সার্বক্ষণিক একটি বিরোধ লেগে থাকতো—মা কার দিকে মুখ করে গল্প বলবেন। শেষ পর্যন্ত ফয়সালা হতো মা কারো দিকে তাকাবেন না উপরের দিকে তাকিয়ে গল্প বলবেন।

মনে হতে পারে মায়ের গল্পগুলো সব শিশুতোষ, ধর্মীয় অথবা রূপকথার কাহিনী নিয়ে। তা কিন্তু মোটেই নয়। অত্যন্ত সাম্প্রতিক ও পারিবারিক ঘটনা-দুর্ঘটনাগুলোকেও তিনি তাঁর গল্পের ও নীতিশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করতেন—আমাদেরকে নেহাত শিশু মনে না করে। মনে আছে আমার নানাকে তাঁর কাপড়ের ব্যবসায় কলকাতার ব্যবসায়ীরা কেমন করে ঠকিয়েছিল, আমাদের বাড়িতে

একজন দূর সম্পর্কের আত্মীয় আশ্রিত হয়ে এসে, দুর্দান্ত চুরি করে আমাদেরকে দারুণ সংকটে ফেলেছিল—এসবও তিনি খুবই নাটকীয় ভাবে আমাদেরকে বলেছেন।

মায়ের সঙ্গে ছাদে কাটাবার সময় সেখানে আমাদের একটি চমকপ্রদ আসবাব ছিল। সেটি হলো ভাঁজ করা যায় এমন একটি স্প্রিংয়ের লোহার খাটিয়া। খুব সম্ভব এটিও যুদ্ধের পর নিলাম থেকে কেনা হয়েছিল। এটি আগাগোড়া অসংখ্য ইস্পাতের স্প্রিংএ ছাওয়া ছিল; ফলে এতে বসে গল্প শোনার সময় এবং এতে চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশ দেখার সময়, মৃদু দোল খাওয়ার যে মজা হতো তার তুলনা ছিল না। পরে বেশ কিছু বড় হওয়া অবধি আমাদের ভাই বোনদের এর ওপর স্প্রিঙের তালে তালে লাফালাফি দাপাদাপি সহকারে নানা খেলার ফলে একটি একটি করে এর স্প্রিংগুলো ছিড়তে থাকে; এভাবে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হবার আগে পর্যন্ত এটি আমাদের সবাইকে আনন্দ দিয়ে গেছে।

আরো এক ভাবে মা আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন সেটি তাঁর শিল্পকর্ম দিয়ে। দিনের বেলার কিছু সময় মা আমাদের স্বর্ণালঙ্কারের দোকানের কোন কোন অলঙ্কারে ফিনিশিং টাচ দিতেন। এটি প্রধানত হতো বিশেষ করে 'কণ্ঠা' ও 'চিক' নামে পরিচিত গলায় পরার দুটি অলঙ্কারের ক্ষেত্রে। কণ্ঠা বড় বড় স্বর্ণ গোলককে (সোনার খোলের মধ্যে গালা ভরা) মালার মত গ্রথিত করে তৈরি হতো। লাল-নীল চমৎকার সব পশমী সুতার গুচ্ছে এই গ্রথিত করার কাজ করতেন মা। দুটি গোলককে একটু আলাদা রাখার জন্য দেয়া হতো আকর্ষণীয় মখমলের চাকতি। আর সুতাগুচ্ছের দুই প্রান্তে লাগানো হতো নানা রঙের পশমী সুতার তৈরি ছোট কদম ফুল সদৃশ পম্‌পম্‌। পশমী রঙিন সুতা দিয়ে একটি গোলকাকার গুটি বানিয়ে তারপর কাঁচি দিয়ে তার প্রান্তগুলো ছেঁটে দিয়ে মা যে ভাবে তুলতুলে পমপম তৈরি করতেন তা আমার কাছে অপূর্ব শিল্পকর্ম মনে হতো। পমপম সহ সুতাগুচেছ গিট দিয়ে কণ্ঠা গলায় লাগানো হতো। পমপম লাগানো ওই বাড়তি সুতাগুচ্ছকে মা বিনুনির মত বুনে সুন্দর রূপ দিতেন। চিক জিনিসটি যদিও ভিন্ন, অনেকটা চ্যাপ্টা হারের মত, সেটিতেও আমার মা মখমলের ব্যাকিং লাগাতেন আর দুই প্রান্তে পশমী সুতা ও পমপম।

ওই 'মায়ের কুল' নামক আমাদের কামরায় চূড়ান্ত রূপ পেয়ে এ সব অলঙ্কার চলে যেত আমাদের দোকানের শো-কেইসে। এ সবের ফাঁকে ফাঁকে মা তৈরি করতেন আমাদের জন্য ডিজাইন করে সোয়েটার, ঘর সাজাবার নানা জিনিস—সব কিছু মিলে তাঁর হাতে ছোঁয়াটাই ছিল নান্দনিকতায় আমার প্রথম সবক। আড়া-আড়ি লাল আর হলুদ ব্যাণ্ড একের নিচে এক দিয়ে মায়ের তৈরি একটি সোয়েটার আমার বিশেষ প্রিয় ছিল, স্পষ্ট মনে আছে। মায়ের সব কাজের সঙ্গে আমার লেপটে থাকার অভ্যাস রান্নাঘরেও বিস্তৃত হয়েছিল—যেখানে নানা ভাল মন্দ রান্নার আইডিয়া তাঁকে বায়নার আকারে দিতে আমি কম যেতামনা।

টুনু আর আমি মায়ের অন্য একটি স্বরূপ তেমন দেখতে পাইনি কিন্তু শুনেছি—তা হলো কড়া শিক্ষক ও শৃঙ্খলারক্ষকের। তাঁর দুই ছাত্রী ইতোমধ্যে বিয়ের কারণে বিদায় নিয়েছিল—বুবু (মমতাজ) আর ছোট খালা (মাহফুজা)। প্রায় বুবুর সমবয়সী খালা বেশ কিছুদিন আমাদের বাসায় থেকে পড়া লেখা করেছেন। আর দুই ছাত্র বড়দা আর মেজভাই—তাঁরা ইতোমধ্যে মায়ের কড়া শাসনের কিছুটা বাইরে চলে গেছেন। কিন্তু তাঁদের সবার মুখে পরে শুনেছি এই স্নেহময়ী মা কিন্তু শৃঙ্খলা আর কাজের ব্যাপারে একেবারে অনমনীয় ছিলেন, পান থেকে চুন খসলে রক্ষা ছিলনা। সে ক্ষেত্রে তাঁরা আশ্রয়-প্রশ্রয় পেতেন আব্বার কাছে। চিরকাল আব্বাকে দেখেছি ওপরে খুব হুমহাম করলেও আসলে একেবারে মাটির মানুষ। সংসারের সব ক্ষেত্রে মা'ই ছিলেন কড়া শৃঙ্খলার মানুষ, এমন কি আমার বাবার ব্যবসার ক্ষেত্রেও তিনিই নাকি ছিলেন মূল পরিশ্রম ও প্রেরণাদাত্রী, এবং নো-নন্‌সেন্স ধরনের সংকল্পের মানুষ। পরে আব্বা বহুবার এই কথা আমাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আমি কিন্তু শেষ পর্যন্ত নির্ভয়ে মায়ের সঙ্গে লেপটে থাকতে পেরেছি। বড়দের কাছে যেমন শুনেছি ঠোঁটকে দাঁতে কামড়ে ধরে মায়ের বিশেষ মূর্তিটির মানেই ছিল সিদ্ধান্ত থেকে তাঁকে টলানো যাবেনা—এটি আমাকে কখনো দেখতে হয়নি। অথচ ওই 'শেষ পর্যন্ত' কথাটির মানে হলো আমার জীবনের মাত্র প্রথম চার পাঁচটি বছর—তাঁর সুস্থতার সময় পর্যন্ত।

শৈশবে শুধু মায়ের ন্যাওটা ছিলামনা আমি, আব্বারও ছিলাম। দোকানে, মসজিদে, আর সব চেয়ে লোভনীয়—বেড়ানোতে এবং বিয়ের ও অন্যান্য নানা দাওয়াতে আমি তাঁর সঙ্গ নিতাম। বয়সে তারুণ্য তখনো ছেড়ে না গেলেও ইতোমধ্যেই তিনি চট্টগ্রামের প্রধান দুই স্বর্ণালঙ্কার ব্যবসায়ীর একজন। শহরে, এবং চট্টগ্রামের নানা অঞ্চলের গ্রামে আমার আব্বা হাজী দুলামিয়া সওদাগরের নাম তখনই মানুষের জানা, কারণ বিয়ে-থা উপলক্ষে অলঙ্কার কিনতে হতো অনেককেই। অন্য জন ছিলেন হাজী দানু মিয়া সওদাগর। সেই হিসেবে সমাজে আব্বার খাতিরের ও দাওয়াতের কমতি ছিলনা। আব্বার সমব্যবসায়ীদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু বণিক, তাঁর কারিগররাও ছিলেন তাই। তাঁর ঘনিষ্ঠতম বন্ধুরা ছিলেন কারিগরদের সিনিয়রদের কয়েকজন। বিশেষ করে নিবারণ কাকা, রমণী কাকার সঙ্গে পরামর্শ না করে কিছু করেছেন, সুসংবাদ-দুঃসংবাদ যাই হোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরকে জানাননি, তাঁদের ছাড়া বেড়াতে বা সিনেমা দেখতে গেছেন—এমন বড় একটা মনে পড়েনা। তাঁরা ছাড়াও হিন্দু ব্যবসায়ী, কারিগরদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার (যেমন আব্বার, তেমনি আমাদের সবারও) একটি আকর্ষণীয় ফল হলো বার মাসে তাদের তের পূজো পার্বনে আমাদের মিষ্টি-মুখ হওয়া—বিশেষ করে পহেলা বৈশাখের হাল-খাতার (আমরা বলতাম গদি সাইৎ) দিকে তো রীতিমত তাকিয়ে থাকতাম—যত ইচ্ছে তত মিষ্টি খাওয়ার সুযোগের জন্য।

আব্বার ব্যবসায় ঢোকার কাহিনীটি মনে খুব রেখাপাত করেছিল—কারণ আব্বা অসংখ্যবার এটি আমাদের বলেছেন। ইংরেজি মাধ্যমে কঠিন এ্যান্ট্রান্স পরীক্ষা (সেকালের এসএসসি) দেবার সময় যত ঘনিয়ে আসছিল চট্টগ্রাম শহরে ঐতিহাসিক কাজেম আলী স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র আব্বার পরীক্ষা আতঙ্ক ততই বাড়ছিল। দাদা নজু মিয়াও মনে করতেন আব্বা পড়াশোনায় যথেষ্ট মনোযোগী নয়। একদিন তিনি সরাসরি জিজ্ঞাসা করলেন 'পড়বি, না দোকানদারি করবি?' আব্বা উত্তর দিতে দেরি করেননি—'দোকানদারি করবো'। সেই তাঁর বক্সীর হাটে সোনাপট্টিতে ব্যবসার হাতে খড়ি। দাদার থেকে কিছু পুঁজি নিয়ে শুরু—ফার্মের নামও দিলেন দাদার নামে 'হাজী এম নজু মিয়া সওদাগর' (শেষ অবধি ওটিই ছিল)। পরে স্কুলে পরীক্ষার সময় যখন উদ্বেগে বিষণ্ন থাকতাম এক এক সময় মনে হতো কেউ আমাকেও ওই রকম অপশন দেয় না কেন—'পড়বি না দোকানাদারি করবি?' অনেক সময় ভেবেছি আমাদের এই পড়াশোনায় অমনোযোগী আব্বা কেন আমাদের পড়াশোনার ব্যাপারে এমন মনোযোগী হয়ে উঠলেন যে যার জন্য হেন কোন ত্যাগ স্বীকার নেই যা তিনি করেননি।

যখনকার কথা বলছি তখন কিন্তু আমার লেখাপড়া সে ভাবে শুরুই হয়নি—তাই আব্বার নিত্য সহচর হতে বাধা ছিলনা। এসবে আমার লোভটি শুধু খাওয়া দাওয়ার উপর ছিল তাও নয়। আমি ছিলাম বরাবর অন্যদের কথা গোগ্রাসে গেলার মানুষ—চিরদিন ওটিই ছিল আমার শিক্ষার একটি প্রধান উৎস। আব্বার সাহচর্য—দোকানে আর দাওয়াতে—ছিল তার একটি সুবর্ণ সুযোগ। তাঁদের জগতে যা কিছু আলোচিত হতো সব ব্যাপারেই আমার মোটামুটি আগ্রহ ছিল, বোঝার চেষ্টা করতাম, চিন্তা করতাম। ধর্মীয়, পারিবারিক, সামাজিক, ব্যবসায়িক, বৈষয়িক, জমিজমা ইত্যাদি, এবং সর্বোপরি রাজনৈতিক—সব কিছুতে আমার জ্ঞানের প্রথম হাতেখড়ি হয়েছে ওই কথা গেলার মাধ্যমে।

আব্বার ব্যস্ততার মধ্যেও দাওয়াতে, বেড়ানোতে, সঙ্গী হওয়া ছাড়াও সেই শৈশবে একান্তে গল্পও কম হতোনা আব্বার সঙ্গে। প্রধানত তাঁর বাল্যকালের গল্প করতেন, আত্মীয় স্বজনদের কথা বলতেন, বোম্বাই হয়ে সেখান থেকে জাহাজে হজ্জে যাওয়ার কথা বলতেন, সেখানকার নানা অভিজ্ঞতা শোনাতেন এবং আমাদের নানা প্রশ্নের জবাব দিতেন। অবাক লাগে আমরা মায়ের পেটে এলাম কেন, এই প্রশ্নও আমি আব্বাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, আর আব্বা আল্লাহ দিয়ে গেছেন এমন স্ট্যান্ডার্ড উত্তর না দিয়ে সরাসরি বলেছেন যে আগে আমি তাঁর পেটে ছিলাম, এবং সেখান থেকে মায়ের পেটে ঢুকে পড়েছি। যদিও এটি আরো প্রশ্নের জন্ম দিয়েছিল—উত্তরটি যে অত্যন্ত আধুনিক ও সাহসী ছিল তা বলাই বাহুল্য। জীবনে আমার আব্বা এরকম আরো অনেক অপ্রত্যাশিত আধুনিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন—বিশেষ করে আমাদের লালন পালনে—যে কথা পরে ভাবতেই অবাক লেগেছে।

নিবারণ কাকাদের সঙ্গে আব্বার সিনেমা দেখার সঙ্গী হয়েছি—যদিও তার বেশি কিছু মনে নেই। কিন্তু আব্বা, মা এবং পরিবারের অন্যদের সঙ্গে মিলে 'চন্দ্রলেখা' সিনেমাটি দেখেছিলাম মনে আছে (১৯৪৮ সালে মুক্তি পাওয়া হিন্দি ছবি)। সেখানে সার্কাসের বাঘের হালুম করে লাফ দেয়াতে খুবই ভীত হয়ে কান্না জুড়ে দিয়েছিলাম। মা সিনেমাকে প্রায়ই 'টকি' বলতেন। তাতে মনে হয় সাইলেন্ট চলচিত্রও চালু ছিল সে সময়।

শৈশবে গ্রাম

অধিকাংশ সময় শহরে থাকা—এখানকার জমজমাট পরিবেশের ভাগী হওয়া, আবার অন্য দিকে প্রায়ই বেশ কিছু দিনের জন্য গ্রামে থাকা, এই উভয় জগতের স্বাদ প্রায় একই সঙ্গে পাওয়ার বিরল সুযোগ আমার শৈশবে ঘটেছিল। আর গ্রাম মানে বাথুয়ায় আব্বার গ্রাম, আর চান্দগাঁওয়ে মায়ের গ্রাম—উভয়ে শহর থেকে এত কাছে এবং শহরের এমন প্রভাবের মধ্যে ছিল যে অজ পাড়াগাঁ বলা যাবেনা মোটেই। অথচ গ্রামের প্রকৃতি, ঝিঁঝি ডাকা সকল স্নিগ্ধতা, গ্রামীণ সংস্কৃতি, ষোল আনাই ছিল—বেস্ট অব দি বোথ ওয়ার্ল্ড ছাড়া আর কী বলা যায়? দাদার বাড়ি বাথুয়া গ্রামটি হাটহাজারি থানাতে পড়লেও হাটহাজারি থেকে সেটি বেশ দূরে, বরং শহরেরই কাছে। শহর থেকে কালুর ঘাটের দিকের বাসে ওই জানালি হাট রেল স্টেশনের 'বাহার সিগন্যাল' স্টপেজ পর্যন্ত যাওয়া যেত। ওখানে নেমে রেলের সিগন্যালটি দেখতাম চট্টগ্রাম-দোহাজারি রেল রাস্তার পাশে। অধিকাংশ সময় এই সুন্দর লাল আর সবুজ রঙের ছোপ লাগানো সিগন্যালটিকে সোজা ভূমি সমান্তরাল থাকতে দেখতাম। কখনো কালেভদ্রে আমাদের বাস আসা আর ট্রেন আসা এক সঙ্গে ঘটলে একে কাৎ হয়ে থাকতে দেখতাম। তখন একটু অপেক্ষা করলে রেলরাস্তা দিয়ে ঝম ঝম করে ট্রেন যাওয়ার অপূর্ব দৃশ্য দেখতে পেতাম। বড়রা রেলের রাস্তার পাশে থাক তার দেখিয়ে বুঝিয়ে দিতেন কী ভাবে স্টেশন থেকে এই তার টেনে সিগন্যালকে কাৎ করা হয়। রেল রাস্তা থেকে গ্রাম্য মাটির পথে আধ ঘণ্টার মত হেঁটে নজু মিয়া হাট যাওয়া যায়, যা কিনা আমার দাদা নজু মিয়ার প্রতিষ্ঠিত হাট। শীতে ধান উঠে গেলে শুকনা জমির ওপর দিয়ে কোনাকুনি যাওয়া যেত বলে হাঁটা পথটি কিছু কম হতো। চট্টগ্রাম-কাপ্তাই রাস্তা তৈরি হবার পর অবশ্য একেবারে নজুমিয়া হাট পর্যন্ত বাসে যাওয়া যায়, কারণ ওটি কাপ্তাই রাস্তার পাশেই, হালদা নদীর ওপর মদুনা ঘাট সেতু থেকে খুব দূরে নয়। নানার বাড়ি শহরের আরো কাছে চান্দগাঁও থানায়। ওখানেও চট্টগ্রাম-কালুরঘাট বাসে যাওয়া যেত, 'পাঠাইন্যার গোদা' স্টপেজে নেমে গিয়ে। কোন এক পাঠান ওখানে একটি একটি 'গোদা' বা বাঁধ তৈরি করেছিল বলেই ওই নাম। ওখানে থেকে মাটির রাস্তা ধরে 'যোগীর দোকান' নামে পরিচিত দোকান পর্যন্ত গেলে রাস্তাটি দুভাগ হয়ে যায়। ডানের রাস্তা দিয়ে একটু এগোলেই লাল মিয়া খলিফার বাড়ি, যা

আমার নানার বাবার নাম। দাদার বাড়ি, নানার বাড়ি উভয়টিতেই পুরো পথ হেঁটে যাওয়া কঠিন ছিলনা—বরং সে সময় এটি বেশ স্বাভাবিক ছিল। আমাদের শহরের বাসা থেকে অনেকেই এটি নিয়মিত করতেন—হেঁটে বা বড়জোর সাইকেলে যেতেন।

শহরে মা বাবা ভাইবোন ছাড়াও একটি বৃহত্তর পরিবার আমাদের ছিল—আমার খায়ের আহমদ চাচা ও কাসেম চাচা, আমাদের দোকানের সঙ্গেই যাঁদের দোকান; সোবহান চাচা, সিরাজ চাচা, রিজিয়া ফুপু—তাঁরা বয়সে ছোট তখনো স্কুলের ছাত্র ছাত্রী—কেউ সালাম ভাই, কেউ ইউনূস ভাইয়ের মোটামুটি সমবয়সী বলে তাঁদের বন্ধু স্থানীয়। বড় ভাই ও ছোট চাচারা মিলে শহরে যেই জম-জমাট ক্লাবের মত কার্যক্রম গড়ে তুলেছিলেন তার বিস্তৃতি বাথুয়াতেও ঘটেছিল। তাঁদের অনেক কাজকর্ম গ্রামেও চলতে থাকতো যেমন গান বাজনা, সিনেমার গল্প, হাডুডু খেলা। গ্রামে তাঁদের সমবয়সী আরো কিছু সৃষ্টিশীল বালক সেখানে যোগ দেয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কামাল নামের দূর সম্পর্কের আত্মীয়—স্বভাবজাত ভাবে সৃষ্টিশীল ছেলে। আমরা শিশুরা তখনো এসবের নীরব দর্শক।

এই নীরব দর্শক হিসেবেও বাথুয়াতে আমার সব চেয়ে রোমাঞ্চকর মনে হতো চাঁদনী রাতগুলোতে দুপুর রাতে গ্রামের ছেলেদের হাডুডু ইত্যাদি খেলা—অনেক সময় পাড়ার সঙ্গে পাড়ার প্রতিযোগিতায়। যতটা না খেলার রোমাঞ্চ তার চেয়ে বেশি বদর দিয়ে খেলায় আহবান করার। দুপুর রাতে যখন সময় হয় কিছু ছেলে এসে চিৎকার করে বলতে থাকে 'গোলা বদর বদর—হেইয়া বদর বদর'। তখন এ বাড়ি ও বাড়ি থেকে ছেলেরা হুড়মুড় করে খেলার জন্য তৈরি হয়ে সমস্বরে জবাব দেয় 'গোলা বদর বদর...'। খেলা দেখার অনুমতি আমাদের শিশুদের বড় একটি মিলতোনা, কিন্তু চাঁদনি রাতে ওই বদর ধ্বনির জন্য আশা করে জেগে থাকতাম। ওই বদর ধ্বনির আরো অন্য ব্যবহারও আমি দেখেছি। যেমন মনে পড়ে এক চাচার বিয়েতে গ্রামের পথে সবার সঙ্গে অনেকখানি পথ হেঁটে বরযাত্রী গিয়েছি। পথে খুউব সুন্দর একটি বাড়ি—শুনেছি মস্ত বড় নাম করা সওদাগর কিন্তু ওহাবি এবং সে জন্য আশ-পাশের সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিদের কাছে খুবই অপ্রিয়। চট্টগ্রামে ও বাংলার অন্যান্য অঞ্চলে সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি মতাবলম্বী মুসলমানদের পাশাপাশি ওহাবি মতাদর্শেরও কিছু কিছু প্রচার হয়েছে বহু কাল ধরে। আমার শৈশব কালে চট্টগ্রামে এই দুই এর বিরোধটি খুব স্পষ্ট ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সউদি আরব অঞ্চলের ধর্ম প্রচারক আবদুল ওয়াহাবের অনুসারী ওয়াহাবিরা পীর, দরগা, উরশ, কবর ইত্যাদির প্রতি ভক্তিকে অনৈসলামিক কাজ মনে করেন; তাঁরা হযরত মুহাম্মদ (দ:) এর মানব সত্তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন এবং তাঁর উদ্দেশে মিলাদের অংশ কিছু কিছু অনুষ্ঠানকেও বর্জনীয় মনে করেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নিরা তাঁদের এই মৌলবাদি দৃষ্টিভঙ্গিকে মোটেই সহ্য করতেন না। আমাদের

বরযাত্রীদের তরুণ অংশ খুব করে বদর দিলো ও বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে—এ যেন শক্তি প্রদর্শন ও বিবাদের উস্কানি দেয়া। অন্য দিকে বরযাত্রীরা কনে বাড়িতে পৌঁছে খানিকটা দূরে থেমে গিয়ে আবার বদর দিলো। এটিও এক ধরনের শক্তি প্রদর্শন তবে নির্বিবাদে—ভাবখানা যেন আমরা কনে জয় করে নিতে এসে গেছি। ওহাবি-সুন্নির বিরোধটি ছিল বেশ দেখার মত—কী নিয়ে তাদের বিরোধ তা আমরা বুঝতামনা, মনে হয় ছোটদের এমনকি তরুণদের কেউই বুঝতোনা। কিন্তু তারাই আগ বাড়িয়ে বলতো 'ওয়াবি গ'র খাচে নোয়াবি' (ওহাবি গায়ের কাছে আসবেনা)। আমরা শুধু ওটুকুই দেখতাম, আর শোনতাম কোথায় কোন মিলাদ শরীফে ওহাবি সুন্নি মারামারি হওয়ার কাহিনী। মারামারির কারণগুলো যা শোনতাম তাতে অবাক হতাম। দাঁড়িয়ে 'ইয়া নবী সালাম আলাইকা' পড়া যাবে কিনা, নামাজে মাইক ব্যবহার করা যাবে কিনা, এমনি সব বিষয় নিয়ে মারামারি।

গ্রামের জীবনে এসব অবশ্য নিত্য দিনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিলনা—আমাদের শিশুদের ক্ষেত্রে তো নয়ই। বরং গ্রামের বাড়িতে আমরা দিনের বেশি অংশই কাটাতাম প্রকৃতির খেলাঘরে, এবং তা অদ্ভুত ভাবে দুরন্ত কয়েকজন কিশোরীর নেতৃত্বে। এমনি দুজন কিশোরী নেতৃত্বের কথা আমার খুব মনে পড়ে—তাদের একজন বাথুয়ার, অন্যজন চান্দগাঁওয়ে নানা বাড়িতে। বাথুয়ায় আব্বার নিজের যে বাড়ি তা আমার দাদার ছোট ভাইদের বাড়ি সংলগ্ন, দাদার বাড়ি থেকে এই ক'টি বাড়ি দিয়ে বিচ্ছিন্ন। দাদার এক ছোট ভাইয়ের কিশোরী মেয়ে পাখি ফুপু। আমরা কয়েক বাড়ির বেশ কয়েকজন ছোট শিশু তার দুরন্তপনায় মুগ্ধ ছিলাম, এবং তার প্রকৃতি জ্ঞানেও। পাখি আমাদেরকে অনেকটা সময় দিতো, নানা শিশুতোষ খেলাধূলার আয়োজন করত। তার চেয়েও বড় কথা হলো সে ছিল একজন প্রকৃতিবিদ—বিশেষ ভাবে উদ্ভিদবিদ। কোথায় জংলার মধ্যে রয়েছে কোন শাক, কোথায় থানকুনির পাতা, কোথায় কী রকমের ফার্ন (বহু রকমের অপুষ্পক উদ্ভিদ), ইত্যাদি পাওয়া যাবে সেটি পাখির নখদর্পণে। আমরা যখন মিছামিছি বনভাতির আয়োজন করতাম তাতে এক ধরনের ফার্ন মোরগের প্রতিনিধিত্ব করতো, অন্য ধরনের ফার্ন মুরগির। ধূলাবালি দিয়ে ভাত, নানা রকম পাতা গুল্ম দিয়ে মিছামিছি তরকারি, মুরগি, মাছ ইত্যাদি দিয়ে রান্না রান্না খেলাকে আমরা বলতাম ধূল-ভাতি খেলা। নানা রকম খাদ্যের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিচিত্র গুল্মকে চিনে নিতে হতো। পাখি ফুপুর ভাষায় এবং আমাদের ভাষায় এদের একটির নাম মোরগ, একটির নাম মুরগি, একটির নাম মাছ—আমরা ওরকম নাম ব্যবহার করলেও প্রত্যেকটিকে আলাদাভাবে চিনে নিতে পারতাম পাখি ফুফু দেখিয়ে দিত কোনটি কোথায় পাব। বাড়ির পেছনে জংলা জায়গাটি ছিল আমাদের উদ্ভিদবিদ্যা অভিযানের একটি ক্ষেত্র, আরেকটি ক্ষেত্র ছিল আমাদের বাড়ির সামনেই থাকা নিজেদের বেশ বড় দিঘির পাড়ে। দিঘির অপর পাড়ে ছিল ওর বাবার দোকান যেখানে তাঁর জন্য খাবার নিয়ে যাওয়া ছিল পাখির নিত্য কর্তব্য

(ঐ দাদা আবার দোকানেই থাকতেন, শুনেছি দীর্ঘ কাল শুধু দিঘিটি মাত্র পার হয়ে বাড়িতে আসেন নি)। ওই দিঘির পারে পারে আরো অনেক রকমের লতা গুল্মের সন্ধান পাখি দিতো। দোকানে খাবার নিয়ে যাওয়া ছাড়াও বাড়িতেই পাখির আরো বহু কর্তব্য ছিল, যাতে অমনোযোগের কারণে ওকে সারাদিন বকা ও গঞ্জনা সহ্য করতে হতো। তার মাকে (সায়রার মা দাদী বলেই ডাকতাম) দেখতাম সারাক্ষণ একটানা বকাবকি করছেন পাখিকে লক্ষ করে। তার পরেও পাখি ফুপু আমাদের সঙ্গে প্রকৃতিচর্চা আর খেলাধূলাতে কোন কার্পণ্য করতোনা। আরো বড় কথা সে লুকিয়ে বিড়ি খেতো—এই দুঃসাহসী এবং মেয়েদের জন্য অতি ব্যতিক্রমী কাজটি তাকে আমাদের চোখে আরো বড় হিরো এবং নেতাতে পরিণত করেছিল। দুঃসাহসিকতার জন্য এবং প্রকৃতির জগতে আমার হাতেখড়ির সুযোগ করে দেয়ার কারণে এই কিশোরী নেতা আমার স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

পাখি যদি কিশোরী উদ্ভিদবিদ হয়ে থাকে আমার একেবারে ছোট খালা খালেদা ছিল কিশোরী প্রাণিবিদ। নানাবাড়িতে থাকার সময় খালেদা খালাই হতো আমার শিক্ষক, পথপ্রদর্শক ও দার্শনিক—আবারো সেই প্রকৃতির পাঠশালায়। আমাদের এই কিশোরী নেতার বিশেষ উৎসাহ ছিল ছোট পাখির বাসা আবিষ্কার করা ও তাদের ছানা পোনা নিয়ে গবেষণা করা। তবে পোকা মাকড়ের ওপরেই তার এক্সপেরিমেন্ট বেশি হতো এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা পোকামাকড়ের জন্য মোটেই সুখকর ছিলনা। সেই দৃশ্যটির কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে যখন খালেদা একটি বিরাট মাকড়সা যোগাড় করেছিল। তার আগ্রহী ছাত্র আমাদের কয়েকজনকে গোল করে বসিয়ে মাঝখানে বসে সে মাকড়সাটিকে উলটিয়ে দেখালো সেটি সাদা বড় ট্যাবলেটের মত একটি পুত্তলি আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। নানা রকম কৌশল ও ক্ষুদ্র অস্ত্র প্রয়োগ করে সেই পুত্তলিটি সে মাকড়সা থেকে অক্ষত ভাবে ছিনিয়ে নিলো। তারপর সার্জনের মত নিপুণতায় এর সাদা আবরণটি একটু একটু করে ছিঁড়ে উন্মুক্ত করে ফেল্‌লো। বিস্ফারিত চোখে দেখলাম ওখান থেকে বের হলো অসংখ্য অতি ক্ষুদ্র মাকড়সার বাচ্চা—বেরিয়েই নানা দিকে ছড়িয়ে পড়লো। এরকম কাজ করে খালেদা খালা আমাদেরকে মন্ত্র-মুগ্ধ করে রাখতো। তার যাবতীয় খেয়াল খুশির কাছে পোকা মাকড়কে হার মানতে হতো। যেমন বেশ বড় সড় ফড়িংকে খালেদা লম্বা সুতার আগায় বেঁধে কিছুতে আটকিয়ে রাখতো। ফরর্ আওয়াজ করে ফড়িংটি সারাদিন এক জায়গায় ঘুরতে থাকতো। ফড়িঙের উড্ডয়ন তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য এটি আমাদের কাছে বেশ সুবিধাজনক হয়েছিলো। বেশ মজা হলেও খালেদা খালার এভাবে পোকা মাকড়ের ওপর চড়াও হবার মধ্যে যে একটি নিষ্ঠুরতা আছে তা আমরা ছোটরা অনুভব করতাম, এ নিয়ে অনুযোগও করতাম। কিন্তু সে বোঝাতো ওদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না—ভাবখানা যেন ফড়িংও আনন্দে খেলছে। খালেদা রাংতা কাগজ যোগাড় করে কাদার মডেলের ওপর তা সেঁটে সুন্দর

সুন্দর জিনিসও বানাতো। এভাবে তার ছোট তাজিয়া গড়া আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখতাম।

আমার অন্য কিশোরী নেতার ক্ষেত্রে যেমন ঘটতো খালেদার ক্ষেত্রেও ঠিক তাই ঘটেছে। এই ছোট্ট খালাটির উপরেই আমার নানার যাবতীয় আদেশ নির্দেশ ও নির্ভরশীলতা। প্রতিদিন নানা সারা শহর দিব্যি হেঁটে চষে এসেছেন মনের সুখে তাঁর নিত্যকার সখ একগাদা কাঁচা বাজার করে, বাড়ির সামনে এলেই তাঁর হাঁক ডাক শুরু হয়ে যেত 'খালেদা খালেদা' রব তুলে—তিনি অত্যন্ত কাহিল, এই নচ্ছার মেয়েটা দৌড়ে এসে তাঁকে ধরছেনা কেন, জিনিসপত্র সামাল দিচ্ছেনা কেন, ইত্যাদি কত কি! যদ্দুর মনে পড়ে খালেদা খালার তখন স্কুলে যাওয়া হচ্ছিল না। সনাতন সব কিশোরীদের মত তারও অবস্থা ছিল যত দোষ নন্দ ঘোষ। বাড়িতে তখন আমার নানার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী ছোট নানী। আমার মায়ের মা তখন নেই, খালেদার মাও (অন্য নানী) নেই। আমার মায়ের নিজের বোনদের সবার বিয়ে হয়ে গেছে। আর ছোট নানীর সন্তানরাও ছোট। কাজেই আমাদের এই কিশোরী নেতার উপরেই সব কিছুর চাপ—দুনিয়ার বকাঝকা। নেতৃত্ব গুণ সম্পন্ন দুরন্ত কিশোরী বলে হয়তো তার ওপর বড়রা আরো একটু বেশি খাপ্পা—আমাদের কাছে কিন্তু দারুণ নেতা!

নিজের বাড়ি, নানার বাড়ি—উভয় গ্রামে আমার আনন্দোচ্ছল দিনগুলোর একটি বড় কারণ ছিল নানা রকম শিশুতোষ খেলা। শহরে এ ধরনের খেলা হতো খুব সীমিত ধরনের অল্প জায়গায়, শুধু আমাদের ভাইবোন কয়েক জনের মধ্যে, এবং প্রায় সবই নিজেদের উদ্ভাবিত খেলা ওই 'গাড্ডা মে ঢুকো' ধরনের। যেমন গ্রামে আসা যাওয়ার জন্য চট্টগ্রাম—কালুরঘাট লাইনের যে বাস ভ্রমণ আমাদের একটি আনন্দ অভিজ্ঞতা ছিল তাকেই আমরা একটি খেলায় পরিণত করেছিলাম। আমাদের দোকান যখন বন্ধ থাকতো সেখানকার চেয়ারের পেছনে চেয়ার সাজিয়ে এই বাস বাস খেলা আমরা খেলতাম। মূল চরিত্র ছিল ড্রাইভার আর কন্ডাক্টর। কন্ডাক্টর পেছন থেকে কিছুক্ষণ পরেই হাঁকতো স্টপেজের নাম, অথবা 'রোখ্‌কে', 'ঠিক হ্যায়', ধ্বনি—সব বাস কন্ডাক্টর এভাবেই বলতো। আর ষ্টপেজগুলোর নাম আমাদের মুখস্ত—চকবাজার, বহদ্দার হাট, পাঠাইন্যার গোদা (নানা বাড়ি হলে ওখানে নেমে যেতাম), বাহার সিগন্যাল (নিজের বাড়ি যেতে ওখানে নামতে হতো)। তাছাড়া কখনো কন্ডাক্টরের বাসের সামনে দাড়িয়ে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে স্টার্ট দেয়া, ড্রাইভারের ব্রেক কষা, মাঝে মাঝে কন্ডাক্টর দৌড়ে গিয়ে পুকুর থেকে টিন ভরে পানি এনে ইঞ্জিনে পানি ঢালা, পয়সা নেয়া, টিকেট দেয়া এসব তো ছিলই। হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে গাড়ি স্টার্ট করার ব্যাপারটি হয়তো এখনকার অনেকে জানবেনা, কারণ এখন এ কাজটি সেল্‌ফ স্টার্টার মোটর দিয়ে স্বয়ংক্রিয় ভাবে হয়। সে সময় আরেক জনকে গাড়ির সামনে গিয়ে সঠিক ছিদ্রের মধ্যে হ্যান্ডেল ঢুকিয়ে সজোরে হাতে ঘুরিয়েই ইঞ্জিনটিকে প্রাথমিক ভাবে ঘুরিয়ে দিতে হতো। ড্রাইভারকে ওসময়

তার নিজের জায়গায় থাকতে হতো অ্যাকসেলারেটর দেবে ইঞ্জিনের কাজ শুরু করে দেবার জন্য। চলার সময় ড্রাইভারকে যে রাবারের ভেপু বাজাতে হয় (তখন হর্ন ছিলোনা) সেটি আমরা মুখে শব্দ করতাম। বাহার সিগন্যালের পরে এই বাস কোথায় যায়, কালুরঘাটটি কী রকম, সেটি তখন আমাদের কাছে রহস্যই রয়ে গেছে।

গ্রামে আমাদের খেলাগুলো ছিল অনেক বেশি বৈচিত্রময়—পাড়া প্রতিবেশী অনেক শিশুর সঙ্গে একযোগে খেলার—আমাদের চেয়ে খানিকটা বড়দের নেতৃত্বে। নাম না জানা পূর্বসূরি উদ্ভাবনশীল শিশুদের আবিষ্কার বলে ওগুলোর মধ্যে শুধু অনুকরণ নয় অনেক সৃজনশীলতাও ছিল। বহুরকম খেলার মধ্যে বড় হয়ে কোন কোনটি দেশের নানা জায়গায় প্রচলিত দেখেছি। সেগুলোর কথা না বলে খুব স্থানীয় স্বকীয় বৈশিষ্টের একটির কথা বলি, যেটি আমি খুব উপভোগ করতাম। এর নাম 'সইল্যারো ভাই' অর্থাৎ 'ও ছাগলিয়া ভাই'। চাটগাঁইয়া থেকে ভাষান্তর করলে ব্যাপারটা এ রকম : খেলায় এক পক্ষ হলো ছাগলিয়া ও তার ছাগলগুলো (আমরাই), অন্য পক্ষ হলো কৃষকরা। সুর করে ওদের কথোপকথন : 'ও ছাগলিয়া ভাই, তোর ছাগল আমার ধান খেয়েছে'। 'মাফ কর'। 'আবার খেয়েছে'। 'বন্ধ কর'। তখন কৃষকরা 'জানে ঘুর ঘুর জানে ঘুর ঘুর' বলতে বলতে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছাগলিয়া ও তার ছাগলদেরকে নিজেদের বেষ্টনীর মধ্যে আটকিয়ে ফেলতো। এরপর শুরু হতো সুরে সুরে বলার সঙ্গে সঙ্গে ওদের বের হবার চেষ্টা এবং কৃষক দলের বাধা দেয়ার পালা। ছাগলিয়া : 'এদিকে যাব', কৃষকরা :'গুতা দেব'; 'এদিকে যাবো'—পাটা মারবো'; 'এদিকে যাব'; 'খন্তা মারবো'। শেষ পর্যন্ত জোর করে বা চালাকি করে বেষ্টনী ভাঙ্গতে পারলে খেলা শেষ।

বাথুয়া আর চান্দগাঁওয়ের গ্রাম ছাড়া আমার আরেকটি অত্যন্ত প্রিয় জায়গা ছিল ঘন ঘন যাওয়ার, যেটি শহরের উপকণ্ঠে হলেও তখন ছিল আধাগ্রাম—কাপাসগোলায় আমার বুবুর বাড়ি। ও জায়গাকে বাদুরতলাও বলা হয় কারণ একটি মাত্র বিশাল বট গাছের ডালপালা থেকে অসংখ্য বাদুড় ঝুলতো, সেটিও একটি দেখার মত ব্যাপার ছিল। এখানে গেলে দিনে দিনে ফেরত আসতাম বটে তবে সে দিনটি হতো অত্যন্ত আনন্দময় দিন। এই সেদিন বুবুর মৃত্যুর (৪ সেপ্টম্বর ২০১৫) কয়েক মাস আগে পর্যন্ত চট্টগ্রামে গেলে ওখানে বুবুর কাছে ছুটে না গেলে কিছুই পূর্ণ হতোনা, আর ওটাই হতো চট্টগ্রামে যাওয়ার একটি আনন্দময় অংশ। বালিকা বধূ হিসেবে আমার জন্মের আগে আগে শ্বশুর বাড়িতে চলে গেলেও বুবুই ছিল আমাদের পরিবারের সাইনবোর্ড—আমার বাবা মমতাজের বাপ, আমার মা মমতাজের মা। আব্বার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী তখনো ছিলেন বুবু, শেষ পর্যন্তও তাই ছিলেন। বুবুর বাড়িতে আমার আকর্ষণ কিন্তু বাথুয়া বা নানা বাড়ির মত খেলাধূলা, বেড়ানো, এসব ছিলনা। বুবু নিজেই ছিলেন আকর্ষণ।

কিশোরীসুলভ চেহারার হালকা গড়নের বুবু (আশি উত্তীর্ণ বয়সেও তাই ছিলেন) বাংলা সাহিত্যের সেই চিরন্তন বড় দিদি। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমি কী করছি, কেমন আছি, কোথায় গিয়েছি, মা আমাকে কী খাওয়াচ্ছেন তা জিজ্ঞেস করে ঠিক যে যা পছন্দ করি সেইগুলো অতি যত্নে রান্না করে খাওয়াতেন। আর আকর্ষণ ছিল ভাগনি ছোট্ট বুলবুলি ও তার সমবয়সী ওর ফুপুরা। আরো একটি আকর্ষণ ছিল তা হলো রেডিয়ো। আমার দুলাভাইয়ের ছিল রেডিয়োর সখ—প্রায়ই ব্র্যান্ড বদলাতেন। কোন কোনটাতে নানা রকম আলোর ফুলঝুরি দেখা যেত, নব্ ঘোরালেই কথা-গান ভেসে আসার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাজিক লাইটও ঝিলিক দিয়ে যেত। মনে হতো রাজ্যের যত আকর্ষণ সেই সুন্দর ঢাউস বাক্সটির মধ্যে সব ভরে দেয়া হয়েছে।

বর্ণাঢ্য গুরুজনরা

বাবা-মা, চাচা-চাচী, ফুপু-খালা এদের সঙ্গে আমাদের কোন দূরত্ব, রহস্যময়তা বা আড়ষ্টতা ছিলনা মোটেই। কিন্তু তাঁদের আগের প্রজন্মের যে ক'জন পূর্বপুরুষের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাঁদেরকে মনে হয়েছে রীতিমত রহস্যে ঘেরা সুদূর ব্যক্তিত্ব। অবশ্য মেলামেশা ও ঘনিষ্ঠতার অভাব তার একটি বড় কারণ। অন্য ক'জনের সঙ্গে একই বর্ণাঢ্যতার অধিকারী হয়েও অধিক ঘনিষ্ঠতা ও সহজিয়া আচরণের দিক থেকে আমার নানা ছিলেন এর একমাত্র ব্যতিক্রম। তাঁর কথায় পরে আসবো।

আমার দাদা নজু মিয়া সওদাগর—আব্বার দিক থেকে আমাদের গোষ্ঠীপতি। গৌর বর্ণ, ক্ষীণকায় অথচ সৌম্য বাইবেলীয় চেহারার গম্ভীর এই মানুষটির স্মৃতি আমার শুধু শৈশবের ওই কয়েক বছরের। আমার স্মৃতিতে দাদার ও দাদা-বাড়ির সব কিছু বড়, ভারি এবং রাজকীয়। বিয়ে, বৈঠক ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক কারণে দূরে কোথাও যেতে হলে তিনি যেতেন বেহারার দ্বারা বাহিত একটি সুন্দর চেয়ারে (চট্টগ্রামে যাকে বলা হয় তাঞ্জাম)। দাদার এই তাঞ্জাম বাহিত ছবিটিই আমার স্মৃতিতে বেশি রয়েছে। দাদার বাবার নাম ছিল আবদুল হামিদ টেন্ডল। যাঁরা শ্রমিক যোগান ও ব্যবস্থাপনা করতেন তাঁদেরকে বলা হতো টেন্ডল। আবদুল হামিদ এই কাজটি করতেন বার্মার রেঙ্গুনে—যে সময় আমাদের অঞ্চলের অনেক মানুষেরই কাজকর্ম এবং ভাগ্যান্বেষণ বার্মায় হতো। বড় ও ভারি জিনিসের বিষয়ে বলতে গেলে দাদা-বাড়িতে কাচের গ্লাসগুলো ছিল অনেক কারুকার্যময়, পুরু কাচের এবং খুব ভারি—আমি হাতে নিয়ে তুলতে পারতামনা। তা ছাড়া সুন্দর কাজ করা চীনা মাটির বাসনও ছিল দশাসই—কয়েক জন এক সঙ্গে খাবার জন্য। জেয়াফতে, বিয়েতে, রান্নার জন্য ভারী বিশাল তামার ডেগচি ছিল—যার কিনারায় খোদাই করে লেখা শ্রী আব্দুল হামিদ টেন্ডল। একই নাম খোদাই করা খুবই ভারী তামার বদনা ছিল—যা আমরা আলগাতে পারতামনা। যতটুকু দেখেছি দাদা

ছিলেন ভারিক্কি কড়া শাসনের মানুষ—বিশেষ করে ছেলের বৌদের প্রতি তাঁর কড়া শাসন আমার শিশু চোখে ধরা পড়েছে। আমার নিজের দাদী অনেক আগে মারা গেছেন—আব্বাই ছিলেন তাঁর একমাত্র জীবিত সন্তান। আমার চাচাদের মা'ও তখন জীবিত ছিলেননা। যে দাদী ছিলেন তিনি কনিষ্ঠা দাদী, সন্তানহীন। তাঁর সঙ্গে অবশ্য পরে বহু আনন্দময় সময় কেটেছে।

দাদা নজু মিয়া সরাসরি ও বর্গাদারদের মাধ্যমে কৃষি কাজের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন এবং কিছুটা ব্যবসায়ের ওপরও। সমাজে তাঁর যথেষ্ট আধিপত্য ছিল যেটি আরো বৃদ্ধি পায় তাঁর দ্বারা নজুমিয়া হাট পত্তনের মাধ্যমে—ওই এলাকার একটি বিখ্যাত হাট। তখন থেকে জমজমাট শুরু হয়ে পরে ওই অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে ভাগ্য গড়ার ফলে হাটটি এখন ব্যবসা-বাণিজ্যে দালান-কোঠায় শহরের রূপ ধারণ করেছে। সারাদেশ মধ্যপ্রাচ্য-মুখী হবার অনেক অনেক আগে বৃটিশ আমল থেকেই এখানকার মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে চাকরি করতে গিয়েছে। একই কারণে বেশ কিছু ব্যাংকের শাখা এখানে রয়েছে বহুদিন আগে থেকেই। আমার শৈশবে হাটের মূল রাস্তাটি ছিল ইট বিছানো পথ, এর দু'পাশে দোকানের সারি—মুদির দোকান, চায়ের দোকান, ডাক্তারখানা, ওষুধের দোকান যা যা থাকার সবই ছিল। এর প্রবেশের মুখে একটি কারখানার মত ছিল যেখানে কাঠের তৈরি চরকার মত কিছু হাতে চালানো যন্ত্র দিয়ে শিমুল তুলা থেকে বিচিগুলো আলাদা করা হতো। বিচিসহ এবং বিচি ছাড়ানো তুলার আলাদা স্তুপ থাকতো তাতে। ধান ছাঁটার কলও ছিল বাজারে, ডিজেল ইঞ্জিনে চলতো। বাজারের শেষ প্রান্তে খালের পাড়ে পারিবারিক কবরখানা—যেখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা শায়িত আছেন। একদিকের সারিতে দোকানগুলোর পেছনে প্রশস্ত অনেকখানি জায়গা জংলায় ভর্তি—সেখানেও রয়েছে পূর্ব পুরুষদের আরো কিছু কবর। এটি আসলে আমাদের দিঘির পাড়, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বেশ বড় যে দিঘিটি শোনেছি আবদুল হামিদ টেন্ডলের চাচা হিন্দু জমিদারের কাছ থেকে কিনে নিয়েছিলেন। এ দিঘির বিপরীত পাড়েই হলো আমাদের বাড়ি—সবই প্রায় এক সারিতে, সামনে উঠান, তারপর বিভিন্ন দেউড়ি ঘর। হাটের ওই মূল রাস্তার এক দিকে বড়সড় আমাদের মসজিদ। সাধারণ দিনগুলোতে ওই দোকানপাটের কারণে বাজার যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে। কিন্তু সপ্তায় দু'দিন হাটবারে ওটি হয়ে পড়ে রীতিমত জনাকীর্ণ একটি বর্ধিষ্ণু ব্যবসা কেন্দ্র। দু'পাশের দোকানের সামনে বসে হাট। আর এ রাস্তার সমান্তরালে থাকা ছোট রাস্তার সঙ্গে মাছের বাজার, গোশ্‌তের বাজার ইত্যাদি নানা ছাউনির নিচে।

হাট বসার দিনে ওখানে যেতাম হাট বাজার করতে অন্যদের সঙ্গী হয়ে, সে এক চমকপ্রদ অভিজ্ঞতা। নজুমিয়া হাটেই প্রথম সাক্ষাৎ পেয়েছি তাৎক্ষণিক চেঁছে নেয়া বরফ কুচির উপর লাল নীল সিরাপ দেয়া 'আইসক্রীম', রেশমি মিঠাই, কাঠি লজেন্স, কটকটি ইত্যাদির স্বাদ। দেখেছি ভ্রাম্যমাণ ম্যাজিশিয়ানের ম্যাজিক—বাজিকরের সহকারী ছেলেটা কীভাবে পুরো একটি তলোয়ার মুখে ঢুকিয়ে

ফেলতো, আর বাজিকর আমাদেরকে সাবধান করে বলতো একেবারে পিনপতন নীরবতা বজায় রাখতে, কারণ কামরূপ কামাখ্যায় তাঁর ওস্তাদ তাঁকে সে ভাবেই হুকুম করেছেন, না মানলে ছেলেটি মারা যাবে। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মত তার কথা তামিল করতাম। সওদা নিয়ে আসা বেপারিদেরকে ছাড়াও গ্রামের পরিচিত ছেলেমেয়েদেরকেও দেখতাম মুরগি, ডিম ইত্যাদি বিক্রি করতে বসতে হাটে। বেপারিদের সঙ্গে ভাল পরিচয় হয়েছে যখন চাচাদের সঙ্গে হাটে 'হাসিল' তুলতে গিয়েছি। হাটের সত্ত্বাধিকারী হিসেবে প্রাপ্য এই ট্যাক্সটি তাঁরা পেতেন—কখনো নগদে কখনো শাকসব্জি ইত্যাদি দিয়ে। এই নিয়ে বেপারিদের নানা সওয়াল, কাকুতিমিনতি আমি খুব লক্ষ্য করতাম। বড় একটি ঝুড়ি সব বিক্রেতাদের সামনে দিয়ে নিয়ে যাওয়া হতো। তার পণ্যের পরিমাণ অনুযায়ী বেপারিরা বেগুণ, কুমড়ো, শাক ইত্যাদি কিছু অংশ ঝুড়ির ভেতর দিয়ে দিত। তেমন কোন পরিমাপ ছিল না, পুরোটাই ছিল চোখের আন্দাজের ওপর। অনায্য ভাবে কম দিতে চাইলে কিছুটা সওয়াল করা হতো। তবে বেচাকেনা খারাপ দেখিয়ে কেউ কেউ কম দেবার অনুমতি প্রার্থনা করতো। তাছাড়া বেপারিদের সবাইকে খুব কাছের থেকে দেখতে, তাদের কথা শুনতেও ভাল লাগতো। একইভাবে নজুমিয়া হাটের প্রায় সব দোকান ঘুরে দেখা সম্ভব হয়েছে দোকানগুলোর ভাড়া তোলার সময় চাচাদের সঙ্গে থেকে। সেখানে অবশ্য বেশ কিছু আলাপ পরিচয়ের সুযোগও ঘটেছে, কারণ দোকানদারদের অনেকে আত্মীয়, অনেকে চাচাদের বন্ধুস্থানীয়; ভাড়া নিয়ে কী ভাবে দাখিলা দিতে হয় তাও দেখেছি। বর্ধিষ্ণু হাটের দিকে লক্ষ্য করে সে সময় একটি কথা ওখানকার মানুষের কাছে প্রায়ই শোনতাম 'ভবিষ্যতে এমন একদিন আসবে যখন শহর (অর্থাৎ চট্টগ্রাম শহর) বিলাত হবে এবং নজু মিয়া হাট শহর হবে'। তাদের স্বপ্ন অদ্ভুতভাবে অর্ধেক ঠিকই ফলে গেছে—শহর বিলাত হয়েছে কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ, তবে নজুমিয়া হাট যে শহর হয়েছে তা বলাই বাহুল্য।

আমার দাদার ওই জমিদারী কায়দার ভারিক্কি চেহারা ও হুকুমদারি স্বভাবটিই আমার স্মৃতিতে থাকলেও আব্বার মুখে, মায়ের মুখে দাদার অন্য রকম গল্পও শুনেছি—বিশেষ করে আব্বার সঙ্গে, চাচাদের সঙ্গে তাঁর নানা মতান্তর, জেদাজেদি ইত্যাদির কথা। তাঁর বাল্যকালের কথাও শুনেছি। যেমন একবার তাঁর বাবা আবদুল হামিদ টেন্ডল তাঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে গিয়েছিলেন বেড়াতে। আসার আগে বেশ জমকালো পোষাক বানিয়ে দিয়েছিলেন রেঙ্গুনের বিখ্যাত দরজিকে দিয়ে। দাদার সাম্প্রতিক জীবনের নানা কথাও অন্যদের কাছে শুনেছি। আব্বা দোকান শুরু করার পর, বিশেষ করে দোকানটি সাফল্যের মুখ দেখার পর দাদার বহু চাহিদা আব্বার উপর দিয়ে গেছে। দাদা নিজে ব্যস্ত ছিলেন জমিজমা ইত্যাদির তদারকি শাসনের কাজে। দলিল লেখায় তাঁর যথেষ্ট মুনশিয়ানা ছিল, সুন্দর কিন্তু দুর্বোধ্য ক্লাসিকাল ঢঙের হস্তাক্ষরে প্রচলিত রেওয়াজ অনুযায়ী নিখুঁত ভাবে লিখতেন। কালেভদ্রে শহরে যখন আসতেন তাও মামলা মোকদ্দমা, রেজিস্ট্রেশন

ইত্যাদি কাজেই আসতেন। সেটি তাঞ্জামে চড়ে আসা সম্ভব ছিলনা, আম লোকের সঙ্গে বাসে আসাও তাঁর কম্মো নয়। তাই তিনি আসতেন নৌকা করে, তাঁর দু'চারজন পারিষদকে সঙ্গে নিয়ে। বাড়ির কাছের খালে নৌকাতে উঠে হালদা, কর্ণফুলি হয়ে চাক্তাই খালে, সেখান থেকে আব্বার দোকানে। পুরো পথে ধীরে ধীরে আসতে দিনের একটি বড় অংশ কাবার হয়ে যেত—এ বড় রাজকীয় আগমন। তবে তাঁর আসাটি ছিল বিরল ব্যাপার। এর চেয়ে বেশি ঘন ঘন যা ঘটতো তা হলো দাদার বিখ্যাত চিরকুট পাঠানো। ছোট ছোট কাগজে—লিখে পাঠাতেন তাঁর নানা নির্দেশ ও চাহিদার ফর্দ—প্রধানত আব্বার বরাবরে। এতে থাকতো টাকা পাঠানোর, বিশেষ কোন জিনিসপত্র বা সওদা কিনে পাঠাবার, গেরস্থালি কোন কাজ সম্পন্ন করার নির্দেশ। প্রয়োজনে একাধিক চিরকূটও থাকতো। এই চিরকুট নিয়ে আসা এবং সেই অনুযায়ী জিনিসপত্র দাদার কাছে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পড়তো ওই নিশিকাকার ওপর। তিনি দাদা ও আব্বার মাঝখানে যোগসূত্র ছিলেন, উভয়ের হয়ে কাজ করতেন। এসব কাজে তিনি বাথুয়া থেকে হেঁটে আসতেন, হেঁটে যেতেন—কোন কোন দিন একাধিকবার। ওদিকে দাদা নিশ্চিন্তে বাথুয়া মৌজা এবং ওই পুরো অঞ্চলের একজন শীর্ষ মুরব্বি হিসেবে নানা সমিতি, সালিশ, ইত্যাদিতে দাপটের সঙ্গে সভাপতিত্ব করে যাচ্ছিলেন তাঁর তাঞ্জামে চড়ে বেড়িয়ে। ইউনিয়ন বোর্ডের অফিস, পোস্ট অফিস ইত্যাদি সরকারী কেন্দ্রগুলো এখান থেকে বেশ দূরে হলেও তাঁর নজুমিয়া হাট এলাকার ব্যবসায়িক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিলো, সেই সঙ্গে তিনিও হয়ে উঠেছিলেন স্থানীয় সমাজের কেন্দ্রবিন্দু। অবশ্য আমার কাছে দাদার ওই বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বকে ফুটো করে দেবার মত কিছু গল্পও বলতেন আশার বাপ দাদু—আমাদের শহরের বাসার বহুকালের কর্মী হিসেবে যার সাক্ষাৎ এ অধ্যায়ে আগেই পেয়েছি। তিনি অল্প বয়সে দাদার কৃষি কাজের রাখাল ছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে দাদার অনেক খবর রাখতেন। যেমন আশার বাপের মতে খুব কিপটে স্বভাবের জন্য দাদাকে আড়ালে লোকে ডাকতো 'ইছনি হাজি' (ইচা শুটকি খাওয়া হাজি সাহেব)। সে যে যাই বলুক, হাজী নজু মিয়া সওদাগরের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল ওই অঞ্চল ছাড়িয়ে অনেক অনেক দূরে। কিন্তু মানুষটার শীর্ণ শরীর আরো শীর্ণ হয়েছে, চিরকাল হাঁপানি পীড়িত দাদার হাঁপানির টান ক্রমে আরো বেড়েছে।

আমার জীবনের প্রথম মৃত্যু দর্শনও আমার দাদার মৃত্যু। তখনো স্কুল যাওয়া শুরু হয়নি আমার। হঠাৎ খবর এলো গ্রামের বাড়ি যেতে হবে দাদা মারা গেছেন। একটি বাস ভাড়া করা হয়েছে, যা শহরে থাকা অনেক আত্মীয়স্বজন দিয়ে ভর্তি। সেই বাসে ভীড় করে বসে গ্রামে গেলাম—শোকার্ত গ্রামের মুখোমুখী হতে। সবই একেবারে নতুন অভিজ্ঞতা। আমার মনে আছে এদিক ওদিক পায়চারি করে এক পর্যায়ে যখন দাদার মৃতদেহ রাখা ঘরে ঢুকলাম—সবাই আমাকে কাছে ডেকে নিলো, কাফনের বাঁধন খুলে মুখের উপর থেকে কাপড় সরানো হলো শুধু আমাকে

মৃত দাদার মুখ দেখানোর জন্য। তাঁর নিথর মুখ দেখে যেমন থতমত খেয়েছিলাম, তেমনি বয়স্ক সব লোকরা আমার প্রতি এত মনোযোগ দেয়াতেও বিস্মিত হয়েছিলাম। বুঝতে পারছিলাম এই প্রতিপত্তিশালী মানুষটির একজন উত্তরসূরি হিসেবেই আমাকে আলাদা দাম দেয়া হচ্ছে, যদিও তিনি এখন শীর্ণকায় ছোট খাট সাদা কাপড়ে ঢাকা একটি দেহ মাত্র।

আমার দাদার অন্য ভাইয়েরাও ছিলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণাঢ্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী, আমার বিবেচনায় ব্যতিক্রমী জীবনের জন্য তাঁদের কেউ কেউ দাদার চেয়েও বর্ণাঢ্য। তখন গ্রামে একটি ছড়া প্রচলিত ছিল :

আবদুর রশীদ টেন্ডলের ঠাঁট
নজু মিয়ার হাট,
ফোরখ মিয়ার মোটর গাড়ি
জুনু মিয়ার জালাবারি।

আবদুর রশীদ টেন্ডল স্থানীয় আর একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। বাকিরা আমার দাদা ও তাঁর ভাইরা। জালাবারি হলো কৃষি সংক্রান্ত শব্দ; সে ক্ষেত্রে ছড়াটির তাৎপর্য একটু পরেই বোঝা যাবে। দাদা নজু মিয়া সবার বড়, তাঁর পরেই ফোরখ মিয়া। জীবন-জীবিকার ক্ষেত্রে দাদার এই ভাই অনেকগুলো সৃষ্টিশীল এক্সপেরিমেন্ট করেছিলেন যারই ফল ফোরখ বিড়ি,ফোরখ ব্লক প্রিন্টেড শাড়ি, ফোরখ মিয়ার ভাড়ায় খাটা গাড়ি (চট্টগ্রাম শহরে ভাড়া গাড়ির আদি প্রবর্তকদের অন্যতম)—সবগুলোকে আজকের দিনের ভাষায় ক্ষুদ্র ও মাঝারি বিনিয়োগের শিল্প বলা যায়। হাটে পৌঁছলেই তাঁর দোকানে গিয়ে এই স্বল্পভাষী অদ্ভুত এক গম্ভীর গরিমা নিয়ে সদা উপবিষ্ট এই মানুষটিকে সালাম করাটি ছিল আমাদের প্রথম কাজ। এই দোকান ছেড়ে তাঁকে বড় একটা কোথাও যেতে দেখিনি—বাড়িতেও নয়। তাঁকে সবাই রাজার বাপ বলতো তাঁর বড় ছেলের নাম রাজা মিয়া বলে। বাকি ছেলেদের নাম শের আলী, বাদশা, আমানুল্লাহ (আফগানিস্থানের বাদশাহ আমানুল্লাহর নামে), এবং ওয়াজেদ আলী (লখনৌয়ের নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের নামে)। এমন রাজন্য প্রীতি যাঁর, তাঁর নিজেরো ছিলো রাজকীয় চেহারা ও বেশভূষা। ঝুঁটিযুক্ত লাল তুর্কী ফেজ মাথায়, পাকানো গোঁফ (দাড়ি বিহীন) এবং রক্তিম মুখের এই দাদাকে ইস্তাম্বুলের তুর্কী সুলতানি প্রাসাদের কোন অমাত্য ভাবতে বেগ পেতে হতোনা। ফোরখ বিড়ির বাণ্ডিলের উপর যে ছবিটি মুদ্রিত থাকতো তাও তাঁর এই চেহারা ও বেশের—কিছুটা কম বয়সের। তাঁদের দুই ভাই ইরানের আবাদানে কাজ করেছেন—তেলের রিফাইনারির কাজ। বলে রাখা ভাল যে আমার শৈশব কেটেছে আবাদান, বাহরায়েন, ডিগবয় (আসাম), আকিয়াব (বার্মা) ইত্যাদি জায়গার গল্প শুনে শুনে। এই দুই ভাই ফেরত আসেন নি—ওখানে এক প্লেগ মহামারীতে মারা গিয়েছেন। তবে তাঁদের একজনের স্ত্রী ফেরত এসেছিলেন। ফোরখ মিয়া আবাদান গিয়ে তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন।

সবার ছোট দাদা জুনু মিয়া বয়সে আমার আব্বার কয়েক বছর মাত্র বড়, তাই তাঁরা উভয়ে খুব ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই দাদা কিন্তু খুবই সাদামাটা জীবনের—রেঙ্গুনে কাজ করেছেন, দেশে দোকান ও ব্যবসা ছিল। কিন্তু তাঁর সব চেয়ে প্রিয় কাজ ছিল স্বহস্তে কৃষি কাজ, অন্যদের তদারকি করা ছাড়াও—তাই ছড়ায় জুনু মিয়ার জালাবারির কথা। নিজের বিয়ের ক্ষেত্রে কিন্তু এই দাদা সাহসিকতা দেখিয়েছেন। বার্মায় বার্মিজ মেয়ে বিয়ে করে বৌ আর শ্বাশুড়ি দু'জনকেই নিয়ে এসেছেন দেশে। বহুকাল ধরে এই বার্মিজ দাদী আমাদের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। তার চেয়েও নজর কাড়তে দাদীর মা—আকর্ষণীয়া এই বয়স্কা মহিলা সব সময় বার্মিজ পোষাক 'থামি' পরে থাকতেন; অনেক বেশি বয়সেও এক মনে গেরস্থালির কাজ করতেন, খুবই আগ্রহের ও যত্নের সঙ্গে গরু বাছুরের যত্ন নিতেন, দুধ দোয়াতেন সব কিছু। মা, মেয়ে দু'জনেই এত হাসিখুশি থাকতেন, আমাদেরকে এত আদর করতেন যা অনন্য—আর বর্মী হয়েও নিখুঁত চাটগেঁয়ে ভাষায় কথা বলতেন। দাদার শ্বাশুড়ি এই বৃদ্ধা দীর্ঘজীবী হয়েছিলেন; বাথুয়া গ্রামেই সমাহিত আছেন, তাঁর মেয়েও।

নানা বাড়ির প্রধান আকর্ষণ ছিলেন আমার নানা, যাঁর নামও দুলা মিয়া। এক সময় রেঙ্গুনে ও কলকাতায় আসা যাওয়া করে কাপড়ের ব্যবসা করেছেন। কিন্তু আমার শৈশবে ইতোমধ্যেই তিনি বাড়িতে স্থিত হয়েছেন জমিজমার মালিক হিসেবে। আমার দেখা মত আমি তাঁকে জীবিকার জন্য কোন কাজ করতে দেখিনি—হয়তো কোন ভাবে জমিজমা, খাজনা এসবের খোঁজ খবর রাখতেন। ধানের গোলাই ছিল এ বাড়ির নগদ ব্যাংক। এমন কি আমার তরুণ মামাকে পকেট খরচের টাকা হিসেবে এই ধানের গোলাতেই হাত দিতে হতো। নানাকে শুধু দেখেছি ঘুরে ঘুরে শহরের ও আশপাশের ভাল ভাল বাজার থেকে কাঁচা বাজার করতে এবং আমাদেরকে ভাল ভাল জিনিস খাওয়াতে। ভোজন রসিক নানার খুব ভাল জানা ছিল চট্টগ্রামের সেরা গরুর গোশ্ত কোথায় পাওয়া যায়—বিশেষ করে গরুর ভাল পায়া। আমের দিনে আমরা গেলে তিনি লম্বা একটি আঁকশি নিয়ে বেরুতেন বাড়ির আম বাগানে—আমরা পিছু পিছু গিয়ে তাঁর নিপুণ হাতের আম পাড়া দেখতাম। তারপর এই আমের ব্যবহারে দুধে-আমের ভাত নিজের হাতে তৈরি করে নানা আমাদেরকে খাওয়াতেন। এমন নানার সঙ্গে খাতির থাকবে না তবে কার সঙ্গে থাকবে? নানার অন্য আকর্ষণ ছিল তাঁর গল্প। ওই সময় আমরা বেশি ছোট হলেও তাঁকে দেখতাম আমার বড় দুই ভাইয়ের সঙ্গে বিশ্বের নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে। নানা বিষয় নিয়ে তাঁর নিজস্ব থিওরি ছিল—বিশেষ করে চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে। বৃটিশ আমলে বড় হওয়া নানার অবিচল শ্রদ্ধা ও আগ্রহ ছিল ইংল্যান্ডের রাজার ওপর। নানা বাড়িতে ষষ্ঠ জর্জের ছবিটি দীর্ঘকাল সযত্নে টাঙ্গানো ছিল। নানার জীবনের একেবারে শেষের দিকে ১৯৬১ সালে রাণী এলিজাবেথ পাকিস্তান সফরের অংশ হিসেবে চট্টগ্রাম এসেছিলেন। সেই বয়সে

দুর্বল দেহ নিয়ে একা হেঁটে তিনি জনতার ভীড়ে যোগ দিয়ে রাণীকে দেখতে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ পথ হাঁটার অভ্যাসটি কিন্তু নানার চিরন্তন। আমার দীর্ঘদেহী নানা এই ব্যাপারে সোমালিয়ার মারাথন দৌড়বিদদের ঈর্ষার কারণ হতে পারতেন।

সুদূর শৈশবে রাজনৈতিক আবহ

আগেই উল্লেখ করেছি আমার জন্ম হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষের ক্রান্তিকালে, যে কারণে শৈশবে যুদ্ধের অনেক রেশ থেকে গিয়েছিল। উপমহাদেশীয় রাজনীতিরও ছিল সেটি একটি ক্রান্তিকাল—ইংরাজদের থেকে স্বাধীনতা, ভারত বিভক্তি, পাকিস্তানের জন্ম। আমার ৪/৫ বছর বয়স পর্যন্ত এই পরিবর্তনগুলোর রেশও আমাদের বক্সীর হাট রোডের বাসাতে যথেষ্ট বজায় ছিল। এক্কেবারে শুরুতে আমার মুখে যখন আধো-আধো বুলি তখনই আমাকে শেখানো হয়েছিল গুড়কে 'গান্ধি চিনি' এবং চিনিকে 'জিন্নাহ চিনি' বলতে (~ ১৯৪৮)। আমাদের বাসায় তখন অধিকাংশ সময় চা ইত্যাদিতে সাধারণত গুড় এবং শুধু মাঝে মাঝে চিনি ব্যবহৃত হতো। চকচকে সুন্দর চিনির দানা ছোট্ট শিশুকে বেশি আকর্ষণ করবে এটিই স্বাভাবিক—তাই আমি প্রায়ই বায়না ধরতাম গান্ধি চিনি নয় আমার জিন্নাহ চিনি চাই। একই ভাবে রাজার মাথা যুক্ত পুরোনো তামাটে বৃটিশ ভারতীয় পয়সার বদলে আমি চকচকে এক্কেবারে নতুন পাকিস্তানী পয়সা পেলে খুব খুশি হতাম। ওই সময়ে নানা রকম মুদ্রা বাজারে চল্লতো—বৃটিশ ভারতীয়, পাকিস্তানি, এবং এমনকি বার্মিজও। সবাই পাকিস্তানি মুদ্রায় তা বদল করে নিচ্ছিল। আমাদের দোকানের ঠিক সামনেই বসতো পুরোনো মুদ্রা ও নোট বদলানোর এক হকার। তার টেবিলে সাজানো নানা দেশের নানা রকম নোট ও মুদ্রা আমাদের কাছে বেশ আকর্ষণীয় ছিল। আরো আকর্ষণীয় ছিল তার হাঁক—"টাকা আধুলি সিকি বদলি-বার্মা ইণ্ডিয়া পয়সা বদলি"।

রাজনীতির বার্তাগুলো এভাবে পরোক্ষ ভাবে আমাদের শিশুদের কাছে তো আসতোই, আরো প্রত্যক্ষ ভাবেও আসতো। শহরে আমাদের বাসায় বড়রা ছিল সব সময় রাজনীতির আলোচনায় মুখর। একেবারে বড়দের দলে ছিলেন আব্বা এবং আমার দুই খালু। চৌধুরী খালু আমাদের সঙ্গেই থাকতেন আব্বার ম্যানেজারের কাজ নিয়ে। মোক্তাল খালু লয়েডস ব্যাংকে কাজ করতেন, প্রায়ই সাইকেল চালিয়ে আমাদের বাসায় আসতেন। সেকালে গ্রামাঞ্চলের বিরল এন্ট্রান্স পাশদের (আজকের এস এস সি) একজন বলে বেশ বিশিষ্ট ছিলেন; দেশের ও বিশ্বের রাজনীতির ভাল খবর রাখতেন। ব্যাংকে তাঁর ঠিক ওপরের উপরিওয়ালাই ছিলেন ইংরেজ সাহেব, তখনো এবং এর পরেও বহুদিন। সুযোগ পেলেই ইংরেজিতে কথা বলা খালুর স্বভাব। এ সময়ের অনেকদিন পর যখন আমি ক্লাস

থ্রি-তে পড়ি তিনি একবার সাহেবের অনুমতি নিয়ে বুবু, খালা ও আমাদের ছোটদেরকে রাতের বেলা লয়েড্স ব্যাংক নিয়ে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল লিফ্টে চড়ানো আর ফ্রিজ দেখানো; আর ওই ফ্রিজ থেকে আগে রেখে দেয়া শীতল মিষ্টান্ন আর পানীয় খাওয়ানো। আব্বা ও দুই খালু মুসলিম লীগের ঘোর সমর্থক—পাকিস্তান আন্দোলন নিয়ে তাঁরা তখনো ভীষণ শিহরিত। বাসায় তরুণতররা সব রকম রাজনীতির কথা বলতেন—আমার চাচারা, দূর সম্পর্কের আত্মীয় স্বভাবশিল্পী কামাল, আমার বড় দুই ভাই সালাম ও ইউনূস, পরে আমাদের গৃহ শিক্ষক। এঁরা কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ সবার কথা সমান আগ্রহ নিয়ে আলোচনা করতেন, তর্কের ঝড় তুলতেন। তাঁদের ওপর ছিল ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন ধারার সাহিত্যের ও ফিল্মের প্রভাব। আমাদের দোকানে রাখা *আজাদ* পত্রিকা পড়তেন, আবার প্রতিবেশীদের দোকানে গিয়ে কলকাতার *যুগান্তর*, *সত্যযুগ* ইত্যাদিও পড়তেন। নেহাতই শিশু বয়সের হয়ে আমি এগুলো জানলাম বা বুঝলাম কী করে? এর একটি কারণ হলো সেই ৪/৫ বছর বয়স থেকে সেই যে আমার একটি অদ্ভুত স্বভাব তৈরি হয়েছিল বড় ছোট অন্যদের সবার সব কথা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গেলা, তা নিয়ে ভাবিত হওয়া, এবং মনে রাখা—যার অনেক কিছু আজ অবধি মনে আছে। অবশ্য কোন কোন কথা হয়তো এর কিছু পরে শুনেছি, এখন মনে হচ্ছে ওই প্রথম শৈশবে শুনেছিলাম; এরকম ভুল কোন কোন ক্ষেত্রে হতে পারে। আমার আর একটি বিশেষ অভ্যাস ছিল যেখানেই কোন বিষয়ে গান আর সুর থাকে তা সুরে সুরে মনে গেঁথে রাখা—তা কোন করুণ ঘটনার কান্নার গানই হোক, আত্মীয়ার বিয়েতে মেয়েলি গানই হোক, বা রাজনৈতিক আন্দোলনের গণসংগীতই হোক। আমাদের বাসায় হিন্দি ছবি, রাজনৈতিক সভা, মিছিল ইত্যাদি থেকে শোনা গানের কলি ভাঁজার মানুষ প্রচুর ছিল—বিশেষ করে কামাল, চাচা সিরাজ, মেজভাই ইউনূস। তা ছাড়া বক্সীর হাট রোডের উপর দিয়ে সারাক্ষণ আসা যাওয়া করা বাউল, ফকির, ভিখারি এদের মুখেও সে সময় এমনি গান প্রচুর থাকতো। যেমন 'হাসি হাসি পরবো ফাঁসি দেখবে জগৎবাসী, একবার বিদায় দাও মা ঘুরে আসি'—এ গান আমি ওদের মুখেই প্রথম শুনেছিলাম। নজু মিয়া হাটে 'আহার দেখো বাহার দেখো' বাক্সের বায়োস্কোপে মধ্যে ফাঁসির দড়ি গলায় যে যুবকটিকে দেখতাম প্রদর্শকের 'ক্ষুদিরামের ফাঁসি দেখ' বলার সঙ্গে সঙ্গে—সেই ছবির সঙ্গে গানটি মেলাবার চেষ্টা করেছি।

দেশাত্মবোধক গানের মধ্যে হিন্দি গানগুলোই বেশি শুনেছি সেকালে, আর তার সুরে কিছুটা অনুভব করেছি ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন, যা মাত্র কয়েক বছর আগে শেষ হয়েছিল। কামালের গলায় একটি গান প্রায়ই শোনতাম-'দূর হঠো ভাই দুনিয়াওয়ালে হিন্দুস্তান হামারা হ্যায়'। কিন্তু আমি বেশি মজা পেতাম

কিছু চাটগেঁয়ে গানে। সে সময় চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবী এবং পরে কম্যুনিস্ট নেত্রী কল্পনা দত্তের নাম সবার মুখে মুখে ছিল; তাঁর একটি গান :

আঁরো গর আঁরো বারি আঁরো সম্বত্তি
গরফোরা বাঁদর এডে গরের রাজত্বি

অর্থাৎ আমাদের ঘর, আমাদের বাড়ি, আমাদের সম্পত্তি; ঘর-পোড়া বাঁদর এসে এখানে রাজত্ব করছে। কল্পনা দত্ত চট্টগ্রামের বোয়ালখালির শ্রীপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। চট্টগ্রাম থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা পাশ করে কলকাতা বেথুন কলেজে পড়ার সময় সূর্যসেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলে যোগ দেন। মাস্টার দা সূর্য সেনের নির্দেশে কল্পনার বান্ধবী আরেক তরুণী বিপ্লবী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের সঙ্গে পাহাড়তলীতে ইউরোপিয়ান ক্লাব আক্রমণের কথা থাকলেও এর কয়েকদিন আগেই তিনি ধরা পড়ে যান। প্রীতিলতা একাই আক্রমণ চালিয়েছিলেন এবং ধরা পড়ার উপক্রম হলে লুকিয়ে সঙ্গে রাখা সায়ানেড বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন (১৯৩২)। কল্পনা দত্ত অস্ত্রাগার লুণ্ঠন পরবর্তী বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড পান। ১৯৩৯ এর দিকে কারামুক্ত হয়ে তিনি ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং পার্টির সর্বভারতীয় জেনারেল সেক্রেটারী পূর্ণচন্দ্র যোশীকে বিয়ে করেন। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তিনি চট্টগ্রাম থেকে কম্যুনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচন করে হেরে যান। দেশবিভাগের পর দীর্ঘকাল ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন।

পাকিস্তানের সেই প্রথম দিনগুলোতেও কংগ্রেস ও কম্যুনিস্ট পার্টির বেশ দবদবা ছিল। চট্টগ্রামে কংগ্রেস নেতা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের স্মৃতি ছিল সর্বত্র। চট্টগ্রামে চন্দনাইশের বরমা গ্রামে তাঁর জন্ম; কলকাতায় এবং ক্যাম্ব্রিজে লেখাপড়া করলেও, ব্যারিষ্টারী পাশ করে কলকাতায় আইন ব্যবসা শুরু করলেও, তাঁর রাজনৈতিক ভিত্তিভূমি চট্টগ্রামেই। এখানেই তিনি বিশের দশকে স্বদেশী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, চট্টগ্রামে বার্মা অয়েল কোম্পানি ও আসাম-রেলওয়ের কর্মীদের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিয়ে কারাবরণ করেন (১৯২১)। তিনি সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির একজন সদস্য নির্বাচিত হন এবং বঙ্গীয় আইন সভারও সদস্য হন চট্টগ্রাম থেকে। পরে অবশ্য তিনি কলকাতার মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন (১৯৩০)। 'দেশপ্রিয়' খেতাবে পুরো বঙ্গে ও ভারতে এক নামে পরিচিত এ মানুষটি চট্টগ্রামে প্রাতঃস্মরণীয় হয়েছিলেন। যখনকার কথা বলছি যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তখন বহুদিন ধরে পরলোকগত (১৯৩৩)। চট্টগ্রাম কংগ্রেসের নেতৃত্বে ছিলেন তাঁর ইংরেজ স্ত্রী নেলি সেনগুপ্ত। এই ব্যক্তিত্ব সম্পন্না প্রৌঢ়া নারীকে আমি দেখেছি আমার শৈশবের ওসময়ের কিছু পরে জে এম সেন হলের সভায়। নেলি সেনগুপ্ত নিজেও সর্বভারতীয় অঙ্গনে কংগ্রেসের বড় নেতা ছিলেন, অল-ইণ্ডিয়া কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ্যানি বেসান্ত ও

সরোজিনি নাইডুর পর তিনিই তৃতীয় নারী যিনি এই শীর্ষ পদে নির্বাচিত হয়েছেন। এ সময় তিনি কারাবন্দী হন দীর্ঘ সময়ের জন্য। ১৯৪০ এবং ১৯৪৬ সালে চট্টগ্রাম থেকে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে বঙ্গীয় আইন সভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে ১৯৫৪ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে পূর্ব বাংলা আইন সভায়ও চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত হন; যেই নির্বাচনে হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্ট মুসলিম লীগকে প্রায় উৎখাত করে দিয়েছিল। কিন্তু সেই পরিস্থিতি ঘটেছিল আমার বর্তমান আলোচ্য সময়ের আরো বেশ কয়েক বছর পর।

পঞ্চাশের দশকের একেবারে শুরুতে আমাদের বাসার তর্ক বিতর্কে রাজনীতি. তখনো আবর্তিত পাকিস্তান আন্দোলনের ও মুসলিম লীগ নেতৃত্বের রেশ ধরে। আবছা আবছা যা মনে পড়ে মনে হতো যেন সবাই এখনো এই আন্দোলনে রয়েছে। স্বাধীন দেশে জিন্নাহ চট্টগ্রামে এসে পলোগ্রাউণ্ডের মাঠে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (মার্চ ১৯৪৮); মাওলানা হুজুর অস্বাভাবিক দীর্ঘ মোনাজাত ধরলে জিন্নাহ সাহেব 'আল্লা হুম্মা আমিন' বলে নিজেই মোনাজাতের ইতি টেনেছিলেন এসব গল্প তখন আমি অনেকবার শুনেছি। দোকানের সামনে ফকিরদের মুখে শুনেছি অনেকটা মাইজভান্ডারি সুরে 'আল্লহ নি বাঁচাইবো মোদের মিস্টার জিন্নারে'; যদিও জিন্নাহ তখন পরলোকে। আব্বা দীর্ঘ সময় মুসলিম লীগ ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য ছিলেন—নিয়মিত প্যারেড করেছেন। এটি সর্বত্র গঠিত হয়েছিল কংগ্রেস ভলানটিয়ারদের অনুকরণে। উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের সপক্ষে সবার মনোবল রক্ষা—বিশেষ করে ১৯৪৬ এর নির্বাচনের সময়। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় কোন অনুষ্ঠানে তাঁর সামাজিক সম্মানের বিবেচনায় আমাদের পাড়ার লীগ ন্যাশনাল গার্ড আব্বাকে গার্ড অব অনার দিয়েছিলেন—একথা আমি অন্যদের কাছে শুনেছি। এই উৎসাহী অন্যদের একজন ছিলেন নুরুল আলম—আমাদের পাশের বাদশা মিয়া সওদাগরের দোকানের তরুণ কর্মচারী। সপ্তাহে ছয়দিন লুঙ্গি গেঞ্জি পরে দোকানদারী করেন। রোববার তাঁকে চেনা যায়না—খাঁকি স্মার্ট পোষাক ও সবুজ ব্যারে টুপি ও বুট পরে তিনি স্বেচ্ছাসেবী আনসার ট্রেনিংয়ে যান। লীগ ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যরা অনেকে আনসারে স্বেচ্ছাসেবী হয়েছেন। নুরুল আলমকে ওই বেশে দেখতে ও তাঁর কথা শুনতে আমার খুব ভাল লাগতো। তিনি বোঝাতেন এখন ভারত থেকে বিতাড়িত হয়ে অনেক মোহাজের এসেছেন। তাঁদের সাহায্য করার জন্যই আমাদের সবাইকে এখন 'আনসার' বা সাহায্যকারী হতে হবে। দোকানের সামনে দিয়ে নানা রকম উর্দু শ্লোগান দিয়ে মাঝে মাঝে মোহাজেরদের মিছিল যেত।

আব্বা ও খালুদের মুখে আগের দিনের চট্টগ্রামের যে গল্প শোনতাম তাতে ১৯৩০ সালের অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিপ্লবীদেরকে তাঁরা প্রতিপক্ষই মনে করতেন—সূর্য সেন, অম্বিকা চক্রবর্তী, অনন্ত সিংদেরকে তাঁরা মুসলমানদের ওপর জবরদস্তি করা সন্ত্রাসী হিসেবে বিবেচনা করতেন। ভাইয়েরা ও চাচারা কিন্তু এই

ব্যাপারে একমত ছিলেননা। এর ক'বছর পরে বক্সীর হাটেই আমার বড় ভাইদের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নাটকের মহড়ায় আমি নিয়মিত উপস্থিত থেকেছি। অথচ আব্বার প্রজন্মের মুসলিমদের প্রায় সবার হিরো বরং ছিলেন আহসান উল্লাহ দারোগা। চট্টগ্রামের পুলিশ অফিসার আহসান উল্লাহ দারোগা বিপ্লবীদেরকে শক্ত ভাবে দমন করার কারণে ওদের টার্গেট ছিলেন। একদিন প্রকাশ্য রাস্তায় একজন তরুণ বিপ্লবী খুব কাছে থেকে গুলি করে এই দারোগাকে হত্যা করে। এই হত্যাকাণ্ড এবং এর সুযোগ নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে যে হঠাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গিয়েছিল সেই কাহিনী আমি বহুবার বড়দের মুখে শুনেছি। লক্ষ্য করেছি আব্বাদের প্রজন্মের আত্মীয় স্বজনদের আসরে চট্টগ্রামের রাজনীতির ঘটনা-দুর্ঘটনার মধ্যে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ঘটনাটিকে না যত বড় করে দেখা হতো তার চেয়ে বেশি বড় করে দেখা হয়েছে আহসান উল্লাহ দারোগার হত্যা ও তার ফলে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে। অবশ্য চট্টগ্রামের অন্য সব দাঙ্গার মত এরও স্থায়ীত্ব ছিল খুবই স্বল্প, এবং ক্ষয়ক্ষতিও তেমন বেশি নয়। চট্টগ্রামে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছিল অন্য যে কোন জায়গার চেয়ে অনেক বেশি অটুট।

আর একটি দাঙ্গার সূত্রপাত হয়েছিল আমার সুদূর শৈশবেই, কিছুটা আমার অভিজ্ঞতার ভেতরেই। চট্টগ্রামে সম্ভবত প্রথম বারের মত একটি এক্সিবিশন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল সরকারী উদ্যোগে বর্তমানে যেখানে স্টেডিয়াম তার মাঠে (১৯৫০)। এক্সিবিশনের দিনগুলো আমার জন্য ছিল অত্যন্ত ফুর্তির—প্রায় প্রতিদিনই দিনের বড় অংশ সেখানে কাটাতাম, কারণ আমাদের দোকানের একটি স্টল সেখানে ছিল, খুবই সুন্দর ঝলমলে বাতি ইত্যাদি দিয়ে সাজানো। আর সেই স্টলের সামনে গার্ড হিসেবে দাঁড়িয়ে থাকতো আমাদের গ্রামের তরুণ সোনা মিয়া। সোনা মিয়াকে এজন্য যে পোষাক পরানো হয়েছিল তাতে কেউ বলবেনা সে বাথুয়া গ্রামের চাষি যুবক। একেবারে যুদ্ধের বেশে খাকি ইউনিফর্মে—মাথায় টুপি, অনেক পকেট, শোল্ডার ব্যাজ, বুকে তেরচা করে গুলিভর্তি ব্যান্ডোলিয়ার, পায়ে বুট ও এঙ্কলেট পট্টি, হাতে বন্দুক—সোনার দোকানের গার্ড বলে কথা। আমি এক্সিবিশনের স্টলের ভেতরে বসার চেয়ে সোনা মিয়ার পাশে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে বাইরের দৃশ্য দেখতেই পছন্দ করতাম। ওখান থেকেই দেখা যেত এক্সিবিশনের ঠিক মাঝখানে ব্যান্ড পার্টি ঘুরে ঘুরে ব্যান্ড বাজাচ্ছে। তাদের পরনে বাঘের চামড়া (হয়তো কৃত্রিম), সামনে পেতলের চকচকে মাথাওয়ালা লাঠি হাতে ব্যান্ড মাস্টার নানা কসরৎ দেখাচ্ছে, অনেকগুলো ব্যাগ পাইপ যাদের থেকে সুন্দর ঝালর ঝুলছে (ব্যাগ পাইপের বালিশের মত ফোলানো জিনিসটিকে আমার কাছে মনে হতো একটি ছাগলের মত—বের হয়ে থাকা বাঁশিগুলো ছাগলের পায়ের মত), আর নানা কিসিমের ড্রাম, বিউগল ইত্যাদি। তখন আমরা ব্যান্ড বলতামনা, বলতাম 'জং বাজা' বা 'লড়াই বাজনা'। এই বাঘের ছাল পরা মানুষগুলো এক্সিবিশন মাঠের মাঝখানে একটি টাওয়ারের চারদিকে ঘুরে ঘুরে বাজাতো—

যেমন চমকপ্রদ দৃশ্য তেমন চমকপ্রদ বাজনা—মুগ্ধ হয়ে দেখতাম আর শোনতাম। ওই এক্সিবিশন থেকে একদিন ফেরার সময় শোনলাম—ফেরা হবেনা, কারণ শহরে কার্ফিউ অর্ডার জারি করা হয়েছে, কেউ রাস্তায় নামতে পারবেনা। কার্ফিউ কথাটি আমি এই প্রথম শোনলাম। এক্সিবিশনের স্টলে আটকা পড়া এই শিশুকে বোঝানো হলো কার্ফিউতে রাস্তায় বের হলে কী হয়। সবাইকে খুব আতঙ্কিত দেখলাম—কারণ শহরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছে—বক্সীর হাটে আমাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের স্বর্ণালঙ্কারের দোকান লুট হবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। কেন হঠাৎ এমনটি হলো, যার জন্য দিন দুপুরে কার্ফিউ দিতে হলো সে সব হয় জানতে পারিনি, নয় এখন মনে নেই। কর্তৃপক্ষ কড়া ব্যবস্থা নেয়ায় সন্ধ্যা হবার আগেই এটি দমন করা হয়েছিল—আমরা নিরাপদে ফিরে গিয়েছিলাম, তা মনে আছে।

বক্সীর হাটের দোকানে আব্বা নিজে হিন্দু ও মুসলিম উভয় ধর্মীয় অনুষঙ্গের এক রকম চাঁদাবাজিতে খুব ভুগতেন তা দেখেছি। এখানে নানা বারোয়ারি পূজার চাঁদা তোলার ঢাক বাজতো; দোকানের সামনে এসে সমানে বাজানো হতো যতক্ষণ না চাঁদা পাওয়া যেত। সুপ্রতিবেশী হিসেবে আব্বাকেও চাঁদা দিতে হতো। এতে আব্বা যতটা না বিরক্ত হতেন তার চেয়ে বেশি বিরক্ত হতেন মহরম উপলক্ষে নানা পাড়ার তাজিয়ার চাঁদা আদায়ের জন্য একের পর এক দল এসে যখন ঢোল বাজাতো। প্রায়শই এরা ষণ্ডা প্রকৃতির মানুষ হতো—ঢোল বাজানো ছাড়াও লাঠি খেলার মতো লাঠিও ঘোরাতো। আব্বা এগুলোকে এবং তাজিয়া বের করে নানা দলের মধ্যে মারামারি করাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন। কিন্তু তবু ঢোল না বাজানো ও হৈচৈ না করার শর্তে চাঁদা তাঁকে দিতেই হতো। আমার অবশ্য কোন রকম ঢাক ঢোলই তেমন খারাপ লাগতোনা—মহরমের লাঠিখেলা এবং সুন্দর তাজিয়াগুলোও ভাল লাগতো; পূজার সুন্দর মণ্ডপগুলোতো অবশ্যই। চকবাজারের একটি জায়গায় তাজিয়াগুলো রাখা হতো, আমার সে সময় ওখানে এক সঙ্গে অনেকগুলো তাজিয়া দেখার সুযোগ হয়েছে—আমরা এদের বলতাম—'গোরা মঞ্জিল'—নানা রঙের রাংতা স্বজ্জিত হয়ে এদের অনেকগুলো বহু তলা হতো। তবে আশুরা উপলক্ষে চট্টগ্রামের যে 'কারবালার মাঠে' সব পাড়ার তাজিয়াগুলো একত্র হয়ে যুদ্ধখেলা ও লাঠিখেলা হতো তার অনেক গল্প শুনলেও, নিজেরা কখনো গিয়ে দেখিনি। শুনেছি চোঙার ভেতরে বারুদে আগুন লাগিয়ে এক ধরনের রকেট ছোঁড়া হতো ওখানে, যাকে বলা হত 'চুয়া খেলা'। বাসায় টুনু আর আমি রাংতা সংগ্রহ করতাম ছোটখাট তাজিয়া বানাবার চেষ্টায়, কখনো তেমন ভাল কিছু তৈরি হয়নি তাতে।

আসলে বক্সীর হাটে আমাদের ছোটদের দিন কেটেছে মুসলিম অনুষ্ঠানাদির চেয়ে হিন্দু অনুষ্ঠানাদির মধ্যেই বেশি। এর একটি কারণ আমাদের দোকান পরিবেষ্টিত ছিল বণিক সম্প্রদায়ের হিন্দু দোকানদার ও কারিগরদের দ্বারা। তাদের বার মাসে তের পার্বণ—আর আমরা ছিলাম সেসব পার্বণের উৎসাহী

অংশগ্রহণকারী। চৈত্র সংক্রান্তির দিন বক্সীর হাটে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটতো। হঠাৎ সেদিন অনেক সাধু সন্ন্যাসীর আগমন হতো। গায়ে ছাই মাখা, খুবই জটিল জটাধারী চুল, হাতে কমণ্ডলু, ত্রিশূল—এই বেশে তাদের দেখে গল্পে শোনা মুণি-ঋষিদের কথা মনে হতো। ভাবতাম এরা কোথা থেকে আসে। আমার কল্পনা ছিল ওরা ওই পাহাড়ের চূড়ায় জঙ্গলে কোথাও ধ্যানে মগ্ন থাকে সারা বছর, চৈত্র সংক্রান্তির দিন নেমে আসে। সবাই যে শুধু ধ্যানের মানুষ নয় তা বুঝেছিলাম এক ঘটনায়। ওরা দোকানে দোকানে ভিক্ষা করতো, সবাই ভক্তি ভরে প্রণামী দিতো। আমাদের পাশের দোকানে গোপাল কাকার দোকানে দেখলাম এক সুঠামদেহী সাধু আর এক কৃশকায় সাধুর সঙ্গে ভীষণ ঝগড়া করছে একটি ত্রিশূলের মালিকানা নিয়ে। একজন বুক চাপড়িয়ে বলে 'আমার আমার', অন্য জন আরো জোরে বুক চাপড়িয়ে বলে 'আমার আমার আমার'; শেষ পর্যন্ত সমাধান কী ভাবে হয়েছিল মনে নেই। তবে ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী টুনু আর আমি বয়স হবার পরেও কখনো বুক চাপড়িয়ে 'আমার আমার' বললে দুজনেই ওই ঘটনার কথা মনে করে হাসিতে গড়াগড়ি যেতাম।

আপন স্কুল থেকে আসল স্কুল

আড্ডা ও কলের গানের মুগ্ধ শ্রোতা

আয়োজন করে কোন বিশেষ সময়ে এসে পড়ালেখা শুরু হয়নি আমার। শুধু মনে পড়ে একেবারে স্বাধীন দিনগুলোর মধ্যেও কখনো কখনো নিয়ম করে বসতে হচ্ছে বিভিন্ন গৃহশিক্ষকের কাছে, আর হুজুর আসছেন আরবি কায়দা (আমরা বলতাম সিরা) পড়াতে। বাংলা আর আরবি উভয় ক্ষেত্রে বর্ণ জ্ঞান আর পড়তে শেখা মাত্র—তাও খুবই আদরের মধ্যে, বড় ভাইদের সিরিয়াস পড়ালেখার মাঝে উঁকি ঝুঁকি দিতে দিতে। আসলে সেই চার পাঁচ বছর অবধি পড়ালেখা করার চেয়ে বরং পড়ালেখা দেখছিলামই বেশি। কিন্তু আমার যেই স্বভাব সব কিছু ভাল করে দেখা, শোনা আর ভাবা; স্কুলে যাবার প্রশ্ন উঠার অনেক আগেই বই, পত্রিকা, সাইনবোর্ড নানা জায়গার লেখাগুলো পড়ার ও বোঝার চেষ্টার মাধ্যমে ইতোমধ্যে এক রকমের 'পাঠক' হয়ে উঠছিলাম।

বড় ভাইদের এবং এখন আমাদের ছোটদের গৃহশিক্ষকদের আনাগোনার একটি বাড়তি ফল হলো বাসায় রাজনৈতিক ও অন্যান্য আড্ডার ও বিতর্কের দলটি বড় হলো—আমারো কথা গেলার খোরাক বাড়লো। এগুলো আমি রীতিমত উপভোগ করতাম। তা ছাড়া ভাইদের, চাচাদের ও তাঁদের বন্ধু-বান্ধবদের হিন্দি ফিল্মের কাহিনী, তার ভাল-মন্দ সমালোচনা, সেই ফিল্মি গান গাওয়া, তাদের এক এক জনের অন্যান্য নানা সখ, নানা অ্যাডভেঞ্চার এ সবের নীরব দর্শক ও শ্রোতা হয়ে পড়লাম আমি, তবে কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত সরব এবং সক্রিয়ও। আমার এই অতিরিক্ত কৌতূহলের প্রতিক্রিয়াগুলো তাদের দিক থেকে কখনো নেতিবাচক হয়নি। ইউনূস ভাই (মেজ ভাই) এবং সালাম ভাই (বড়দা) তো আমাকে তাঁদের অসংখ্য কাজে এক রকম জুনিয়র পার্টনার করেই নিয়েছিলেন—যা পরবর্তীতে বেড়েছে বৈ কমেনি। অন্যরাও আমার অতিরিক্ত কৌতূহলে মজাই পেতেন। সবার আড্ডার মধ্যে আমার কাছে সব চেয়ে প্রিয় ছিল রাজনৈতিক

প্রসঙ্গগুলো—কারণ এতে তর্ক-বিতর্কের উত্তেজনা বেশি থাকতো; এতে বড়, ছোট, গুরুজন সবাই কমবেশি অংশ নিত। আমার মোটামুটি একটি ধারণা হয়ে গিয়েছিল কে কোন পক্ষ নেবে। কিছু কিছু যুক্তি শুনতে শুনতে জানা হয়ে গিয়েছিল—যদিও সব খুঁটিনাটি বুঝতামনা। এখন মনে হচ্ছে অনেক জিনিস তখনই শুনেছি এবং বুঝেছি; আসলে হয়তো কয়েক বছর পরে শোনা ও বোঝা জিনিসও এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কোনটি যে ঠিক কোন বছরের সেটি খুব নিশ্চিত হয়ে আলাদা করা কঠিন।

ফিল্মের আলোচনা ও গান তরুণতর সদস্যদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বার বার শুনতে শুনতে মনের মধ্যে বিশেষ ভাবে গেঁথে যেত কিছু গানের সুর—বিশেষ করে হিন্দি ফিল্মের গান। এর কারণ ওই সব গানে মনে হয় একেবারে পরিবেষ্টিত ছিলাম। বাসায় তো গাওয়া হতোই, নানা পূজা লেগেই থাকতো পাড়ায়, আর সেই সঙ্গে মাইকে পরিচিত হিন্দি গান। আব্বার সঙ্গে বা অন্যদের সঙ্গে যত বিয়েবাড়িতে যেতাম সেখানেও মাইকে এগুলো বাজতো। এর পরও বহু বছর পর্যন্ত এক একটি এই হিন্দি ফিল্মের গান আমার একটি বিশেষ সময়ের বা ঘটনার স্মৃতির সঙ্গে একেবারে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। যেমন 'আয় মেরি দিল কহি আউর চল', শুনলে কয়েকটি স্মৃতি মনে পড়ে; 'বচপন কি দিন ভোলা না জানা' শুনলে অন্য কিছু স্মৃতি; 'চল্ চলরে মুসাফির চল্' কিংবা 'আওয়ারাহ্ ওঁ ওঁ ওঁ,' সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু স্মৃতি। স্মৃতিতে গাঁথা অন্য রকম গানগুলো শোনতাম বাসায় কারো কারো কাছে, আর দোকানের সামনের রাস্তায় বাউন্ডেলে ছেলেদের কাছে।

তবে শিগ্‌গীর গানের আশ্চর্য আর একটি উৎসের সন্ধান পেলাম। আমাদের দোকানের দুই দোকান পরেই ছিল আশার বাপ নানার (আবদুস সোবহান সওদাগর) তৈজস পত্রের দোকান—আমার নানার চাচাতো ভাই তিনি। দোকানের ওপরের তলায় তাঁদের বাসা। নানী খুব আদর করতেন বলে ওই বাসায় প্রায়ই যেতাম। সেখানে দুই মামা শফি ও ইদ্রিস—তাদের মধ্যে শফি বেশ একটু বড় হলেও ইদ্রিস আমার থেকে মাত্র কিছু বড়—পরে কিছু দিন স্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি ওর সঙ্গে। ওদের বাসায় একটি কলের গান ছিল (চাটগেঁয়ে ভাষায় 'খলগন')। শফি মামা আর ইদ্রিস মামার সঙ্গে অনেক দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ওতে মনোনিবেশ করে থাকতাম। ভারি শ্যালাকে (প্রথম যুগের প্লাস্টিক) তৈরি বেশ কিছু রেকর্ড ছিল তাদের—বেশির ভাগ হিন্দি সিনেমার গান, পল্লী গীতি ও পুরোনো দিনের গান; আব্বাসউদ্দিনের বেশ কিছু, কানন বালা প্রমুখেরও। রেকর্ড ঘোরার গতি কমে এলে আমরা হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে এতে 'পাম্প' দিতাম। সঙ্গে সংলগ্ন একটি ছোট কৌটাতে নতুন পিন থাকতো। আর অন্য খোপে নষ্ট পিনগুলো রাখা হতো। পিন লাগিয়ে সাউন্ড বক্সটি টেনে এনে রেকর্ডের প্রান্তে আস্তে ছেড়ে দেয়া হতো—আর ভেসে আসতো গান, সঙ্গে লাগানো চোঙের মধ্য দিয়ে। রেকর্ডগুলোর উপর ছবিতে হিজ মাস্টার্স ভয়েসের কুকুরটি যে ভাবে গুটিসুঁটি চোঙার সামনে

বসে গান শুনছে আঁকা আছে, অবিকল সেই ভঙ্গিতে বসে মনোযোগ সহকারে গান শোনার কারণে আমাকে মামারা ওই কুকুরটির সঙ্গেও তুলনা করতো। পুরোনো রেকর্ডের খাঁজে পিন আটকে একই অংশ বার বার গাওয়া হতে থাকলে আমরা তাড়াতাড়ি সাউন্ড বক্স তুলে রেকর্ডের অন্য অংশে রাখতাম। পিনের সুঁচাগ্রটি কিছুক্ষণ পর ঘষায় ঘষায় ভোতা হয়ে গেলে গানের মাধুর্য কমে যেত—তখন পিন বদলে দিতাম। এই কাজগুলো নিজে করার চান্স পেলে খুবই ভাল লাগতো। নানার বাসার এই যন্ত্রটিই আমার জীবনের প্রথম মিউজিক যন্ত্র, অবশ্য বুবুর বাসার রেডিয়ো বাদ দিলে। জীবনের প্রথম বছরগুলোতে এর ক্ষীণ আওয়াজের গান শোনার যে অদ্ভুত মুগ্ধতা পরের কোন কিছুর সঙ্গে তার তুলনা হয়না। বড় কথা হলো এ যন্ত্রের সব কিছু আমাদের সাধ্যের মধ্যে—বিদ্যুৎ লাগেনা, যেখানে ইচ্ছে নিয়ে যাওয়া যায়, দম কমে গেলে দম দেয়া, আটকে গেলে পুনরুদ্ধার করা—সব আমাদের হাতে। ওই কলের গানের একটি গানের কথা বিশেষভাবে মনে পড়ে তার ব্যতিক্রমী বিষয়ের জন্য—'রিক্সা চালাই মোরা রিক্সাওয়ালা; কাঠ ফাটা রোদে, পিচঢালা পথে, ঝড় বাদলেতে, শীতের রাতে—রিক্সা চালাই মোরা রিক্সাওয়ালা। টুন টুন টুন টুন ঘন্টি বাজে, সওয়ারি হাঁকে জলদি চালাও হেই জলদি চালাও; ওরা বুঝেনা যে পেটের জ্বালায় মোরা পিঠে মানুষ বই'। মনে পড়ে এই জন্য যে এটি এবং বামপন্থী আরো কিছু গান শুনে তখনই এদের মধ্যে প্রতিবাদী ব্যাপারটি একটু একটু বুঝতে পারছিলাম। এরকম গান তখন বেশ জনপ্রিয়ই ছিল। খুব সম্ভব ভারত বিভাগের পরও সর্ব ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি এবং তার সাংস্কৃতিক প্রভাব এ অঞ্চলে যথেষ্ট ছিল। মজার ব্যাপার হলো যখন এ গান শুনছি তখনো কোন প্রকারের রিক্সা দেখিনি, রিক্সাওয়ালার কষ্টও দেখিনি (অবশ্য এ গানে কলকাতার মানুষে টানা রিক্সার কথা বলা হয়েছে যা পরেও বহুদিন দেখিনি)। চট্টগ্রামে তখন চলতো ঘোড়ার গাড়ি। পরিবারের সবাই—বিশেষ করে মা, বুবু, খালা ওরাসহ কোথাও যেতে হলে আমরা ঘোড়ার গাড়িতে যেতাম; স্বল্প পাল্লার, বা দূর পাল্লার যাই হোক।

শৈশবে কোন কোন জিনিসের সঙ্গে এক রকমের রোমান্টিক ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। কলের গান ছিল সে রকমের একটি। ঘরে বাইরে এত গান, মাইকে তো গান বাজছে খুবই দরাজ কণ্ঠে। তারপরও আমার আকর্ষণ সেই ক্ষীণ-কণ্ঠী কলের গানটির প্রতি। এটি গানের জন্য যতটা নয়, ছিল কলের জন্য; তার চেয়ে বেশি হয়তো বলা যায় গানের আকর্ষণের সঙ্গে কলের আকর্ষণ মেশার জন্য। এমনি আর একটি রোমান্টিক আকর্ষণ ছিল সেই ঘোড়ার গাড়ির প্রতি। এখানে কলের ব্যাপার ছিলনা—ছিল ঘোড়া, কোচওয়ান, অন্য রকম গতি সব মিলিয়ে একটি ব্যতিক্রমী অনুভূতি। যখনই শোনতাম কাউকে পাঠানো হয়েছে কোথাও যেতে একটি ঘোড়ার গাড়ি 'কেরেয়া' করতে (ভাড়া করতে) মনটি আনন্দে নেচে উঠতো।

চট্টগ্রামের ঘোড়ার গাড়িগুলো ছিল ফিটন—রীতিমত রাজকীয় (পরে দেখেছি বৃটেনের রাণীর ফিটনের সঙ্গে এর অনেক মিল)। এর চালক কোচওয়ান সবার মাথার উপর চাবুক হাতে লাগাম ধরে যে ভাবে বসে, তাতে তাঁকে আমার কাছে বীরপুরুষই মনে হতো—কষ্টে থাকা রিক্সাওয়ালার মত মোটেই নয়। অনেকে তার পাশের সীটে বসার সুযোগ পেত। নিজের খুব ইচ্ছে থাকলেও আমাকে কখনো সে সুযোগ দেয়া হয়নি। কোচওয়ানের পাশে পেতলের ফ্রেমে কাচের মধ্যে যে বাতি এবং তাঁর পায়ের কাছে পা দিয়ে দাবার জন্য যে পেতলের ঘন্টা থাকতো তাও অরিজিনাল বৃটিশ ফিটনের মতোই। গাড়ির পেছনে একটি থাকের উপর ঝুড়িতে থাকতো চনা ইত্যাদি ঘোড়ার খাদ্য। দাঁড়িয়ে থাকার সময় ঘোড়াকে এই দানাপানি দেয়া হতো। শহরের কেন্দ্রে মিউনিসিপ্যাল অফিসের সামনে গোল হয়ে ঘোড়ার গাড়িগুলো থাকতো। সাধারণত ওখান থেকে ভাড়া করে আনতে হতো। সিটি কর্পোরেশন অফিস আজো ওখানটিতেই আছে।

চট্টগ্রামে তখন ভাড়া করার আরো উন্নত আরেকটি যান বাহন ছিল—ট্যাক্সি। লালদিঘির পারে একটি ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে সব সময় কিছু ট্যাক্সি পাওয়া যেত। ভাড়া বেশি ছিল বলেই বোধ হয় সচরাচর আমাদের পরিবারে কাউকে এটি ব্যবহার করতে দেখিনি। তবে হ্যাঁ একদিন ওই ট্যাক্সি আমাদের হতো, অর্থাৎ বাসার সব ছেলে মেয়ে শিশুদের, যেদিন বাড়ির কোন ছেলের মুসলমানির পর সেরে উঠে গোসল করার দিন আসতো। মুসলমানির কষ্টের পুরস্কার স্বরূপই যেন ট্যাক্সিতে চড়ে পতেঙ্গা সমুদ্র তীরে যাবার সুযোগ পেত সে—আর তার সুবাদে বাকি সব শিশু। এ ছাড়া অন্য কোন উপলক্ষে ট্যাক্সিতে চড়ার কথা মনে পড়েনা, সমুদ্র তীরে যাবার কথাও না।

আপন স্কুলের বিচিত্র রূপ

আসল স্কুলে ভর্তি হতে এখনো দেরি থাকলেও আমার আপন স্কুলের কোন বিরাম ছিলনা, এবং সেটি শুধু বাল্যশিক্ষা বই থেকে নয়। যেমন বাংলা ছাড়াও একটি বাড়তি ভাষা মোটামুটি রপ্ত হয়ে গিয়েছিল, অন্তত বোঝার ক্ষেত্রে। সেটি হিন্দি অথবা সঠিক ভাবে বললে হিন্দুস্তানি। বাংলা শেখাটাকেও আমাদের ক্ষেত্রে একদম তুচ্ছ করা যায়না, কারণ সেটি পরিবেশ থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে শেখার সুযোগ ছিলনা। আমার সেই শৈশবে সর্বত্র আমরা চাটগেঁয়ে ভাষায় পরিবেষ্টিত ছিলাম। বাড়িতে তো বটেই আশপাশে সব জায়গায়—যেখানে যাওয়ার সুযোগ হতো; এমনকি আমার প্রথম স্কুলেও শিক্ষকরা বই পড়ানোর বাইরে অধিকাংশ কথা চাটগেঁয়েতে বলতেন, বকাঝকা, উপদেশও সেই ভাষাতেই দিতেন। অবশ্য শহরে বাসার মধ্যেই চাঁটগেঁয়ে ভাষা বলেননা এমন বেশ কয়েকজন কাজ করতেন। তাঁরা পরিবারের ঘনিষ্ঠ স্বর্ণ-কারিগররা, যাদের প্রায় সবাই ছিলেন কুমিল্লার মানুষ, তাই কুমিল্লার আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতেন। এমন পরিবেশ সত্ত্বেও স্কুলের লেখাপড়ার আগেই শুদ্ধ কথ্য বাংলাটি ভালই রপ্ত করেছিলাম। এর কারণ ছিল

বাসায় বড় ভাইরা, চাচারা, তাদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে গড়া এক রকম সাংস্কৃতিক আবহ—আবৃত্তি, গান এবং ঘরোয়া থিয়েটারে; সে সবের কথা শিগ্‌গীর বলতে হবে। সিনেমার কল্যাণে হিন্দিরও একটি বড় স্থান ছিল। হিন্দি অবশ্য আরো বহুভাবে আমাদের জীবনে ছিল। 'রেডিয়ো সিলোন' এবং 'বিবিধ ভারতীর' (খুবই জনপ্রিয় ও শক্তিশালী রেডিয়ো ব্রডকাস্ট যাতে হিন্দি গানই বাজানো হতো একের পর এক) প্রভাব শুরুর সুযোগ তখনো না ঘটলেও হিন্দুস্তানী বা ভোজপুরি ফেরিওয়ালা, মুটে ও অন্যান্য কর্মী বক্সীর হাটের রাস্তায় কম ছিল না। লাল কাপড়ের পুটলিতে রাখা হিন্দুস্তানি চানাচুরওয়ালার হাঁক খুব মনে পড়ে—'চানাচুরগরম, বাবু মিলায়ে মজাদার চানাচুরগরম'। বুবুদের বাড়িতে বহুদিন এক দারোয়ান ছিলেন নেপালি গুর্খা—তাঁর কাছেও হিন্দুস্তানিতে তাঁর যুদ্ধকালীন গল্প শুনতে বেশ মজা পেতাম। মজার ব্যাপার হলো বামপন্থী রাজনীতিবিদদের গান আর শ্লোগানগুলোও তখন শুধু বাংলা ছিলনা, উর্দুও ছিলনা, অনেকগুলো ছিল হিন্দি বা হিন্দুস্তানি; পাকিস্তানের গানও তাঁরা হিন্দিতে গাইতেন।

এর মধ্যে একটি খুব মনে পড়ে :

> দেশ হামারা পাকিস্তান, চাঁদ সেতারোকা আসমান
> রহনে ওয়ালো সব সমান মুসলমান হিন্দু খৃস্টান।...

খুব সম্ভব সর্ব ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যক্রমের প্রভাবে তা হয়েছে। পরে অবশ্য সব ক্ষেত্রেই হিন্দির ব্যবহার কমে গিয়েছিল, তার জায়গায় এসেছিল উর্দু। প্রধানত ভারতীয় মুসলিমদের ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের আসার ফলে উর্দুভাষীদের সাক্ষাৎ বেশি বেশি পেতে থাকলাম। বিশেষ করে বক্সীর হাট-খাতুনগঞ্জ এলাকায় ব্যবসায়ীদের একটি বড় অংশ ছিল গুজরাটি মুসলিম, যাদেরকে আমরা বোম্বাইওয়ালা বলতাম। নিজেদের মধ্যে গুজরাটি বল্লেও বাইরে তাঁরা উর্দু বলতেন। আব্বা ও পরিবারের অন্যরা স্থানীয় যে বড় মসজিদে জুমা, তারাবি ইত্যাদি নামাজ পড়তেন তার একটি বড় অংশ মুসল্লি বোম্বাইওয়ালা ছিলেন বলে ওখানে ইমাম-মুয়াজ্জিনের সব কথা উর্দুতে হতো।

বোম্বাইওয়ালারা ছাড়া খাতুনগঞ্জের তখন বেশ কিছু মারোয়াড়ি ব্যবসায়ী ছিলেন। তাদের একজন বড় ব্যবসায়ী কানাইয়া লালের নামটি আমাদের কাছে খুব বেশি পরিচিত ছিল, কারণ কাছেই ছিল তাঁর এলুমিনিয়ামের ফ্যাক্টরি—চকচকে সব ডেগ্‌চি পাতিলের বিরাট সমারোহ, আমাদের শিশুদের নজর কাড়তো। আর আমাদের দোকানের সামনেই ছিল পরেশ লালের বিল্ডিং—নিচে বিভিন্ন দোকান, উপরের ছাদটিতে সব সময় জমকালো মূর্তি মন্ডপ সহ এই ওই পূজা লেগে থাকতো; সেই সঙ্গে মাইকে কলের গান থেকে গান। আমাদের ছাদ থেকে এর সবই আমরা দেখতাম ও উপভোগ করতাম।

এর মধ্যে বাসার ঘরোয়া থিয়েটার গোষ্ঠীটি বেশ জমে উঠেছে এবং তার প্রথম স্মরণীয় মঞ্চায়নটি ঘটেছে শহরে নয়, গ্রামে। নানা কারণে আমার স্মৃতিতে

এই ঘটনাটি বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বড় দুই ভাই ইতোমধ্যে প্রাইমারি স্কুল ছাড়িয়ে একটু বড় পরিসরের বিদ্যালয়ে ঢুকেছেন—বড়দা দারুল উলুম মাদ্রাসায় আর ইউনূস ভাই গভর্নমেন্ট এম ই স্কুলে—উভয়েই চট্টগ্রামের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান। চাচা সোবহান তখন আরেক ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজের (যা তখন সবার মুখে বুড়া মাদ্রাসা বলে পরিচিত) স্কুল শাখায়। শেষের ওই দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একটি বড় বৈশিষ্ট ছিল এগুলোর অবস্থান—চট্টগ্রাম কলেজের সামনের সুউচ্চ পাহাড়ের চমৎকার পরিসরে। সিরাজ চাচা স্কুলে পড়লেও বলিউডের ধ্যান ধারণায় বেশি আচ্ছন্ন মনে হতো। গ্রামের দূর সম্পর্কের আত্মীয় কামাল অবশ্য প্রায় পুরোপুরিই একজন বলিউড শিল্পীর মত আচরণ করতেন। ঘরোয়া থিয়েটারে গ্রামের প্রতিবেশী আরো কুশীলব ছিল যাদের কথা স্পষ্ট মনে পড়ছেনা। আমরা তখন কিছুদিন গ্রামে বাথুয়ার বাড়িতে আছি, স্কুল পড়ুয়ারা ওখান থেকেই যাতায়ত করছেন। সেবারের মঞ্চায়নটি ছিল 'কারবালার পরে' নামের একটি নাটিকার। ঠিক কারবালার মূল কাহিনী নিয়ে নয়; বরং তার পরেপরে সীমারের, এজিদের কী কী পরিণতি হয়েছিল সে কাহিনী নিয়েই নাটিকাটি। এর রিহার্সেলের, রূপসজ্জার এবং মঞ্চসজ্জা এবং হলঘর ও দর্শক নিয়ন্ত্রণের যে আয়োজন বেশ কিছু দিন ধরে চলছিল সেসব এখানো স্পষ্ট মনে খোদাই হয়ে আছে, যদিও নেহাতই ছোট শিশু হবার কারণে দু'একটি ছোটখাট ফাইফরমাশ খাটা ছাড়া আমার নিজের কোন ভূমিকাই ছিলনা এতে। নানা রঙের প্রচুর রাঙতা কাগজ এসেছিল। বাঁশ, কাঠের তলোয়ার, বর্শা, ঢাল ইত্যাদির উপর এসব লাগিয়ে যথা সম্ভব জমকালো করে তোলার চেষ্টাও ছিল। নকল দাঁড়ি-গোফ ইত্যাদির চেষ্টাটিও ছিল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। বাথুয়ায় আমাদের বাড়ি ও আশপাশের বাড়ির অনেক কিশোররা কোন না কোন পার্ট পেয়েছিল অভিনয়ে, যদিও অনেক ক'টি নেহাত এক্সট্রা হিসেবে জনতা বা সৈন্যবাহিনীর সদস্য হিসেবে। যেমন আমার শফি চাচার (দাদার ভাই জুনু মিয়ার ছেলে) পার্টটি ছিল গোঁফ-ওয়ালা প্রহরী হিসেবে বার বার বর্শা হাতে এদিক থেকে ওদিক, ওদিক থেকে এদিক পায়চারী করা মাত্র। অংশগ্রহণের ব্যাপকতার দিক থেকে এটি ছিল রীতিমত একটি গণনাট্য। তবে অংশ গ্রহণটি অভাবনীয় রূপ ধারণ করেছিল হবু দর্শকদের মধ্যে নজু মিয়া বাড়ির এবং আশ পাশের পাড়ার মেয়েদের ও মহিলাদের অন্তর্ভুক্তির আয়োজনের মাধ্যমে—যদিও নাটিকায় কোন মহিলা চরিত্র ছিল বলে মনে পড়েনা। বাড়ির উঠানের অপর পাশে—দেউড়ি ঘরটিই ছিল নাটক মঞ্চস্থ করার স্থান। এর এক পাশটিতে পাটের সুতা দিয়ে চিহ্নিত করে মহিলাদের জন্য রিজার্ভ রাখা হয়েছিল। তা ছাড়া মায়ের ন্যাওটা শিশু হিসেবে আমার গতিবিধির একটি বড় অংশ ছিল অন্দর মহলে—সেখানে শিগ্‌গীর অনুষ্ঠিত হাতে যাওয়া নাটক দেখার চাপা উত্তেজনা এবং উঁকি ঝুঁকি দিয়ে রিহার্সেল দেখার আগ্রহ থেকে বেশ বুঝতে পারছিলাম যে পুরো ব্যাপারটি পুরুষ-মহিলা দর্শকদের চমকপ্রদ সমাবেশের মধ্যেই হবে।

অনুষ্ঠানটি কিন্তু শুধু নাটিকা নিয়েই পরিকল্পিত ছিলনা। এটি হতে যাচ্ছিল একটি বিচিত্রানুষ্ঠান—গান, কৌতুক ইত্যাদি নানা জিনিসের সমন্বয়ে। রিহার্সাল থেকে একটি কৌতুকের কথা মনে পড়ে। মাস্টার ছাত্রদের পড়াতে চেষ্টা করছেন, কিন্তু ছাত্রদের মন পড়ে আছে হিন্দি গান গাওয়াতে। মাস্টার পড়া দিয়ে বাইরে গেছেন আর ছাত্ররা হাত নেড়ে নেড়ে সমস্বরে গাইছে :

'আল্লা মেরা মাস্টার কো, দো মাইনা কে লিয়ে গলা মে' ফাঁসি দে'।

রিহার্সাল আর আয়োজনের দিনগুলোকে দারুণ উপভোগ করেছি। প্রতিদিন এর প্রধান আয়োজক ও মূল ভূমিকায় অভিনয়কারী ভাইয়েরা আর চাচারা শহরে স্কুল থেকে নতুন নতুন আইডিয়া নিয়ে আসতেন আর পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতেন।

অবশেষে এলো সেই দিনটি, যেই সন্ধ্যায় এটি অভিনীত হবে। দিনের মধ্যেই মঞ্চসজ্জা, রূপসজ্জা, হলসজ্জা সব কিছুর ফাইনাল টাচ দেয়া হয়েছে। সন্ধ্যার পরপরই অনেক দর্শক আসন নিয়ে নিয়েছেন—বিশেষ করে মহিলারা, হলের অর্ধেকের কাছাকাছি মহিলাদের উপস্থিতিতে ভরে গেছে। প্রারম্ভিক গান শুরু হয়েছে সবাইকে জড়ো করার জন্য। এমন সময় ঘটলো বিপত্তি। আমার দাদা হাজি নজু মিয়া সওদাগর হঠাৎ রুদ্র মূর্তি ধারণ করে আবির্ভূত হলেন। হাতের লাঠিটি এলোপাতাড়ি চালিয়ে মঞ্চসজ্জার সব কিছু ভেঙ্গে দিলেন এবং এসব বেশরিয়তি কাজের হোতাদের ওপর বিশেষ করে তাঁর ছোট ছেলেদের ও বড় নাতিদের ওপরও গালিগালাজের সঙ্গে লাঠি প্রয়োগ করতে ভুললেন না। দর্শকরা নিমেষেই হাওয়া হয়ে গেল, বিশেষ করে মহিলারা। তাদের হুড়োহুড়িতে হলের বাকি সাজ সজ্জারও বারোটা বাজলো। এত দিনের এত আয়োজন—নিমেষেই তার সব কিছুর বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটলো। কিছুক্ষণের মধ্যে পুরো বাড়িটার ওপর থমথমে নীরবতা নেমে এলো।

কিন্তু না; এখানেই সব ঘটনার পরিসমাপ্তি ঘটলোনা। অনুষ্ঠানটিকে পণ্ড করেছেন নিশ্চিত হয়ে দাদা কয়েক ঘর পর তাঁর নিজের বাড়িতে ফেরত গেছেন। বাড়ির অন্য প্রান্তে তাঁর বড় ছেলের অর্থাৎ আব্বার বাড়ির বারান্দায় দেখা গেল আমার মাকে। বেশ বড় গলায় তীক্ষ্ণ স্বরে দাদার বাড়ির দিকে মুখ করে তিনি এ ঘটনার প্রতিবাদ জানালেন। ছোট ছোট ছেলেদের এতদিনের নির্দোষ আয়োজনটি কেন এই বুড়োর সহ্য হলোনা তাই ছিল তাঁর প্রতিবাদের মূল প্রতিপাদ্য। গুরুজনকে মোটেও ছেড়ে কথা বললেননা তিনি। আমার মায়ের স্পষ্টবাদিতা ও প্রতিবাদী স্বভাবটি আমার মোটামুটি জানা ছিল। এই কারণে বিশেষ করে চাচাদের কাছে তিনি হিরোর এবং আশ্রয়ের বটবৃক্ষের মত ভালবাসা ও সম্মান পেতেন। তা সত্ত্বেও যে ভঙ্গিতে ও যে ভাষায় তিনি এ প্রতিবাদটি জানালেন, এবং এমন প্রতিপত্তিশালী মানুষকে চ্যালেঞ্জ করলেন তাতে পাঁচ বছর বয়সী শিশু আমার কাছেও মনে হলো সৎসাহস এই গ্রামে একজনেরই আছে। বলা বাহুল্য পরের

দিনই আমরা পুরো পরিবার গ্রাম থেকে শহরের বক্সীর হাটের বাসায় ফিরে গেলাম। কারণ মা আর এক মুহূর্ত দাদার সান্নিধ্যে গ্রামে থাকতে রাজি ছিলেন না। সেই যে আমরা গেলাম, স্থায়ী ভাবে আর কখনো ফিরে আসিনি।

শহরের মধ্যে একটি গ্রামের বাড়ি

শহরের জীবনের নানা আকর্ষণ ছিল; অন্তত সিনেমা দেখা তো ছিলই। চট্টগ্রামে তখন একবার উপমহাদেশের বিখ্যাত সার্কাস দল 'কমলা সার্কাস' এসেছিল। ওই এক্সিবিশনের মাঠে—তাদের শো হচ্ছে প্রতিদিন। সার্কাস দলের নানা সদস্য সহ তাদের রং বেরঙের প্রচারণা মিছিল ইতোমধ্যে শহর প্রদক্ষিণ করেছে কয়েকবার, আমাদের বক্সীর হাটের রাস্তা দিয়েও গেছে। নাম করা ভারতীয় সার্কাস দলের খেলা আমরা দেখবোনা এমন হতেই পারেনা। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে পুরো পরিবার গেলাম সার্কাসে—আব্বা, মা, আমরা সব ভাইবোন। সার্কাস চমৎকার উপভোগ করলাম পরিবারের সবাই; কখনো অবাক বিস্ময়ে, ভয়ের উদ্বেগে, আবার কখনো হেসে গড়াগড়ি খেয়ে। চমকপ্রদ সব কসরতের মধ্যে আমরা ছোটরা সব সময় উন্মুখ হয়ে ছিলাম মাঝে মাঝে কখন উদ্ভট পোষাক পরা ক্লাউনরা মজার মজার কাণ্ড করবে। আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে 'মৃত্যু গোলক' নামের একটি বিশাল গোলকের ভেতরে চারদিকে সজোরে মোটর সাইকেল চালনা—দেয়াল বেয়ে উপরে, এমন কি মাথা নিচের দিকে দিয়ে উল্টো হয়ে।

বড় একটা সমস্যা সৃষ্টি হলো সার্কাস থেকে ফেরার সময়। ফেরার জন্য সবাই ঘোড়ার গাড়িতে উঠেছি, তখন নানা রকম খেলনাওয়ালা, বাদামওয়ালারা গাড়ি ঘিরে ধরেছে। সবচেয়ে ছোট ভাই আইয়ুব তখন একেবারেই কোলের বাচ্চা। সে বাদামওয়ালার কাছ থেকে বাদামের একটি ঠোঙ্গা নিয়ে খেতে চাইলো, দেখা গেলো তার দাম দেয়ার মত ভাংতি পয়সা আমাদের নেই—আছে বড় নোট। আইয়ুবও ছাড়বেনা, তাই টাকা ভাঙাতে অনেক্ষণ লেগে গেল। এমনিতেই আমরা তখন খুব ক্লান্ত, অনাবশ্যক এই দেরীতে মায়ের হঠাৎ ধৈর্যচ্যুতি হলো। তিনি ওই জনাকীর্ণ জায়গায় উচ্চস্বরে বকাঝকা করলেন ছোট্ট আইয়ুবকে এবং আমাদের সবাইকে—মায়ের কাছ থেকে যা ছিল খুবই অস্বাভাবিক। এই ঘটনার পর বাসায় প্রায়শ এরকম অস্বাভাবিক ধৈর্যচ্যুতি, রাগারাগি ও অসংলগ্ন কথাবার্তা থেকে আমরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম যে মা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়েছেন।

মায়ের অসুখ আমাদের পরিবারের সবার জীবনকে চিরতরে বদলে দিল। অন্যদের জন্য এটি যেভাবে বদলালো অন্তত শুরুতে আমার জন্য বদলালো কিছুটা ভিন্ন ভাবে। কারণ অসুখ যখন তীব্রতর হলো, মা সবার প্রতি প্রায়শ মারমুখী হতে থাকলেন আমি কিন্তু বরাবরের মত মায়ের ন্যাওটা রইলাম, একেবারে তাঁর সংলগ্ন থেকে। আরো বেশ কিছু দিন পর অসুখটা যখন ভিন্ন পর্যায়ে গড়ায়, তাঁর আক্রমাণত্মক হবার প্রবণতা কমে গিয়ে বেশির ভাগ সময় শান্ত সমাহিত হয়ে শুধু

অসংলগ্ন কথাবার্তা বকাবকিতে সীমাবদ্ধ হয়, এবং বাকি সময় তিনি কোরাণ পড়া, নামাজ পড়াতে ক্রমাগত ব্যস্ত থাকেন, তখন পরিবারের সবার জন্যই এটি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক অংশে পরিণত হয়। আমাদের বক্সীর হাটের বাসার সব হালচাল মায়ের অসুখকে কেন্দ্র করে অনেক ক্ষেত্রে কিছুটা অদ্ভুত ভিন্ন রূপ নিতে হলেও—এর হৈচৈ, আনন্দ, তর্ক, সখ, ঘরোয়া গান-বাজনা-থিয়েটার এবং সর্বোপরি লেখাপড়ায় এর কোন প্রভাব পড়লোনা। কখনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার মধ্যে কখনো ভাইবোনদের নিজস্ব ভূবনে একে তুচ্ছ করে কৌতুক-খেলায় পরিণত করার মাধ্যমে আমরা সবকিছু আগের মতই চালিয়ে গেলাম।

এর মধ্যে কিন্তু আমাদের একটি বড় রকমের ঠাঁই বদল হলো। বক্সীর হাটের সীমিত পরিসরে সব কিছু বড় চাপা অবস্থায় করতে হতো। বিশেষ করে বড় ভাই দু'জনের এখনকার লেখাপড়ার জন্য একটু শান্ত পরিবেশ দরকার ছিল। আমরা এ পর্যন্ত উন্মুক্ত হাওয়ায় বাসের অভাবটি পূরণ করছিলাম প্রায়ই গ্রামে গিয়ে থেকে। আম্মার প্রবল আপত্তির কারণে এবং পরে তাঁর অসুস্থতার কারণে এটি আর সম্ভব হচ্ছিলনা। তাই আব্বা শহরের মধ্যেই একটি গ্রামের বাড়ির ব্যবস্থা করলেন। শহরের ঘাট ফরহাদ বেগ অঞ্চলে খালের পাড়ে পুকুর সমেত একটি চমৎকার জমি কিনে সেখানে পাকা ভিটা ও আলকাতরার প্রলেপ দেয়া বেড়ার সমন্বয়ে সুন্দর একটি কটেজ বাড়ি বানালেন, আর আমরা পুরো পরিবার সেখানে চলে গেলাম। বক্সীর হাট থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটি, তাই আসা যাওয়ার সমস্যা ছিলনা। বাড়ির পেছনে পুকুর, সেই পুকুরের চারপাশ নারকেল গাছ, যার মধ্যে থোকা থোকা নারকেল—সব সময় পাড়া যায়। পুকুরে মাছ চাষ হয়েছে। এখানকার নারকেল আর পুকুরের মাছ আমরা ওই বাড়িতে যাওয়ার আগে থেকেই পাচ্ছিলাম। বাড়ির সামনে বড় উঠান তার পর দেউরি ঘর—যেখানে গৃহ শিক্ষক থাকেন, আমাদের পড়াশোনার ব্যবস্থাও সেখানে। পেছনে বাড়ির বাউণ্ডারি দেয়ালের ঠিক বাইরেই একটি সরু খাল—ঐ দেয়ালের ছোট একটি দরজা খুলে সরাসরি খালে যাওয়া যায়। খাল দিয়ে মাঝে মাঝে নৌকা চলাচল করে-একটি নৌকা গেলে তার পাশ দিয়ে আরেকটি যাওয়া বেশ দুরূহ। আমাদের ছোটদের কাছে এমন বাড়ির একটি আলাদা মজা থাকারই কথা—বিশেষ করে বক্সীর হাট বাসার দু'তিনটি কামরা, বারান্দা ও ছাদের সীমাবদ্ধতার তুলনায়। তবে এখানটায় বড় বেশি নীরবতা, জন-মানব শূন্যতা—অন্তত বাড়ির আশপাশটায়, সেটি ভাল লাগতনা।

নতুন বাসায় আসার কিছু দিন আগে আমার নতুন ভাইয়ের জন্ম হয়েছে—আজমের। ভাই পাওয়ার আনন্দ আর নতুন বাসা পাওয়ার আনন্দ একাকার হয়ে গেল আমাদের কাছে। বাসায় এখন সৃজনশীল মানুষের সংখ্যা বেশি বলে আজমের একাধিক নাম হলো। আজম নামটিই শেষ পর্যন্ত টিকলেও অন্য একটি নাম খোরশেদ আনোয়ার অন্তত সে সময় বেশ কাটতি পেয়েছিল। তাই নতুন বাসাটিরও নাম হলো খোরশেদ মঞ্জিল—তা বাসার গেটে সুন্দর করে লিখেও

দেয়া হলো। এ বাড়িতে আসার পর আমার আর টুনুর নিয়ম করে লেখাপড়া শুরু হলো গৃহ শিক্ষকের কাছে। খুব বেশি সময় ধরে বা বেশি সিরিয়াস লেখাপড়া তা ছিলনা। এ বাসায় বিদ্যুৎ ছিলনা, কিন্তু গ্রামের বাড়িতে বিদ্যুৎহীন পরিবেশে থাকতে অভ্যস্ত ছিলাম বলে আমার কাছে এটি খুব মারাত্মক একটি অসুবিধা বলে মনে হলোনা। বরং লেখাপড়ার জন্য নতুন নতুন যে তেলের বাতিগুলো আসতো সেগুলোকে আমার অত্যন্ত চমৎকার মনে হতো। এর বাহারি রঙিন কাচের সুন্দর আকৃতির চিমনির মধ্য দিয়ে আসা মৃদু আলোর মধ্যে আমি একটি অলৌকিক দ্যোতনা অনুভব করতাম।

নতুন বাসাতে আসার পর আমার আপন স্কুলটিতে একটি নতুন মাত্রা পেল, সেটি হলো পাড়া বেড়াবার মাত্রা। সেখানে যিনি আমাকে নিয়ে যেতেন তিনি হলেন আমাদের বাসার বাবুর্চি ও কেয়ার টেকার, গ্রামের বাড়িতে আমাদের প্রতিবেশী—সাহেব মিয়া দাদু। বক্সীর হাটের বাসায়ও তিনি মাঝে মাঝে দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন।

আমার শৈশবের এক দুর্দান্ত চরিত্র এই সাহেব মিয়া দাদু। দীর্ঘ সুঠামদেহী এ মানুষটার গায়ে থাকতো সাদা গেঞ্জি, পরনে সাদা বড় চেকের লুঙ্গি, অনেকটা খাটো করে পরা সব সময়। সেই লুঙ্গির ওপরটায় আবার বেশ প্রশস্ত একটি চামড়ার বেল্ট যাতে বোতামওয়ালা দুই একটি পকেটও ছিল। আমাদের গ্রামে আত্মীয় স্বজন সহ অনেককেই এরকম খুবই প্রশস্ত চামড়ার বেল্ট লুঙ্গির উপর পরতে দেখতাম। খুব সম্ভব বাহরায়েন ও এডেন (ইয়ামেন) প্রবাসীদের মাধ্যমে এর চল আমাদের ওখানে এসেছিল। সাহেব আব্বী দাদুর নিজের প্রবাস কাহিনী কিন্তু ওখানে গড়ে ওঠেনি, গড়ে ওঠেছিল আসামের ডিগবয়ে, যেখানে তিনি জীবনের প্রথম ভাগের অনেকটা সময় কাটিয়েছেন। তাঁর কাছে যখনই থেকেছি ঘুরে ফিরে তিনি ডিগবয়ের অভিজ্ঞতাগুলোতে ফিরে গেছেন—শুধু ডিগবয় আর ডিগবয়। প্রায় কেশশূন্য মাথার নিচে তাঁর মুখে যেন খোদাই করা ছিল ডিগবয়ে তাঁর কঠিন সব দিনগুলোর পুরো ইতিহাস। নানা দাগে ভর্তি ফাটা ফাটা রেখা চর্চিত মুখ—অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনার সাক্ষী। একটি চোখ তাঁর নষ্ট ছিল, সেখানে মণিহীন শুধু সাদা। কিন্তু বাকি চোখটার ঝিলিক তাঁর যে কোন গল্পকে অনেক বেশি বাঙময় করে তুলতো। তাঁর ডিগবয়ের অধিকাংশ কাহিনী সেখানকার তেলের রিফাইনারিতে কাজকে কেন্দ্র করে। আমাদের অঞ্চলের অনেক মানুষ সেখানে এ কাজই করতেন, তাঁদের ভাষায় রিফাইনারি ছিল তেলের 'বানচাইল' (শব্দটির বুৎপত্তি কখনো খুঁজে পাইনি)। বানচাইলে তাঁর কাজের একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ তাঁর কাছে প্রায়ই শোনতাম—যার মধ্যে অনেক কারিগরি খুঁটিনাটি ছিল। যেটুকু চিত্র মনে ধরতে পেরেছি তাতে দেখতাম সাহেব মিয়া একটি বড় চাকা ধরে আছেন কন্ট্রোল রুমে। প্রচণ্ড উত্তপ্ত ও যন্ত্রপাতি ঠাসা ওই কন্ট্রোল রুম। তাঁর সামনে এটি বড় ঘড়ির মত মিটার—চাপ মাপার যন্ত্র। তিনি চাকা একটু একটু

ঘোরাচ্ছেন, বয়লারে চাপ বাড়ছে, ওই মিটারের কাঁটা তা নির্দেশ করছে; কিন্তু অত্যন্ত সাবধানে কাজ করতে হচ্ছে, তাঁর সাহেবের নির্দেশ মত। চাপ নির্দিষ্ট সীমার একটু বাড়তি হলে বয়লারে বিস্ফোরণ হবে, সবই সূক্ষ্ম দক্ষতার ওপর নির্ভর করছে। তবে দুর্ঘটনা ঘটেছে, নিয়মিত ভাবেই ঘটেছে, আর তারই সাক্ষী তাঁর ক্ষত বিক্ষত মুখ আর একটি নষ্ট চোখ।

সাহেব মিয়া দাদুর মুখে আরো বাড়তি সব চিহ্ন যোগ হয়েছে ডিগবয় থেকে তাঁর প্রত্যাবর্তন কাহিনীর মধ্য দিয়ে। ওই সেই জাপানিদের বার্মা থেকে ভারত আক্রমণের পাঁয়তারার সময়—যার ফ্রন্ট লাইন ছিল আসাম আর চট্টগ্রাম। বিশেষ করে ডিগবয় ছিল জাপানিদের টার্গেট—কারণ এখানেই রয়েছে বৃটিশদের যুদ্ধ সক্ষমতার একটি বড় উৎস তেলের রিফাইনারি ও ডিপো। একে ধ্বংস করতে পারলে, ভারতে ঢোকার কাজটি সহজ হয়ে পড়বে তাদের জন্য। এ জন্য ডিগবয়ে প্রচুর জাপানি বোমা বর্ষণ হয়েছে, আসামের অন্যত্রও রয়েছে। ইম্ফলের যুদ্ধে মনিপুর দিয়ে আসামে জাপানি আক্রমণ আসন্ন হয়ে পড়েছিল। তাদের সঙ্গে সুভাষ বসুর নেতৃত্বে 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'ও ছিল। ওই অবস্থায় ওখানকার প্রবাসীরা দলে দলে দেশে ফিরে আসার চেষ্টা করছিল (১৯৪৪)। আতঙ্ক আর যুদ্ধ প্রস্তুতির কারণে অন্য যানবাহন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় অন্য অনেকের মত সাহেব মিয়াকেও পায়ে হেঁটে এই পথ পাড়ি দিতে হয়েছিল গোলযোগপূর্ণ একটি অবস্থার মধ্য দিয়ে। সেই যে কষ্ট, খাদ্যাভাব, বিমান আক্রমণের ঝুঁকি এ সবের মধ্য দিয়ে তাঁর দেশে আসার কাহিনী তাঁর মুখে প্রচুর শুনেছি। মোটের ওপর তাঁর ভাষ্য অনুযায়ী তিনি ছিলেন নানা পরিস্থিতির, নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যাওয়া একজন পোড় খাওয়া মানুষ।

হয়তো সে সব কারণেই তাঁর মধ্যে কিছু বেপরোয়া ভাব ছিল, কোন কিছু নিয়ে তর্ক করতে গেলে সোজা সাপটা জবাব দেয়াই তাঁর স্বভাব ছিল। যেমন আমাদের সবার রান্না করতে গিয়ে কখনো খারাপ রান্নার সমালোচনা করলে তাঁর তাৎক্ষনিক জবাব হতো, 'তাতে কী হয়েছে, ডেগচিতে তো কিছু অবশিষ্ট থাকেনি।' নারী জাতির ওপর ছিল তাঁর সম্পূর্ণ অনাস্থা। অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অন্য কথার মধ্যে তিনি তাঁর এই মতামতকে নিয়ে আসতেন—মেয়েদেরকে শিক্ষা দেবার কোন প্রয়োজন নেই, তাদেরকে ঘর সংসারের বাইরে কোন দায়িত্ব দেয়াও অনুচিত। নিজের মতের সপক্ষে তিনি বলতেন 'এজন্যই তো মেয়েদের কোন জেল-ফাঁসি নেই, সবার কৃত-কর্মের দায়িত্ব পুরুষকেই শেষ পর্যন্ত নিতে হয়'। তিনি অবশ্য জানতেন না ওই ছোট বয়সেও আমরা ভিন্ন ধরনের খবর পাচ্ছিলাম—প্রীতিলতা আর কল্পনা দত্তের কাহিনীতে। অনেক দিন পরে মনে হয়েছে নিজের বাড়ির কিছু নারীর ক্ষমতায়নই হয়তো তাঁকে এই বিপরীত মতের দিকে নিয়ে গেছে। গ্রামে আমাদের বাড়ির পাশে তাঁর বাড়ি হওয়াতে তাঁর স্ত্রীর (যিনি 'নুরুল আলমের মা' বলে পরিচিত ছিলেন) গভীর স্নেহ আমরা পেতাম,

বাড়ি গেলেই আদর করে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে এটা সেটা খাওয়াতেন। সামান্য তোতলা এই মহিলা তাঁর স্বামী শ্বাশুড়ির সঙ্গে সারাক্ষণ যেভাবে সংসারের সকল বিষয় নিয়ে উচ্চ কণ্ঠে তর্ক করতেন, এবং নিজের সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করতেন সেখানেই বোধ হয় দাদুর ওই অনাস্থার ও ভয়ের জন্ম। তাঁদের ছেলে নূরুল আলম ছিলেন গ্রামে থাকার সময় ইউনূস ভাইয়ের শৈশবের অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তিনি পরে চট্টগ্রামে ও বিদেশে বাস-ট্রাকের ড্রাইভারের কাজ করেছেন।

অনেক রকম গার্হস্থ্য কাজে সাহেব মিয়া দাদু অত্যন্ত পটু ছিলেন। তা ছাড়া তিনি যে কোন অজানা মানুষের সঙ্গে দ্রুত বন্ধুত্ব করে দীর্ঘ আলাপে রত হতে পারতেন, এবং সবাইকে নিঃস্বার্থভাবে সহায়তা দিতে চাইতেন—মনে হতো শুধু কথা বলার আনন্দের কারণে। কথা এমন ভাবে বলতেন যেন সব কাজের টেকনিক্যাল বিষয়গুলো তাঁর নখদর্পণে, অতীত অভিজ্ঞতার নানা গল্প এর সঙ্গে থাকতো। ঘরে ও বাইরে তাঁর সঙ্গী হবার জন্য আমার আগ্রহের কারণও এই কথাগুলো শোনা। অন্যদের মধ্যেকার কথা মনোযোগ দিয়ে শুনে নিজের চিন্তার খোরাক করা আরো কম বয়স থেকেই যে আমার স্বভাব।

দুপুরের পর সবার খাওয়া শেষ হলে, সাহেব মিয়া দাদুর অবসর ও পাড়া বেড়াবার সময়। প্রায়ই আমি তাঁর সঙ্গী হতাম। মনে হতো পুরো ঘাট ফরহাদ বেগ এলাকার মানুষ তাঁকে চেনে। শহরের প্রান্তে হলেও গ্রামের পরিবেশ এখানে, সবই গ্রামের গেরস্ত বাড়ির মত। তবে বাড়ির অনেক লোক শহরে কাজে ব্যস্ত থাকতো। কোথায় কার বাড়িতে গাভির বাচ্চা দেবার সময় হয়েছে এটি দাদুর জানা—তিনি গিয়ে হাত লাগাবেন এর সুচারু সম্পাদনে, সঙ্গে অবশ্য কথা চলবে। স্থানীয় নানা সমস্যা নিয়ে—যেমন চুরির উপদ্রব, বানের পানির উপদ্রব, এগুলোর উৎস, সমাধান সব বিষয়ে তাঁর নিজস্ব থিওরি ছিল, সেগুলো নিয়েই আলাপ চলতো। এরকম পাড়া বেড়ানোতে একটি অভিজ্ঞতা আমার মনে কিছু ভবিষ্যৎ শংকা এনে দিয়েছিল যে শংকার মধ্যে অনেক দিন বাস করেছি।

সেটি ছিল কোন এক বাড়িতে একটি ছেলের মুসলমানির ঘটনা। এতে সাহেব মিয়া দাদুকে যে খুব বেশি সহায়তা দিতে হয়েছিল তা নয়, কিন্তু এর প্রত্যেকটি পর্যায় তিনি তদারক করেছেন, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, এবং এর প্রক্রিয়ার নানা ভালমন্দ নিয়ে নিজস্ব থিওরি দিয়েছেন। এমনকি বিচ্ছিন্ন চর্মের টুকরাটিকে কীভাবে কবরস্থ করতে হয় সেই থিওরি পর্যন্ত। আমার থেকে বেশ কিছুটা বেশিবয়সী কান্নারত ছেলেটিকে পাঁজাকোলা করে হাজামের সামনে নিয়ে যাওয়া, সেখানে হঠাৎ ছেলেটির বিকট চিৎকার, সেখান থেকে ওই অবস্থায় ফেরত আনা, ঘিরে ধরে সবাই বাতাস করা ইত্যাদি প্রত্যেকটি পর্যায় আমি আগাগোড়া খুবই অপছন্দ করেছি, কিন্তু উপায় ছিলনা। সারাটা সময়ে বাড়ির বয়স্ক মহিলারা সেজদা দিয়ে পড়েছিল, কারো কারো মাথায় পানি ঢালা হচ্ছিল। আমাকে নিয়েও কোন এক সময় এরকম ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে পারে সেই শংকাটি মাথার মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল বৈ কি।

ঘাট ফরহাদ বেগের বাসা ছেড়ে দিয়ে বক্সীর হাটে ফেরার পরও সাহেব মিয়া দাদুর নানা প্রজেক্টের ইতি হয়নি। ওখানে স্বল্প পরিসর জায়গাতেও তিনি একটি প্রায়-অন্ধ ছাগীকে জায়গা দিয়ে লালনপালন করেছিলেন। এখানে এই ছাগীর বেশ কয়েকটি বাচ্চাকেও বড় করেছেন—যাদের জন্ম, বেড়ে ওঠা ইত্যাদি সব কিছু আমরা কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছি। চিলের তাড়া খেয়ে একটি ময়না (চাটগেঁয়ে ভাষায় শাইর) আমাদের বাসায় পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গেছিল। সাহেব মিয়া দাদু টোটকা ওষুধ দিয়ে তার পা ভাল করে তাকে কথা বলতে শিখিয়েছিলেন। স্কুল থেকে ফিরেই ময়নাটিকে জিজ্ঞেস করতাম 'অ শাইর ক্যান আছ?'। এটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিত 'ক্যান আছ?' দাদু যথেষ্ট ধৈর্য নিয়ে এ ময়নাকে নানা কথা শেখাতেন। ময়নাও চাটগেঁয়ে ভাষায় নানা কথা চুটিয়ে বলতো, যা সবাইকে অবাক করতো। আমাদের নানা জনের নাম ধরে ডাকতো ময়না, নানা নির্দেশ দিতো। আমরাও দাদুকে অনুসরণ করে ময়নাকে ওটা ওটা শেখাবার চেষ্টা করতাম। এই ময়না আমৃত্যু কথা বলে আমাদেরকে আনন্দ দিয়েছে। সবাই বলতো সাহেব মিয়ার ময়না তার মতই বাকপটু। সাহেব মিয়া দাদুর অধিকাংশ প্রজেক্টে আমি একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত থেকে উৎসাহ নিতাম ও সহায়তা দিতাম।

ঘাট ফরহাদ বেগের বাসাটির একটি বিশেষ আকর্ষণ আমার কাছে ছিল তা হলো এর ঠিক পেছনে বাসার বাউণ্ডারি ঘেঁষে বয়ে যাওয়া খালটি। প্রতিদিন দুই বার এই খালে বান ডাকতো—আর এর পানি উপচিয়ে প্রায়ই আমাদের উঠানটিকে ডুবিয়ে ফেলতো। এটি ঘটতো জোয়ার ভাটার কারণে; কারণ খালটি কিছু দূর গিয়ে বড় চাক্তাই খালের সঙ্গে মিশেছে যা আবার কর্ণফুলির মাধ্যমে সমুদ্রের সঙ্গে। সবাই ওই ডুবে যাওয়াকে ওই বাসার বড় বিড়ম্বনা মনে করলেও আমার কাছে কিন্তু ব্যাপারটি বেশ মজার মনে হতো—ঐ নিয়ম করে দুই বেলা বান ডাকা। অবশ্য বানের পানির সঙ্গে জোঁক আসা আবিস্কৃত হওয়ার এবং আমি নিজেও জোকের কামড় খাওয়ার পর ওই মজা আর টেকেনি। ওই খাল দিয়ে নৌকা করে আমাদের বাসায় লোকের আসা যাওয়া দেখেছি। কিন্তু এতে নিজের একটি ভ্রমণ স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে আছে। খুব সম্ভব এটিই আমার জীবনের প্রথম নৌপথে ভ্রমণ। একটি নৌকায় আব্বা ও আরো দু'একজনের সঙ্গে ওই বাসা থেকে গ্রামের বাড়ি বাথুয়ায় গিয়েছিলাম অনেক্ষণ ধরে ভ্রমণের পর। যতক্ষণ ওই সরু খালের মধ্যে ছিলাম ততক্ষণ মনে হয়েছে যেন রাস্তার পথ দিয়েই যাচ্ছি তর তর করে—ক্ষেত-খামার, বাসাবাড়ি, পথঘাটের একেবারে কাছ দিয়ে, যেন ডাঙার লোকজনকে হাত বাড়ালেই ধরা যাবে। পরে অবশ্য কিছুক্ষণ একটি বড় নদী দিয়ে যেতে হলো (খুব সম্ভব কর্ণফুলি ও হালদা)। তারপর আবার আর একটি খাল যা একেবারে আমার দাদা বাড়ির লাগোয়া জায়গায় নিয়ে গেছে আমাদেরকে। এই শেষের অংশটি একেবারে বিশুদ্ধ গ্রামের ভেতর দিয়ে—কোথাও ধানের ক্ষেতের

মাঝখান দিয়ে, কোথাও রাস্তা, গাছগাছড়ার পাশ দিয়ে কোথাও আবার বাড়িঘরের উঠান ঘেঁষে বউ ঝিদের কাজকর্মের দৃষ্টি সীমার মধ্যেই। যাত্রা শেষ হওয়ার কিছু আগে একটি অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়লো; পড়ন্ত বেলার রোদ গিয়ে পড়েছে একটি চমৎকার বাড়ির অদ্ভুত রকম অংশে যেখানে লাল, নীল, সবুজ নানা রকম রঙিন কাচের জানালা আর ঘুলঘুলির বাঁকানো ডিজাইনের মধ্যে রোদ পড়ে অদ্ভুত সুন্দর ছটা সৃষ্টি করেছে। সেদিন একে মনে হয়েছিল রূপকথার রাজবাড়ির মত। পরে শুনেছি ওটি আমাদের এলাকার বড় ব্যবসায়ী নূর আলী সওদাগরের বাড়ি।

ঘাট ফরহাদ বেগের বাসার পুকুরটিও একটি বড় আকর্ষণ ছিল। এর আগে গ্রামের দিঘি ও পুকুরে সময় কাটালেও এভাবে দীর্ঘক্ষণ ধরে তাকিয়ে একেবারে থাকার ঘরের লাগোয়া নিজস্ব পুকুরের দৃশ্য দেখার সুযোগ পাইনি। এখানকার মাছের হঠাৎ লাফিয়ে ওঠা, পুকুরের পানির ওপর অনেক ফড়িঙের ওড়া, গাছের ওপর মাছরাঙ্গার বসে থাকা ও হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে মাছ ধরা, এগুলো তখনই প্রথম দেখেছি—পরে ওভাবে আর সুযোগ হয়েছে কিনা মনে পড়েনা। আর একটি মজার জিনিস ছিল সেখানে। পুরো পুকুরকে ঘেরা অনেক যে নারকেল গাছগুলো ছিল তাতে ছিল অসংখ্য কাঠবিড়ালি (চাটগেঁয়ে ভাষায় বলতাম গিলোডি)। এরা মাঝে মাঝে নেমে আসতো, আবার দ্রুত গাছ বেয়ে উপরে উঠে যেত। নারকেল খেয়ে ক্ষতি করতো বলে অনেকগুলো গাছের ওপর কেরোসিনের খালি টিন ঘণ্টা হিসেবে বাঁধা ছিল যার সঙ্গে বাঁধা দড়ি নিচে নেমে এসেছিল। যে যখন পারতো তখনই দড়ি টেনে বাজানোই নিয়ম ছিল কাঠবিড়ালি তাড়াবার জন্য। এগুলো সব হয়েছিল সাহেব মিয়া দাদুর তত্ত্বাবধানে। তাঁর সঙ্গী আমিও মাঝে মাঝে দড়ি টেনে ঘণ্টা বাজাবার সুযোগ পেতাম। বহুদিন অলস দুপুরে সাহেব মিয়া দাদুর সঙ্গে আমি পুকুর পারে বসে থাকতাম। তিনি ব্যস্ত গেরস্তের মত এটা সেটা করতেন। হয়তো বাগানের জন্য নতুন বেড়া তৈরি করতেন, নারকেল গাছের ঘণ্টার সঙ্গে লাগানো দড়ি মেরামত করতেন; আমাদের বাড়ির জন্য তো করতেনই, তাঁর পাড়া বেড়াবার বন্ধুদের জন্যও করতেন—কারো ছাগলের খুটিটি দা দিয়ে চেঁছে চেঁছে তৈরি করতেন, অথবা কোন বন্ধুর জন্য একটি যুৎসই লাঠি। তবে তাঁর কথার বিরাম হতোনা এক মুহূর্তের জন্য, আর আমারও মনোযোগের অভাব হতোনা।

এমন ভিন্ন স্বাদের এই বাসাটিতে আমাদের বসবাস অবশ্য খুব বেশি দিন টেকেনি। বাসাটি এর পরেও বহুদিন আমাদের থাকলেও কয়েক মাস পরেই আমরা বক্সীর হাট বাসায় ফিরে যাই। এর প্রধান কারণ এটি মায়ের অপছন্দ ছিল। তিনি কিছুতেই এখানে থাকতে চাইছিলেন না। আর ওসময় তিনি খুব দ্রুত অধৈর্য ও মারমুখী হয়ে পড়ছিলেন, তাঁর অসুখটি প্রকট হতে থাকার সঙ্গে সঙ্গে। তাছাড়া সেই বানের জলে ডুবে যাওয়া মোটেও স্বাভাবিক বসবাসের অনুকূল ছিলনা। তার ওপর ওই অঞ্চলের চোরের উপদ্রবটি আমাদের জন্য অসহ্য হয়ে পড়েছিল। অতএব ব্যাক টু প্যাভিলিয়ন—আবার ২০ বক্সীর হাট রোড।

বক্সীর হাটের বাসার জীবনের অনেক কিছু এর মধ্যে উল্টে পাল্টে গিয়েছিল। যথারীতি জায়গার অভাব হওয়াতে সালাম ভাই ও ইউনূস ভাইয়ের ঠাঁই হলো আমাদের এক বাসা পর সেই নানা-নানী, শফি মামা ও ইদ্রিস মামাদের দোকানের সঙ্গের বাসার একাংশ ভাড়া করে। আমাদের গৃহ শিক্ষকও আসতেন সেখানে, তাই আমি ও টুনু শুধু পড়তে যেতাম সেখানে—স্কুলে ভর্তি হবার পূর্বে যেইটুকু পড়া ঐটুকুই। বাকি ভাই বোনরা থাকতাম আগের মত মূল বাসার সেই বড় কূলে এক সঙ্গে। ওখানে বাইরের পরিবেশ সব আগের মত, কিন্তু ভেতরের পরিবেশ বেশ কিছুটা ভিন্ন। মায়ের অসুখ তখন আরো খারাপ হয়েছে। উচ্চ স্বরে বকাবকি, নিত্যকার বিষয়। এটা সেটা ছুঁড়েও দেন মাঝে মাঝে। বেশ কিছু আহত হবার ঘটনা ঘটলো। অধিকাংশ সময় আব্বাকেই সামাল দিতে হতো বলে চোটপাট তাঁর ওপর দিয়েই বেশি যেত। রাতে বকাবকি-চিৎকার মাত্রাতিরিক্ত হলে আমাদের ঘুম শিকেয় উঠতো—আওয়াজের কারণে তো বটেই, তার চেয়েও বেশি এরপর কী আসে তার আশঙ্কায়।

আবার অধিকাংশ সময় মা একেবারেই ভাল থাকতেন, সারা বাসায় ঘুরে বেড়াতেন, কথা বলতেন, আপন মনে কবিতা আবৃত্তি করতেন, অথবা সুরা পড়তেন সুর করে। আমাদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেও অনেক কথা বলতেন। এদিকে নানা রকমের ডাক্তারি শুরু হয়েছিল মাকে সারাতে—তার সব যে খুব বৈজ্ঞানিক ছিল তা নয়। ওষুধপত্র প্রচুর আসতো, কিন্তু খাওয়াবার কোন সহজ উপায় ছিলনা, কারণ তিনি কোন অবস্থাতেই কোন ওষুধ খাবেন না। তখন ও পরবর্তী সময়ে বৈজ্ঞানিক, আধা-বৈজ্ঞানিক, একেবারে অবৈজ্ঞানিক তুক তাক—কত রকমের চিকিৎসা যে আমরা দেখেছি তার কোন ইয়ত্তা নেই। এর কোন কোনটি আমাদের ছোটদের জন্য অদ্ভুত সব কারণে বেশ মজারও ছিল যা যথাস্থানে বলা যাবে।

স্কুলে প্রথম যাওয়া

বাড়িতে লেখাপড়া চলছিল বটে, স্কুলের জীবন কিন্তু এখনো আমার শুরু হয়নি, এবার সেই সময়টি এসে গেল। এর আগে সন তারিখের প্রয়োজন বড় হতোনা। স্কুলে ভর্তির পর ঘন ঘন তা লিখতে হলো। সেটি ১৯৫১ সাল, আমি ছয় বছরে পড়েছি, তখন প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলাম। স্কুলটি আমার আগে থেকে চেনা—বাসা থেকে ১০/১২ মিনিট হেঁটে গেলেই সেটি পাওয়া যায় লামার বাজার ফ্রি-প্রাইমারি বালক স্কুল। ইউনূস ভাই আগে এই স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন। এর কিছু দূরেই ছিল লামার বাজার ফ্রি প্রাইমারি বালিকা স্কুল। সেখানে বুবু, মাহফুজা খালা, রিজিয়া ফুপু তাঁরা এক সময় পড়েছেন। এ স্কুলের খুব কাছে রয়েছে খাতুনগঞ্জ এলাকার সব চেয়ে বড় মসজিদ—যেখানে বড়রা জুমা, তারাবিহ ইত্যাদি নামাজগুলো পড়েন, আমিও পড়েছি। আরো বেশি ওখানে যেতে হয়েছে

দিঘিতে গোসল করতে বড়দের সঙ্গে। যদিও বাসায় গোসলখানা রয়েছে, দোকানে যাঁরা কাজ করতেন তাঁরা এবং আমার চৌধুরী খালু প্রায় নিয়মিত ওই মসজিদ সংলগ্ন বিশাল দিঘিতে গোসল করতে যেতেন। মাঝে মাঝে আমরা ছোটরাও তাঁদের সঙ্গী হতাম। খালু ছিলেন আব্বার ম্যানেজার—দোকান এবং সাংসারিকও নানা কাজের দায়িত্ব তাঁর ওপর থাকতো। ওই দিঘির নাম বলুয়ার দিঘি, সে কারণে কথ্য ভাবে মসজিদটিকে বলুয়ার দিঘি মসজিদ, স্কুলটিকে বলুয়ার দিঘি স্কুলও বলা হতো। এ দিঘিতেই জোর করে ফেলে দিয়ে এবং তুলে নিয়ে চৌধুরী খালু আমাকে ও সময়েই সাঁতার শিখিয়েছিলেন। তার আগে অবশ্য ভেজা লুঙ্গিতে বাতাস ঢুকিয়ে বয়ার মত তার সাহায্যে ভেসে থেকে দিঘির মধ্যে দাপাদাপি করেছি বেশ কিছুদিন। দিঘিটির যে বড় বাঁধানো ঘাটে আমরা গোসল করতাম তা ছিল একেবারেই বারোয়ারি। সব বয়সের, সব পেশার প্রচুর মানুষের সঙ্গে একই সঙ্গে ছিল আমাদের গোসল। সবাই যার যার কাপড়ও কাচতেন। শুধু কয়েকটি দিন আমি দিঘিতে যাওয়াটি পছন্দ করতাম না তা হলো হোলি খেলার দিন ও তার পরের কয়েক দিন। ওইসময় ঘাটের কাছের পানিটি নানা রঙে রঞ্জিত হয়ে থাকতো রঙ খেলা খেলে আসা মানুষদের গোসল, কাপড় কাচা ইত্যাদির কারণে। আসলে হোলি জিনিসটিকেই আমি খুব ভয় করতাম, যদিও আমাদের হিন্দু প্রতিবেশীরা বেশ আনন্দের সঙ্গেই হোলি খেলতো।

১৯৫১ সালে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির বেশ কিছুদিন আগে স্কুলের অভ্যাস করানোর জন্য ওই স্কুলেরই 'শিশু শ্রেণীতে' আমাকে দেয়া হয়েছিল। এটি একটি অনানুষ্ঠানিক ক্লাস। যেভাবে এই ক্লাসের নাম উচ্চারিত হতে শোনলাম তা হলো 'চিয়চ্চেনি' (শিশু শ্রেণী)। এভাবে প্রথম স্কুলের দিনটি বেশ মনে পড়ে। অদ্ভুত ব্যাপার লেখাপড়াতে মোটেও ভীতি না থাকলেও, জানা অজানা সবার সঙ্গে মিশতে, তাদের কথা শুনতে, বড়দের সঙ্গে যত্রতত্র যেতে বিন্দুমাত্র অনীহা না থাকলেও, সে মুহূর্তে স্কুল-ভীতিটি আমাকে সাংঘাতিক ভাবে পেয়ে বসেছিল। মনে পড়ে ওই যে স্কুলের পরিবেশে রেখে যাওয়া অবস্থায় সারাক্ষণ আমি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলাম। ওসময় যাঁর কাছে আমাকে সঁপে যাওয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন স্কুলে দীনিয়াত পড়াবার মৌলভি হুজুর—মৌলভি মোস্তফা। তিনি আবার ওই বলুয়ার দিঘি মসজিদের ইমামও বটেন। গম্ভীর সৌম্য মূর্তির মাওলানা রূপে সুন্নতি লাঠি হাতে মিম্বরের সামনে দাঁড়িয়ে উর্দুতে জুমার নামাজের খোৎবা দিতে তাঁকে বহুদিন দেখেছি। আব্বা অথবা অন্যদের সঙ্গে দু'রকমের নামাজে ওই বলুয়ার দিঘি মসজিদে যেতাম—এক হলো জুমার নামাজ, আর রমযানের সময় তারাবির নামাজ। মসজিদ কর্তৃপক্ষের মধ্যে আমাদের (অর্থাৎ সঙ্গের বড়দের) কথা হতো মসজিদের খাদেমদের সঙ্গে, মাঝে মাঝে মুয়াজ্জিন সাহেবের সঙ্গে। মুয়াজ্জিন সাহেব বেশ রসিক ছিলেন, হয়তো সে জন্যই অনেকে তাঁকে 'লর্ড মুয়াজ্জিন' ডাকতো। বলুয়ার দিঘিতে গোসল করতে গেলে মাঝে মাঝে সেখান

থেকে তাঁর আজান দেয়া শোনতাম, কখনো তাঁকে দেখতামও। প্রধানত এই অঞ্চলের ধনী বোম্বাইওয়ালাদের দানে এই মসজিদটি ক্রমে ক্রমে বড় হয়েছে ও পাথরের নানা কাজে খুব সুন্দর হয়ে উঠেছিল। তারাবির নামজে অনেকটা সময় মসজিদে কাটতো; সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারতামনা বলে বসে বসেই তেলাওয়াৎ শোনতাম। হাফেজ সাহেব যখন সুরা শেষ করার বিশেষ লম্বা টান দিতেন আমার চেয়ে একটু বড় ছেলেদের দেখাদেখি (বাচ্চাদের এক পাশে এক সঙ্গে জায়গা দেয়া হতো) আমিও দ্রুত উঠে নামাজে দাঁড়িয়ে যেতাম। আর জুমার নামাজে সুন্দর মিম্বারের সামনে দাঁড়িয়ে ইমাম সাহেব অর্থাৎ মৌলভি মোস্তফা যখন লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে খুবই ভারী গম্ভীর স্বরে ধীর লয়ে বক্তৃতার ঢঙে খোৎবা দিতেন তাঁকে অলৌকিক এক সুদূর ব্যক্তিত্ব মনে হতো। বিশেষ করে লর্ড মুয়াজ্জিনের সঙ্গে বড়দেরকে হাস্য রসিকতা করতে দেখলেও ইমাম সাহেবের সঙ্গে সামনাসামনি সাক্ষাতের কোন সুযোগ বা ঘটনা আমার ঘটেনি।

সেই মৌলভি মোস্তফাকে আজ ভিন্ন পরিস্থিতিতে দেখলাম ক্রন্দনরত শিশু আমাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে শান্ত রাখার কাজে। এ জন্য তিনি সব চেয়ে মজার কাণ্ড যেটি করলেন তাতে ওই অবস্থায়ও চমৎকৃত না হয়ে পারিনি। মৌলভি মোস্তফা তাঁর পাঞ্জাবির 'ঘড়ি-জেবের' (চাটগেঁয়ে ভাষায় জেব মানে পকেট) ভেতর থেকে বের করলেন একটি বড়সড় পতঙ্গ—নানা রকম ধাতব রঙের চকচকে দেহ এটির, কোথাও মনে হয় একটু রূপালি, কোথাও একটু সোনালি, একটু সবুজ আভা এমনি। এমন চমৎকার দর্শন পোকা আমি আগে কখনো দেখিনি। ঘড়ি-জেবটি হলো উপরের পকেটের পেছনে লুকানো আরেকটি পকেট যার মধ্যে সরু শেকলে বাঁধা ট্যাকঘড়ি রাখা হতো। তবে পকেটের সঙ্গে সুতা দিয়ে বাঁধা ছিল বলে পোকাটি ওখানেই শুধু ঘুরছিল। পরে স্কুলে পড়ার সময় দেখেছি এটি মৌলভি মোস্তফার নিত্যকার সখ, আমার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক যেভাবে কাজে লাগিয়েছেন, ছাত্রদের হাসাতে নিয়মিত এর সাহায্য নিতেন। তাছাড়া নানা রকম অদ্ভুত মুখভঙ্গি করেও তিনি ছাত্রদের হাসাতেন। একজন জবরদস্ত মাওলানা হয়েও শিশুদের শিক্ষার প্রয়োজনে কাউকে যে ভিন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে হয় মৌলভি মোস্তফা আমার কাছে তার অনন্য উদাহরণ হয়ে রয়েছেন।

স্কুল জীবনের শুরু

দিলা মিয়া মাস্টার

লামার বাজার ফ্রি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি হওয়ার মানে হলো এর হেডমাস্টার দিলা মিয়া মাস্টারের কাছে নিজকে সঁপে দেয়া। তাঁর চেহারা, আচরণ, ব্যক্তিত্ব স্কুলের বাকি সব কিছুকে ছাড়িয়ে অনেক ওপরে। মূল স্কুলের বেড়া ও টিনের ঘরটিতে বসে তিনি পুরো স্কুলের ওপর নজর রাখতেন। প্রত্যেক ছাত্রকে শুধু চিনতেন না, তার বাপ-ভাই-বোন সবাইকে চিনতেন। চিনতে তাঁকে হতো কারণ তাঁর কারবার ছিল খুব দুরূহ প্রকৃতির ছাত্র ও তাদের পরিবারকে নিয়ে। ওই অঞ্চলটি ছিল রাজমিস্ত্রি ও গাড়োয়ানের পেশার মানুষে অধ্যুষিত। স্থানীয় চাটগেঁয়ে ব্যবসায়ীদের ছেলেমেয়েরা যেমন লেখাপড়ার তেমন তোয়াক্কা করতোনা, এই গরীব মানুষরা তো অবশ্যই করতোনা—ছোট বেলা থেকে রাজমিস্ত্রির যোগালি বা গাড়োয়ানের সহকারী হিসেবে কাজে লেগে যেতো এবং ওই শহুরে বা আধা-শহুরে পরিবেশে বখে যেত। দিলা মিয়া মাস্টারের সংগ্রাম ছিল এই পরিবারগুলো নিয়ে, এবং বহু কষ্টে স্কুলে আনার পর তাদের ছেলেদের নিয়ে। এ কাজে তাঁর একটি অস্ত্র ছিল মামলার ভয় দেখানো। সারা দেশে একমাত্র চট্টগ্রাম পৌরসভাই প্রাথমিক স্কুলে ভর্তিকে বাধ্যতামূলক করে এর ব্যত্যয় ঘটালে অভিভাবকের নামে মামলা করার রীতি চালু করেছিল।

মনে রাখতে হবে ওই সময় এবং তার পরেও দীর্ঘকাল প্রাথমিক শিক্ষা স্থানীয় সরকারের সম্পূর্ণ অধীনস্থ বিষয় ছিল। চট্টগ্রামে এর পেছনে ছিলেন পৌরসভার দীর্ঘকালীন প্রধান নূর আহমদ চেয়ারম্যান। এই বিদ্যোৎসাহী মানুষটি দেশ বিভাগের পূর্ব থেকে দীর্ঘকাল চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন, এবং তখন পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের সদস্য ছিলেন। সারা দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক ও মামলা-যোগ্য করার জন্য করাচিতে গণপরিষদেও তিনি ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সেখানে তাঁর আর একটি রেকর্ড দীর্ঘদিন অটুট ছিল—তা

হলো গণপরিষদে সরকারের কাছে সর্বাধিক সংখ্যক প্রশ্ন করা। পৌরসভায় নূর আহমদ চেয়ারম্যানের করা আইনের দোহাই দিয়ে কয়েকদিন অনুপস্থিত থাকলেই যে কোন ছাত্রকে দিলা মিয়া মাস্টার তাঁর বেতের সম্মুখীন করতেন এবং অভিভাবককে ডাকার এবং মামলা করার হুমকি দিতেন। প্রায়ই এসবে কাজ হতো, কিছুটা ভয়ে আর কিছুটা দিলা মিয়া মাস্টারের ব্যক্তিত্বের কারণে।

এই ব্যক্তিত্ব আসলেই ভয়-মিশ্রিত শ্রদ্ধা উদ্রেক করার মতই। কেন জানি তাঁর চোখগুলো সব সময় লাল থাকতো; গম্ভীর ভারী গলা উচ্চ স্বরের কারণে পুরো স্কুলে শোনা যেত। দীর্ঘ সুঠাম দেহ, পাকা গোঁফ, পরিপাটি লুঙ্গি ও সার্ট পরা। পোষাকে সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল ভারি বল্লি-ওয়ালা খড়ম। খড়ম সে সময়ে দু'রকমই ছিল—কাঠের পাটাতনের উপর স্যান্ডেলের মত একটি চওড়া ফিতা লাগানো সাধারণ খড়ম যেটি আব্বা পরতেন, আমিও এক সময় পরেছি। আর ছিল বল্লি ওয়ালা খড়ম যাতে ফিতা থাকতোনা—সামনে বুড়ো আঙুলের কাছে একটি কাঠের গুটি থাকতো (বল্লি) পায়ের বুড়ো আঙুল আর পরের আঙুলটির মাঝখানের ফাঁকে রেখে এই দুই আঙুল দিয়ে গুটিটিকে চেপে ধরে রাখা হতো। এরকম খড়মের একটি আভিজাত্য ছিল। তবে দিলা মিয়া মাস্টার আর আব্বার উভয়েরই খড়ম পরা আমাদের জন্য একটি আশীর্বাদ ছিল। তাঁরা এসে পড়ার আগেই ঠক ঠক আওয়াজে তাঁদের আগমনী সংবাদ পেয়ে আগে যা কিছুই করি না কেন ঝটপট পড়াশোনার ভাব দেখাতে পারতাম।

একটি লম্বা বেত আমাদের হেডমাস্টারের হাতের শোভা ছিল—খুব যে বেশি কারো ওপর এটি প্রয়োগ হয়েছে তা মনে পড়েনা, হলেও বড় জোর সামান্য হাতের তালুর ওপর বা এমনি কিছু—কতকটা যেন বিষয়টির গুরুত্ব রেকর্ড করাবার জন্য। বরং বেতটির অন্যান্য ব্যবহারই ছিল বেশি। একটি হলো অনেকটা মিলিটারি অফিসারদের ব্যাটনের মত, কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে। আর একটি হলো নিজের কামরায় থাকার সময় অথবা স্কুলের বারান্দা দিয়ে পায়চারী করার সময় স্কুলের শিক্ষকবিহীন কোন ক্লাসে বেশি হৈচৈ শুনলে যেখানে আছেন সেখানেই সজোরে টিনের দরজায় বা দেয়ালে বেতের কষাঘাত করে সাবধান করে দিতেন। সেই সঙ্গে তাঁর একটি নিত্য সাবধান বাণী—'সেই চেকা চেকবেনা বাপু'। খুব আনুষ্ঠানিক কথাগুলো ছাড়া এই একটি বাক্যই বোধ হয় তিনি আমাদের সঙ্গে কথাবার্তায় বাংলায় বলতেন, বাকি সব বিশুদ্ধ চাটগেঁয়েতে। অবশ্য হেড মাস্টার হিসেবে তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তব্যও কম থাকতোনা। প্রায়ই তাঁকে সব শ্রেণীর মাঝামাঝি একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে উচ্চ স্বরে কোন না কোন নোটিশ পড়তে হতো। এর প্রত্যেকটি শুরু হতো এভাবে "এতদ্বারা অত্র স্কুলের ছাত্রবৃন্দকে জানানো যাইতেছে যে..."। তাছাড়া হৈচৈ অমনোযোগের মধ্যে আমাদেরকে লেখাপড়ার কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে তিনি টিনের দরজায় পর পর তিনটি বাড়ি দিয়ে তারপর শ্রুতলিপি লিখতে দিতেন। বেতের ওই তিনটি বাড়িতে আমরা

বুঝতাম শ্লেট ও শ্লেটপেন্সিল অথবা খাতা-পেন্সিল নিয়ে তৈরি হতে হবে শ্রুতলিপি লিখতে। স্কুলে প্রথম দু'তিন বছর খাতার চেয়ে শ্লেটের ব্যবহারই করেছি বেশি। ভাল শ্লেট, ভাল শ্লেটপেন্সিল থাকা তখন আমাদের গর্ব। তাঁর একটি অতি প্রিয় শ্রুতলিপির বাক্য ছিল : "জাহাজে চড়িয়া, সমুদ্রের উপর দিয়া গমনাগমনের কালে মনে হয় সমুদ্র অনন্ত, অসীম"। 'দাঁড়ি' এই কথাটি বলে তিনি বাক্যটি শেষ করতেন। শতবার লেখা এই শ্রুতলিপিতে বানান ভুল করার কোন সুযোগ ছিলনা।

যতদূর মনে পড়ে ওই স্কুলে পুরো তিন বছরের অবস্থান কালে তাঁর বেতের মৃদু স্পর্শ পেয়েছিলাম শুধু একবার, তাও অদ্ভুত কারণে, একেবারে শুরুর দিকে। আমার তখন একটি বদভ্যাস দাঁড়িয়েছিল পেন্সিল কামড়ানো—পেন্সিলের কাঠের স্বাদ-গন্ধটি ভাল লাগতো। এভাবে আমার নিজের পেন্সিল তো প্রায়শ ক্ষত বিক্ষত থাকতো বটেই, আনমনা হয়ে আশেপাশে ছেলেদের পেন্সিল কামড়াতেও কার্পণ্য করতামনা। ওদের কেউ নালিশ করে দিয়েছিল হেড মাস্টারকে। তিনি এসে ওই দিন বকা দেবার পর ওই বদভ্যাসটি দূর হয়ে গিয়েছিল। দিলা মিয়া মাস্টারের কিছু কিছু হুমকি আমার কাছে অযৌক্তিক মনে হতো—কিন্তু ওটিই ছিল তাঁর ভঙ্গি। যেমন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠার পর আমরা সেমিপাকা মূল স্কুল ঘরের বিপরীতে (মাঝখানে উঠান রেখে), একটি পাকা ঘরে ক্লাস করার সুযোগ পেয়েছিলাম। এই ঘরটি দান হিসেবে তৈরি করে দিয়েছিলেন স্থানীয় ব্যবসায়ী নূর আহমদ সওদাগর। ভবনের উপর একটি ফলকে তাঁর নাম লেখাও ছিল। এই দাতার ভাই ফজল করিম আমার সহপাঠী ছিল। ঘরটির একটি জানালা ভেঙ্গে যাওয়াতে বৃষ্টির পানি ক্লাসে ঢুকছিল। দিলা মিয়া মাস্টার এসে বেত দুলিয়ে দুলিয়ে ফজল করিমকে শাসিয়ে গেলেন "তোর ভাইকে বলবি শিগ্‌গীর জানালাটি ঠিক করে দিতে, নইলে তোর পিঠের চামড়া থাকবেনা"। যদিও জানতাম এটি নেহাত হুমকি মাত্র, তবুও বড়ই অন্যায় মনে হয়েছিল এটি। বেচারা ফজল করিমের ভাই কেনই বা স্কুলে ভবন দান করতে গেলেন, কেনই বা জানালা ভাঙ্গলে তাঁকেই সেটি মেরামত করতে হবে, কেনই বা এর জন্য ফজল করিমকে নিজের পিঠের চামড়া হারাতে হবে। কিন্তু এ হুমকির জন্য ফজল করিম বা তার ভাইকে বিন্দুমাত্র রাগতে বা আক্ষেপ করতে দেখিনি। জানালা যথাসময়েই মেরামত হয়ে গিয়েছিল।

আমার প্রতি ছিল দিলা মিয়া মাস্টারের অবিমিশ্র পক্ষপাতিত্ব। এর কারণ অল্প কয়েক বছর আগে ইউনূস ভাইয়ের এখানকার লেখাপড়া সগৌরবে শেষ করে স্কুলের নাম উজ্জ্বল করা, এবং আমার দিক থেকেও অনুরূপ করার আলামত পাওয়া। স্কুলের ছেলেরা যে সবাই সুবোধ বালক ছিল তা মোটেই নয়, অনেকেই বয়সে বেশ বড় ছিল এবং মারামারি, বাজে গালি—এগুলোতে ভালই অভ্যস্ত ছিল। তাছাড়া এদের বেশ কয়েকজনকে লুকিয়ে বিড়ি খেতেও দেখতাম। নেহাত দিলা মিয়া মাস্টারই পেরেছিলেন এদেরকে মোটামুটি বাগে রাখতে—যদিও অধিকাংশের জন্য এই প্রাথমিক পর্যায়ই ছিল শিক্ষার শেষ। ওই এলাকার সবাই বলতো

এখানকার ছেলেরা যেমন বেয়াড়া তাদের জন্য দিলা মিয়া মাস্টারের কড়া শাসন না থাকলে কী যে হতো।

লামার বাজার স্কুলের সব ছাত্র যে ওই পর্যায়ের ছিল তা বলা যাবেনা। বিশেষ করে ইউনূস ভাইয়ের এখানকার সহপাঠীদের বেশ কয়েকজনের মধ্যে তখনই প্রতিভার স্ফুরণ দেখেছি। তাঁদের একজন অতি সাধারণ পরিবারের ছেলে ফয়েজ ভাই ছিলেন স্বভাব-শিল্পী। ওই স্কুলে থাকতেই তিনি আঁকার প্রতিভা দেখিয়েছেন এবং বন্ধু ইউনূসের মধ্যে তা সঞ্চার করেছেন। আমিও তাঁর গুণমুগ্ধ ছিলাম—সেই সময় থেকে। ওই স্কুল ছেড়ে ফয়েজ ভাই সাধারণ ধারার আর কোন পড়াশোনা করেছিলেন বলে জানা নেই। ওই সেসময়েই তিনি ও ইউনূস ভাই একজন অবাঙালি শিল্পী আহমদ হোসেনের শিষ্যত্ব নেন—যাঁকে তাঁরা ওস্তাদ বলে ডাকতেন। আমি তাঁদের এই সাধনার গুণমুগ্ধ দর্শক ছিলাম। পরে ফয়েজ ভাই করাচিতে এবং লাহোরে কমার্শিয়াল আর্ট শিক্ষা ও চর্চা করেছিলেন, সুকুমার চিত্র শিল্পও। ঢাকায় সুভাষ দত্তের সঙ্গে কাজ করেছেন। বার বছর বয়সী ইউনূস ভাইয়েরও এই শিল্পচর্চা এবং অন্যান্য উদ্যোগের চমৎকারিত্বও আমার ওই সময়টাকে ঘিরে রেখেছিল, সে কথায় পরে আসছি।

ও সময়ে ইউনূস ভাইয়ের আর এক বন্ধুও আমাকে নানা ভাবে খুবই চমৎকৃত করেছিলেন—তিনি মোহাম্মদ হোসেন। কদম মোবারক এতিম খানাতেই তাঁর বাল্যকাল কেটেছে, স্কুল শিক্ষা শেষ হবার আগেই খুব সম্ভব ১৪/১৫ বছর বয়সে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগ দেন। মাঝে মাঝে নেভির সুন্দর পোষাক পরে বাসায় এলে আমাদের ভীষণ ফুর্তি হতো। তাঁর পোস্টিং ছিল করাচির নৌঘাঁটিতে, এর পর নৌবাহিনীর জাহাজে। একবার চট্টগ্রামে তাঁর মনোয়ারা জাহাজ (বড় যুদ্ধ জাহাজ অর্থে 'ম্যান অব ওয়ার' এর অপভ্রংশ) 'পিএনএস বাবর' এলে তিনি আমাকে এ জাহাজ দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন। বিশাল টারেটের উপর দীর্ঘ কামান, নানা নাবিকের কথা বলার জন্য এ-তলা ও-তলার মধ্যে স্পীকিং টিউব, ডেকের উপর নৌ-সেনাদের সারিবদ্ধ প্রহরা এমন সব দারুণ দৃশ্যের মধ্যে আমার সব চেয়ে পছন্দ হলো এক জায়গায় যে পানির কলের মত কল খুলে যখন খুশি তখনই গরম চা পাওয়া যায় সেই জিনিসটিকে। এর জন্যই বেশি ঈর্ষা হলো মোহাম্মদ হোসেন ভাইকে, এরকম যখন খুশি তখন চা খেতে পারেন বলে। এই মোহাম্মদ হোসেন ভাইয়ের কাছেই প্রথম বলতে শুনেছিলাম বাঙালি নৌ-সেনাদের ওপর কেমন বৈষম্য করা হয়—সেই সদ্য কৈশোর-উত্তীর্ণ কনিষ্ঠ নৌ-সেনাটিও তা অনুভব করতে পারছিলেন। মনে রাখতে হবে পাকিস্তান নৌ-বাহিনীতেই শুধু সংখ্যার দিক থেকে বাঙালিরা সে সময় কিছুটা গণ্য হবার মত অবস্থায় আসতে পেরেছিল।

ফয়েজ ভাই ও মোহাম্মদ হোসেন ভাইয়ের মত কিশোরদেরকে স্কুলের আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অর্ধ সমাপ্ত রেখেই প্রতিভার অন্যান্য ক্ষেত্রে দ্যুতি ছড়াতে

দেখেছি ওই লামার বাজার স্কুলে থাকতেই। তখন থেকেই ব্যতিক্রমী মানুষের দিকে মনোযোগ দিতে, লেখাপড়া কে কোথায় কী করেছে তার বাইরেও মানুষের গুণ দেখতে পাওয়ার এক রকম অভ্যাস ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল, ওই বলুয়ার দিঘির পাড়ের বারোয়ারি আবহতেই।

স্কুলে দেশপ্রেম শিক্ষা

কড়া গম্ভীর মানুষ দিলা মিয়া মাস্টারকে আবেগপ্রবণ হতে দেখতাম যখন তিনি দেশের কথা বলতেন—আর এটি তিনি সুযোগ পেলেই বলতেন। তাঁর সব সময়ের একটি কথা ছিল শিগ্‌গীর দেশের সব লোক শিক্ষিত হবে। স্কুলের বাইরে কোন ছেলেমেয়ে থাকতে পারবেনা; নূর আহমদ চেয়ারম্যান চট্টগ্রামে যা করেছেন, শিগ্‌গীর সারা পাকিস্তানে তা চালু হবে। এই সময় চট্টগ্রামের পটিয়া থানার শিক্ষিতের হার পাকিস্তানের অন্য সব থানার চেয়ে বেশি একথাও তিনি খুব গর্ব ভরে বলতেন।

সুযোগ পেলেই ক্লাসে এসে তিনি দেশের জন্য নানা বীরত্বের কথা বলতেন। যেমন একটি কাহিনী ছিল দেশ বিভাগের সময় পাকিস্তানের প্রাপ্য সব সম্পদের নথিপত্র নিয়ে দিল্লি থেকে করাচি বিমানে যাচ্ছিলেন ব্রিগেডিয়ার শের খান। পাকিস্তান সীমান্ত পার হবার পর পর দুর্ঘটনায় বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। নিজের নিশ্চিত মৃত্যুকে সামনে রেখেও শের খান দেশপ্রেম ভোলেননি। তিনি বিধ্বস্ত হবার আগেই বিমান থেকে ওই মূল্যবান নথি সহ ব্রিফকেসটি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন—আর সেটি অক্ষত পাওয়া গিয়েছিল।

আরেক দিন তিনি বললেন 'আগামী কাল চট্টগ্রামে আসবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি বৃটিশ জেনারেল ডগল্যাস গ্র্যাসির হাত থেকে মাত্র কিছুদিন আগে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর নাম জেনারেল আইয়ুব খান। তোমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁকে দেখতে। কাশ্মীরের যুদ্ধের সময় এই সেনাধ্যক্ষই ভারতীয়দের ঘুষ প্রত্যাখান করে সেতু উড়িয়ে দিয়ে তাদের সৈন্য চালনা বন্ধ করে দিয়েছিলেন অসীম সাহসে'। পরদিন আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁর সংবর্ধনায়। এভাবে বিভিন্ন উপলক্ষে আমরা লাইন বেঁধে ছোট ছোট পতাকা হাতে, 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ', 'কায়দে-আজম জিন্দাবাদ' 'লড়কে লেঙ্গে কাশ্মীর' ইত্যাদি ধ্বনি তুলে নানা জায়গায় যেতাম। 'কায়দে-আজম' মানে মহান নেতা, যা জিন্নাকে বলা হতো। লড়াই করে কাশ্মীর নেবার কথা বলার কারণ হলো কিছুদিন আগে (অক্টোবর ১৯৪৭) এ নিয়ে প্রথম যুদ্ধে কাশ্মীরের বড় অংশ ভারতের কাছে চলে গিয়েছে। শুধু ছোট একটি অংশ পাকিস্তানের সঙ্গে এসেছে। একে কিছুটা পৃথক সত্তা দেয়া হয়েছিল 'আজাদ কাশ্মীর' নামে। ১৪ আগস্ট পাকিস্তান দিবসে তো বটেই অন্যান্য উপলক্ষেও আমরা ওভাবে যেতাম—কখনো চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের কাছে মাঠে, কখনো

মিউনিসিপ্যাল অফিসের সামনে, কখনো অন্যত্র। আমাদের শিক্ষক রোহিনী বাবু আমাদের পরিচালনার দায়িত্বে থাকতেন—দুই লাইনের মধ্যে সঠিক দূরত্ব রাখা, কেউ পিছিয়ে না পড়া, ইত্যাদি দেখা ছিল তাঁর কাজ। আমাদের লোভটি থাকতো সঠিক জায়গায় পৌছার পর প্রত্যেককে দেয়া মিষ্টির প্যাকেটটির। অবশ্য শহরের মধ্য দিয়ে মিছিল করে যাওয়া, সবার আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকা এগুলোও ভাল লাগতো। ফেরার সময় মোটামুটি ছত্রভঙ্গ হয়ে ফিরতাম, তখনো রোহিনী বাবুর তত্ত্বাবধানে।

স্কুলে প্রথম বছরের একটি ঘটনা বেশ তোলপাড় তুলেছিল। রোজকার মত স্কুল থেকে ফিরে এসেছি, সন্ধ্যায় বাসায় মহা হৈচৈ—প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী জনসভায় বক্তৃতা দেবার সময় আততায়ীর গুলিতে নিহত হয়েছেন (১৬ অক্টোবর ১৯৫১)। সে রাতে এ নিয়ে সবাই যেন স্তব্ধ, নির্বাক। ইতোমধ্যে ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে কাল স্কুলে যেতে হবে না। একদিন পর বাসায় *আজাদ* পত্রিকা এলে আলোচনার ঝড় উঠলো। পত্রিকায় আমারো একটু নজর বুলাবার সুযোগ হলো—সব শব্দ বুঝতে না পারলেও তখন পত্রিকা ধীরে ধীরে কিছুটা পড়তে পারি। তাছাড়া আলোচনা-বিশ্লেষণ তো বাসায় চলছেই। সেই জনসভার মাঠটি ছিল রাওয়ালপিণ্ডির কোম্পানিবাগ; আমি কল্পনা করছিলাম লাল দিঘির মাঠের কথা, আমাদের বাসার খুব কাছেই, যেখানে জনসভা দেখেছি। কয়েকদিন পর সবার মুখে মুখে শোনলাম গুলি খাওয়ার পর পর লিয়াকতের অস্ফুষ্ট কথা—'মুঝে গোলি লাগ গেয়ি, খোদা পাকিস্তান কি হেফাজত করে'। আততায়ী সৈয়দ আকবরকে ওখানে উপস্থিত মানুষ হাতে পিটিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলার ব্যাপারটিও কল্পনা করে শিউরে উঠছিলাম। আরেকটি দৃশ্য আমার চিন্তায় খুব আসছিল যেভাবে হাসপাতালে রক্ত দিয়ে তাঁকে বাঁচাবার চেষ্টা করা হচ্ছিল। আমার চিন্তায় ব্যাপারটি ছিল যেন বুকে গুলিতে ফুটো হয়ে গিয়েছে, তাই ওই ফুটো দিয়ে বোতল থেকে রক্ত ঢেলে দেয়া হয়েছে। কোন মৃত্যুর এত বিশদ বর্ণনা আগে কোনদিন শুনিনি।

স্কুলে যখন গেলাম দিলা মিয়া মাস্টার আমাদের সবাইকে ডেকে বোঝালেন এই শোকের তীব্রতা আর তাৎপর্য। তিনি বেশ গুছিয়ে, আবেগ দিয়ে বললেন। লিয়াকতের হত্যাকান্ডে আমরা যে কতখানি অসহায় ও এতিম হয়ে গেলাম সেটি বোঝাবার চেষ্টা করলেন। বিশেষ করে জোর দিয়ে বললেন হিন্দুস্তানের হামলার বিরুদ্ধে একমাত্র তাঁরই রুখে দাঁড়াবার মত হিম্মৎ ছিল—কেমন করে মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে বলেছিলেন 'শির কুচল্ দেঙ্গে'—আমাদের হেডমাস্টার একই ভাবে মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে কথাগুলো বললেন।

বায়ান্নোর একুশে ফ্রেব্রুয়ারি একটি ঝড় তুলে গেলো। আমার কাছে এর স্মৃতি ছাত্র ছাত্রীদের মিছিলের স্মৃতি—আমাদের বাসার সামনে দিয়ে কত মিছিল! আর বাসার মধ্যে ঝড় তোলা আলোচনা—*আজাদ* পত্রিকা হাতে নিয়ে। মিছিলের ছাত্ররা

সবাই বড় ছাত্র—হাইস্কুলের অথবা কলেজের। হাতে কালো পতাকা, মুখে শ্লোগান 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', 'খুনি নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই'। বিশেষভাবে যে মিছিলটি মনের মধ্যে গেঁথে আছে সেটি ছিল ছাত্রীদের। এরকম শাড়ি পড়া বড় ছাত্রীদের আমি আগে কখনো দেখিনি (সবারই প্রায় সাদা শাড়ি), ও ভাবে শ্লোগান দেয়া জঙ্গি মূর্তিতে তো নয়ই। সবার কথাবার্তা, পত্রিকার ছবি ও লেখা সব কিছুতে বুঝলাম ঢাকায় পুলিশের গুলিতে অনেক ছাত্র নিহত হয়েছে, প্রতিবাদে উত্তাল ঢাকা। কিন্তু সঠিক করে বলা যাচ্ছেনা কতজন নিহত হয়েছে। এখন কী হবে এই নিয়ে চিন্তিত সবাই। খাজা নাজিম আর নুরুল আমিন রাতারাতি বড় ভিলেনে পরিণত হলো আমাদের কাছে। বাসায় বেশি বয়সীদের মধ্যে বাংলাপ্রীতি তেমন ছিলনা, কিন্তু তরুণরা সবাই খুব উত্তেজিত। ভাই, চাচা, গৃহ-শিক্ষক তাঁরা ইতোমধ্যেই পূর্ব বাংলা যুবলীগের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন যেটি খুবই বামপন্থী স্বাধীন যুব সংস্থা হিসেবে সদ্য গড়ে ওঠেছিল। আর আমার দুই খালু—চৌধুরী খালু আর মোক্তাল খালু ঘোরতর মুসলিম লীগার। দুই পক্ষ সমানে সমানে বাকযুদ্ধ করতো, আব্বা সাধারণত অংশ নিতেননা। বায়ান্নোর একুশে ফেব্রুয়ারি বাসার এই বিতর্ককে তুঙ্গে তুললো। লামার বাজার স্কুলে কিন্তু এই নিয়ে কোন ঝড় উঠলোনা, দিলা মিয়া মাস্টারও এই নিয়ে আমাদেরকে কোন ভাষণ দিলেননা।

পুরোনো দিনের লেখাপড়া ও স্কুলের মজা

লামার বাজার স্কুলে যখন পড়ি তখন অন্তত আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক স্কুল সিস্টেমের মধ্যে আধুনিকতার ছোঁয়া এসেছে। যেমন বাংলা পড়ার জন্য আমাদের ছিল 'অমিয় পাঠ' প্রথম ভাগ, 'অমিয় পাঠ' দ্বিতীয় ভাগ—যাকে ছবি ইত্যাদি দিয়ে কিছুটা শিশুতোষ করার চেষ্টা করা হয়েছে। অঙ্কের বইয়ের ক্ষেত্রেও কথাটি সত্য। কিন্তু ওই সময়টি ছিল একটি ক্রান্তিকাল—বাল্যশিক্ষার পুরোনো ধারা তখনো শেষ হয়ে যায়নি। তাই ওই অমিয় পাঠের পাশাপাশি আমাদেরকে পড়তে হয়েছে মদন-মোহন বসাকের 'বাল্যশিক্ষা' এবং অঙ্কের বইয়ের সঙ্গে ওরকমই প্রাচীন ধাচের 'ধারাপাত'। এগুলো একেবারেই দীনহীন ভাবে ছাপানো চটি বই রাস্তার পাশে, গ্রামের হাটে সর্বত্র খুব সম্ভব দুআনা চার আনায় পাওয়া যেত। আর পড়লেই বোঝা যেত যে এর কোন নতুন সংস্করণ বের করার কোন বালাই ছিলনা—বৃটিশ আমলের, এমনকি 'ভারতেশ্বরী রাণী ভিক্টোরিয়ার' ছবি ও কথা ওখানে থাকতো। অনেক শিক্ষক মনে করতেন এই বাল্যশিক্ষা বই না পড়লে লেখাপড়া পোক্ত হবেনা। ধারাপাত জিনিসটি পরবর্তী প্রজন্মের অনেক হয়তো চিনবেইনা। আসল অঙ্ক করতে পারার আগে নানা রকম বিচিত্র হিসাব ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচয় ঘটানোই ছিল ধারাপাতের উদ্দেশ্য—যার বেশির ভাগ মুখস্থ করতে হতো। এক থেকে একশ' পর্যন্ত গোণার 'শতকিয়া' দিয়ে এটি শুরু হতো। কিন্তু সেটিই একমাত্র

'কিয়া' ছিলনা, ছিল 'মণকিয়া', 'গণ্ডাকিয়া'—আরো কত কি। প্রত্যেক কিছু মাপার জন্য তখন দুটি ভিন্ন পরিমাপ সিষ্টেম শেখানো হতো—একটি দেশীয় এবং একটি বৃটিশ। পরবর্তী সময়ে উভয় সিষ্টেমের এককে অঙ্ক করতে হয়েছে। তাই ধারাপাতই ছিল ওই একক ও তাদের মধ্যে সম্পর্কগুলো মুখস্থ করে রাখার উপযুক্ত জায়গা—আর এরকম মুখস্থবিদ্যা দিয়েই শুরু হতো আমাদের অঙ্কের কসরত। মুদ্রার হিসাব করার জন্য এক দিকে টাকা, আনা, পয়সা; অন্য দিকে পাউন্ড, শিলিং, পেন্স, ফার্দিং—মজার ব্যাপার হলো এখন এই দুইয়ের কোনটাই নেই। টাকা, আনার হিসেবের মধ্যে 'পাই' বলে আরো একটি জিনিস ছিল যার ব্যবহার কখানো না দেখলেও অংকে থাকতো (১২ পাইয়ে এক আনা; 'টাকা আনা পাই' নামে বাংলা ছবির কথা মনে আছে?)।

ওজনের জন্য উভয় সিষ্টেমে অনেক জটিলতা ছিল। ১৬ ছটাকে এক পোয়া, ৪ পোয়ায় এক সের, ৪০ সেরে এক মণ; আবার ৮০ তোলায় এক সের। জমি মাপার জন্য ৪ কড়ায় এক গণ্ডা, ১৬ গণ্ডায় এক কানি (এখনো অনেকে যে 'কড়ায় গণ্ডায়' কিছু শোধ দিতে চান তার উৎপত্তি বোঝা গেল?); আবার ২০ কাঠায় এক বিঘা ইত্যাদি। এসব জটিল হিসেব সহজে মনে রাখার জন্য নানা রকম ছড়া ছিল ধারাপাতে। এই প্রাচীন ভাষার ছড়াকে কখনো কখনো আসল জিনিসের থেকে বেশি কঠিন মনে হতো। যেমন বিঘাকিয়ার জন্য ছড়াটি ধরা যাক :

কুড়ুবা কুড়ুবা কুড়ুবা লিহ্যে
কাঠায় কুড়ুবা কাঠায় লিহ্যে
কাঠায় কাঠায় ধুল পরিমাণ
২০ ধুলে হয় কাঠার প্রমাণ।

আর ছিল শুভঙ্করের নানা ছড়া। মণের দাম এত হলে আড়াই সেরের দাম কত হবে, এধরনের সমস্যা মুখে মুখে সমাধানের জন্য শুভঙ্করের ছড়াগুলো মুখস্থ করতে হতো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ছড়া শুরু হতো 'মণ প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর' এমনিতরো একটি পংক্তি দিয়ে আর শেষ হতো 'শুভঙ্করের ফাঁক' কথাটি দিয়ে। শুভঙ্কর ছিলেন প্রাচীন ভারতীয় একজন গণিতবিদ। সে সময় স্কুলে অঙ্কের ক্লাসে 'মানসাঙ্ক' বলে একটি জিনিস প্রচলিত ছিল—কোথাও কিছু না লিখে মুখে মুখে অঙ্কগুলো করতে হতো; আর সেগুলোর অনেক ক্ষেত্রে শুভঙ্করের ছড়া ছাড়া উপায় ছিলনা। এরপর যত ওপরের ক্লাসে গিয়েছি ততই অঙ্ক থেকে এসব অসংখ্য 'কিয়ার' কিছু কিছু বাদ পড়েছে, স্কুলের কাজ থেকে, সত্যিকার ব্যবহার থেকেও। এই জন্যই বলছিলাম যে আমরা একটি ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলাম। শেষ পর্যন্ত হাই স্কুল ছাড়ার আগেই 'দশমিক মুদ্রা' এবং পরিমাপের কোন কোন ক্ষেত্রে 'দশমিক ব্যবস্থা' চালু হয়েছিল পাকিস্তানের সামরিক শাসক আইয়ুব খানের এক ফরমান বলে। যদ্দূর মনে পরে আমাদের ওয়ান, টু'তে পড়ার সময়ও বাংলা পাঠ্য বইয়ে সাধু ভাষা ও হুবহু সংস্কৃত তৎসম শব্দের আধিক্য ছিল—যা কয়েক

বছরের মধ্যে আমাদের লেখাপড়ায় একেবারেই কমে গিয়ে ঝরঝরে চলতি ভাষা চালু হয়েছিল।

এ ধরনের আরো বাল্য শিক্ষা বইয়ে অন্যান্য বিষয়ও সহজে মনে রাখার জন্য নানা ছড়া ছিল, যেগুলোও আমাদেরকে মুখস্থ করতে বলা হতো। দেশের নানা বাদ্য যন্ত্র, নানা ফল, নানা পশু, পাখি, মাছ ইত্যাদি নিয়ে ছড়া ছিল। যেমন মাছেরটি ছিল :

রুহিত মাগুর পাবদা তপসী চিতল
ভেউস বাউস রুই জিওল কাতল,
ইলিশ খলিশা বাইম গোলসা কোড়াল
চাঁদা বাচা চিংড়ি চেলা বাতাসি বোয়াল।

লামার বাজার স্কুলে খেলার জায়গা তেমন ছিল না। পুরোনো কাঁচা ঘর আর নতুন পাকা ঘরের মাঝখানে ছোট একটি উঠান শুধু ছিল। ক্লাসের ফাঁকে আমরা এখানেই একটু ছুটাছুটি করতাম; মারামারি, দাপাদাপি যা কিছু ওখানেই হতো। মাঝে মাঝে বায়োস্কাপওয়ালা স্কুলের কাছে তাঁর বাক্স নিয়ে আসতেন। চারজন এক সঙ্গে দেখতো তাঁর বর্ণনার সুরে সুরে 'আহার দেখ বাহার দেখ ক্ষুদিরামের ফাঁসি দেখ, জাপান-বৃটিশ লড়াই দেখ' ইত্যাদি। আর আসতো লটারি করার রেশমি মিঠাই। এক আনা দিয়ে একটি টিকেট কিনে পানিতে ভেজালেই নম্বর ভেসে উঠতো। ১ থেকে ১০ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যক রেশমি মিঠাইয়ের গোল্লা পাওয়া যেত, যা আমাদের সামনেই তৈরি হতো।

রেশমি মিঠাইওয়ালা আমার জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মজা নিয়ে আসতো। প্যাঁজা প্যাঁজা মিঠাইটি খেতে বেশ। লটারি খেলার একটি আলাদা আনন্দও ছিল। এক আনা দিয়ে যদি বেশ ক'টি পেতাম তা হলে বন্ধুবান্ধবকে বিলানোর সুযোগ হতো। আমার কাছে কিন্তু এর অন্য একটি মজা ছিল যা না খেলে, না কিনলেও পেতাম—সেটি হলো একে তৈরি হতে দেখা। যে বাক্সের মত ঠেলা গাড়িতে কাজটি হতো তার সবার উপরে একটি সুতার সঙ্গে লটারির টিকেটগুলো ঝোলানো থাকতো—যেগুলোর থেকে একটি টেনে নিয়ে পানিতে ভেজাতাম আমরা। এর নিচেই ছিল কিনারা উঁচু করা একটি বড় থালা যার মাঝখানে সুন্দর গোলাপি রঙের গলিত মিঠাইপূর্ণ একটি পাত্র থাকতো। এই গলিত মিঠাইয়ের পাত্রটিকে হ্যাণ্ডেল ঘুরিয়ে মিঠাই-ওয়ালা খুব জোরে ঘোরাতে পারতো। নিচে একটি চুলা দিয়ে পাত্রটির মিঠাই সব সময় গলিত রাখা হতো। রেশমি মিঠাই তৈরির সময় মাঝখানের পাত্রটিকে যখন ঘোরানো হতো তখন তার গায়ে অসংখ্য ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়ে মিঠাইয়ের সূক্ষ্ম সুতাগুলো বের হয়ে পাত্র আর থালার মধ্যবর্তী জায়গাটিকে আস্তে আস্তে প্যাঁজা তুলার মতো জিনিসে ভরে ফেলতো। এটিই ছিল সব চেয়ে মজাদার দৃশ্য। প্রথমে জায়গাটিতে হালকা মাকড়সা জালের মত মিঠাইয়ের সুন্দর গোলাপি জাল তৈরি হতো, তারপর ওই জাল ক্রমেই ঘন হতে থাকতো আরো আরো মিঠাইয়ের সুতা এসে, অবশেষে একবারে প্যাঁজা তুলার মতো। যথেষ্ট ঘন

হবার পর হ্যান্ডেল ঘোরানো বন্ধ করে মিঠাইওয়ালা ওই প্যাঁজা তুলাকে হাত ঘুরিয়ে কুড়িয়ে নিতো এবং দু'হাতে একটু একটু চেপে একটি গোল্লা বানিয়ে কাঠির মাথায় আমাদেরকে দিতো। এটি করার ফলে আজকালকার মত হাতে না ছোঁয়া বিশাল এলোমেলো আকৃতির রেশমি মিঠাইয়ের বদলে তখন আমরা পেতাম ছোট বলের মত গোল্লা।

স্কুলের গেইটের ঠিক বাইরেই ছিল করিম বক্সের দোকান। লজেন্স, বুট, বাদাম ইত্যাদি লোভনীয় জিনিস যেমন পাওয়া যেতো তেমনি খাতা, পেন্সিল, শ্লেট এসবও পাওয়া যেত ওখানে। করিম বক্সকে আমরা তো মান্যগণ্য করতামই, আমাদের হেডমাস্টারও করতেন। এর প্রমাণ প্রতি বছর স্কুলের যে বার্ষিক অনুষ্ঠানটি হতো সেখানে হেড মাস্টারের একটি বিস্তারিত প্রতিবেদন থাকতো। সহযোগিতার জন্য যে সব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির নাম বলা হতো তাতে করিম বক্সের নামও থাকতো। বার্ষিক অনুষ্ঠানটি হতো লামার বাজার বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত ভাবে, সেখানকার প্রধান শিক্ষয়িত্রীও এরকম বক্তৃতা দিতেন। অভিভাবকদের অনেকেই উপস্থিত থাকতেন। স্কুল ইন্সপেক্টরও আসতেন। এই একটি দিন মেয়েদের সঙ্গে সম্মিলিত ভাবে সভা করার সুযোগটিতে বেশ মজা পেতাম। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে মেয়েদেরই অংশগ্রহণ বেশি ছিল। বালক বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আমি সব সময় অংশ নিতাম—এজন্য স্কুলে ও বাসায় প্রচুর রিহার্সাল হতো। এখানে অংশ নিতে নিতে এ কাজে আমার সক্ষমতা সম্পর্কে নিজের ও আমার শিক্ষকদের যথেষ্ট আস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। তাই তৃতীয় শ্রেণীতে একবার অন্য স্কুলে অনুষ্ঠান করার জন্য ধারে পাঠানো হলো আমাকে। বাদুরতলায় কাপাসগোলা স্কুলের হেড মাস্টারের সঙ্গে দিলা মিয়া মাস্টারের বন্ধুত্ব ছিল। সেখানে বার্ষিক সভায় ছাত্র-'শিল্পী'র ঘাটতি থাকাতে আমাকে ধারে পাঠানো হলো। এটি আমার জন্য ছিল একটি বিরল সম্মানের বিষয়, আবার আশঙ্কার বিষয়ও বটে সম্পূর্ণ অপরিচিতদের মধ্যে স্টেজে উঠে পারফরম করতে হবে—ওখানকার ভাবসাব জানিনা, ছাত্ররা হাসাহাসি বা হৈচৈ শুরু করলে আমার কী অবস্থা হবে তাও তো জানিনা। কাপাসগোলা স্কুলে দর্শকদের মধ্যে পরিচিত কিছু মুখ কিন্তু আমি দেখতে পেলাম—এরা বুবুর শ্বশুর বাড়ির কয়েকটি ছেলে ও তাদের অভিভাবকরা। স্কুলটি বুবুর বাড়ির খুব কাছে এবং ওই পাড়ারই স্কুল। আমার দুটি অংশগ্রহণ ছিল অনুষ্ঠানে—একটি আবৃত্তি আর একটি গান। আবৃত্তিটি ছিল বেশ অভিনয় করে দেখানোর মাধ্যমে :

'নদী তীরে বৃন্দাবনে সনাতন একমনে জপিছেন মালা
হেন কালে দীন বেশে, ব্রাহ্মণ চরণে এসে করিল প্রণাম।'

আর গানটি ছিল দেশাত্মবোধক, পরেও অনেকবার গেয়েছি :

'সংশয় বিঘ্নের জিঞ্জির ভাঙ্গি, আমরা এনেছি পাকিস্তান
শৃঙ্খল-মুক্তির চঞ্চল ছন্দে, আজাদ সৈনিক গাহে গান।'

ঠিক করে রেখেছিলাম যে এখান থেকে বুবুর বাড়িতে যাব। ওই ছেলেদের কল্যাণে তাঁর কাছে খবর পৌছে গিয়েছিল আগেই। তাই বুবুর বাড়িতে আমাকে নিয়ে রীতিমত উৎসব। তাঁর আত্মীয়স্বজন মহিলারা ছেলেপুলে নিয়ে জড়ো হয়েছিলেন। তাদের কাছে বুবুর গর্ব আর ধরেনা, তার এতটুকু ভাইটি স্থানীয় স্কুলের অনুষ্ঠানে হায়ারে এসেছে। যথারীতি বুবুর সেই লোভনীয় খাবারের ভুরিভোজও বাদ গেলনা।

বরকলে প্রাকৃতিক শিক্ষা উপকরণ

স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগে পরে দু-বার আমি দক্ষিণ চট্টগ্রামের চন্দনাইশে বরকলে গিয়েছি। ওখানে আমার চৌধুরী খালুর বাড়ি। প্রথম বার গিয়েছি খালুর দ্বিতীয় বিয়েতে। বেশ কিছু দিন হলো আমার এই সফুরা খালা মারা গিয়েছিলেন। তাঁদের ছেলে আমার খালাতো ভাই বাদশা বয়সে আমার চেয়ে খানিকটা ছোট। আর খালাতো বোন জোহরা বু'র ততদিনে বিয়ে হয়ে গিয়েছে। খালুর দ্বিতীয় বিয়েতে আমরা সবাই দলেবলে গিয়েছিলাম শহর থেকে ট্রেনে। আমার প্রথম ট্রেন ভ্রমণ হিসেবে সেটি খুব মনে পড়ে। চট্টগ্রাম-দোহাজারি স্থানীয় ট্রেন লাইনে কয়লা চালিত বাষ্পীয় ইঞ্জিনের ট্রেনে আমাদের যাত্রা। এই প্রথম ইঞ্জিনে পানি ভরা থেকে শুরু করে, ইঞ্জিনের পেছনে কয়লার গাড়ি, হুইসেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে সরু রেখায় ধোঁয়া উদ্গীরণ (কারণ হুইসেলটি বাষ্প চালিত), বয়লারের দুপাশের ইঞ্জিনে হুশ হুশ শব্দ করে করে পিষ্টনের সামনে-পেছনে আসা যাওয়া, আর সাথে সাথে উপরের চিমনি দিয়ে গল গল করে ধোঁয়া উদ্গীরণ, এগুলো দেখার সুযোগ হলো। মনে হলো অন্যদের তুলনায় এসব জিনিসে আমার একটু বেশি কৌতূহল রয়েছে, এও যেন নিজের কাছে নিজের প্রথম আবিষ্কার।

কয়লার ইঞ্জিনের বিড়ম্বনাটি একটু পর টের পেলাম। বিয়েতে যাওয়া উপলক্ষে সাদা প্যান্ট-শার্টে খুব ধোপদুরস্ত ভাবে সেজেছিলাম। কিন্তু ট্রেনের ইঞ্জিন থেকে বাতাসে ভেসে আসা ছাইয়ের গুড়োগুলো জানালা দিয়ে ঢুকে সেই পোষাককে কালিমা লিপ্ত করছিল। আবার জানালা বন্ধ করে দিলে আমার দেশ দেখা হয়না—কাজেই উভয় সংকটের মধ্য দিয়ে চল্‌লো ট্রেন ভ্রমণ। ষোল শহর, জানালী হাট—তারপরেই বিখ্যাত কালুরঘাট ব্রিজ—কর্ণফুলি নদীর উপর দিয়ে। গ্রামের বাড়ি যাবার জন্য এই জানালী হাট স্টেশনের বাহির সিগনালে আমরা বাস থেকে নেমে যেতাম—এর পরের জায়গাগুলো আমার কাছে ছিল রহস্যে ভরা, বিশেষ করে কালুরঘাট ব্রিজ ও কর্ণফুলি নদী। লাল রঙা লোহার ব্রিজ। খুব ধীর গতিতে ট্রেনটি সেই ব্রিজ অতিক্রম করলো। আমার মনে হলো ঝম ঝম করে পুরো ব্রিজ কেঁপে উঠলো এ সময়, আর তাতে যেন কিছু ঢেউ খেলে গেল কর্ণফুলিতে। ব্রিজ থেকে উজানে ভাটিতে অনেক দূর পর্যন্ত নদীটিকে দেখলাম মন ভরে। অনেকগুলো সাম্পান দেখলাম যাতে মাঝি সাম্পানের পেছন ভাগে দাঁড়িয়ে

ক্রস করা দুটি দীর্ঘ দাঁড় এক সঙ্গে চালাচ্ছে। কোন কোন সাম্পান আবার দেখলাম ডাঙায় চরার ওপর তুলে রাখা। আমার কাছে সাম্পানের সব চেয়ে সুন্দর অংশ মনে হলো তার পেছনের অনেক উঁচু অংশ যার কিনারা দুটি কূলার দুই কিনারার অংশের মত ওপরে উঠে আসা। আমাদের যাত্রা শেষ হলো কাঞ্চন নগর স্টেশনে এসে। ওখান থেকে খালুর বাড়ি বরকল এবং কাছে কনের বাড়িতে বরযাত্রী কী ভাবে গিয়েছিলাম তা এখন মনে পড়ছেনা—খুব সম্ভব হেঁটে। বিয়ের আসরে খালুকে খুব একটা বরের মত মনে হয়নি, যদিও গান গেয়ে মালা পরানো হয়েছিল মনে আছে। দুটি ছোট মেয়ে অনেক দূর থেকে মালা হাতে গান গেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছিল। বরের কাছে এসে মালা পরিয়ে দেয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের গানও শেষ হলো। বর মনে না হওয়ার একটি কারণ হলো দুই পক্ষের সবার সঙ্গে তাঁর উঠে গিয়ে বেশ চুটিয়ে আলাপ-সালাপ করা। পরে দেখলাম বিয়ের আসরের ব্যতিক্রমগুলো আমার চোখে ঠিকই ধরা পড়েছে, লোকজন আড়ালে খালুর সমালোচনা করছে বরের মত চুপটি করে বসে না থেকে সবার সঙ্গে অভ্যর্থনা ও আলাপে রত হওয়াতে—হোকনা সে দ্বিতীয় বিয়ে।

লামার বাজার প্রাইমারি স্কুলে থাকা কালেই বরকলে আরো একবার যাওয়া হলো—এবার খুব মজা করে বেড়াতে। চৌধুরী খালুর অনেক দিনের ইচ্ছা আমাকে তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে নিয়ে যাবেন। ওই সময় খালাতো ভাই বাদশা এসেছিল শহরে। ওর সঙ্গে আমার খুব ভাব। ছোট্ট ছেলেটি অন্যদের নকল করে অনেক কিছু করতে পারে—বিশেষ করে গ্রামের হুজুররা যে ভাবে ওয়াজ করে বাদশা সেটি খুব গম্ভীরভাবে নকল করে দেখাতে পারতো। বাদশার এরকম একটি নকল করা ওয়াজ এখনো মনে আছে। সে হুজুরের মতই থেমে থেমে, হাত নেড়ে নেড়ে বলতো : 'বাংলা নয়, ইংরেজি নয়, ফরাসি নয়, চলুন কালামে পাকের ভাষা আরবি শিখি...'। ঠিক হলো বাদশা আর আমাকে নিয়ে খালু বাড়ি যাবেন সাপ্তাহিক ছুটির সুযোগে। এবার আমরা বক্সীর হাটের কাছে চাক্তাই খাল থেকে নৌকা নিয়ে নদী পথে গেলাম। নদী পথে খুব ধীর ভ্রমণ--এর মজাই আলাদা। আমার বিশেষ ভাবে মনে আছে পথে কালার পোল বলে একটি জায়গার কথা—যেখানে চোখে পড়ার মত একটি কাঠের সেতু রয়েছে। অল্প কিছু দিন পর অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ওপর নাটক করা প্রসঙ্গে এই কালার পোলের কথাটি বার বার শুনেছি—এর কথাটিই পুরোটা নদী ভ্রমণের স্মৃতির মধ্যে শুধু মনে আছে।

বাড়ি পৌছার পর পরই পুকুরে জাল ফেল্‌লেন খালু। বাদশা ও আমি পুকুর পাড়ে ঘুরে কাটালাম। যুৎসই একটি রুই মাছ জালের মধ্যে আটকিয়ে কেমন করে তোলা হলো আমাদের হাত-তালির মধ্যে সে দৃশ্যটি এখনো চোখে ভাসছে। মাছ ধরা, সঙ্গে সঙ্গে রান্না করে সবাই মিলে খাওয়া—এ সবকিছুর মধ্যে আমিও যে একটি উপলক্ষ তা অনুভব করে খুব আনন্দ পেলাম। অন্য সময় দাওয়াতে আসল মেহমানদের সঙ্গ নিয়েছি, আজকে আমিই আসল মেহমান। বাদশাও মনে হলো

একদিনেই তাদের বাড়ির ও আশপাশের সব কিছু দেখিয়ে শেষ করার জন্য ছটফট করছিল। তবে চিরকাল মনে রাখার মত জিনিসগুলো সে দেখালো পরদিন সকালে।

সকালে নাস্তা করেই বাদশা নিয়ে পেল দেউরি ঘরে তারা যেখানে হুজুরের কাছে পড়ে। দেখলাম লুঙ্গি পরা খালি গায়ে মাঝ বয়সী দাড়িওয়ালা একজন আধশোয়া অবস্থায় রয়েছেন। আশপাশের বাড়ির ছোট ছোট বেশ কিছু ছেলে ওখানে জড়ো হয়েছে। অল্পক্ষণ সুর করে সবাই আরবি কায়দা পড়লো, তারপর আলিফ, বে, এসব লেখার পালা। কাছেই রাখা ছিল টুকরা করা কিছু কলাপাতা, প্রত্যেকে একটি করে নিয়ে নিল। আসার সময় বাদশা মুরগির পালক নিয়ে এসেছিল। অন্য ছেলেরাও প্রত্যেকে তাই করছে। ওই পালক চেঁছে নতুন কলম বানানো হলো চোখের সামনে। হামানদিস্তার মতো একটি পাত্রে ছোট ছোট পুঁতির মত ঘন নীল কিছু ফল। এর মধ্যেই সেগুলো পিষে কালি তৈরি হয়েছে। ওই কালি দিয়ে কলাপাতার ওপর সবাই বার বার একই হরফ লিখলো, হুজুরকে দেখালো। হুজুরের হাতে ভীষণ রকমের লম্বা একটি বেত। নিজে কথা কম বলেন—তবে বেত নাচান বেশি। অনেককে সে বেতের বাড়ি খেতে হলো, আবার নতুন করে লিখতে হলো। কাজটি খুব সোজা। কলাপাতা একটু ধুয়ে ফেলতেই আগের লেখা মুছে গেল, তার উপর নতুন করে লেখা। কলাপাতাকে চাটগেঁয়েতে বলে বরাক। এই লেখার কাজটিকে সবাই বললো বরাক লেখা। যাদের হয়ে গেল তাদেরকে হুজুরের পা টেপার কাজে লেগে যেতে দেখলাম। এজন্য কাউকে কিছু বলতে হলোনা, ওরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই পা টিপতে লেগে গেল, যেন এ-ও বিদ্যা চর্চার অংশ। বাদশা আমাকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল হুজুরের সঙ্গে। মনে হলো ছাত্ররা মোটামুটি ফুর্তি করেই সব কিছু করছিল—বেত খাওয়া, পা টেপা এত সবের মধ্যেও তাদের নিরানন্দ হতে দেখলামনা। ওরা আমাকেও একটি কলাপাতা দিলো লিখতে। আরবি লেখার পর বাংলা অক্ষরও মকশো করা হলো কলাপাতার উপর। ফলের রসের জলো কালি যে কলাপাতার উপর খুব ভাল ফোটে তা বলবোনা, কিন্তু লেখার প্র্যাকটিস ঠিকই চলে।

বাদশাদের দেউড়ি ঘর আমাকে নতুন করে কিছু জিনিস ভাবতে শেখাল। আমাদের লামার বাজার স্কুল কিংবা বক্সীর হাটের লেখাপড়ার ধরনটাই দেশে একমাত্র ধরন নয়। তার বাইরেও আরো জায়গা আছে, আরো ধরন আছে।

বইয়ের স্বাদ

বই পড়ার বা আরো ভাল করে বলতে গেলে বই ঘাঁটার সুযোগ বক্সীর হাটের বাসায় আমার ইতোমধ্যেই ছিল। ইউনূস ভাই 'শুকতারার' গ্রাহক। কলকাতার ঝামাপুকুর লেনের দেব সাহিত্য কুটিরের প্রকাশিত এই কিশোর পত্রিকা নিয়মিত আসতো। তাছাড়া ওই দেব সাহিত্য কুটিরের ছাপানো শক্ত মলাটের দুটি ঢাউস

কিশোর পূজা বার্ষিকী বাসায় ছিল—একটির নাম ছিল আবাহন, অন্যটির নাম মনে পড়ছেনা। ছবিতে, কমিকে, লেখায়, এগুলো ছিল আমার কাছে যাদুর বাক্সের মত। সব যে বুঝতাম তা নয়, অনেক কিছু উল্টা পাল্টা বুঝতাম, তবুও ভীষণ ভাল লাগতো। প্রধানত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম নিয়ে নানা কাহিনী। ওতে একটি রূপকথার মত গল্প মনে পড়ে। দেশে দেখা দিয়েছিল এক মহা শক্তিশালী দৈত্য। তার অত্যাচারে দেশের মানুষের দুর্দশার শেষ নেই, দেখা দিয়েছে মহা দুর্ভিক্ষ, নিজেদের মধ্যে হানাহানি। এমন সময় ঘোড়া হাঁকিয়ে এসেছেন এক তরুণ—অভীক কুমার। তিনি সবাইকে জাগিয়ে তুল্লেন। দৈত্যের পতন হলো। গল্প নানা ভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিল দৈত্যটি ছিল ইংরাজ, আর অভীক কুমার ছিলেন নেতাজি সুভাষ বসু। তাছাড়া কিশোর অভিযান, গল্প, কবিতা ছড়া সব কিছু ছিল এই দুই বার্ষিকীতে। তবে একেবারে নিজের করে প্রথম বই (পাঠ্য বই ছাড়া) তখন হাতে এল যখন প্রথম শ্রেণীতে পরীক্ষায় প্রথম স্থান পেয়ে স্কুলের বার্ষিক অনুষ্ঠানে দিলা মিয়া মাস্টারের হাত থেকে কয়েকটি বই পুরস্কার পেলাম। ছোট ছোট তিনটি বই সুন্দর লাল ফিতা দিয়ে বাঁধা। এর মধ্যে একটি ছিল নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবনী, অন্যগুলোর নাম মনে নেই তবে দেশাত্ববোধক বিষয়ে সেটি মনে আছে। ওই দিনই অথবা তার পরের দিন ইউনূস ভাইয়ের কাছে পুরস্কার পেলাম আরো কয়েকটি বই ও সে সঙ্গে একটি ওয়াটার কালার রঙের বাক্স। ওই বই ক'টা আর ওই রঙের বাক্সটা (দুই সারিতে চকলেটের আকৃতির নানা রঙ আর ছোট্ট একটি তুলি, বাক্সের উপর মিকি মাউজের ছবি) আমার ভুবনটিকে যেন মুহূর্তে পরিবর্তিত করে দিলো। সেই যে আমার সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য সাথী বইকে পেয়ে গেলাম আজ অবধি সে ওভাবেই রয়েছে। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবার মুহূর্তে পাওয়া সেই বইগুলোর প্রতি ওই অনুভূতির কোন তুলনা নেই। সেগুলোর গন্ধ নেয়া থেকে শুরু করে সব কিছুই আমোদিত করে রেখেছিলো চারদিক—আর বার বার করে এগুলো পড়ার আগ্রহ তো বটেই।

সেই সাত বছর বয়সের পর থেকে যতই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্য দিয়ে এগোলাম নিজের সম্পর্কে দুটি ধারণায় প্রায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। একটি হলো স্কুলে প্রথম স্থানটি পেতেই হবে এবং তা স্বাভাবিক চেষ্টাতেই সম্ভব। আর একটি হলো বই আমার জন্য ধীরে ধীরে একটি নেশায় পরিণত হচ্ছে। প্রত্যেক বার প্রথম হওয়াটার একটি বিশেষ আনন্দ ছিল এবার স্কুলের বার্ষিক সভায় পুরস্কার হিসেবে নতুন কী বই হাতে আসছে (প্রতিবার সংখ্যা বাড়ছিল) তার প্রতি কৌতূহল। তবে এই প্রাপ্তির চেয়ে চাহিদা ছিল কিন্তু অনেক বেশি। বইয়ের দোকানে গিয়ে বা অন্য কোন সূত্রে পছন্দ করা বই পড়ার কোন সুযোগ তখনো হয়নি। সালাম ভাই ও ইউনূস ভাই তখন কিছুটা পাকা পাঠক, পকেট খরচের টাকাও একটু আধটু তাঁদের থাকে—তবে সে সবও খুব সীমিত। তাঁদের যে ক'টা বই বাসায় ধীরে ধীরে জমছিল নজর সেদিকেই গেল। কোন কোনটি আমার জন্য

কঠিন হলেও, সেগুলোও সমানে পড়ে গেছি। বেশির ভাগ কিশোর উপন্যাস, আর ডিটেকটিভ উপন্যাস, অথবা অ্যাডভেঞ্চার। ইউনূস ভাই ডিটেকটিভ গল্পের এমন পোকা ছিলেন যে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় তিনি নিজেই একটি ডিটেকটিভ উপন্যাস লিখে ফেলেছিলেন। সেটি ছাপাবার চেষ্টা করবেন এমন কথাও শুনেছিলাম, কিন্তু তা আর হয়নি। তাই বিখ্যাত ডিটেকটিভ গল্পের সিরিজ মোহন সিরিজের বইগুলো আমি বই পড়ার প্রায় শুরুতেই পড়া আরম্ভ করেছি; অন্য রকম ডিটেকটিভ বইও। বেশ কিছু বোধ হয় ইংরেজি থেকে অনুবাদ। এরকম একটি বইয়ের কথা মনে পড়ে যার ভেতরটা বেশ কিছুটা বুঝলেও প্রচ্ছদে নামটি বুঝতে পারিনি—বাংলায় লেখা নামটি ছিল 'মিডল্যান্ড ব্যাংক মিষ্ট্রি'।

বেশ কিছুটা না বুঝলেও বই পড়ে যেতে কিন্তু আমার আগ্রহের কমতি ছিলনা; যা বুঝতামনা তা নিয়ে নিজেই একটি থিওরি উপস্থিতমত বানিয়ে নিতাম। যেমন মনে পড়ে 'অজানার উজানে' নামের একটি কিশোর অ্যাডভেঞ্চার বই আমাকে খুব মুগ্ধ করেছিলাম। তাতে কয়েক জায়গায় 'দেরাজ' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল। দেরাজ মানে যে ড্রয়ার তা জানা ছিলনা, কিন্তু বর্ণনা থেকেই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে এরকম কিছু খোপ খাপ মত রাখার জায়গা হবে—কাজেই বড় হোচট খেতে হয়নি। অজানার উজানেতে একটি বাঙালি ছেলে বাড়ি পালিয়ে বিহার ও উত্তর প্রদেশের নানা দুষ্কৃতকারীর খপ্পরে বার বার পড়েছে এবং উদ্ধার পেয়েছে। এর একটি ছবি ও একটি কথা এখনো চোখে ভাসে—নির্জন দেহাতি জায়গায় আগুন জ্বালিয়ে কিছু সন্দেহজনক লোক শীত নিবারণ করছে। আমাদের পালানো কিশোর রাজনকে দেখে জিজ্ঞেস করলো 'মকান বা' (বাড়ি কোথায়?)। ওটি যে হিন্দুস্তানি কথা নয় তা বেশ বুঝছিলাম—খুব সম্ভব ভোজপুরি জাতীয় কোন কথ্য ভাষা। রাজন তাৎক্ষণিক মিথ্যা বানিয়ে চটপট উত্তর দিল 'বানারস'। এক পৃষ্ঠা জুড়ে আর্ট পেপারে আঁকা একটি ছবিতে এই দৃশ্যটি আঁকা ছিল নিচে ক্যাপশন ছিল 'মকান বা?'

ভাল লাগার মধ্যে যদিও পার্থক্য ছিল, বই পড়তে তেমন কোন বাছবিচার করতামনা—যা সামনে পেতাম তাই পড়তাম। এমনকি আব্বা বা অন্য কারো যত্নে তুলে রাখা ধর্ম-উপদেশ বইগুলো যেখানে পাক-নাপাক ইত্যাদি বিষয়ে উপদেশাদি থাকতো সেগুলোও পড়েছি। যখন যেটি পড়তাম তখন তার দৃষ্টিভঙ্গি নেবার চেষ্টা করতাম। যখন বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে পার্থক্য দেখা দিত, তখন নিজের একটি পক্ষপাতিত্ব আপনিই গড়ে উঠতো।

একটি জিনিস মোটামুটি স্পষ্ট যে আমার বই পড়া শুধু 'ঠাকুরমার ঝুলি' জাতীয় বই দিয়ে হয়নি। তবে একটি ব্যতিক্রমী বইয়ে অন্য রকম এক ঠাকুরমায়ের অবতারণা বলতে গেলে আমার পাঠাভ্যাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। এই বইয়ে ঠাকুরমা সহ পরিবারের সবার আসর বসতো প্রতিদিন রাতে খোলা ছাদে। কলেজ পড়ুয়া ছেলেটি জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিত,

চিনিয়ে দিত। বেশি কথা হতো ঠাকুরমার সঙ্গেই কারণ প্রত্যেকটি বিষয়ে ঠাকুরমার নিজস্ব ধ্যান ধারণা ছিল—যেমন 'চাঁদের বুড়ির' ব্যাপারে। প্রতি রাতের জন্য নতুন বিষয় আসতো, কোন দিন চাঁদ, কোন দিন শুক্র গ্রহ, কোনদিন মঙ্গল ইত্যাদি। বেশ কিছু ছবি ছিল বইটিতে—দূরবীনে দেখা নানা গ্রহ-উপগ্রহের ছবিতো ছিলই, সৌরজগৎ কেমন করে সৃষ্টি হলো তেমনি সব থিওরির কাল্পনিক ছবিও ছিল। যেমন অন্য কোন তারার আকর্ষণে সূর্য থেকে পটলের আকৃতির গ্যাসীয় পদার্থ কেমন করে বিচ্ছিন্ন হয়ে এসেছিল এবং তার নানা অংশ থেকে বিভিন্ন গ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল সেই ছবি। পটলের দুই প্রান্ত সরু, পেট মোটা—তাই সূর্যের অপেক্ষাকৃত খুব কাছের ও খুব দূরের গ্রহগুলো ছোট, মাঝখানেরগুলো বড় (এই পুরো থিওরিটি এখন অবশ্য পরিত্যক্ত হয়েছে)। কলেজ পড়ুয়া বিজ্ঞান ছাত্র খুব সহজ করে এগুলো বোঝাতো যেন ঠাকুরমাও বুঝতে পারেন। ঠাকুরমা যেমন মজা করে বুঝতেন তাঁর নানা আপত্তি সত্ত্বেও, আমিও কিছুটা বুঝতাম বৈকি।

খুব সম্ভব এটিই আমার জীবনের প্রথম বিজ্ঞানের বই, আর এটি অত্যন্ত কৌতূহলের সঙ্গে পড়ে, অনেক মজা পেয়ে ভবিষ্যতের আমার পক্ষপাতিত্বটি কিছুটা স্পষ্ট হয়েছিল বলা যেতে পারে। বিজ্ঞানের বিষয়ের সঙ্গে যদি কোথাও অ্যাডভেঞ্চার এসে মিশতো তা হলে সেটি সোনায় সোহাগা হতো। ওই সময়ই এরকম প্রথম বইটির যোগানও বাসায় ভাইদের বইয়ের তাকে পেয়ে গিয়েছিলাম—জুল ভার্নের লেখা 'রহস্যময় দ্বীপ'। জুল ভার্নের অনেক বই পরে বাংলা-ইংরেজিতে পড়েছি, কিন্তু এই বইটি ওই তখনকার পর আর পড়া হয়নি। দুটি দৃশ্য খুব মনে পড়ে। অজানা, জনমানবশূন্য দ্বীপে অভিযাত্রী কয়েকজন গিয়েই খাদ্য সংকটে পড়েন, কোথাও খাওয়ার মত কিছু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা। সমুদ্রের বেলাভূমিতে গর্তের মধ্যে পাওয়া গেল লুকিয়ে রাখা কচ্ছপের ডিম—কাঁচা খেতেও বেশ। অমৃতের স্বাদে সে ডিম খেয়ে প্রাণ বাঁচালো তারা। কচ্ছপের ডিম কখনো খাওয়া হয়নি—তখনো নয়, এখনো নয়; কিন্তু জুল ভার্নের কল্যাণে সেই স্বাদ এখনো অনুভব করি। এরপর আগুন জ্বালাবার যখন প্রয়োজন হলো—নানা উপায় ভাবা হলো। শেষ পর্যন্ত কাজে লাগলো একটি বুদ্ধি। দু'জনে তাদের হাতঘড়ির কাচটি খুলে ফেল্‌লো। কাচ দুটি মুখোমুখী লাগিয়ে নেয়া হলো কিনারায় কাদা দিয়ে সেঁটে। আগেই এর ভেতর পানি ভরে নেয়া হয়েছিল। সব মিলে একটি অতশী কাচের রূপ নিলো। এটি দিয়ে সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে শুকনা পাতায় আগুন ধরিয়ে নেয়া হলো। এই দৃশ্যটিরও একটি সুন্দর ছবি ছিল বলে এ অংশটি এত স্পষ্ট মনে রয়েছে। এরপর থেকে বই খোঁজার সুযোগ যখন পেয়েছি এমনি বইয়ের জন্য মনে আঁইঢাঁই করে। তবে অন্য রকম বইয়ে যে উৎসাহ কম ছিল তাও নয়।

বই পড়া যে রীতিমত নেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে তা টের পেলাম আমার থেকে বয়সে অল্প বড় মামা ইদ্রিসের সঙ্গে একটি চুক্তি করে। সেই যে কলের গান

শোনতাম যে মামার সঙ্গে—সেই ইদ্রিস মামা, আমাদের বাসার একটি বাসা পরেই যাদের বাসা। ইদ্রিস তখন গভর্নমেন্ট এম ই স্কুলে পড়ে—যা লামার বাজার স্কুলের তুলনায় অনেক কুলীন স্কুল। ওদের স্কুলে লাইব্রেরি আছে, আর প্রতি শনিবারে নিয়মিত লাইব্রেরি ক্লাস হয় এবং প্রত্যেকে একটি বই ধার করতে পারে। চুক্তিটি ছিল আমি তার বাড়ির কাজ করে দেব, আর সে মোটামুটি আমার ফরমায়েশ মত একটি বই আমার জন্য এনে দেবে, যা সপ্তাহান্তে ফেরত দেব। পরিস্কার মনে পড়ে প্রতি শনিবার হাফ ছুটির পর আমাদের ও ইদ্রিসদের দোকানের মাঝখানে গোপাল কাকার দোকানের সামনে তীর্থের কাকের মত বসে থাকতাম ইদ্রিসের আগমনের পথ চেয়ে—কখন ব্যাগ হাতে হেলে দোলে তাকে আসতে দেখা যায়। আসা মাত্রই ব্যাগ খুলে প্রথমেই বইটি হস্তগত করতাম, এবং অধীর আগ্রহে দেখতাম এবার কী বই আনলো।

গৃহশিক্ষক

স্কুলে ভর্তির আগে ও পরে বিভিন্ন গৃহশিক্ষকরা ছিলেন আমার জীবনে ও পারিবারিক গোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ মান্নান মাস্টারের সমকক্ষতা লাভ করতে পারেননি। লামার বাজার স্কুলে ভর্তির সময় থেকে বেশ কয়েক বছর তিনি আমাদের ছোট ক'জন ভাইবোনেরদেরকে পড়াতেন। বক্সীর হাট বাসার রাজনৈতিক ও অন্য সব আড্ডায়ও তিনি একজন মধ্যমণি ছিলেন। সুন্দর চেহারার এই মার্জিত তরুণ খুব সম্ভবত উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেই চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিঙের খাস মহালে চাকরি করতেন। আমাদের বাসায় থাকাকালীনও তাঁর চাকরি ছিল ওখানে; আর সকালে ও বিকেলে আমাদেরকে পড়ানো। তাঁর কোর্ট বিল্ডিঙের অভিজ্ঞতাগুলো বাড়ির আড্ডাকে বেশ সরস করে রাখতো। আমাকে তিনি সেখানে এক আধদিন নিয়েও গেছেন। দারুণ লাগতো এই যাওয়াটি—ঢালু রাস্তার উপর দিয়ে পাহাড়ের ওপর উঠে যাওয়া যেখানে সেই বিশাল ভবন যার এক কোনায় মান্নান মাস্টারের অফিস, অনেক দলিলদস্তাবেজের জঙ্গলের ভেতর। কোর্ট বিল্ডিঙে ওঠার রাস্তার পাশে ছিল সারিবদ্ধ অনেকগুলো অস্থায়ী খুব সাধারণ মানের রেস্টুরেন্ট। মামলা উপলক্ষে জেলার সর্বত্র থেকে প্রচুর মানুষকে দৈনিক ওখানে আসতে হতো—তাদের খাবারের জন্যই মূলত এই রেস্টুরেন্টগুলো। কিন্তু আমার জন্য এগুলোর আকর্ষণ ছিল এদের নান রুটি বানানো। গোল বালিশের মত কাপড়ের পুটলির ওপর সদ্য বেলা রুটি লেপটে নিয়ে বেশ জোরেশোরে তা উত্তপ্ত তাওয়ার ওপর চেপে দেয়া হতো। তারপর স্যাঁকার প্রক্রিয়ায় যেভাবে এটি ফুলে উঠতো আর যে অত্যন্ত লোভনীয় গন্ধ ছড়াতো সেটি আমার কাছে ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। মনে পড়ে একদিন মান্নান মাস্টার ও তাঁর বন্ধু মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বেদার বখ্‌ত মাস্টারের সঙ্গে আমি ওই আকর্ষণীয় রুটির স্বাদ নিতে পেরেছিলাম ওখানে।

আমাকে সহ নিয়ে তাঁরা দু'জন অনেক্ষণ গল্প করেছিলেন সবাই ওই নান রুটি ও সঙ্গে মুরগির পাখনা ও ঝোল খেতে খেতে; অমৃতের মত লেগেছিল।

মান্নান মাস্টার আদর্শবাদী বাম রাজনীতির মানুষ ছিলেন। রাজনৈতিক বিতর্কে তিনি সব সময় বয়সে কম অন্যদের পক্ষে থাকতেন। তাঁর নরম মার্জিত যুক্তিপূর্ণ কথাগুলো আমার খুবই ভাল লাগতো, মনে হয় সব সময় একমত না হলেও অন্য সবারও ভাল লাগতো। ওই সময় তিনি বিয়ে করেন ও সে উপলক্ষে বেশ কিছুদিন গ্রামের বাড়িতে ছিলেন। ফেরার পর সবাই শুধু তাঁর বিয়ের কথা বলতো, বৌ-এর কথা জিজ্ঞেস করতো। তিনি বেশ লজ্জা পেলেও অনেক গল্প করতেন বৌয়ের। কিছুটা অন্যদের সঙ্গে তাঁর আড্ডা থেকে, কিছুটা আমাদের সঙ্গে কথার ছলে তাঁর আগের জীবনেরও অনেক কিছু আমাদের জানা হয়ে গিয়েছিল। লেখাপড়া করতে গিয়ে তাঁর সংগ্রামের কথা, চাকরীর জন্য নানা চেষ্টা—নানা জায়গায় যাওয়া, অন্য সুদূর গ্রামীণ থানার পরিবেশে প্রথম চাকরীতে মেসে থাকা খাওয়ার কষ্টের কথা, ইত্যাদি অনেক কিছু। এরকম কোন পরিস্থিতিতে একজন বুয়া কীভাবে পর পর অনেক বেলা শুধু দুই টুকরা বেগুন ও ঝোল দিয়ে ভাত রেঁধে দিতেন সে কথাও মনে আছে।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার কালে বাড়িতে কিছু কিছু জিনিস বেশ মনোযোগ দিয়ে চিন্তা করে পড়া হতো বটে, কিন্তু লেখাপড়ার অনেকটাই ছিল বেশ কোলাহল করে। সব কিছু সজোরে পড়ার নিয়ম ছিল। আব্বাও সব সময় নিশ্চিত হবার চেষ্টা করতেন যে আমরা সত্যি সত্যি পড়ছি কিনা, বিশেষ করে কেউ 'আউট বই' পড়ে বেশি সময় নষ্ট করছিনাতো। মান্নান মাস্টার উচ্চারণের উপর খুব জোর দিতেন, ইউনূস ভাইও দিতেন। এর ফলে চাটগেঁয়ে ভাষাটাই সব সময় বলতে থাকলেও আমাদের বাংলা উচ্চারণে তার টান আসার সুযোগ কম হয়েছে। পরের স্কুলগুলোতে বহু-জেলা ভিত্তিক ছাত্রের প্রাচুর্য থাকায় এই দিক থেকে আরো সুবিধা হয়েছে। এক সময় কিছুদিনের জন্য আমাদের বাসার মধ্যেই কারখানায় যে সব স্বর্ণের কারিগর কাজ করতেন তাঁদের একজন খগেন কাকার মেয়ে সুধা আমাদের সঙ্গে পড়ালেখায় যোগ দিয়েছিল। আমাদের দলের (টুনু, আইয়ুব ও আমি) অন্যদের চেয়ে সুধা একটু বড় ছিল। তাই কোলাহলের লেখাপড়ায় সে প্রায়ই চীয়ার লিডারের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতো। তার ভাষা হলো কুমিল্লার কথ্য ভাষা—সেই ভাষাতেই প্রায়ই আহ্বান জানাত—' চলো আমরা আরো রাইগ্যা রাইগ্যা (জোরে জোরে) পড়ি।' এরও দু'এক বছর পরের দিকে যখন মান্নান মাস্টার চাকরির বদলি বা ওরকম কোন কারণে চলে গিয়েছিলেন, তখন অল্প দিনের জন্য আমরা খুবই অন্য রকম একজন গৃহশিক্ষক পেয়েছিলাম যিনি দুই বেলা পড়াতে আসতেন। তিনি একেবারেই ধোপদুরস্ত হিন্দু বাবু—চমৎকার ভাবে ধুতি পাট করে পরতেন। তাঁর মুখের বাংলাও ছিল অতি সুন্দর—খুব সম্ভব নদীয়া শান্তিপুরের দিকে বাড়ি ছিল। ব্যবহারও অত্যন্ত অমায়িক, আমাদের শত

অত্যাচারের মধ্যেও। তিনি আমাদেরকে আপ্যায়ন করে শান্ত ও মনোযোগী রাখার চেষ্টা করতেন। দোকানের সামনে সব সময় আখ বিক্রেতা আখ বিক্রি করতো। মাস্টার মশাই এসেই একটি আখ কিনে নিতেন এবং টুকরা টুকরা করিয়ে আমাদেরকে দিয়ে সুন্দর কথায় আখ খাওয়ার আমন্ত্রণ জানাতেন। আমরা চাচাতো বোন রেহানাও কিছু সময় আমাদের সঙ্গে পড়তো। রেহানা আমার থেকে ছোট, মাস্টারকে মোটেও সমীহ করতোনা। সে প্রায়ই তাঁর কোলে পিঠে চড়ে 'এই মাস্টার এই মাস্টার' বলে খামচি কেটে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করতো। মাস্টার মশাই এতই ভাল মানুষ ছিলেন যে একটুও না বকে তার কথা শোনার চেষ্টা করতেন।

বড় ভাইদের পড়াতেন এমন গৃহশিক্ষকদেরও ভূমিকা ছিল আমাদের উপর। তাঁদের একজন ছিলেন আবদুল বারি মাস্টার। দেশ বিদেশের নানা রকম গল্প আড্ডার ছলে তিনি বলতেন—এগুলো আমার জন্য বলা না হলেও কান-পাতা অভ্যাস নিয়ে আমি তা কম উপভোগ করতাম না। বিশেষ করে বিভিন্ন বই পড়ার পর সে সম্পর্কে তিনি যে আলোচনা করতেন তা খুব ভাল লাগতো। ওর মধ্যেই একদিন তাঁকে আমি বলতে শোনলাম যে আমি যে সব বই পড়ছি এত ছোট বয়সে তা পড়া আমার উচিত হচ্ছেনা। এতে আমার মতিগতি পরে বিগড়ে যেতে পারে।

বাসায় আমাদের পড়ার দল, খেলার দল আমাদের কাছে ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ সময় আমাদের পরিবারের নিয়মিত দাই জরিনার মা জানালো আমাদের এক নতুন সঙ্গী আসছে। একদিন সত্যি সত্যি জরিনার মাই আমাকে ডেকে নিয়ে দেখালো ফুটফুটে এক ছোট্ট শিশু বিছানায় চিৎ হয়ে ঘুমোচ্ছে। এই নবাগতের নাম হলো জাহাঙ্গীর (মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর); আমাদের আর তর সইছিলোনা কখন সে বড় হয়ে দলের পূর্ণ সদস্য হবে। এসময় আমরা তিন চার ভাই বোন বড় একটি খাটে (বাসার বড় কুলে) এক সঙ্গে ঘুমাতাম—একই লেপের তলে। লেপ নিয়ে রীতিমত টানাটানি হতো। কিনারার দুই জন প্রাণপণে নিজের দিকে টানতাম আর বলতাম 'টান ভাই টান'। এ কথা বল্‌লে এখনো আমরা হাসিতে গড়িয়ে পড়ি।

সাংকেতিক নম্বরের ব্যবহার

আমাদের বাসায় 'দুই নম্বর' কথাটির একটি বিশেষ অর্থ ছিল—বরং বলা যায় একাধিক বিশেষ অর্থ ছিল। মায়ের অসুখের সব চেয়ে আক্রমণাত্মক পর্যায়টি ইতোমধ্যে কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছিলো। ওই অত্যন্ত ঝড়ো হাওয়ার সময়টিতে আমাদের দিনগুলো, আরো বেশি রাতগুলো, কাটতো বড়ো আশঙ্কার মধ্যে—এই বুঝি তুলকালাম শুরু হয়ে যায়। তখন যেমন সামাল দেয়ার ফ্রন্ট লাইনে থাকতেন আব্বা, এখন অপেক্ষাকৃত শান্ত সময়েও তাঁকে নতুন ভূমিকায় একই কাজ করতে

হতো। এটি হলো আম্মাকে নানান কথায় ভুলিয়ে ভালিয়ে যথাসম্ভব শান্ত রাখা, তাঁর সব প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখা, তাঁর যে অদ্ভুত সব আবোল তাবোল কথা ওসবের পিঠে কথা বলে তাঁকে সঙ্গ দেয়া ইত্যাদি। যখন পরিচিত কাউকে লক্ষ্য করে মা ক্রমাগত বকাবকি করতেন আব্বা সত্যি সত্যি ওই কথায় যোগ দিতেন, বোঝাবার চেষ্টা করতেন যে ব্যাপারটি তিনি যা ভাবছেন তা নয়। এতে মা বুঝতেন বলে মনে হয়না, কিন্তু কেউ তাঁর কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছে মনে করে শান্ত হতেন। মায়ের ওই বকাবকি গালিগালাজ বেশ টার্গেট করা ছিল—এক এক জনকে লক্ষ্য করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে টার্গেট হতেন আত্মীয়স্বজন—তাঁর বাবা, শ্বশুর, ভাই, বোনজামাই, এবং আর একটু দূরের আত্মীয়রা। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো প্রায়শ বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতারাও টার্গেট হতেন—বিশেষ করে ফজলুল হক এবং খাজা নাজিমকে তিনি যে ভাবে বাক্য বাণে আক্রমণ করতেন মনে হতো যেন অন্যদের মতো এই নেতাদেরকেও তিনি হাড়ে হাড়ে চেনেন। সব ক্ষেত্রেই তাঁর এ সব বাক্যবাণ শুরু হতো খুব নিম্ন স্বরে, প্রায় বিড় বিড় করে, তারপর গলার স্বর উঁচু হতে হতে শেষ পর্যন্ত চিৎকারে পরিণত হতো। ওই ক্ষেত্রে আব্বা কাছে থাকলে শান্ত করতে সুবিধা হতো। আমরাও একই ভাবে চেষ্টা করতাম। অবস্থা বুঝে কখনো নিরাপদ দূরত্বে থেকে তা করতে হতো, অন্য সময় আমাদের প্রতি মা বেশ স্নেহশীলা থাকতেন, ওই হৈচৈ এর মধ্যেও আমরা কাছে বসেই তাঁর সঙ্গে মুখে মুখে কথা বলতাম।

আব্বা তাই চাইতেন। তিনি চাইতেন আমরা সব সময় মার কাছে যাই, কথা বলি, তাঁর দেখাশুনা করি। বক্সীর হাটে বাসায় এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা সহজে মায়ের বাক্যবাণে পড়তেন—তার মধ্যে ছিলেন মামা নুরুল আবসার আর চৌধুরী খালু যাঁরা দু'জনেই আমাদের দোকানে কাজ করতেন। যেহেতু কোন ভাবে তাঁদের কথা মনে করিয়ে দিলেই মায়ের সেই কল্পিত সব অভিযোগ উথলে উঠতো, তাই তাঁরা তো মা'র সামনে কখনো আসতেনইনা, তাঁর সামনে তাঁদের নাম উচ্চারণ করাটিও নিরাপদ ছিলনা। তাই তাঁদেরকে কোড নাম দেয়া হয়েছিল—মামার নাম দুই নম্বর এবং খালুর নাম চার নম্বর। এতে আমরা এমন অভ্যস্ত হয়ে গেলাম যে শুধু মায়ের সামনে নয়, আমরা ভাইবোনেরা নিজেদের মধ্যেই দুই নম্বর মামা, চার নম্বর খালু এমন ভাবেই বলতাম। দুই নম্বর কথাটির আরো একটি ব্যবহার ছিল আমাদের মধ্যে। ভাইয়েরা বড় হবার পর, এবং মামা আসার পর, ২০ বক্সীর হাট রোডের বাসায় জায়গা সঙ্কুলান হচ্ছিল না বলে একের পর এক নানা স্থানে এর একটি সম্প্রসারিত জায়গা সৃষ্টি করতে হয়েছে। প্রথমে সেটি করা হয়েছে আমাদের প্রায় সংলগ্ন ইদ্রিস মামাদের দোকানের পেছনে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে। পরে আমাদের বাসার পেছনেই একটি বর্ধিত ছোট দোতলা ঘর করা হয়েছে যার নিচের তলায় বাবুর্চি সমেত নতুন রান্না ঘর, উপরের তলায় একটি পার্টিশনের একদিকে বড় ভাই দু'জনের ঘর ও অন্য পাশে মামার থাকা ও

আমাদের পড়ার ব্যবস্থা হলো। এই নতুন জায়গাগুলোর অস্তিত্বও মায়ের কাছ থেকে গোপন রাখতে হতো। তাই এর যখন যেটি ছিল তখন সেটিকেই দুই নম্বর বলা হতো। কথা থেকেই বুঝে নিতে হতো দুই নম্বর মানুষের কথা বলছি না দুই নম্বর ঘরের কথা বলছি।

এই সব কিছুর মধ্যে আব্বা কিন্তু আব্বার এবং মায়ের দুই ভূমিকাই পালন করতে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। লেখাপড়ার বিষয়টি মাস্টারের উপর ছেড়ে দিলেও তাঁর কড়া নজর আমরা পড়াশোনা ঠিক মত করছি কিনা। ইউনূস ভাইয়ের স্কুলের বেশ কয়েকজন শিক্ষক আর আমার লামার বাজার স্কুলের দিলা মিয়া মাস্টারের সঙ্গে তাঁর সরাসরি যোগাযোগ। ওই দিকে আবার আমাদের ছোটদের সবার ঠিক সময় পড়তে বসা, খাওয়ার সময় সবাইকে নিয়ে বসে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে ঝগড়া এড়িয়ে ভাল ভাল জিনিসগুলো পাতে ভাগ করে দেয়া, এসব কাজও তাঁর। রাতে সঠিক সময়ে বাতি নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছি কিনা তা নিজে এসে চেক করে যেতেন; অথবা নিজের ঘর থেকেই উচ্চ স্বরে খবরদারি করতেন। সব চেয়ে মজার ব্যাপারটি করতেন আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগানোর সময়। সবাই এক সঙ্গে শুতাম বলে এক সঙ্গেই কাজটি সারতে পারতেন। প্রতিদিন নতুন নতুন প্রেরণা সৃষ্টি করতেন ঘুম থেকে উঠার উৎসাহ যোগাতে—কিন্তু সব সময় খড়মের তালে তালে শব্দ সৃষ্টি করে নাচানাচি করতেন আর দুই হাতে তালি বাজাতেন। যেদিন রাতে বৃষ্টি হতো সেদিন বলতেন দেখ দেখ পাছের রাস্তা (গলি দিয়ে সংযুক্ত আমাদের পরের অপেক্ষাকৃত নিচু রাস্তা) পানিতে ভেসে গেল, বন্যা হয়ে গেল। খাওয়ার লোভটিও দেখাতেন। জানতেন যে সকালে চিনি দেয়া রুটি কিংবা বেলা বিস্কুট ও চায়ের একঘেঁয়ে ব্রেকফাষ্টে আমাদের আগ্রহ কম। তাই কোনদিন মেন্যু বদলে কাছের সুইটমিট শপ থেকে হালুয়া-পুরি, অথবা শীতের দিনে চাটগাঁর বিশেষ রকম সিলিন্ডার আকৃতির ভাপা পিঠা যাকে চুঁয়া পিঠা বলা হতো, তা আনা হবে এমন লোভ দেখিয়ে দ্রুত বিছানা ছাড়তে উদ্বুদ্ধ করতেন। বন্যার কথাটি অতিরঞ্জিত হলেও খাওয়ার ব্যাপারটি তা হতোনা। যখন যে বাচ্চাটি একেবারে ছোট, কোলের বাচ্চা, তাকে নিয়ে আব্বা যা করতেন তা আজকের আধুনিক সন্তান পালনে শিক্ষিতা মায়েদেরকেও হার মানাতে পারে। তিনি সেই কয়েক মাসের বাচ্চার সঙ্গে সারাক্ষণ কথা বলতেন—তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে যেন তার সঙ্গে আলাপ করছেন। সেই সঙ্গে হাত তালি, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি দিয়ে শিশুর দৃষ্টিকে একেবারে তাঁর দিকে নিবদ্ধ করে রাখতেন। পর পর বিভিন্ন ভাইয়ের ক্ষেত্রে শুনতে শুনতে আব্বার এই বেবী টকগুলো আমাদের সবার মুখস্থ ছিল।

সব চেয়ে পরিশ্রমের কাজটি আব্বা করতেন আমাদেরকে গোসল করাতে গিয়ে। এ সময় বাসার ওপরের তলায় একটি ছোট্ট গোসলখানা তৈরি হয়েছে, সে গোসলখানায় রানিং পানির ব্যবস্থা হয়েছে। এই গোসলখানার প্রতি তাঁর একটি

আলাদা মোহ ছিল। তাই এর জানালাতে লাগিয়েছিলেন কারুকার্য করা রঙিন কাচ। আর মেঝেতে পানির কলের ঠিক নিচটাতে বর্গাকৃতির একটি বিশুদ্ধ মার্বেলের স্ল্যাব। এই মার্বেলকে আমরা বলতাম চঙ্গবঙ্গ পাথর—এ এক আশ্চর্য জিনিস মনে হতো। ওই গোসলখানাকে সব মিলে এক রঙমহল মনে হতো আমাদের শিশু চোখে। তবে আব্বা যেভাবে সাবান মাখানো তোয়ালে দিয়ে এক এক জনের সারা গা রগড়াতেন, এমনকি কানের ভেতরটা পর্যন্ত, তা অত্যন্ত ব্যথা সৃষ্টিকারী ছিল। কিন্তু তিনি এটি তাঁর প্রতি দিনের অবশ্য কর্তব্য মনে করতেন। গোসলখানা খুব ছোট হওয়ার কারণে এর দরজার বাইরে থেকে উঁচু প্রবেশ পথে হাঁটু বাঁকা করে হাঁটুর ওপর এক এক জনকে রেখে তিনি এই রগড়ানোর কাজটি করতেন। একজনের শেষ হলে আর এক জনের। ইতোমধ্যে আমরা বাকিরা লাইন দিয়ে অপেক্ষায় থাকতাম। আব্বা অবশ্য নানা কথা বলে ওসময় আমাদেরকে মোহিত রাখার চেষ্টা করতেন। এসব যখন তিনি করছেন—তখন তিনি একজন অত্যন্ত ব্যস্ত ব্যবসায়ী, সারাদিন দোকানে ব্যস্ত থাকতে হয়; ধর্মকর্মে অতি নিয়মিত ও নিবেদিত; চট্টগ্রাম জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে, এবং সমাজের গণ্যমান্যদের একজন হিসেবে, নানা সভা ও দাওয়াত ইত্যাদির প্রায়শ মধ্যমণি।

একই সঙ্গে বাবা ও মায়ের ভূমিকা পালন করে আব্বা মায়ের ভিন্নরূপটি বেশ হালকা করে দিয়েছিলেন আমাদের জন্য। অসুস্থ মায়ের বিসদৃশ সব আচরণকে আমরা দৈনন্দিন জীবনের অতি সাধারণ ব্যাপার করে নিতে পেরেছিলাম—এমন কি ভাইবোনদের নিয়মিত খেলাধূলা, হাসিকৌতুকেরও অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেদিন রাতে মার গলার স্বর আস্তে আস্তে চড়া হচ্ছে দেখতাম, ঘুমের আশা ত্যাগ করতে হবে মনে করতাম, তখনো ফিস ফিস করে একজন আরেকজনকে বলতাম আজ বোধ হয় তিন নম্বর বিপদ সংকেত। মায়ের পরাবাস্তব অনেক কথায় সায় দিয়ে আমরা ওই ভাবেই তাঁর সঙ্গে কথা বলতাম, এমনকি তর্কও করতাম। মা আমাদের কয়েক জনের নাম পরিবর্তন করে তাঁর নতুন পছন্দের অন্য নামে ডাকা শুরু করলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে কথা বলতে এই নতুন নাম ব্যবহার করতাম। এর ফলে টুনুর নাম উম্মে কুলসুমের বদলে মা ওকে করলেন বিলকিস বানু। আজমকে করলেন ফারুক আজম। সর্ব কনিষ্ঠ জাহাঙ্গীরকে তিনি ডাকতেন আবুল আব্বাস। একবার এই নতুন নাম দেয়ার পর তিনি কিন্তু সারা জীবন সেটিতে স্থির ছিলেন—আর বদলাননি, এবং কখনো ছোট ডাক নামে না ডেকে পূর্ণ নামেই ডেকেছেন। লক্ষ্যনীয় যে নবী-পয়গম্বরের নামে যে ক'জনের নাম ছিল সেই ইউনূস, ইব্রাহীম বা আইয়ুবের নাম কিন্তু তিনি বদলাননি।

আব্বার আর একটি কাজ সে সময় বহুদিন একটানা চলেছে—তা হলো মাকে সুস্থ করার জন্য সম্ভাব্য সকল পরামর্শ মত চেষ্টা করা। এ জন্য যে যা বলেছে সব রকম চিকিৎসাকে তিনি আমলে নিয়েছেন। কিন্তু কোনটি স্থায়ী কোন কাজ করেছে

বলে মনে হয়না। এগুলোর অনেকগুলো আমরা কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছি, অনেকগুলোতে অংশও নিতে হয়েছে।

চিকিৎসা-চেষ্টার কোন কোনটি আমাদের উপর বেশি দাগ কেটেছে তার অভিনবত্বের কারণে। ডাঃ এম ইউ আহমেদের নামটি মনস্তত্ত্ববিদ এবং বিশেষ করে সম্মোহন বিদ্যার পারদর্শী হিসেবে দেশে খুব পরিচিত ছিল। ওই সময় অবশ্য তিনি এতটা বিখ্যাত হয়ে উঠেননি। তবুও চিকিৎসা প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আব্বার কাছে তাঁর নাম পৌঁছে গিয়েছিল, এবং তিনি যথারীতি ডাঃ আহমেদের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। তাঁর থেকে পাওয়া গেল মাকে সম্মোহিত করে ভাল করে তোলার চেষ্টার পরামর্শ। এর নিয়ম হলো রুগীকে কিছু একটি করার জন্য বার বার 'সাজেশন' দিয়ে সম্মোহিত করা। ডাঃ আহমেদ নাকি দেখিয়েছেন যে কাউকে বার বার বিশেষ ভঙ্গিতে 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ছো, ঘুমিয়ে পড়ছো,' বললে সে ঘুমিয়ে পড়ে; 'তোমার হাত শক্ত হয়ে যাচ্ছে, শক্ত হয়ে যাচ্ছে,' বললে শেষ পর্যন্ত সে আর হাত নাড়াতে পারেনা—যতক্ষণ সম্মোহিত থাকে ততক্ষণ। বলা বাহুল্য মায়ের ওপর এটি কাজ করেনি, ওই অবস্থায় তাঁকে সম্মোহিত করে কার বুকের পাটা!

আমরা শিশুরা কিন্তু ডাক্তারের দেখাদেখি একে অপরকে সম্মোহিত করার চেষ্টাও কম করিনি—মজা করে। কখনো এটি কাজ করেছে বলে মনে পড়েনা—যদিও মজার খেলা হিসেবে ব্যাপারটি মন্দ ছিলনা। কেন জানি আমার কখনোই মনে হয়নি এটি কাজ করবে। এসব ব্যাপারে তখন থেকেই আমার এক রকম সন্দিহান মন থাকতো, পরে একটু বড় হয়ে একদিন এক সভার মধ্যে এম ইউ আহমদকে সত্যি সত্যি কয়েক জনকে সম্মোহিত করতে দেখেছিলাম। 'তুমি ঘুমিয়ে পড়ছো ঘুমিয়ে পড়ছো' বলতে বলতে তিনি কয়েক জনকে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছেন দেখেছি। পরে তাদের ঘুম ভাঙ্গাতে কষ্ট হয়েছে। তবে কতগুলো ব্যাপার যে আদতেই অবৈজ্ঞানিক তা যদ্দূর মনে পড়ে তখন থেকেই কেমন করে জানি সন্দেহ করতাম। তাই সাহেব মিয়া দাদু যখন বলছিলেন যে বাড়ির মহিলারা পানির মধ্যে চুল ডুবিয়ে রাখলে ঠিক সে সময় বাড়ির ছেলেটির মুসলমানিতে ঝুঁকি কম থাকবে বা কষ্ট কম হবে—তাতে আমার মোটেই আস্থা আসেনি; ওই ছেলের চিৎকার শুনে কিনা জানিনা।

ক্লাস টু-তে পড়ার সময় একদিন স্কুল থেকে ফিরেছি, দেখলাম বাড়ি শুদ্ধ লোক আমার জন্য অপেক্ষা করছে। আসা মাত্রই কলরব করে উঠলো—'এই যে সে এসে গেছে'। অপেক্ষমানদের কেন্দ্রবিন্দুতে আছেন মাঝ বয়সী একজন যোগী। তাঁকেও আনা হয়েছে মায়ের চিকিৎসার আর একটি চেষ্টা হিসেবে। আমার জন্য অপেক্ষার কারণ হলো ঠিক বয়সের একটি শিশুর মাধ্যমেই এটি করতে হবে। বাড়িতে টুনু আছে, কিন্তু সে মেয়ে বলে চলবেনা। ছোট ভাইরা আছে, তবে ওরা বেশি ছোট, অন্যরা বেশি বড়—আমিই শুধু ঠিক বয়সের। আমাকে একটি

পিড়ির ওপর বসিয়ে সব বুঝিয়ে দেয়া হলো—মা সিদ্ধাকে মন দিয়ে ডাকতে হবে, তা হলে আমার নখের মধ্যে মা সিদ্ধাকে দেখা যাবে এবং তিনি আমার কথায় কী ভাবে সাড়া দিচ্ছেন তা দেখে চিকিৎসা এগোবে। আমার হাতের দুটি বুড়ো আঙ্গুলের নখে একটি বার্নিশের মত কিছু লাগিয়ে দেয়া হলো যাতে তা আয়নার মত চকচক করে। কী বলতে হবে শিখিয়ে দেয়া হলো—'মা সিদ্ধা তুমি যদি সদয় হয়ে থাকো তা হলে আমাকে দেখা দাও, আমার মাকে সুস্থ হতে সাহায্য কর...'। বার বার বলা সত্ত্বেও মা সিদ্ধা দেখা দিলেন না। যোগী কিন্তু দাবি করতে লাগলেন আমি দেখছি ঠিকই, মনোযোগ দিচ্ছিনা। আমার নিজের বা আশপাশের মানুষের আবছা ছোট প্রতিচ্ছবি বা তার নড়াচড়া নখের উপর উঁকি ঝুঁকি দিচ্ছে বটে কিন্তু আমি তা প্রতিচ্ছবি হিসেবে চিনছিলাম, মা সিদ্ধা হিসেবে নয়। অনেক চেষ্টা করে যোগী হাল ছেড়ে দিয়ে বললেন এই ছেলেকে দিয়ে চলবেনা।

বড় ভাইদের কাজে সহযোগী সদস্য

২০ বক্সীর হাটের অল্প বয়সীরা বেশির ভাগ সময় ব্যস্ত থাকতো নানা সৃষ্টিশীল কাজ নিয়ে দুর্দান্ত সব এক্সপেরিমেন্টে। এর প্রধান হোতা আমার বড় দুই ভাই—সালাম ভাই আর ইউনূস ভাই। এসব আমার স্কুলে ভর্তি হবার বেশ আগে থেকেই ঘটে আসছিলো। ধীরে ধীরে অধিকাংশ কাজে আমাকেও একটি প্রান্তিক ভূমিকা দেয়া হতে লাগলো—কিছুটা আমার উৎসাহ ও কৌতূহলের কারণে, অন্তত মনোযোগী দর্শক-শ্রোতা হিসেবে; এবং কিছুটা বড় ভাইয়েরা আমাকে তাঁদের কাজে সহযোগী করতে আগ্রহী ছিলেন বলেও। বিশেষ করে তাঁর সব কাজে আমি ইউনুস ভাইয়ের ছায়াসঙ্গী ছিলাম। এতে আমার কিছু নগদ লাভও অবশ্য ছিল। যেমন ইউনূস ভাইয়ের তখন পকেট-মানি প্রাপ্য হয়েছে, খরচ করার মত অল্প কিছু পয়সা থাকতোই, এবং তা প্রধানত ব্যয় হতো ছমদিয়া রেস্টুরেন্টে ছানামুখী খেতে অথবা আমানিয়া রেস্টুরেন্টে চপ চা খেতে। ছায়াসঙ্গী হবার সুবাদে ওখানে যাওয়ার পথে বেড়ানোর ও আমার জন্যও খাবার অর্ডার হবার অপরিসীম সুখ আমি প্রায় নিয়মিতই লাভ করতাম। ছমদিয়া রেস্টুরেন্টটি বাসার অপেক্ষাকৃত কাছে বদরপাতিতে, বদর শাহের মাজারের লাগোয়া। এখানে ছানামুখী খাওয়া ছাড়াও আমার আরেকটি বড় আকর্ষণ ছিল প্রায় আলমারির সাইজের বিশাল রেডিওটির—যার থেকে আওয়াজটিও আসতো খুব দরাজ গলার। রেডিয়োটির শব্দ বের হতো যে লাউড স্পীকার দিয়ে তার মুখে লাগানো রেশমী সুন্দর আবরণটি আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপতো। মনে রাখতে হবে সে সময় ভাল্ব ভিত্তিক রেডিও সবই বেশ বড়সড় হতো, তার ভেতর ওই ভাল্বগুলো থেকে আলো জ্বলতেও দেখা যেত। অন্যদিকে আমানিয়া রেস্টুরেন্টটি ছিল লালদিঘির পাড়ে, চট্টগ্রামের খুবই কেন্দ্রীয় জায়গায়, এবং বেশ কেতাদুরস্তও বটে। সেখানে বিশেষ ভাবে পুলকিত হতাম আলুর চপ (সঙ্গে কাঁচা পেঁয়াজ ইত্যাদি) এবং চা পরিবেশন

রীতি, ম্যানেজারের ঘন্টা বাজানো, এবং টেবিলে দুটি সুন্দর কাচের শিশি থেকে ইচ্ছেমত সিরকা আর গোল মরিচের গুঁড়া যোগ করার সুযোগ।

কিন্তু সে তো গেল নগদ প্রাপ্তির কথা; উভয় বড় ভাইয়ের বিভিন্ন রকম সখ ও প্রজেক্টের কোন রকম অংশ হতে পারাটাই ছিল অতি আনন্দের ব্যাপার। যেমন ফটোগ্রাফি ছিল তাঁদের ধ্যান, জ্ঞান ও নেশা। তাঁদের প্রথম বক্স ক্যামেরাটির পেছনে পেছনে আমিও কম ঘুরিনি। একটি ভাল সাবজেক্ট পেতে, একটি ভাল শট নেবার জন্য তাঁরা করতেন না এমন কোন কাজ নেই। কিছুদিনের মধ্যে বুঝলাম তাঁরা নেহাত ফটো তুলতে চাননা, ফটো শিল্পী হতে চান। বক্স ক্যামেরা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে তাঁদের প্রথম ফোল্ডিং ক্যামেরা নিয়ে যখন এর মাহাত্ম্য উচ্ছ্বসিত ভাবে সবাইকে বোঝাচ্ছেন সেই সুবাদে আমারও এই ব্যাপারে জ্ঞানের ভাণ্ডার বৃদ্ধি পাচ্ছিল। এটি অবশ্য ঠিক এ সময় তাঁদের সব কাজ আমি কথা হিসেবেই আয়ত্ত করেছি বেশি, হাতে কলমে দেখাতে পেরেছি খুব অল্প। তবে তাঁদের ফটোগ্রাফিতে 'মডেল' হিসেবে কাজ করে এসেছি একেবারে শিশু বয়স থেকে। অবশ্য এই মডেলের আদিতম রূপ যে ফটোতে তাঁরা সৃষ্টি করেছিলেন তা পরে আমার ও আইয়ুবের জন্য বিব্রতকর হয়েছিল। খুব সম্ভব পাঁচ বছরের আমার গায়ে সূচাগ্র কাপড়ও না রেখে আপাদমস্তক ক্লোজ আপ নেয়া হয়েছিল। আর আইয়ুবের ফটোতে পাজামার এক পা ওপরে গোটানো, অন্য পা সম্পূর্ণ, এক হাতের শার্টের আস্তিন গোটানো, অন্য হাত সম্পূর্ণ, একটি টুপি কাত করে পরানো। হয়তো তাঁরা প্রথমটির নাম দিতে চেয়েছিলেন 'দি ন্যুড' এবং দ্বিতীয়টির নাম দিতে চেয়েছিলেন 'দি ভ্যাগাবন্ড'। তাঁরা বাসার কাছে 'মায়াপুরী ষ্টুডিও' নামের একটি ষ্টুডিওর মালিকের সঙ্গে খাতির জমিয়েছিলেন, যার কারণে সেই ষ্টুডিওর ডার্ক রুমে নিজেদের ছবি নিজেরা ডেভেলপ করার, প্রিন্ট করা সুযোগ পেয়েছিলেন—তাঁদের জন্য এক্সপেরিমেন্টের জায়গা হলেও অন্ধকার ঘরে আবছা লাল আলোতে ছবি ফুটে ওঠার সেই ডার্করুমটি আমার জন্য ছিল মায়াপুরীই বটে। মনে রাখতে হবে সে যুগে আমাদের দেশে ফটো মানে সাদা কালো ছবি। কখনো কখনো রঙিন ছবির স্বাদ মেটাবার জন্য ছবিতে রঙ লাগানো হতো—সে কাজটাও ছিল রীতিমত একটি শিল্প। মায়াপুরীর ফটোগ্রাফারদের কাছে ইউনূস ভাই এটি শিখতেন। অবশ্য আঁকাটি তাঁর ইতোমধ্যে আরো ব্যাপক অর্থেই নেশা। তাঁর বন্ধু ফয়েজ সহ তিনি এখন ওস্তাদ আহমদ হোসেনের কাছে তালিম নিচ্ছেন। বাসায় ইজেল-ক্যানভাস ইত্যাদিও এসে গেছে। তবে এসব বাসায় করতে হতো গোপনীয়তার মধ্যে, আব্বার চোখ এড়িয়ে। আব্বা এমনিতেই ভাইদের পড়াশোনায় পূর্ণ মনোযোগ না দিয়ে এত রকমের কাজে সময় দেয়া পছন্দ করতেন না, যদিও তা সহ্য করতেন, প্রকারান্তে অর্থও যোগাতেন। কিন্তু ছবি আঁকা, বিশেষ করে মানুষের ছবি আঁকা তিনি গুনাহর কাজ মনে করতেন, তাই ওটা গোপনে করতে হতো। এখানেই আমি বেশি কাজে আসতাম। যথেষ্ট আগে আব্বার আসার ওয়ার্নিং পৌঁছে দিতাম, যাতে

ইজেল ইত্যাদি গুটিয়ে ক্যানভাস লুকিয়ে ফেলতে পারতেন। নিজের একটি পোট্রেট ফটো থেকে বড় একটি তৈলচিত্র আঁকতে তাঁর যে কতদিন লেগেছিল, আর এর মধ্যে কত বার যে আমাকে সতর্ক করার কাজ করতে হয়েছে সে কথা খুব মনে পড়ে। ইউনূস ভাইয়ের এই সখ পরে নানা দিকে বিবর্তিত হয়েছে—যেমন পোস্টার করা, লেটারিং করা, প্রচছদ করা ইত্যাদি। আমিও এর কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনুগামী হবার চেষ্টা করেছি।

তবে ওই শিশু বয়সেই আমাকে বিশেষ ভাবে উপকৃত করেছে বড় দুই ভাইয়ের স্ট্যাম্প জমাবার সখ। সেই বয়সেই বিশাল সংগ্রহ গড়ে তুলছিলেন তাঁরা, যা খুব সুন্দর করে অ্যালবাম বানিয়ে তাতে যত্ন সহকারে লাগিয়ে রাখতেন। স্ট্যাম্প বিনিময়, সংগ্রহ, কেনা ইত্যাদির সুবাদে একই সখের অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগও গড়ে উঠেছিল তাঁদের, কিছু সরাসরি, কিছু চিঠিপত্রের মাধ্যমে। সব চেয়ে সাহসী পদক্ষেপটি ছিল কাচে ঢাকা দুটি পাতলা শো-কেইস বানিয়ে তাতে বিক্রির জন্য এমন সব স্ট্যাম্প প্রদর্শন করতেন যা তাঁদের একাধিক ছিল, এবং ক্রেতাদের মধ্যে যার চাহিদা ছিল। শো-কেইস দুটি তাঁরা আমাদের পাশের দোকান গোপাল কাকার দোকানের সামনে প্রতিদিন মেলে রাখতেন। গোপাল কাকা খুব সহযোগিতা করতেন, বিক্রি হলে টাকাটা নিয়ে পরে দিয়ে দিতেন। স্ট্যাম্পের এই ব্যবসা প্রচেষ্টা খুব বেশি না এগোলেও কিছুটা যে সফল হয়েছিল তা মনে পড়ে। তাঁদের সংগ্রহের প্রায় সব স্ট্যাম্প আমার দেখা ছিল। এতে আমার প্রচুর আগ্রহ ছিল তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতাম কোনটি কোন দেশ, কোথায় সেটি, ছবির মানুষটি কে ইত্যাদি। আমার ভূগোল জ্ঞান এভাবে শুরু হয়েছিল স্কুলে ভূগোল পড়ার বহু আগে। কোন কোন দেশ এতে দেখতাম যাদের স্ট্যাম্প ছিল, কিন্তু দেশ সেভাবে আর ছিলনা, যেমন আমাদের নিজেদের দেশ বৃটিশ ভারতের। শুধু দেশের নাম বা পরিচয় জানা হতোনা, ছবির বিষয়গুলোও দাগ কাটতো। যেমন ইরাকের রাজা ফয়সালের ছবি দেখে ভাবতাম এই বাচ্চা ছেলেটি আবার রাজা হলো কী করে। ইংল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জর্জের ছবি ছিল অনেক দেশের ষ্ট্যাম্পের উপর যেমন মালয়, কেনিয়া, নাইজেরিয়া, বাহামা, জ্যামেইকা, এমনকি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া; তেমনি বেলজিয়ামের রাজার ছবি সহ কঙ্গো, রুয়ান্ডা-বুরুন্ডি। ইংরেজি অক্ষরে লেখা নানা নাম—মানুষের, দেশের, ঘটনার—নিজ আগ্রহে পড়ার সক্ষমতাও এই স্ট্যাম্প থেকেই আমার শুরু হয়েছে।

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে আগ্রহ ও জানার সুযোগ ওই ছোট বয়সেই আমার হয়েছিল স্ট্যাম্প ছাড়া আর একটি উৎস থেকে—তা হলো বাসায় রাখা *আজাদ* পত্রিকা থেকে। সব যে বুঝতাম তা নয়, কিন্তু যা বুঝতাম তাতেই এর প্রতি এত আগ্রহ জন্মেছিল যে পত্রিকা পেয়েই ওইগুলোই পড়তাম, এমনকি এর ওপর লেখা সম্পাদকীয়ও। মুসলিম বিশ্বের ঘটনাগুলোই বেশি দাগ কেটেছিল সে সময়ে। দিনের পর দিন পত্রিকায় ছিল এমন বেশ কিছু খবর; আমি রীতিমত

আগ্রহ নিয়ে অনুসরণ করতাম। এর মধ্যে ছিল ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেকের ক্ষমতা পেয়ে (১৯৫১) শাহের ক্ষমতা খর্ব করার চেষ্টা, তেল জাতীয়করণ, এবং পরে একটি অভ্যুত্থানে শাহের আবার তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা (১৯৫৩)। শেষের ঘটনায় আমেরিকার সিআইএর স্পষ্ট হাত ছিল বলে তখনই লেখা হয়েছে।

মিশরে রাজা ফারুকের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানে 'ফ্রি অফিসারদের' ক্ষমতা গ্রহণ (২৩ জুলাই, ১৯৫২), ১৯৫৪ থেকে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আলজেরিয়ার এফএলএন মুজাহিদদের সংগ্রাম, ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার (১৯৪৮) পর আরবদের সংগ্রাম এগুলোও পত্রিকা জুড়ে থাকতো। মোসাদ্দেক ও ইরানের শাহের ব্যাপারটি মনে একটু বেশি দাগ কেটেছিল, এর একটি কারণ সালাম ভাই ভারতীয় কোন একটি ইংরেজি পত্রিকায় কমিক কার্টুনরূপী ছবি দেখিয়ে আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন কী ভাবে শুরুতে মোসাদ্দেক শাহকে তাড়িয়ে গণতন্ত্র আনার চেষ্টা করেছিলেন, পরে শাহই মোসাদ্দেককে তাড়িয়েছেন। আরো একটি কারণ হলো স্কুলে ভর্তি হবারও আগের আমার একটি স্মরণীয় ঘটনা ছিল ইউনূস ভাইয়ের স্কুলের দলের সঙ্গে ইরানের শাহকে দেখতে যাওয়া (১৯৫০)। শাহ তখন পাকিস্তান সফরে এসে চট্টগ্রামেও এসেছিলেন, এবং পুরাতন বিখ্যাত চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসের চূড়ায় যে টাওয়ার আকৃতির জায়গাটি আছে (এখনো আছে) সেখানে দাঁড়িয়ে সম্মিলিত জনতাকে দর্শন দিয়েছিলেন। মনে পড়ে স্কুল ছাত্রদের সঙ্গে আমিও কাঠিতে লাগানো সুন্দর একটি ইরানের পতাকা পেয়েছিলাম যাতে মাঝখানে একটি সিংহ আঁকা ছিল এবং তাতে জরি লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। অনেকখানি পথ আমরা 'ইরানের শাহ-ইন-শাহ জিন্দাবাদ' ধ্বনি তোলে সার্কিট হাউজের সামনে মাঠে এসেছিলাম। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেখানে রোদে বসে থাকতে হয়েছিল; কিছুক্ষণ পর পর রব উঠেছে ওই ওই এসেছেন, আমরাও আবার শ্লোগান তুলেছি। এর মধ্যে কোন্ বার যে তিনি সত্যি সত্যি এসেছেন, গেছেন, এতদূর থেকে ভাল করে টের পাইনি। তিনি সেখানে কোন বক্তৃতা দেননি।

নিজে *আজাদ* পত্রিকা পড়ে ওসব খবর নিয়ে যা জেনেছি তা আরো বিস্তৃত হয়েছে সালাম ভাই, ইউনূস ভাই, মান্নান মাস্টার এঁদের মধ্যে আলাপের কারণে। দুই ভাই নিয়মিত ডাঃ রসিক লাল বণিকের চেম্বারে গিয়ে কলকাতা থেকে আসা যুগান্তর, স্টেট্‌সম্যান এবং ইলাস্ট্রেটেড উইকলি পড়তেন। আমাদের দোকানের দুই দোকান পর ছিল মোড়ে রাস্তা ঘেঁষে ডাঃ বণিকের ছোট চেম্বার। তিনি ছিলেন এল এম এফ ডাক্তার, (মেডিক্যাল কলেজ নয়, মেডিক্যাল স্কুল থেকে পাশ করা), কিন্তু অত্যন্ত ভাল চিকিৎসক, অতি আকর্ষণীয় মার্জিত ব্যক্তিত্ব এবং শিশুদের বন্ধু। আমার শৈশব কৈশোরের পুরোটা কাল তিনি আমাদের সবার পারিবারিক চিকিৎসকই শুধু ছিলেন না, একজন স্নেহশীল অভিভাবকও ছিলেন। ডাক্তার বাবুর মতই চমৎকার মানুষ ছিলেন তাঁর তরুণ কম্পাউন্ডার রঞ্জন। ব্যান্ডেজ করা, ইনজেকশন দেয়া, ফোঁড়া কাটা, সেলাই, মিক্সচার তৈরি ইত্যাদি প্রিয়-অপ্রিয়

কাজগুলো রঞ্জনই করতেন, কিন্তু এমন ভাবে করতেন যে খুবই সান্ত্বনা ও আস্থা অনুভব করতাম ওই শিশু বয়সেও। ডাঃ বণিকের কথা মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে চোখে ভাসে তাঁর চেম্বার লাগানো টিনের ওপর আঁকা সুন্দর একটি ছবি। এটি ওভালটিনের বিজ্ঞাপনের ছবি, যাতে কোন অলিম্পিকে অবস্ট্যাকল রেইসের একটি দৃশ্য আছে। সুঠামদেহী সাদা, কালো, হলুদ নানা কিসিমের তরুণরা বীরদর্পে দৌড়ে লাফ দিয়ে একটি বাধা অতিক্রম করছে তার দৃশ্য। নিচে নানা দেশের পতাকা। সুদূর শৈশবে এই ছবি বার বার দেখেছি আর সেখান থেকেই বোধ হয় প্রথম চাক্ষুষ ধারণা পেয়েছি দেশে দেশে মানুষের বৈচিত্র্যের।

বড়দের আসরে সহযোগী সদস্যের ভূমিকা আমার দিন দিন আরো পোক্ত হয়েছে। লামার বাজার স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে যখন পড়ি ততদিন তাঁদের অনেক প্রজেক্টে আমি ভাল ভাবেই জড়িত হয়ে পড়েছি। এর অনেকটাই ঘটতো সেই দুই নম্বরে (বাড়ির দুই নম্বর, মানুষের নয়)। দুই নম্বর ছিল আমাদের জন্য রূপকথার কাল্পনিক শাংরি লা'র মত। কোন নির্দিষ্ট জায়গা নয়—জায়গা মাঝে মাঝে বদলেছে, কিন্তু আনন্দ ও মজার মজার কাজের জায়গা—শাংরি লা' যেমন হিমালয়ের কোন অনির্দিষ্ট স্থানে স্বর্গীয় আনন্দময় স্থান। সেই ফটোগ্রাফি, ছবি আঁকা, স্ট্যাম্প জমানোর প্রথম সময়ে ওগুলো ছিল দোকানের পেছনের অসংগঠিত কিছু জায়গায়। আমার তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ার কাল থেকে এটি এক দোকান পরে ইদ্রিস মামাদের পেছনে আলাদা ঘরে স্থানান্তরিত হয়েছে। সালাম ভাই ও ইউনূস ভাই এর স্থায়ী বাসিন্দা, আমি বরাবরের মত পার্ট টাইম। ঘরটির পেছনে একটি বেশ বড় খালি জায়গা ছিল জংলার মত। ভাইদের মাথায় চাপলো এখানে ফুলের বাগান করতে হবে। গ্রামে প্রাকৃতিক ফুল পাতা অনেক দেখেছি, কিন্তু যত্ন করে ফুল বাগান গড়তে কখনো দেখিনি; একেবারে পরিকল্পিত বাগান। এতে প্রধান পরামর্শকের ভূমিকা নিলেন ইউনূস ভাইয়ের বন্ধু মোহাম্মদ হোসেন ভাই, যিনি তখন কদম মোবারক এতিমখানার ছাত্র ও বাসিন্দা, পরে পাকিস্তান নৌবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন। এতিমখানায় তাঁদেরকে বাগানে কাজ করতে হতো, তাই বাগান পরিকল্পনা ও রচনায় তিনি ছিলেন পাকা। শুধু পরামর্শ দিয়েই নয়, অধিকাংশ চারা দিয়েও তিনি সহায়তা দিয়েছিলেন। এখানেই আমার ঘটেছিল নানা রকম ফুল ও ফুল গাছের সঙ্গে পরিচয়, এবং এসবে মুগ্ধ হবার শুরু।

আসলে উদ্ভিদের সঙ্গে মিতালী আমার শিশু মনের জন্য আরো পুরোনো ব্যাপার। মায়ের সঙ্গে যখন ২০ বক্সীর হাটের ছাদে অনেক্ষণ কাটাতাম তখন আমার একটি কাজ ছিল ওখানে মাটি ভর্তি কাঠের প্যাকিং বাক্সের আর মাটি ভর্তি বোমার খোলের টবগুলোতে টম্যাটো গাছে পানি দেয়া, আরো চারা নতুন লাগানো। প্রতিদিন দুপুরে বা সন্ধ্যার দিকে ছাদে গেলে দেখতাম ছোট টম্যাটো চারাগুলো কেমন নিস্তেজ হয়ে নেতিয়ে পড়েছে। মনটা খুব খারাপ হয়ে যেতো, যেগুলো বেশি শুকিয়ে বেশি নেতিয়ে ঝুলে পড়তো তাদের জন্য আশঙ্কিত হতাম।

ভোরে ছাদে গেলে দেখতাম নেতিয়ে পড়া অধিকাংশ চারাই কেমন টগবগে হয়ে পুষ্ট ও খাড়া হয়ে গেছে রাতের শিশির ধারণ করে। মনটি এতো ভাল হতো যে—শুধু এই দৃশ্য দেখার জন্যই ওইসময় ছাদে যেতাম। চারা একটু বড় হলে তাতে ছোট ছোট টম্যাটো যখন আসতো কী যে ভাল লাগতো!

এবার দুই নম্বরের বাগানের ব্যাপারটি কিন্তু অতটা শিশু সুলভ নয়, অনেকটাই প্রফেশনালের মত। দাগ কেটে পরিকল্পনা করে রচিত বাগান। নানা মৌসুমের নানা ফুল স্থান গেয়েছে সে পরিকল্পনায়। বাঁশের কঞ্চি গেঁথে আর্চের মত বাঁকানো একটি গেইটের কাঠামো তৈরি করে তাতে লাগানো হয়েছে লতানো গেইট ফুল, অপরাজিতা ইত্যাদি। তারপর কিছু স্থায়ী ফুল গোলাপ ইত্যাদি, আবার গ্রীষ্মের গেঁদা ফুল, বর্ষার নানা রকম কলাবতী, শীতের জিনিয়া ডালিয়া ইত্যাদি। রাতের সুবাস ছড়ানো গন্ধরাজ, হাসনাহেনা ইত্যাদিও যত্ন করে লাগানো হয়েছে তার শুভ্র সৌন্দর্যের জন্য। এ সবের নতুন-পুরাতন বিশেষজ্ঞদের পেছনে নানা ফাই ফরমাশ খেটে খেটে আমিও বেশ পরিচিত হয়ে পড়লাম ফুলের সঙ্গে। ফুলের রাজ্যে বাস্তব বিচরণে এখন পর্যন্ত আমার বড় পুঁজি ওই অভিজ্ঞতা, এবং ফুলের প্রতি ভালবাসার উৎসও সেখানেই।

বাগানের সামনে সেই দুই নম্বরে আরো সব দুর্দান্ত ঘটনা ঘটছিল যা আমার শিশু মনে দীর্ঘদিনের জন্য রেখাপাত করে আছে। তার একটি হলো 'চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন' নাটকটির মহড়া দেয়া। এর আগে বাথুয়া গ্রামে 'কারবালার পরে' নাটকের প্রচুর মহড়া হয়ে মঞ্চস্থ হবার দিনই কেমন নাটকীয় ভাবে ভেস্তে গিয়েছিল তা বলেছি। তখন নাটকের বিষয়ের সঙ্গে তেমন একাত্ম হতে পারিনি অতি অল্প বয়সের কারণে। কিন্তু এবার তা পেরেছি, এক একটি চরিত্র বেশ দাগ কেটেছে। এই নাটকটির মহড়া কোন অজ্ঞাত কারণে মঞ্চস্থ হবার বহু আগেই থেমে গিয়েছিল; হয়তো মঞ্চস্থ করার পরিকল্পনাটি তেমন পাকাপাকি ছিলনা, মহড়া দিয়েই আনন্দ পেয়েছে সবাই।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন নাটকের বইটি চটি বই, ছোটদের উপযোগী করেই লেখা—এটি আমি পড়েছি, তাই মহড়ার দৃশ্যগুলোর প্রতি বেশ একাত্ম হতে পেরেছি। প্রথম দৃশ্যে মাস্টারদা সূর্যসেন ভারতের একটি মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে মাতৃভূমির স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার শপথ নিচ্ছেন। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বিভিন্ন পর্বে আমরা দেখি লোকনাথ বল, অনন্ত সিংহ, নির্মল সেন প্রমুখ কিংবদন্তিখ্যাত বিপ্লবীদের। লোকনাথ বলের ভাই কিশোর ট্যাগরাকেও নাটকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে রাখা হয়েছে। অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর শহর ছেড়ে বিপ্লবীরা যখন জালালাবাদের পাহাড়ে (বর্তমানে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে) বৃটিশ মিলিটারির সঙ্গে সম্মুখ সমর করেছে তখন ট্যাগরা গুলিতে নিহত হয়। এই চরিত্রটিতে নিজেও মহড়া দেবার আমার মনে মনে একটু একটু লোভ ছিল, কিন্তু বয়স অনেক কম বলে সে প্রশ্ন ওঠেনি। কোন কোন দৃশ্যে আমি খুব মজা

পেয়েছি। যেমন পুলিশ-অস্ত্রাগারের সেন্ট্রি যখন সামরিক উর্দি পরা লোকনাথ বল ও সঙ্গীদেরকে চ্যালেঞ্জ করে হাঁক দিলো 'হুকুমদার' (হু কামস দেয়ার), আর লোকনাথ বল স্বাভাবিক ভাবে বললেন 'ফ্রেন্ড', তারপর সোজা ঢুকে পড়লেন অস্ত্রাগারে। অস্ত্রাগার দখলের পর এর লোহার তৈরি ভল্ট খোলা হয়েছিল গাড়ির সঙ্গে ভল্টের দরজা চেইন দিয়ে সংযুক্ত করে গাড়ির স্ট্যার্ট দিয়ে টেনে। দৃশ্যে সেটি কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে সে নিয়ে নানা রকম মত ছিল মহড়ায়। কেউ বলেছেন বাইরে থেকে গাড়ি স্টার্টের শব্দ শোনা যাবে আর ভল্টের দরজা খুলে আসবে। কেউ বলেছেন গাড়ির আদলে কিছু থাকবে, তাতে হ্যান্ডেল ঘুরিয়ে ষ্টার্ট দিতে দেখা যাবে ইত্যাদি। এই নাটকটি মঞ্চস্থ না হলেও আমার জন্য সেটি এক বিরাট অভিজ্ঞতা। মাস্টারদা সূর্য সেন ও অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ছিল সেদিন দেশপ্রেমিক অ্যাডভ্যাঞ্চারের একটি অপূর্ব রোমাঞ্চ। এর কিছু দিন পর পত্রিকায় যখন দেখলাম যে ডাকাতির অভিযোগে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের একজন হিরো অনন্ত সিংহ কলকাতায় গ্রেপ্তার হয়েছেন তখন আমি মর্মাহত হয়েছিলাম। আমার মন বলছিল এটি নিশ্চয়ই নেহাত সাধারণ ডাকাতি নয়, অন্য কিছু।

ওই দুই নম্বরে আরো একটি উদ্যোগের কথা মনে পড়ে যার মাধ্যমে দর্শক-শ্রোতা হিসেবে আমি এমন কিছু কাজের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম যা বড় হয়ে বহু দিন পর আমাকে যথেষ্ট করতে হয়েছে, এখনো হচ্ছে। বড়দা, চাচা সোবহান (পরে ছাত্রনেতা এবং চট্টগ্রামের সুপরিচিত আইনজীবী), ইউনূস ভাই এবং তাঁদের কয়েকজন বন্ধু মিলে একটি উন্নয়ন সমিতি গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন—নাম দিয়েছিলেন 'মহফিলে নও' (নবীন সংঘ)। শেষ পর্যন্ত এই সংঘটি সফল ভাবে কাজ শুরু করেছিলো কিনা, তা জানতে পারিনি। কিন্তু কয়েক মাস ধরে কয়েকটি সভা হয়েছিল যার অধিকাংশে আমি কৌতূহলী শ্রোতা হিসেবে উপস্থিত ছিলাম। মূল উদ্যোগ বড়দার ও চাচা সোবহানের—তাঁরা দুজনেই সে সময় নিউ সিষ্টেম মাদ্রাসা ও পরে মূল ধারার শিক্ষায় এসেছিলেন বলে মহফিলে নও-তে তাঁদের মাদ্রাসার বন্ধুদের সংখ্যা বেশি ছিল। যদ্দূর মনে পড়ে বড়দার দারুল উলুম মাদ্রাসার একজন বেশ বাগ্মী সিনিয়র বন্ধু এর সভাপতি এবং সোবহান চাচা এর সম্পাদক হয়েছিলেন। আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল কী ভাবে আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় একটি সংগঠন গড়ে ওঠে এবং তার সভা পরিচালিত হয় তা দেখতে পাওয়া। সবকিছু খুবই নিয়মের মধ্যে আনুষ্ঠানিক ভাবে হতো, যেমন কথা বলতে সভাপতির অনুমতি নেয়া হতো। প্রথম সভাগুলোর কাজ ছিল মহফিলে নও এর জন্য গঠনতন্ত্র তৈরি। নাম থেকে শুরু করে সবকিছুর ওপর যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছে, পরে সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। প্রত্যেক সভা শুরু হবার আগে 'কোরামের' জন্য অপেক্ষা করা হতো—শব্দটির সঙ্গে এই সুবাদে সেই শিশু বয়সেই পরিচিত হই। নাম, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, কর্মপরিধি, সদস্য হবার নিয়ম, নির্বাহী পরিষদ নির্বাচন, সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য; সভাপতি, সম্পাদক,

কোষাধ্যক্ষ, নির্বাহী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, সভা পরিচালনা, আর্থিক উৎস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে একের পর এক বিতর্ক হয়েছে; অন্যান্য সমিতির উদাহরণ টানা হয়েছে; অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়েছে; সভার কার্যবিবরণী লেখা হয়েছে। সভা মুলতবী করে তারিখ দেয়া হয়েছে পরবর্তী সভার। ওই কার্যবিবরণী অনুমোদনের মাধ্যমে যথারীতি পরবর্তী সভা শুরু হয়েছে। কয়েকটি সভার মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত মহফিলে নওয়ের গঠনতন্ত্র রচিত হয়েছিল সে কথা অবধি মনে আছে। কিছু কিছু অ্যাকশন প্ল্যানও নেয়া হয়েছিল। এর রাবার স্ট্যাম্প এর ডিজাইন করে, সেটি তৈরি করে তা যে ব্যবহার করা হতো—সেই ব্যাপারটি বিশেষ ভাবে মনে আছে। এর কারণ এর পর থেকে আমাকে রাবার স্ট্যাম্প বাতিকে পেয়েছিল। ব্লেড দিয়ে রাবার কেটে কেটে আমি নিজের জন্য নানা রাবার স্ট্যাম্প বানাবার চেষ্টা করেছি বেশ কিছু দিন ধরে।

দুই নম্বরের নতুন নতুন ঘটনাবলীর সঙ্গে প্রবল কৌতূহল নিয়ে লেগে থাকলেও অবশ্য এক নম্বরের সনাতন স্পর্শ থেকে বিচ্যুত হইনি মোটেও। অর্থাৎ আমাদের মূল বাসা ও দোকান, দোকানের সামনে বরাবর অবসর সময় কাটানো, আব্বার সঙ্গ নিয়ে তাঁর নানা রকম সামাজিক কাজে ও দাওয়াতে যাওয়া ইত্যাদির মোহ যায়নি। দোকানে বিয়ের বাজার সহ নানা বড় কেনাকাটা উপলক্ষে দল বেঁধে আসা ক্রেতাদের মধ্যে মতান্তর, আলোচনা, আব্বাদের সঙ্গে তাদের আলাপ ইত্যাদি শুনতে ভাল লাগতো, সামাজিক অনেক বিষয় আঁচ করতে পারতাম। তাঁদের সবাই পুরুষ, কিন্তু কথাবার্তা হতো মহিলাদের দাবি, সখ, আবদার ইত্যাদি নিয়ে এবং পরিবারের মর্যাদা অনুযায়ী সঙ্গত হচ্ছে কিনা, সামর্থ্য আছে কিনা এসব নিয়ে। আব্বার সঙ্গে যখন দাওয়াতে অথবা বিরল কখনো কখনো সালিশ ইত্যাদিতে যেতাম সেখানেও অনেক বিষয় সামনে আসতো, আমার নিজের মধ্যেও অনেক চিন্তা হতো। একবার আমাদের এক আত্মীয়ার বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভাবনা সম্পর্কে এক সালিশে গিয়ে একজন বৃদ্ধ মুরব্বির কথাটি আমার কাছে অন্যদের থেকে খুব ভিন্ন এবং আধুনিক মনে হয়েছে। তিনি বলছিলেন এখানে একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো এই ছেলেটি এবং এই মেয়েটি নিজেরা কী চায়। তারা এক সঙ্গে থাকতে চায় কি চায় না, এটিই শুধু আমাদেরকে জানতে হবে। এই কথাটি আমাকে খুব খুশি করেছে, অন্যদের অন্য রকম কথার বিপরীতে; বেশ ভাবিয়েছেও বটে। অন্য ধরনের কিছু সালিশ, মীমাংসা ইত্যাদি হতো জায়গাজমি নিয়ে, যেগুলো হয়তো মামলা-মোকদ্দমার দিকে গেছে বা যেতে পারে। সেও এক অন্য জগত—দলিল পত্র, ওয়ারিশ, ভাগাভাগি, কোর্ট কাচারি, কৃষিজমি, হাল-বলদ ইত্যাদি নানা বিষয়ে অনেক কিছুর ভাসা-ভাসা ধারণা এ সময় হয়েছে—গেরস্ত মানুষের দুনিয়াটি কিসের চারদিকে আবর্তিত হয় তারও কিছু আভাস পেয়েছি। এর আগে কারিগর দেখলেও 'কনসালটেন্ট' দেখিনি; এখন দেখলাম জমি বিষয়ক পরামর্শদাতা 'আমিন' রূপে (আমিনরা হলেন নক্সা ধরে জমি মাপামাপি করে সীমা

চিহ্নিত করার বিশেষজ্ঞ)। গুরুজনদেরকে দেখতাম জমির বিরাট নক্সার উপর আমিনকে নিয়ে ঝুকে পড়ে গবেষণা করতে। আরএস খতিয়ান (রয়্যাল সার্ভে), দাগ, ছিট, ইত্যাদি শব্দ শুনতে পেতাম। এই আমার প্রথম ম্যাপ-রিডিং করতে দেখা। আর দেখতাম পুরোনো হলুদ হয়ে যাওয়া রাজার মাথাযুক্ত স্ট্যাম্পে অনেক আঙ্গুলের ছাপ সহকারে দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে ও দুর্বোধ্য বাক্যে লেখা কবলানামা।

যথেষ্ট সময় স্কুলে কাটলেও, আরো অনেক সময় দুই নম্বরে এবং নিজের দরকারি ও বেদরকারি পড়াশোনায় কাটলেও, তখনো কিছু সময় দোকানের মধ্যে কাটতো—এ যেন ছিল নেহাত একটি বিশ্রাম বা বিনোদনের মত। এখানকার অলঙ্কারগুলোর কারুকার্য খুব ভাল লাগাতো। গিনি সোনা, বেটার সোনা; গিনির মধ্যে আবার রাজা গিনি ও রাণী গিনি; ইত্যাদির মধ্যে খাদের পার্থক্যগুলো বুঝতে শিখেছি। গিনি আসলে বৃটেনের স্বর্ণমুদ্রা—এক কালে যার মূল্যমান ছিল এক পাউন্ড এক শিলিং, এতে সুনির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ থাকে। রাণী গিনি ভিক্টোরিয়ার আমলের, রাজা গিনি তার পরের। বেটার সোনায় খাদ থাকেনা, এটি বিশুদ্ধ সোনা। তাছাড়া রুলি, বালা ইত্যাদিতে যে যথেষ্ট 'পাইন' (সংযোগে ব্যবহৃত অন্য ধাতু) থাকে তা হিসেব থেকে কীভাবে বাদ দিতে হয় তাও জানা হয়েছে। রূপার অলঙ্কারগুলো আমাকে বেশি আকর্ষণ করতো—মনে হতো তার মধ্যে যেন একটি ভারি বনেদিয়ানার ছাপ আছে—পায়ের মল, ঝুমঝুমি (পায়জাব বলে পরিচিত), কোমরের বিছা, মাদল ইত্যাদি গাঁথা কোমরবন্ধ, গলার হার ইত্যাদি বেশ লাগতো। তবে সব চেয়ে স্বপ্ন-মাখা অভিজ্ঞতা হতো যখন আমাদের পরিচিত জহুরী তাঁর যাদুর বাক্সটি নিয়ে আসতেন। তিনি এলে আব্বা তাঁকে নিয়ে দোকানের পেছনে যেতেন। টেবিলের উপর একটি ছোট ট্রের মত পাত্র রাখা হতো। জহুরী তাঁর বাক্স থেকে চিমটা দিয়ে নিয়ে নিয়ে ছোট ছোট রত্নপাথর দুই একটি করে ট্রের উপর রাখতেন, আর আব্বা সেগুলো পরীক্ষা করতেন। তাঁদের মধ্যে আলাপগুলো শুনে এবং কখনো বা জিজ্ঞেস করে রঙিন আলো ঠিকরে পড়া এই পাথরগুলোর অধিকাংশের সঙ্গে পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। হীরা, নীলা, চুনি (রুবিও বলা হতো) এগুলো ছিল সব চেয়ে দামি। তারপরেই আসতো হলুদ আভার পোখরাজ (টোপাজও বলা হতো), কিংবা সবুজ পান্না, কিছুটা মেটে ওপেল ইত্যাদি। পাথর যত বড় হতো, তাতে কাটগুলো এবং আলোর আভা যত খেলতো, ততই তার মূল্য হতো। ওই ছোট্ট পাথরগুলো তাঁদের হাতে যেভাবে ঝিলিক দিয়ে যেতো এবং দু'জনে মিলে যেভাবে এগুলো পরীক্ষা করতেন এর গুণাগুণ নিয়ে আলাপ করতেন, আমার শিশুমন তখন আর বক্সীর হাটের হৈচৈয়ের পরিবেশে থাকতো না—চলে যেত রূপকথার রত্নরাজ্যে।

দোকানে কাটাবার সময়টি হতো এক ধরনের বিশ্রাম নেয়া। স্কুলের লেখাপড়া শুরু হয়েছে অল্প কয়েক বছর মাত্র। কিন্তু ইতোমধ্যেই পরীক্ষার অত্যাচারটি বেশ টের পাচ্ছিলাম—ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক, নয়-মাসিক, বার্ষিক সবগুলোর একটি চাপ

গড়ে উঠছিল যা পরে যেমন খুব সুখদায়ক ছিলনা, তখনো ছিলনা। এর কারণ লেখাপড়াকে মজা হিসেবে নিতেই আমি অভ্যস্ত বরাবর, পরীক্ষা হিসেবে নয়। নিয়ম করে, ঘণ্টা ধরে পরীক্ষার জন্য পড়া তখনই এত বিরক্তিকর ছিল যে আমাদের দোকানের বিপরীতে কয়েকটি দোকানে বালক কর্মীদেরকে দেখে খুব হিংসে হতো; মনে হতো তারা সব সময় গল্প করছে, হাসাহাসি করছে, তাদের জীবনে কোন উদ্বেগ নেই, পরীক্ষার উদ্বেগ তো নেই। রাতে এসব দোকানে কীর্তনের আসর বসতো—বেশ ভালই লাগতো দূর থেকে ভেসে আসা এই সংগীত। ঢোল, খঞ্জনী এরকম দু'একটি বাদ্য যন্ত্র নিয়ে গাওয়া ওই কীর্তনের আসরে মনে হয় ওসব দোকানের সৌখিন গায়করাই অংশ নিতো। তখন থেকেই কীর্তনের সুর আমার একটি প্রিয় সুর। কিন্তু তার মধ্যেও হিংসেটা থাকতো। ওই কর্মী ছেলেগুলোও নিশ্চয়ই ওই গানের আসরে আছে—তাদের জীবনের পুরোটাই সুখ!

বাসায় আমাদের খেলার দল

আমার একজন নতুন ভাইয়ের জন্ম বাড়িতে আমার জন্য নতুন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছে। এর আগে জাহাঙ্গীরের জন্মের সময় বেশি ছোট বয়সের কারণে নতুন বাচ্চার কোন দায়িত্ব আমাকে দেয়া হয়নি। কিন্তু মোসাদ্দেকের ক্ষেত্রে তা হলোনা। মোসাদ্দেকের নামটি দেবার ভারও কিন্তু মুরব্বিদের হাতে না থেকে জুনিয়রদের হাতে চলে এলো—অর্থাৎ আমার বড় ভাই ও তাঁদের সমজদার ছোট চাচারা, মান্নান মাস্টার প্রমুখের উপর। বড়রাও নাম প্রস্তাব করেছিলেন, আমাদেরকে যিনি কোরান পড়াতে আসেন সেই হাফেজ সাহেবও। কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকলো বড় ভাইদের দেয়া নাম, এবং তা সাম্প্রতিক বিশ্ব রাজনীতি থেকে। ইরানের সাহসী ও জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক কিছুদিন আগে মার্কিন গুপ্ত সমর্থনে সংঘটিত শাহের অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন—আমাদের বাসায় তাঁর প্রতি সবার খুবই সমর্থন ও সমবেদনা। তাই মোসাদ্দেক নামটিই টিকে গেল। মনে পড়ে একটি আনুষ্ঠানিকতা হয়েছিল নামকরণের ক্ষেত্রে। রেড়ির তেলের একটি প্রদীপের মধ্যে অনেকগুলো সলতে দিয়ে বিভিন্ন প্রস্তাবিত নামের প্রতিনিধিত্ব করে এক একটি জ্বালানো হয়েছে। যেটি বেশিক্ষণ টিকেছে সেটি গৃহীত হয়েছে। নিয়মটি এমন ছিল বটে তবে খুব সম্ভব নাম সেভাবে স্থির হয়নি। মোসাদ্দেকের কান্না থামানো, কোলে নেয়া, কখানো কখনো পার্শ্ব নলে নিপল লাগানো ধাতব ফিডারটি মুখে ধরে তাকে দুধ খাওয়ানো-এসব দায়িত্ব মাঝে মাঝে আমিও পেতাম; হাত তালি দিয়ে গান গেয়ে তার সঙ্গে খেলা করার ব্যাপারতো রয়েছেই, যাতে ছোট সব ভাই বোনরাও শরিক হতো।

আসলে আমরা ভাই বোনদের দল যেমন ভারী হচ্ছি, তেমনি তাদেরকে নিয়ে টুনু আর আমার মধ্যে আনুগত্যের দল ভারী করার একটি প্রতিযোগিতাও ক্রমে

বাড়ছিল। বড়দা আর মেজভাই—গোড়া থেকেই বড় হবার কারণে আলাদা। কিন্তু আমরা বাকিরা সব রকম খেলাধুলা এক সঙ্গে করতাম, টুনু আর আমি ছোটদের খেলায় নেতৃত্ব দিতাম। খেলাধুলা বলতে ওই ঘরের মধ্যেই, বড় জোর ছাদে। শুরুর দিকে এগুলো ছিল সেই দোকান-দোকান খেলা, বাস-ট্রেন খেলা, অথবা টুনুর স্কুল থেকে আমদানি কিছু মেয়েলি খেলা, আর নিজেদের আবিষ্কৃত কিছু খেলা। পরে ঘরের ভেতর এক রকম নিজেদের নিয়মে পিং পং আর ছাদে ওরকম ক্রিকেট খেলেছি। ক্রিকেটের জন্য পুরোনো তক্তা ফেড়ে ব্যাট, আর লাটিমের লোহার অংশটুকু ফেলে দিয়ে বল তৈরি হতো। উইকেটের কাজ করতো বদনা, বোল্ড আউটটিই ছিল একমাত্র আউট। বোল্ড হলে বদনায় শব্দ হতো। রাবার বল না হয়ে অনিয়মিত আকৃতির লাটিম হওয়াতে বল দূরে যেতনা। কিন্তু এ সব খেলার মধ্যেই দল পাকানোর বিষয়টি থাকতো—ছোট ভাইদের (প্রায় সবাই তখনো বেশ ছোট) অধিক আনুগত্য কে বেশি পাবে তার প্রতিযোগিতায়। আর ছোটরাও প্রায়শ তাদের দল বদল করতো। এও ছিল আমাদের এক রকম খেলা। পরে এর একটি নামও জুটে গিয়েছিল যা হলো পার্টাপার্টি খেলা, সেটি অবশ্য ঘটেছে যখন বাড়ির বাইরের রাজনৈতিক পার্টির প্রতিযোগিতা, তাদের মিছিল, শ্লোগানে আমরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। সেই অভিজ্ঞতাগুলো তুঙ্গে উঠেছিল পরের বছর যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনের সময়। সে কথায় পরে আসবো।

আমাদের খেলার দলের সবাই যেমন খুব ছোট, মাঝে মাঝে তার মধ্যে আরো এক ক্ষুদে সদস্য এসে যোগ দিত, বেড়াতে এসে দু'একদিনের জন্য; একেবারে একটি পুতুলের মত। সে হলো বুবুর মেয়ে বুলবুলি। সে যখন থাকতো তখন আমাদের সবার আনন্দ বেড়ে যেতো অনেক খানি। আমি ও টুনু স্কুল থেকে ফিরেই তাকে নিয়ে লেগে পড়তাম। তার মুখের কথাগুলো খুব মজার লাগতো—সেটি বুবুর শ্বশুর বাড়ির মানুষরা চট্টগ্রাম শহরের আদি বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে। এই কারণে আমাদের থেকে সামান্য দূরত্বে থেকেও বুলবুলির চাটগেঁয়ে ভাষায় কিছু ভিন্ন টান, কিছু ভিন্ন শব্দ ছিল যেটি ছিল আমাদের কছে খুব মজার। যেমন আমরা পিঁপড়াকে আমরা বলতাম 'পোঁয়া' আর বুলবুলি বলতো 'চ্যুঁড়ি' (খুব সম্ভব এর হিন্দুস্তানি প্রতিশব্দ থেকে)। শহরের আদি বাসিন্দাদের ওপর নানাভাষী মানুষের প্রভাবের ফলেই এটি হয়েছে। যে ক'দিন থাকতো আমাদের সব খেলাতে শরিক হয়ে যেত সে।

আমাদের খেলার দলের ক্যাপ্টেনের মত এক ধরনের কর্তৃত্ব আমার এবং টুনুর থাকতো বটে, কিন্তু এর পেছনে কোচ অথবা ম্যানেজারের মত আসল সর্দারিটি থাকতো সেকান্দরের। সেকান্দর ছিল আমাদের বহুদিনের কাজের ছেলে, ওই সময় এবং তারপর অনেকটা সময়। আমার চেয়ে বয়সে তিন চার বছরের বড় হলেও সেও তখন নেহাত বালক, তবে বেশ অভিজ্ঞ বালক। আমি যখন আরো ছোট তখন থেকেই আমাদের ভালমন্দের অনেকটাই তার হাতে ছেড়ে দেয়া

হয়েছিল—ঘটনা-দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা, নাশতা হিসাবে বরাদ্দ বেলা বিস্কুট ইত্যাদি সময়মত খাওয়ানো, ঝগড়াঝাটি থামানো, আব্বা যখন পারতেননা তখন সাবান দিয়ে গোসল করিয়ে দেয়া। প্রায় সব বিষয়ে আপোষের মাধ্যমে আমাদেরকে নানা কথায় রাজি করিয়েই আমাদেরকে তার শাসন করতে হতো। কিন্তু তার কথা মান্য করানোর মোক্ষম যে অস্ত্রটি তার ছিল তা হলো ওই গোসল করানোর ব্যাপারটি। সে হুমকি দিত যে তার কথামতো না চল্‌লে ওই সময় চোখে বেশি বেশি করে সাবান ঘষে দেয়া হবে। আর এটি করলে আব্বার কাছে এ নিয়ে কোন আপিল টিকতোনা, কারণ আব্বারই হুকুম ছিল এই ব্যাপারে কোন গাফিলতি না করার।

কিন্তু সেকান্দরের কথা অমান্য করার প্রশ্ন খুব একটা উঠতোনা, কারণ আমাদের 'ম্যানেজার-কোচ' হিসেবে সে ছিল খুবই আকর্ষণীয় একটি চরিত্র। নিজের পূর্ব-জীবনের অভিজ্ঞতা এবং তার শোনা অন্যদের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে সে ছিল একজন দুর্দান্ত গল্প-বলিয়ে। তা ছাড়া বিভিন্ন ধরনের কারিগরি দক্ষতাও ছিল তার প্রায় স্বভাবজাত—যে ধরনের দক্ষতার আমাদের প্রয়োজন ছিল। যেমন লাটিম যে ভাল ক্রিকেট বল হতে পারে সেই আইডিয়াটি তার। শুধু তাই নয় যেহেতু ছাদে ক্রিকেট খেলতে গিয়ে আমরা প্রায়ই এই বল-রূপী লাটিম হারাতাম, তাই সে সহজ উপায়ে নতুন লাটিমকে তার সুঁচালো লোহার অংশ থেকে মুক্ত করার একটি কায়দাও উদ্ভাবন করেছিল। তাছাড়া পুরোনো তক্তা ফেড়ে চলনসই ব্যাট বানানোটিও তারই কীর্তি। পরবর্তী সময়ে সে আমাদের আরো বড় বড় অ্যাডভেঞ্চারে নেতৃত্ব দিয়েছে, সে কথা যথাস্থানে বলা যাবে। এই সেকান্দর বোধ হয় আমাদের চোখে সাবান দেয়ার হুমকিটি সব চেয়ে বেশি ব্যবহার করেছে তার নিজের পড়াশোনার ব্যাপারে, তার বাংলা লেখা বা অঙ্ক শুদ্ধ করে দেবার ব্যাপারে আমরা গড়িমসি করলে তখন। প্রথম থেকেই সে নিজে নিজে লেখাপড়া করতে উৎসাহী ছিল। আমাদের পাঠ্যবইগুলোই সে পড়তো, নিজের খাতায় লিখতো, আমাদের কাছ থেকে পড়া শিখে নিত। যদিও টুনু, আইয়ুব সবাই তার শিক্ষকতার দাবি করতে পারে, তবে আমিই ছিলাম সেকান্দরের প্রথম শিক্ষক যার কাছ থেকে অ-আ-ক-খ শিখে শুরু করেছে। তারপর সে বহু বছর আমাদের থেকে, পরে সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায়, কিছু সময় নাইট স্কুল এবং নাইট কলেজে পড়ে একে একে ম্যাট্রিক, ইন্টারমিডিয়েট (এইচএসসি) এবং বিএ পাশ করেছে। আগাগোড়া এ সময় আমাদের বাসায় থেকেছে, আমরা বড় হয়ে যাবার পর চট্টগ্রাম জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশনের প্রথমে পিয়ন ও পরে অফিস কর্মকর্তা হিসেবে। এক সময় আমাদের প্যাকেজেস কারখানাটি প্রতিষ্ঠিত হলে সেকান্দর জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশনের কাজ ছেড়ে দিয়ে ওখানে চলে যায়।

ওই সময় সেকান্দরের কারিগরি দক্ষতার সব চেয়ে ভাল প্রকাশ ঘটতো ঘুড়ি ওড়ানোর কাজে। আমাদের একটি খেলা ছিল ছাদে ঘুড়ি ওড়ানো। এজন্য আমাদের লাটাই, সুতা সব ছিল। কাছের দোকান থেকে ঘুড়ি কিনে আনা হতো।

সেকান্দর দেখে শুনে ভাল ঘুড়ি কিনতে পারতো, ঘুড়ি বানাতেও পারতো। তবে তার আসল দক্ষতা ছিল ওড়ার সময় ঘুড়ির আচরণ বুঝতে পারা। এটি লক্ষ্য করে সে পরে অবাধ্য ঘুড়ি নামিয়ে এনে তার ওপর সংশোধন প্রয়োগ করতে পারতো। ডানে বা বামে, সামনে বা পেছনে ব্যালেন্সের কোন অভাবের কারণে যদি ওড়ার সময় ঘুড়ি গোত্তা খেত, বার বার ঘুরতো, লাটাইয়ের শাসন মানতোনা, সেকান্দর তা ঠিক বুঝতে পেরে ঠিক জায়গায় ছোট ছোট কাগজের 'কান্নি' যোগ করে দিত, যার ফলে ঘুড়ির ওই দোষ প্রায়শ আর থাকতো না।

ঘুড়ি ওড়ানোর ব্যাপারে আমরা উৎসাহ ও রসদ পেতাম আমার দুলাভাইয়ের (বুবুর স্বামী) কাছ থেকে। বয়স্ক হয়েও তিনি ছেলেবেলার ঘুড়ি ওড়াবার সখ একেবারে ছাড়েননি যদিও তাঁর ব্যবসা তাঁকে খুবই ব্যস্ত রাখতো। চট্টগ্রামের দুই একটি মাত্র বন্দুকের দোকানের মাধ্যে তাঁরটি অগ্রগণ্য ছিলো—সেটি ছিল তাঁদের পৈতৃক ব্যবসা। তাঁর কাছ থেকেই আমরা ঘুড়ি কাটাকুটি করার জন্য সুতাতে মাঞ্জা লাগানোর প্রক্রিয়া শিখেছিলাম আমাদের ম্যানেজার-কোচ সেকান্দরের নেতৃত্বে। কাজেই ক্রমে ক্রমে এদিকে আমাদের মুনশিয়ানা বাড়ছিলো। মাঞ্জা ইত্যাদিতে আমার বেশি উৎসাহ না থাকলেও ঘুড়ি যখন বাতাস পেয়ে শাঁই শাই করে ছুটতো আর আমি আলগোছে লাটাইটা আঙ্গুলের উপর রেখে তাকে অবাধে বন বন করে ঘুরতে দিতাম, তখন আকাশ জয়ের আনন্দ পেতাম। আমাদের এই একটি মাত্র খেলায় কালেভদ্রে আব্বা এসে যোগ দিতেন। বিশেষ করে আমরা যখন ঘুড়িকে অনেক দূরে উড়িয়ে দিতাম আব্বা ওই সময় যদি কোন কারণে ছাদে উঠতেন তিনিও কিছুক্ষণের জন্য ঘুড়ির নিয়ন্ত্রণ নিতেন, ঘুড়িকে এদিকে ওদিকে চালনার চেষ্টা করতেন, যেমন গোত্তা খাইয়ে আবার তুলে আনতে। ওসময় যদি ঘুড়ি তাঁর হাতের এই ইশারাগুলো না মেনে চলতো তাকে তিনি শাপ শাপান্তও করতেন। বুঝতে পারতাম যে ছোটবেলায় তিনি ঘুড়ি ওড়ানোতে দক্ষ ছিলেন।

সদা প্রস্তুত

স্কাউটিঙের সঙ্গে পরিচয়

ইউনূস ভাই চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র হয়ে ওখানকার স্কাউটিঙের সঙ্গে ওতোপ্রোতো ভাবে জড়িয়ে যাওয়ার সময় থেকেই আমি স্কাউটিঙের সঙ্গে পরিচিত। বাসায় এই নিয়ে তাঁর প্রস্তুতিগুলো দেখতাম—বিশেষ করে এর পোষাক, নানা গুণের জন্য এক একটি ব্যাজ পাওয়া, সেই ব্যাজ পোষাকে লাগিয়ে নেয়া, এগুলো দারুণ আকর্ষণ করতো। স্কাউটের মূলমন্ত্রটিও বার বার শুনে মনে গেঁথে গিয়েছিল তিন ভাষাতেই—বি প্রিপেয়ার্ড, আল মুস্তাহিদ, সদা প্রস্তুত। তাছাড়া কলেজিয়েট স্কুল স্কাউটদের নানা অনুষ্ঠানে তিনি আমাকে নিয়েও যেতেন। তবে স্কাউটিং যে কত বড় জগতের দরজা হতে পারে এটি প্রথম বুঝতে পারি যখন ক্লাস টু'তে পড়ি তখন—সেই বছর করাচিতে প্রথম পাকিস্তান জাতীয় জাম্বুরীতে ইউনূস ভাইদের যোগদান উপলক্ষ্যে (১৯৫২)। চট্টগ্রাম থেকে অনেকে যারা এজন্য করাচি যাবে সে সব স্কাউটদের (অধিকাংশই ১০ থেকে ১৪ বছরের স্কুল ছাত্র) প্রস্তুতি, ট্রেনিং ইত্যাদিতে ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে গিয়েছি—কলেজিয়েট স্কুলে তাঁর সহপাঠী হিসেবে তাদের অনেককে আগে থেকে চিনতাম। কিন্তু এখন নতুন আরো অনেককে চিনলাম। যেমন অত্যন্ত রসিক তৌফিক ভাইকে, খাস চাটগেঁয়ে ছেলে হয়েও যিনি উর্দু মিডিয়াম ইসলামিয়া স্কুলে পড়েন, কথায় কথায় কৌতুক বলে হাসান। আরেক জন বেশ চটপটে বলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যিনি একজন রোহিঙ্গা—তাঁর নামের দ্বিতীয় শব্দটি ছিল আরাকানী; চাটগেঁয়ে তাঁর ভাষা—নিজের আদিনিবাস আরাকানেও সেটিই ছিল তাঁর ভাষা, বাংলা ভাল করে বলতে পারেননা।

চট্টগ্রাম থেকে একটি বিশেষ ট্রেন রওয়ানা হয়ে প্রদেশের যোগদানকারী সব স্কাউটদের নিয়ে ভারতের উপর দিয়ে করাচি যায়। এটি ভারতের নানা শহরে থামে—দিল্লি, আগ্রা ইত্যাদি; স্কাউটরা ওখানে নেমে দর্শনীয় জায়গাগুলো ভ্রমণ

করে। করাচি থেকে যখন তাঁরা ফিরে এলেন সেদিন আমিও স্টেশনে গিয়েছিলাম। ট্রেন থামার পর কেমন হৈচৈ করে অন্য স্কাউটরা তাঁদের অভ্যর্থনা করলো, সোচ্চারে স্কাউট ইয়েল (মজার মজার জয়ধ্বনি) দিলো, কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে পৌছার পর গোল হয়ে দাঁড়িয়ে যেভাবে জাম্বুরী সংগীত গাইলো—'এক হ্যায় হাম সবি, জাম্বুরী জাম্বুরী'—এসবের প্রতিটি শব্দ ও সুর এখনো আমার মনে পড়ে; এমন শিহরিত হয়েছিলাম এই সবকিছুর দ্বারা। কয়েক দিন ধরে পুরো ভ্রমণের গল্প শোনলাম—কেমন করে সারা পথ গান গেয়ে গেয়ে কাটালো সবাই মিলে, করাচি জাম্বুরীতে পাকিস্তানের নানা অংশের ছেলেদের সঙ্গে পরিচয় হলো ইত্যাদি। সেই যাত্রা থেকে আমাদের জন্য সুন্দর সুন্দর জিনিস এসেছিল। আমার জন্য বিমানের পাইলটের মতো টুপি, আইয়ুবের জন্য কাব স্কাউটের টুপি, আর বাড়ির জন্য মার্বেলের ছোট তাজমহল যার ভেতর বাতি জ্বালানো যায়।

স্কাউটিঙের দ্বারা বেশীদিন বাইরে থেকে মন্ত্রমুগ্ধ হয়েই থাকতে হলোনা, আমি নিজেও সরাসরি এতে যোগ দিতে পারলাম। এখনো আমি লামার বাজার স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীতে মাত্র পড়ি—স্বাভাবিক পথে কলেজিয়েট স্কুলের ধারে কাছে ঘেঁষার কোন সুযোগ আমার ছিলনা। তারপরও বাইরের একেবারে কম বয়সী একজন ছাত্র হয়েও কলেজিয়েট স্কাউটসের কাব দলে যোগ দিতে পারলাম। ইউনূস ভাই তখন কলেজিয়েটে তুখোড় স্কাউট। স্কাউট মাস্টার কাজী সিরাজুল হক (কাজী সাহেব বলে তখনই পুরো চট্টগ্রামে সুপরিচিত) সহজে তাঁর কথা ফেলেন না। কাজী সাহেবের অনুমতি নিয়ে ইউনূস ভাই আমাকে স্কাউটদের নানা অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। এমনি একটি অনুষ্ঠান ছিল ইকবাল দিবস, সারা উপমহাদেশ খ্যাতি উর্দু কবি এবং পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা হিসেবে অভিষিক্ত আল্লামা ইকবালের জন্ম বার্ষিকী। ইউনূস ভাই আগে থেকেই আমাকে বলে রাখলেন এতে আমাকে বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতা যেন ভাল হয় এ জন্য একটি বক্তৃতা লিখেও দিলেন, বার বার রিহার্সেল দেওয়ালেন। ইকবাল দিবসের অনুষ্ঠানে যথারীতি বক্তৃতার আহ্বান এলো। আমি ইকবালের কবিতার কিছুটা আবৃত্তি করে শুরু করলাম—

চীন ও আরব হামারা, হিন্দুস্তাঁ হামারা
মুসলিম হ্যায় হাম,
ওয়াতান হ্যায় সারা জাঁহা হামারা

পূর্ব-প্রস্তুতির কারণে বক্তৃতাটির কথা, ভঙ্গি সব খুব ভাল হয়েছিল। ওই দিনই কাজী সাহেব তাঁর দলে আমাকে সদস্য পদ দিয়ে দিলেন সর্বকনিষ্ঠ স্কাউট হিসেবে। স্কাউটিঙের কাজগুলো সাপ্তাহিক ছুটি রোববারে হতো। তাই আমার স্কুল বন্ধ বলে ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে কলেজিয়েটে চলে যেতাম।

স্কাউট খেলাগুলো শিখলাম, বড়দের সঙ্গে আরো অনেক কাজে যথারীতি অংশ নিলাম—সব কাজে আমার মত করে একটি ভূমিকা থাকতো অন্যান্য কাব স্কাউটদের সঙ্গে। কাবদের বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন কাব টিচার মোখলেস স্যার।

কাবদের একটি মজার জিনিস ছিল 'গ্র্যান্ড হাউল' অর্থাৎ নেকড়ে বাঘের মহা-চিৎকার। কাব কথাটিই এসেছে নেকড়ে বাঘের বাচ্চা অর্থে—সেই রুডিয়ার্ড কিপলিঙের লেখা বই 'জাঙ্গল বুক' অনুসরণে। আমরা গাইতে শিখেছিলাম 'আমরা কাবের দল ও ভাই আমরা কাবের দল, নেকড়ে বাঘের বাচ্চা মোরা বাঘের মতই বল'। গ্র্যান্ড হাউলে দুই পায়ের পাতার উপর আর হাতের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে ঠিক নেকড়ে বাঘের ডাক দেবার মত দেহভঙ্গিতে বসে উচ্চ কণ্ঠে আমরা ধ্বনি তুলতাম 'আকেলার' উদ্দেশে। 'জাঙ্গল বুকে' আকেলা হলো একজন জ্ঞানবৃদ্ধ নেতা নেকড়ে বাঘ, আর আমাদের আকেলা আমাদের কাব টিচার। আমরা তখন সবাই মিলে একটি বৃত্ত রচনা করতাম যার কেন্দ্রে থাকতেন আকেলা। গ্র্যান্ড হাউলের ধ্বনি ছিল 'আ-কে-লা, উই উইল ডু আওয়ার বেস্ট' ইত্যাদি।

প্রতি সপ্তায় স্কাউট ক্লাসে গিয়ে আমরা নতুন নতুন খেলা শিখতাম—কাব স্কাউটদের খেলা। যেমন একটি খেলাতে একটি ডালার উপর টুকিটাকি অনেক কিছু রাখা হয় কাপড় দিয়ে ঢেকে আগে থেকে গোপনে—স্কাউট বাঁশি, স্কার্ফ, জুতার ফিতা, পাতা, ফুল, কাঠি, রুমাল, ছুরি—এমনি সব অনেক টুকিটাকি। সবার সামনে কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাপড়টি সরিয়ে আবার ঢেকে ফেলা হয়। যে সব চেয়ে বেশি সংখ্যক জিনিসের নাম মনে রেখে বলতে পারে সে খেলায় জেতে। আর একটি খেলায় বাকি সবাই যখন গোল হয়ে বসে কোন একটি কাজ এক সঙ্গে করতে থাকে যেমন হাত তালি দেয়া, তখন ওই বৃত্তের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে একজন। কিছুক্ষণ পর পর সবাই কাজ বদলায়—যেমন এতক্ষণ দুই হাতে তালি দিচ্ছিল, হঠাৎ সবাই এক হাতে মাটিতে চাপড় দিতে শুরু করলো। মাঝখানের জনকে এখন বের করতে হবে ওই পরিবর্তনের সূচনাটি পূর্ব নির্ধারিত কে করছে, যাকে অনুসরণ করে বাকিরাও প্রত্যেকবার পরিবর্তিত কাজটি শুরু করেছে। খেলাটির নামই হলো 'নেতা কে খুঁজে বের করো'। এ ভাবে একটু পরে পরেই নেতা নিজে শুরু করার কারণে দলের নতুন নতুন কাজ হতে থাকে। যতক্ষণ নেতা না বের করতে পারবে ততক্ষণ খোঁজার কাজটি আগের জনকেই করে যেতে হবে। যদি আসল নেতাকে সে ধরে ফেলতে পারে তা হলে ধরা পড়ে যাওয়া নেতাকেই এখন নেতা খোঁজার কাজ নিতে হবে। তার চোখ বন্ধ রেখে ইশারায় নতুন একজনকে এখন নেতৃত্বের ভার দিতে হবে। কে কত দ্রুত নেতা কে খুঁজে বের করতে পারে, সেটিই খেলার মর্ম। সবাই নেতার দিকে স্পষ্টত বেশি মনোযোগ না দিয়ে যদি তাকে অনুসরণ করতে পারে, তা হলে নেতা ধরা কঠিন হয়। এমনি কত মজার খেলা যে তখন শিখেছি, খেলেছি।

প্রতি বছর কলেজিয়েট স্কাউটদের একটি 'আর্নিং উইক' হতো—যখন বিভিন্ন ছোট দলে কেউ বুট পলিশ করে, কেউ মনোহারী জিনিস বিক্রি করে, কেউ চায়ের দোকান চালিয়ে স্কাউট গ্রুপের জন্য আয় করে। সেবার আমার ঠাঁই হলো চায়ের

দোকানে গামছা হাতে কিছুক্ষণ পরপর টেবিল পরিস্কার করার কাজ। কলেজিয়েট স্কাউটসরা আর্নিং উইক করছে এ কথা শহরে বেশ ছড়িয়ে দেয়া হতো। এই উপলক্ষে স্কুলের প্রাক্তন ছাত্ররা এবং শহরের অনেক গণ্যমান্যরা স্কুলে আসতেন, এবং আমাদের চায়ের দোকানে চা-নাস্তা খেতেন। উদ্দেশ্য হলো এই উছিলায় স্কাউট কার্যক্রমের জন্য কিছু অর্থ সাহায্য করা। তাই তাঁরা বিলের উপরেও অনেক বেশি টাকা দিতেন। যাঁরা আসতেন তাঁদের কেউ কেউ আমার সঙ্গে আলাপও করেছেন। এই চায়ের দোকানে কিছু কিছু খাবার স্কাউটরা নিজেরাই তৈরি করেছে, কোন কোনটি অর্ডার মত বানিয়েছে। রান্নার সক্ষমতা স্কাউটদের একটি বিশেষ গুণ হিসেবে বিবেচিত, যারা পরীক্ষা দিয়ে দক্ষতা প্রমাণ করতে পারতো তারা কুকিং ব্যাজ পেত। ট্রুপে বড় স্কাউটদের দলে বেশ কয়েকজনের রান্নার দায়িত্ব ছিল।

একই ভাবে বুট পলিশের দলও বহু গণ্যমান্য ও ধনী ব্যক্তির বুট পালিশ করে প্রচুর উপার্জন করতো। মনোহারী দ্রব্য বিক্রির দল নামীদামিদের বাড়িতে গিয়ে সাধারণ তৈজস দ্রব্য তাঁদের পরিবারের কাছে বিক্রি করেও দ্রব্যগুলোর আসল দামের তুলনায় বেশি টাকা উপার্জন করতে পারতো। আর্নিং উইকের সময় টাকা পয়সার হিসেব রাখা, এক একটি কাজের জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ঠিকমত কেনাকাটা করা, এসবও একটি বড় কাজ ছিল। কাব স্কাউট হিসেবে যদিও এসব আমাকে করতে হয়নি, দেখেছি বড়রা এটি করতে গিয়ে কী ভাবে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে।

আর একবার হাইকিং হবে। শহরে বনজঙ্গল তো আর নেই, তাই রাজপথ ধরেই লাঠি হাতে হেঁটে যেতে হলো স্কুল থেকে ফৌজদার হাট। বড়দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে ক্লান্ত হলাম বটে কিন্তু সে-হাঁটার আনন্দের কোন তুলনা হয়না। পথটি কিন্তু বেশ চিত্তাকর্ষক। কোন জায়গাই পাহাড় থেকে বেশি দূরে নয়। আর আমাদেরও তেমন তাড়া ছিলনা; ধীরে সুস্থে দৃশ্য দেখতে দেখতে, প্রয়োজন মত পথের ধারে বসে পড়ে বিশ্রাম নিয়ে আমরা এগিয়েছি। চাষের ক্ষেত, সবুজে ঢাকা পাহাড়, দূর থেকে সমুদ্রের আভাস ইত্যাদির শোভা দেখতে দেখতে এই যে হাইকিং সেটিও ছিল একটি চমৎকার অভিজ্ঞতা। ফৌজদার হাটে গিয়ে আমরা সমুদ্রের ধারেও যেতে পেরেছি। পরে বাসে করে স্কুলে ফিরে এসেছি।

হাটহাজারিতে কলেজিয়েট স্কাউটসের ক্যাম্প বসলো। তিন দিন সবাই ক্যাম্পে কাটাবে। আমিও শরিক হয়ে গেলাম যাত্রায়। ব্যাগ গোছানো থেকে শুরু করে প্রতিটি পদক্ষেপ আমার মনে এত চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল যে আজ অবধি মনে আছে। ওই আমার প্রথম এমনি ভাবে ঘরছাড়া ভ্রমণের হাতছানি। সেদিনের ব্যাগের গন্ধটিও মনে পড়ে। ঠিক এমনি ভাবে ব্যাগ গুছিয়েছি আরো অসংখ্যবার। চিরকাল ওই ব্যাগের ওই একই গন্ধ, যা সেদিন প্রথমবার পেয়েছি। গন্ধটি তেলের, তখন ছিল একটি শিশিতে ঢেলে নেয়া সামান্য সরষের তেল। বহু পরে এক সময় সেটি হয়েছে ব্রাইল ক্রীম—কিন্তু ব্যাগের ওই তেলের গন্ধ বরাবর আমাকে ভ্রমণের আনন্দে উতলা করে তুলেছে। চট্টগ্রাম-নাজির হাট লাইনের ট্রেনে

চেপে আমাদের হাটহাজারির উদ্দেশে যাত্রা। কাজী সাহেব স্কাউটদের আরো অনেক বড় বড় যাত্রায় নেতৃত্ব দিয়েছেন—যেমন ইউনূস ভাইদের সেই ভারতের মধ্য দিয়ে করাচি যাওয়ার সারা পথেই তিনি ছিলেন তাঁদের মধ্যমণি। সারাক্ষণ তিনি কীভাবে নানা বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাজমহলের মত দর্শনীয় স্থানে আবেগপ্রবণ হয়ে ইতিহাস ব্যাখ্যা করেছেন, সে গল্প শুনেছি। এখন দেখছি কাছেই হাটহাজারিতে মাত্র তিন দিনের ক্যাম্পেও তাঁর সেই একই ভূমিকা। যাত্রার শুরুতেই তিনি ব্যাখ্যা করলেন ক্যাম্পে আমরা কী কী করবো। স্টেশনে যাওয়া, ট্রেনে ওঠা, গান গাইতে গাইতে, ইয়েল দিতে দিতে ট্রেন ভ্রমণ—প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁর সুন্দর বক্তব্য ছিল, দিক নির্দেশনা ছিল। তাঁর কথা হলো—অসংখ্য মানুষ আমাদেরকে লক্ষ্য করছে, তাদের কাছে আমাদের ব্যবহার আদর্শ স্থানীয় হতে হবে, স্কাউট পোষাকে দেখলেই যেন সবাই আমাদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করতে পারে, আমরা সব কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবো, এমনটিই যেন মানুষ ভাবতে পারে। আমরা যেখানে ক্যাম্প করবো সেই হাটহাজারি স্কুলের দৈনন্দিন কোন কাজে আমরা যেন কোন রকমের বিঘ্ন সৃষ্টি না করি। বরং ওই স্কুলের ছাত্রদের জন্য আমরা হবো অনুকরণীয়। এখানে ক্যাম্পিঙের প্রয়োজনে আমাদেরকে যে সব গর্ত করতে হবে, মাটির পরিবর্তন করতে হবে আসার আগে যেন সেগুলোর কোন চিহ্ন আমরা রেখে না আসি, যথাসাধ্য ঠিক আগের মত করে দিয়ে আসি।

খুব মজায় কাটলো ক্যাম্পে কয়েকটি দিন। শোয়ার ব্যবস্থা, রান্নার ব্যবস্থা করা থেকে শুরু করে সকাল থেকে রাত অবধি স্কাউটদের যত রকম শিক্ষা রয়েছে সবগুলো বাস্তবে পরিণত করার সুযোগ মিল্‌লো এখানে। অধিকাংশ কাজ বড় স্কাউটরা করেছে, আমরা কাবরা সহায়তাকারীর ভূমিকা নিয়েছি। কিন্তু আনন্দ আমাদেরও কমতি ছিলনা কিছু মাত্র। হাটহাজারি স্কুলের ক্যাম্প থেকে আমরা চলে গেছি হাইকিং করে নানা দূরত্বে নানা অ্যাডভেঞ্চার আর অভিযান করার পথে। আশেপাশে ক্ষেত খামার, জংলা জায়গা সব কিছুকে আমরা ব্যবহার করেছি। কিন্তু কাজী সাহেবের সেই উপদেশ মেনেছি—কোথাও কোন কিছুর যেন ক্ষতি না হয়, সবকিছু যেন আগের মত থাকে। রাতের বেলা মাঠের মাঝখানে আগুন জ্বেলে আমরা তার চারদিকে ক্যাম্পের সব চেয়ে মজার অংশ ক্যাম্প ফায়ারের আয়োজন করেছি। যত রকমের গান, নাচ, কৌতুক, নানা জনের জানা ছিল মন খুলে সবাই তা করেছে, আর তাতে একটু পরে পরেই মজার মজার ইয়েল। অনেকগুলো ইয়েল তাৎক্ষনিক ভাবে তৈরি করলো নানা জন। যেমন একজন বল্‌লো 'লাগছে কেমন', সবাই বল্‌লো 'খুব ভাল'। সে আবার জোর দিয়ে বল্‌লো 'আরে ভাই লাগছে কেমন'। তখন সবাই—আরো জোরে বল্‌লো 'খুউব ভাল'। এখানেও মাঝে মাঝে কাজী সাহেবের মন্তব্য এলো; তিনিই যে আমাদের ক্যাম্প চীফ, সব কিছুকে আরো উপভোগ্য আরো শিক্ষনীয় করে তুলতে তাঁর কোন জুড়ি নেই।

সরাসরি কাজী সাহেবের এরকম সান্নিধ্য পেয়েছি খুব ছোট বেলায় কাব স্কাউট রূপে ভিন্ স্কুলের থেকে আসা সদস্য হয়ে। পরে যখন কলেজিয়েট স্কুলে ছাত্র হয়ে এসেছি তিনি তখন বেশিদিন আর এই স্কুলে ছিলেন না—প্রধান শিক্ষক হয়ে চলে গিয়েছিলেন মুসলিম হাই স্কুলে। তবুও কাছাকাছিই ছিলেন—আমাদের স্কাউটিঙের নানা অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন। চট্টগ্রামে যখন দ্বিতীয় পাকিস্তান জাতীয় জাম্বুরী হয় তখন আমরা স্বাগতিক স্কাউট হিসেবে প্রস্তুতি নেবার সময় তাঁর নির্দেশনা পেয়েছি। ইউনূস ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ার সময়, বিদেশে লেখাপড়া করতে চলে যাবার আগে অবধি সব সময় তাঁর সঙ্গে গিয়ে নিয়মিত দেখা করতেন; কারণ তিনি ছিলেন ইউনূস ভাইয়ের এক রকম গার্ডিয়ান ফিলোসফার। এক অর্থে আমাদের পরিবারে সবাই তাঁকে সেভাবেই মানতো। আব্বা তাঁর মতামতের খুব গুরুত্ব দিতেন, সুযোগ পেলেই গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতেন; কাজী সাহেবও আসতেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের বছর খানেক পর তাঁর বাসায়; তখন তিনি অবসর জীবনে, স্বাস্থ্যও ভাল নয়। আব্বা ইউনূস ভাই ও আমাকে নিয়ে চট্টগ্রাম শহরে তাঁর বাসায় গিয়েছিলেন তাঁকে দেখতে। মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী আইন-শৃঙ্খলার অবনতি তখনো শেষ হয়নি। নতুন দেশের নতুন সব সম্ভাবনার কথা সেদিন তিনি বলছিলেন, এবং শৃঙ্খলা ও সুশাসন দ্রুত প্রতিষ্ঠিত না হলে এই সম্ভাবনা যে ভীষণ ভাবে বাধাগ্রস্ত হবে সেটি নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিলেন। এর মাত্র কয়েকদিন পর ঢাকায় খবর পেলাম যে কাজী সাহেব তাঁরই বাসার বহুদিনের কাজের লোকের হাতে নির্মম ভাবে নিহত হয়েছেন। বাসায় থাকা কয়েক হাজার টাকার লোভে তরুণ বয়সের ওই লোক তাঁকে হত্যা করেছিল; এ যেন তাঁর আশঙ্কাটিকেই সত্যে পরিণত করার জন্য।

কলেজিয়েট স্কুলের যে-সব স্কাউটের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ হলাম তাঁদের অনেকে ইউনূস ভাইয়ের সহপাঠী—বড় ভাই স্থানীয়, আবার অনেকে বয়সে ছোট কাব স্কাউট—আমার মত এত ছোট না হলেও। তাদের সঙ্গে আমার লামার বাজার স্কুলের অধিকাংশ সহপাঠীদের অনেকটা পার্থক্য। ভাষার পার্থক্যটি খুব স্পষ্ট—কারণ এখানে চাটগেঁয়ের বদলে বাংলাই বেশি ব্যবহৃত, স্থানীয়দের তুলনায় অন্যান্য জেলার ছেলে কম নয়। শুধু তাই নয় মধ্যবিত্ত সরকারী চাকুরিজীবী পরিবার থেকেই অধিকাংশ আসা বলে লামার বাজার স্কুলের ছেলেদের থেকে আচরণগত পার্থক্যও অনেক। সেদিক থেকেও এ ছিল আমার জন্য একটি নতুন জগত। আসলে অন্য ভাবেও লামার বাজার স্কুলে আমার দিন ফুরিয়ে এসেছিল।

নতুন স্কুলের অভিজ্ঞতা

প্রাথমিক বিদ্যালয় হিসেবে লামার বাজার স্কুলে আমার পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার কথা। আমি সবে তৃতীয় শ্রেণীর শেষের দিকে রয়েছি। এ সময় ঠিক হলো যে আমি এ স্কুল ছেড়ে শহরের আরো সুপরিচিত মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি

হবো, তাও তৃতীয় শ্রেণীর পর চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি না হয়ে এখানে সরাসরি পঞ্চম শ্রেণীতে চলে যাব, যাকে বলা হয় ডাবল প্রমোশন, সেটি নিয়ে। উদ্দেশ্য অবিলম্বে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা দেয়া, যা পঞ্চম শ্রেণীর পর দেয়া হয়। এগুলো ঠিক হলো আমাদের গৃহ শিক্ষক মান্নান মাস্টার ও তাঁর বন্ধু বেদার বখ্‌ত মাস্টারের পরামর্শে। বেদার বখ্‌ত মাস্টার মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক যেটি চট্টগ্রামের সব চেয়ে ভাল প্রাইমারি স্কুলগুলোর একটি বলে পরিচিত। তিনি সে স্কুলের প্রাইমারি বৃত্তি দেয়ার জন্য নির্বাচিত ছাত্রদের কোচিঙের দায়িত্বেও ছিলেন। ওই স্কুলের সুনামের একটি কারণই ছিল প্রতি বছর এখান থেকে বেশ কিছু ছাত্র বৃত্তি পেয়ে আসছে। মান্নান মাস্টার ও বেদার বখ্‌ত মাস্টার এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে তৃতীয় শ্রেণীর পড়া শেষ করলেও আমি এখনই বৃত্তির জন্য তৈরি হতে পারি। এ স্কুলের সুনাম এবং সৌন্দর্যের পেছনে ছিলেন এখানকার আরো একজন শিক্ষক—কবি আলাদীন আলা নূর—যিনি 'কবি মাস্টার' নামে খ্যাত ছিলেন। বেশ কিছু কবিতার বই লিখে তিনি পরিচিতি পেয়েছিলেন। নিজের নজরুলের মত বাবড়ি চুল, চেহারাটিও তাঁর অনেকটা নজরুলের মত। তাঁর কথাবার্তা, চালচলন কবি বা বাউলের মত নরম ধরনের, পোষাকও রঙিন পাঞ্জাবি, রঙিন লুঙ্গি—সাধারণ শিক্ষকদের মত নয়। পরে তিনি সারা স্কুলকে গাছপালা লাগিয়ে সুন্দর করেছিলেন ও তাতে নানা নীতিবাক্য লেখা বোর্ড ফাঁকে ফাঁকে লাগিয়ে সাজিয়ে তুলেছিলেন।

লামার বাজার স্কুলে আমার শেষ দিনটি ছিল বেশ স্মরণীয়। এভাবে চলে যাওয়া নিশ্চয়ই এ স্কুলের শিক্ষকদের পছন্দ হয়নি, দিলা মিয়া মাস্টারেরতো নইই। কিন্তু তিনি মনের থেকে আমাদের উন্নতি চাইতেন। শেষ দিন যখন পা ছুঁয়ে তাঁকে সালাম করলাম তিনি শুধু বললেন "দোয়া করি শুধু বাওটা উড়াইবি, বাওটা উড়াইবি" (পতাকা উড়াবি)।

মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুলে (১৯৫৪) আমার লেখাপড়ার অধিকাংশই বেদার বখ্‌ত মাস্টারের সঙ্গে। আসলে এই নামে ছাত্ররা তাঁকে ডাকতোনা, ডাকতো 'গরম মাস্টার' নামে, তাঁর মেজাজের জন্য। পঞ্চম শ্রেণীতে আমরা যারা বৃত্তি দেবার জন্য নির্বাচিত হয়েছি তারা সব শিক্ষকের সব ক্লাস করলেও আমাদের গুরুত্বপূর্ণ সময় কাটতো স্কুল ছুটির পর কয়েক ঘণ্টা কোচিঙে, গরম মাস্টারের অধীনে। গরম মাস্টার নামটি অবশ্য আমি কখনো তাঁর জন্য যথাযথ মনে করিনি। তিনি খুব শৃঙ্খলা-নিষ্ঠ হলেও বদমেজাজী বা খুব রাগী ছিলেন তা মোটেই নয়। সাদাসিধে চলতে অভ্যস্ত মানুষটির মুখে একটু কাঠিন্যের ভাব ছিল বটে, কিন্তু সেটি ছিল তাঁর বাইরের রূপ। আমরা বৃত্তির দলের সবাই তাঁর কাছে ছিলাম একটি পরিবারের মত। আমাদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু বৃত্তির কোচিঙের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলনা, বরং আমাদের কার বিশেষ কী গুণ আছে, কী সখ আছে সেই সব খবরও তিনি রাখতেন। আমাদের প্রত্যেকের প্রতি তাঁর একটি ব্যক্তিগত সহমর্মিতা ছিল,

যার কারণে আমরা নিশ্চিন্তে তাঁর উপর আস্থা রাখতে পারতাম। কারো মধ্যে সৃষ্টিশীল কিছু দেখতে পেলে সেটিকে দারুণভাবে উৎসাহিত করতেন। নিজের মত করে লেখার কিছুটা অভ্যাস আমার এ সময় গড়ে ওঠেছিল, তিনি এর প্রত্যেক পদক্ষেপে আগ্রহ দেখাতেন, ভাল কিছু হলে সবাইকে পড়ে শোনাতেন। কোচিঙের ফাঁকে কোন মজার মুহূর্ত সৃষ্টি হলে তাঁর কঠিন মুখে দেখা দিত গাল ভরা হাসি—মজাটি উপভোগ করতে আমাদের সঙ্গে তিনি পরিপূর্ণ ভাবে যোগ দিয়ে দিতেন। গরম মাস্টার ছিলেন খুব রাজনীতি সচেতন মানুষ। ওই বছরটি ছিল পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের বছর, যুক্তফ্রন্টের বছর। তিনি যুক্তফ্রন্টের ভাল সমর্থক ছিলেন, এই কথাটি কখানো আমাদের থেকে লুকোবার কোন চেষ্টা করেননি। আমাদের মান্নান মাস্টারের সঙ্গে অনেক রাজনৈতিক আলোচনায় দেশের ভাল-মন্দ নিয়ে তাঁর খুঁটিনাটি জ্ঞান অত্যন্ত প্রখর বলে মনে হতো। বিশ্ব রাজনীতিতে তাঁর আদর্শ নেতা ছিলেন অদ্ভুত ভাবে বার্মার প্রধানমন্ত্রী উ নু। তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে ডাকতেন 'উ নু' অথবা 'থাকিন নু' নামে (বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনে বার্মিজরা নিজেরাই যে দেশের মালিক এটি বোঝাতে উ নু সহ অনেক নেতা 'থাকিন' অর্থাৎ মালিক শব্দটি নামের সঙ্গে লাগিয়েছিলেন)। কেন জানি গরম মাস্টারের ধারণা হয়েছিল আমি বড় হয়ে উ নু'র মত উঁচু মাপের রাজনীতিবিদ হবো।

উ নু বার্মার স্বাধীনতার মুহূর্ত (৪ জানুয়ারি, ১৯৪৮) থেকে ওই সময় ও আরো বহু বছর ওদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। স্বাধীনতার মুহূর্তের অল্প কিছু দিন আগে (১৯ জুলাই ১৯৪৭) বার্মার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রধান রাজনৈতিক ও সামরিক নেতা অস্থায়ী সরকারের প্রধান আউঙ সান (বর্তমান নেত্রী আউঙ সান সূচির বাবা) মন্ত্রীসভার সভা চলাকালে তাঁর প্রায় পুরো ক্যাবিনেট সহ বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হয়েছিলেন। আউঙ সানের সহপাঠী, সহকর্মী ও সহযোদ্ধা উ নু স্বাধীন বার্মার হাল ধরে অসংখ্য প্রতিকূলতার মধ্যেও বার্মাকে একটি আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গড়ে তোলার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন সে সময়। সে কাজ অনেকটা সম্পন্ন করে তিনি ১৯৫৬ সালে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম চর্চা ও জনকল্যাণে রত হন। পরে নির্বাচনে বিপুল ভাবে জয়ী তাঁর দল ১৯৬০ সালে তাঁকে আবার আহবান করে ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনে। আরো পরে জেনারেল নে উইনের সামরিক শাসন বার্মার ঘাড়ে চেপে বসলে তিনি প্রথমে দেশে ও পরে বিদেশে বিকল্প সরকার গঠন করে এর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেন, কিন্তু ব্যর্থ হন। আমৃত্যু তাঁর সংগ্রাম চলেছে, এমন কি আউঙ সান সূচির নেতৃত্বে সাম্প্রতিক গণতন্ত্রের আন্দোলনেও শেষ বয়সে তিনি তাঁর মত করে (যা সূচির সঙ্গে মিলেনি) সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। আমার ভাবতে ভাল লাগে যে গরম মাস্টার এসবের অনেক আগে যে কারণেই হোক আমাকে এরকম একজন নেতার নামে ডাকতেন।

গরম মাস্টারের একটি বড় গুণ ছিল আমাদের নানা জনকে স্বাধীন ভাবে করার জন্য নানা কাজে এগিয়ে দেয়া। স্কুল বোর্ডের চেয়ারম্যান আসবেন, 'এই

তুমি লিখবে তাঁর কাছে ছুটির দরখাস্ত; তুমি, তুমি, আর তুমি গিয়ে তাঁকে এটি দেবে, তাঁর সব প্রশ্নের জবাব দেবে।' স্কুলে অনুষ্ঠান হবে, 'এই তোমরা আজ বিকেলে এর রিহার্সেল করবে, ঠিক করবে কে কোন গান গাইবে, সব ঠিক করে কাল আমাকে দেখাবে।' ওই দশ-এগার বছরের বালক আমাদের উপর তাঁর অনেক আস্থা। এই আস্থা দ্রুত আমাদেরকে স্বাধীন ভাবে চিন্তা ও কাজ করার পথে এগিয়ে নিতে সহায়ক হয়েছিল।

এই বৃত্তির দলের অন্য ছেলেদের কাছে খুব বড় বড় কথা শুনতে লাগলাম। 'প্রশ্নোত্তরিকা' নাকি শিগ্‌গীর আসবে—মোটা মোটা প্রশ্নোত্তরিকা। গত ১৫/২০ বছরের সব বৃত্তি পরীক্ষার সব প্রশ্ন নাকি সেখানে থাকে—সেই বৃটিশ আমল থেকে। এগুলোর উত্তর শিখতে হবে, বহুবার বৃত্তি পরীক্ষার রিহার্সাল দিতে হবে। আবার এক সময় শুনলাম এর পর নাকি অঙ্কের জন্য আমাদেরকে 'যাদব' দেয়া হবে। যাদব কী জিনিস কোন ধারণাই ছিলনা—পরে জেনেছি এটি যাদবচন্দ্র চক্রবর্তীর লেখা বিখ্যাত মোটা পাটিগণিত বই। আমাদের বৃত্তির জন্য অবশ্য তার পুরোটা দরকার ছিলনা—কিন্তু যেটুকু দরকার সেটুকুও ভয় লাগিয়ে দেয়ার মতো। প্রশ্নোত্তরিকা, যাদব সবই একের পর এক এলো। গরম মাস্টারের সন্তুষ্টি ঘটাতে আমার যে খুব অসুবিধা হলো তা নয়, শিগ্‌গীর দলটির মধ্যে অগ্রগণ্যতা পেলাম; মাঝখানে আমার যে চতুর্থ শ্রেণী পড়াই হয়নি এ কথাও সবাই ভুলে গেল। স্কুলে গরম মাস্টার এবং বাড়িতে মান্নান মাস্টারের ভূমিকা এতে কম ছিলনা। তবে তাঁদের পরিকল্পনা মতো যে আমি চলতাম তা বলা যাবেনা। লেখাপড়ায় আমার নিজস্ব পরিকল্পনা করার অভ্যাস তখন থেকেই দেখা দিয়েছে—বেশ জেদ ধরে এক একটি সমস্যা অতিক্রম করার অ্যাকশন প্ল্যান করা তখনই অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।

আসল সমস্যা ছিল অন্য জায়গায়। গরম মাস্টারের সঙ্গে কবি মাস্টারের চলছে সাংঘাতিক মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ। স্কুলের প্রায় সব শিক্ষক তাঁদের দুই ক্যাম্পে বিভক্ত। খুব ভাল মানুষ গোছের একজন হেড মাস্টার ছিলেন—তিনি যে কার দলে সেটি কখনো বুঝতে পারিনি। যুদ্ধটির কারণও কখনো জানতে পারিনি। তবে শুনেছি কিছু দিন আগেও যুদ্ধটা নেহাত ঠাণ্ডা যুদ্ধ ছিলনা—হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে গেছে। বিবাদের একটি কারণ যে আমরা, তা স্পষ্ট ছিল। বৃত্তির ছাত্রদের উপর গরম মাস্টারের একচ্ছত্র আধিপত্য কবি মাস্টারের পছন্দ ছিলনা। গরম মাস্টারের সাম্রাজ্যের অংশ হিসেবে আমার পক্ষে কবিকে এড়িয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু তা হবার জো ছিলনা। তিনি আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমাকে ডাকতেন 'বইন ফুৎ' (বোনের ছেলে) বলে। তাঁর কবিসুলভ নান্দনিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বন্দ্ব কলহের কোন চিহ্ন দেখা যেতনা। কিন্তু গরম মাস্টার ও কবি মাস্টার উভয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে কাজ করছিলেন। বৃত্তি দলের বাকিরা—বদি, মাহফুজ, সঞ্জীব, বাদল এবং আরো বেশ কয়েকজন নিশ্চিন্তে গরম মাস্টারের হয়ে কবির লম্বা বাবড়ি, রঙিন

পোষাক ইত্যাদি নিয়ে হাসি ঠাট্টা করতো। আমি ছিলাম উভয় সংকটে—স্কুলের ভেতর আমার বড় সমস্যা ছিল এই একটাই। তা ছাড়া স্কুলের মান, এর ছাত্রদের মান, শহরের চমৎকার স্থানে এর অবস্থান, এর সুন্দর বাগানে ঘেরা ঘর—সব ছিল লামার বাজার স্কুলের থেকে অনেক ভাল। কিন্তু যখন এই কলহের কথা ভাবতাম তখন মনে হতো আমার আগের স্কুল, এবং দিলা মিয়া মাস্টারই ছিল ভাল।

কলহের একটি বাজে বাস্তব প্রকাশ একবারই শুধু দেখেছিলাম; তাও আমাদের এক বন্ধুর জন্য যথেষ্ট হয়রানি ঘটিয়ে। পঞ্চম শ্রেণী যখন প্রায় শেষ হয়ে আসছিলো আমাদের বৃত্তির দলে এসে যোগ দিয়েছিলো সুভাষ নামের একটি ছেলে। আলবিনো হবার কারণে তার সারা শরীর এমন কি চুল, চোখের ভ্রু পর্যন্ত সাদা ছিলো—তাই ওকে সবাই ডাকতাম সুভাষ সাহেব। নতুন এলেও খুব দ্রুত সে আমাদের ভাল বন্ধু হয়ে ওঠেছিল। সুভাষ আমাদের স্কুলে সব কিছু করলেও কেন জানি সে কিন্তু স্কুলের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়নি, কাজেই স্কুলের নিয়মিত ছাত্র ছিলনা। হয়তো এখানে কোচিং করে অন্য কোন স্কুল থেকে বৃত্তি দেবার পরিকল্পনা ছিল তার। কবি মাস্টারের দল এই বিষয়টি গরম মাস্টারের বিরুদ্ধে ব্যবহারের সুযোগ খুঁজছিলেন। একদিন স্কুল ইনস্পেক্টর বিনা নোটিশে পরিদর্শন করতে এলে সুভাষকে ইশারা করা হলো, এবং সে জানালা টপকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলো, কিন্তু একজন শিক্ষক দৌড়ে গিয়ে তাকে ধরে আনলেন। ইন্সপেক্টর সাহেব এই নিয়ে তদন্ত করলেন, ছাত্রদের সাক্ষ্য নিলেন। মনে হলো আগে থেকে অভিযোগ ছিল তাঁর কাছে। সুভাষ অবশ্য তারপরও আমাদের সঙ্গেই রইলো।

স্কুলে আসা যাওয়ার পথে

মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুলের বছরটির গুরুত্ব আমার কাছে যতটা না স্কুলের ভেতরের জন্য তার চেয়ে বেশি স্কুলের পথের জন্য। মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারি স্কুলটি চট্টগ্রাম শহরের অনেকটা কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত, বর্তমান বিপনী বিতানের পাশে। ছাত্রদের কাছে কৌতূহলভরা গন্তব্য হতে পারে এমন জায়গাগুলো—স্টেডিয়াম, লালদিঘির মাঠ, স্টেশন, পাহাড়ের ওপর কোর্ট বিল্ডিং—এসব স্কুল থেকে কাছে, সহজেই হেঁটে যাওয়া যায়। যেই পথে হেঁটে স্কুলে প্রতিদিন আসা যাওয়া করতাম সেটি খুবই ইন্টেরেস্টিং। সাধারণত বদরপাতির ভেতর দিয়ে বদর শাহর মাজারের সামনে দিয়ে আছদগঞ্জ হয়ে লাল দিঘির পাড়ে আসতাম। একটু পরেই লালদিঘির মাঠ যেখানে চট্টগ্রামের সব রাজনৈতিক জনসভাগুলো হতো এবং এখনো হয়। জনসভা যখন থাকতোনা তখন এখানে নানা অংশে নানা পাবলিক শো হতো, আবার স্থানীয় ক্লাবের খেলার প্র্যাকটিসও হতো। এখানেই প্রথম বড়দেরকে ক্রিকেট খেলতে দেখি। নতুন স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে স্টেডিয়ামের মাঠে গিয়ে চট্টগ্রাম লীগের ফুটবল খেলা আগেই দেখেছি। মারী, ম্যাকওয়া, আইজ্যাক প্রভৃতি বিখ্যাত নামগুলোর সঙ্গেও তখনই পরিচিত হই, কয়েক জনকে

দেখি। এরা চট্টগ্রামের এবং প্রদেশেরও বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড়। ভিন্ন ধরনের নাম বলে এদের কথাই মনে আছে। তবে খেলাধূলা নয়, স্কুলে আসা যাওয়ার পথে অল্পক্ষণের জন্য হলেও যেটি বেশি উপভোগ করতাম সেগুলো হলো সাধারণ পারফরমারদের পাবলিক শো। বিশেষ করে একজন বানর নাচিয়ের কথা খুব মনে পড়ে। ক্ষেতি বুড়ি ও ক্ষেতি বুড়া নামে তাঁর দুটি বানর ছিল। তিনি প্রতি শো'তে ডুগডুগি বাজিয়ে ওদের বিয়ে দেখাতেন। ক্ষেতি বুড়ি বিয়ের জন্য নিজেই নিজেকে সাজাতো—পাউডার মাখতো, চুল বাঁধতো, আয়না সামনে ধরে মুখ দেখতো। বিয়ের আসরে লাজুক মেয়ের মতো বসে থাকতো ঘোমটা টেনে। ক্ষেতি বুড়াও বরের ভূমিকা যথারীতি পালন করতো। সঙ্গে সঙ্গে বানর নাচিয়ের ডুগডুগি সহকারে গানের বর্ণনা একে আরো প্রাণবন্ত করে তুলতো। বিয়ের পর দুজনেই আবার দুটি টুপি উল্টা করে ধরে সবার সামনে গিয়ে পয়সা চাইতো, পয়সা না দেয়া পর্যন্ত সরতোনা। কী চমৎকার ভাবে ট্রেনিং দেয়া হয়েছে ওদের! খেলা শেষে চেইনে বাঁধা বেচারা দু'জন বানর নাচিয়ের সঙ্গে চলে যেত সুড়সুড় করে।

বদি আর আমি এখানে একদিন মাকড়সা-কন্যা দেখেছিলাম টিকেট কেটে। তার দেহের নিচের অংশ বড় মাকড়সার ওপরের অংশ একটি মেয়ের মুখ। মাকড়সা-কন্যাকে রাখা হয়েছিল একটি তাঁবুর মধ্যে। তাঁবুর সামনে টিকেট কাটা দর্শকদের লম্বা লাইন। দু'তিনজন দু'তিনজন করে এক সঙ্গে ঢুকতে দেয়া হচ্ছে কয়েক মিনিটের জন্য। আমি, বদি ও আর একজন এক সঙ্গে ঢুকলাম। প্রদর্শক মাকড়সা-কন্যাকে দু'একটি প্রশ্ন করছেন, কন্যা সংক্ষেপে তার জবাব দিচ্ছে। বেশ বড়সড় মাকড়সার মুখের দিকটি তরুণী একটি মেয়ের যে সুন্দর ভাবে মুখসজ্জা ও কেশ বিন্যাস করেছে। কথার উত্তরও সুন্দর বাংলাতে দিচ্ছে এই মৃদুভাষী মাকড়সা-কন্যা। দর্শকরা প্রশ্ন করলে তার উত্তরও দিচ্ছে। আমরা এতটা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম যে নিজেরা কোন প্রশ্ন করলামনা, যা বলা হচ্ছে তা শোনলাম শুধু। দেখার পর বদি আর আমি তর্ক করতে করতে বাড়ি চললাম। ওর ধারণা মেয়েটি এরকমই। আমার কথা কোন একটি চালাকি আছে এখানে, তবে চালাকিটি যে কী ধরতে পারিনি। মাঠে ম্যাজিক শো যেগুলো হতো তার অধিকাংশ ছিল ওষুধ বিক্রি। ম্যাজিকের মাঝখানে খুব মজার সময়টিতে কিছুক্ষণের জন্য ম্যাজিক স্থগিত করে চলতো ওষুধের ক্যানভাস। তবে তাদের বাচনভঙ্গি ছিল রীতিমত আকর্ষণীয়।

লালদিঘির পারের মাঠ পেরিয়ে পরের পথটুকু অন্য ভাবে আকর্ষণীয়। সেখান থেকে সুন্দর রাস্তা বেয়ে পরীর পাহাড়ে উঠতাম কোর্ট বিল্ডিঙের সামনে, যেখান থেকে শহরের একাংশ দেখা যায়। চট্টগ্রামের আদি পত্তন নিয়ে যে উপাখ্যান রয়েছে তাতে এই পাহাড় এক সময় জ্বিন-পরীদের দখলে ছিল, পীর বদর শাহ এসে একটি চাটি (চেরাগ) জ্বালিয়ে ওই জ্বিন পরীদের বিতাড়িত করেছিলেন। তাই এর নাম পরীর পাহাড়। এর উপর বিশাল কোর্ট বিল্ডিং ভবনটি নিজেও বেশ

পুরোনো নিদর্শন—শতাধিক বছর ধরে ইংরেজ শাসনের স্থানীয় কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ওই কলোনিয়াল স্টাইলের স্থাপত্য ধারা ধরে রেখে। এ যে কত বড় আর কত জটিল একটি ভবন তা আগেই মান্নান মাস্টারের সঙ্গে তাঁর খাস মহলের অফিসে গিয়ে টের পেয়েছি। এখন স্কুলে আসা-যাওয়ার পথে মাঝে মাঝে এর সামনের সুন্দর খোলা জায়গাতে দাঁড়িয়ে শহরের একটি প্যানারোমিক ভিউ নেয়াটাই ছিল আমাদের বড় আনন্দ। আবহাওয়া রোদেলা থাকলে কর্ণফুলির এ পার ওপার অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যেত। সদর ঘাট, তারপর বন্দরের জেটিগুলো, নদীতে জাহাজ, পাড়ে রেলপথ সব কিছু। এখান থেকে দেখতাম পি কে সেনের সাত তলা কুঠি, যা কিনা সে সময় সর্বোচ্চ ভবন বলে দর্শনীয় স্থান হিসেবে পাঠ্য বইয়ে স্থান পেয়েছিল, অথচ সাত তলার ওপরের দিকের ক'টাকে ঠিক তলা বলা যায় কিনা ছিল সন্দেহ। সাধারণ দিনগুলোতে কোর্ট কাছারীর কারণে এ অঞ্চলে মানুষের ভীড় থাকতো। কিন্তু ছুটির দিনে, অথবা ভোর বেলায় বেড়াবার জন্য আর দৃশ্য দেখার জন্য এর কোন তুলনা হতো না। এই পাহাড় থেকে অন্যদিকে দীর্ঘ খাড়া সিড়ি বেয়ে যেখানে নামতাম ঠিক সেখানেই আমাদের স্কুল। পথে পাহাড়ের আরো ওপরে সুন্দর এডিসির বাংলো।

মূল পথে পাহাড়ে না ওঠে একটু অন্য পথে ওঠলে সেদিকটা অনেক নির্জন। ওখানে ছিল একটি দমকল কেন্দ্র—কয়েকটি দমকলের গাড়ি সব সময় মজুদ থাকতো। পাহাড়ে ওঠতে ক্লান্ত হলে অনেক সময় ওই দমকলের কেন্দ্রে জিরিয়ে নিতাম। ওভাবে ওখানকার দমকল বাহিনীর লোকজনের সঙ্গে বেশ চেনা জানা হয়ে গিয়েছিল; তাঁদের গাড়ি ও যন্ত্রপাতির সঙ্গেও। দমকল নিয়ে একেবারে শিশুকাল থেকে আমার প্রচণ্ড কৌতূহল ছিল। বক্সীর হাট বাসার সামনে দিয়ে মাঝে মাঝে খুব দ্রুত ঘণ্টা বাজিয়ে দ্রুতবেগে দমকলের গাড়ি যেতে দেখতাম। লাল গাড়ি, পেছনে পানির ট্যাংক, যন্ত্রপাতি নিয়ে কয়েকজন দাঁড়িয়ে থাকতেন, সামনের সীটে ড্রাইভার, আর তাঁর পাশের সীটে একজন যাঁর সামনে সুন্দর একটি পেতলের ঘণ্টা যা তিনি পাগলের মত দ্রুত বাজাতে থাকতেন। সবার পরনে খাকি ইউনিফর্ম, মাথায় দমকলের হেলমেট। গাড়ির পেছনে অথবা কখনো কখনো এর পেছনে বাঁধা ট্রেইলারে চুপসে থাকা হোস পাইপ রোল করা থাকতো। আজকালকার মতো অ্যালার্ম হর্ন বাজানো দমকল তখন ছিলনা। মূল গাড়িটা যাবার পর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট গাড়ি যেত, যাতে একটু বেশি জমকালো ইউনিফর্ম পরা একজন থাকতেন, আমাদেরকে বলা হতো এবার অফিসার গেলেন, যিনি আগুন নেভানো তদারক করবেন। আরো বেশ খানিক্ষণ পর কিছুটা কম বেগে সব কটি গাড়ি আবার আমাদের সামনে দিয়েই ফেরত যেত। তখনো ঘণ্টা বাজানো হতো, তবে অলস ভাবে একটি আওয়াজের খানিক্ষণ পর আরেকটি আওয়াজ; আগুন নিভিয়ে ফিরছেন তাঁরা। একবার শুধু তাঁদেরকে আমাদের দোকানের সামনে থামতে দেখেছিলাম—যেদিন সামনের পরেশ লালের বিল্ডিঙের

ছাদে আগুন লেগেছিল। কিন্তু হৈচৈ করে নামলেও তাঁদের কোন কাজ করতে হয়নি, এর মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলা হয়েছিল। স্কুলের পথে এই দমকলের মানুষদের সঙ্গে খাতির জমানোটি অন্য রকম একটি সংকটে কাজে লেগে গিয়েছিল।

ছুটির দিন রোববারে বৃত্তির দলের ক্লাস ছিল। আমরা তিন চারজন যখন পাহাড়ি পথে স্কুলে যাচ্ছিলাম জায়গাটি একেবারে নির্জন ছিল। হঠাৎ করে ষণ্ডা মত বেশ ক'জন যুবক (হয়তো বড় ছেলেও হতে পারে, সে সময় অনেক বড় মনে হয়েছিল) আমাদের পথ আগলে গালাগালি ও মারধোর শুরু করে। আমরা হঠাৎ এই অভাবনীয় আক্রমণে ভয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। দৃষ্টি সীমানায়ও কেউ নেই যে চিৎকার করলে শুনবে। আমরা আছি পাহাড়ি পথে, দুদিকেই খাড়া ঢাল; ঘাসে ঢাকা ও কিছু কিছু গাছে ঢাকা পাহাড়ের। তারপরও আমরা গলা ছেড়ে প্রচণ্ড চিৎকার করলাম, হাত পা ছুঁড়লাম। চারদিকে খোলা জায়গা, আওয়াজ অনেক দূর যায়। সামনেই এডিসির বাংলোর সঙ্গে পুলিশ রয়েছে। এতে ষণ্ডা কয়েক জন মনে হলো একটু ভয় পেলো। ওরা বাকিদের দিকে মনোযোগ একটু কমিয়ে আমাদের সঙ্গের সঞ্জীবকে ঠেলতে ঠেলতে পথের বাইরের ঢালের দিকে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে লাগলো। এই সুযোগটি গ্রহণ করে আমরা কিছুটা দৌড়ে, কিছুটা গড়াতে গড়াতে যেদিকে দমকল কেন্দ্রটি আছে সেদিকে পড়ে যেতে লাগলাম অসম্ভব চিৎকার করতে করতে। এতে কাজ হলো দমকল ঘরটির সামনে দমকলের যে ক'জন সেন্ট্রি ডিউটিতে ছিলেন তাঁরা আমাদেরকে দেখতে পেলেন, ঘণ্টা বাজিয়ে অন্য সবাইকে সাবধান করে দিলেন। দমকলে যাঁরা ছিলেন সবাই তাঁদের সঙ্গে থাকা কুঠার ইত্যাদি নিয়ে (যা আগুন নেভাতে ব্যবহৃত হয়) খুবই দ্রুত আমাদের কাছে চলে এলেন। এ সবের আলামত দেখে এর আগেই ষণ্ডারা পালিয়েছিল, সঞ্জীবকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে। আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে দমকলের লোকরা ওদের খানিক্ষণ খুঁজে বেড়ালেন—কিন্তু তারা ততক্ষণে হাওয়া। সবাই দমকল কেন্দ্রে গেলাম। আমাদের হাত পা ছড়ে গিয়েছিল, জামা কাপড় নোংরা হয়েছে, কিছুটা ছিড়ে গিয়েছে। সঞ্জীবের আঘাতটি বেশি ছিল, কিন্তু তাও তেমন কিছু নয়। ওখানে সুন্দর ফার্স্ট এইডের ব্যবস্থা ছিল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে ধাতস্থ হলাম তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে। শোনলাম এখানে এরকম ষণ্ডা কিছু কিশোর বয়সী ছেলে আছে যারা ডাল-পাতা কুড়ানোর ছলে মাঝে মাঝে এমনটি চড়াও হয়; চুরি-চামারিও করে। কাপড়চোপড় কিছু ঝেড়ে মুছে বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে এসে সব বল্লাম বটে তবে যতটা ভয় পেয়েছিলাম ততটা বললামনা, কারণ পাহাড়ের ওপর দিয়ে স্কুলে যাওয়া যদি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়। এরপর ছুটির দিনে ওই পথে স্কুলে আর যেতামনা, রাস্তা দিয়ে অনেক খানি ঘোরা পথে যেতাম।

আমাদের স্কুলের পেছনে পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছিল পুরো দেশের মধ্যে সব চেয়ে বড় বইয়ের দোকান—কোঅপারেটিভ বুক সোসাইটির দোকান। বিশাল

বিশাল কামরার মধ্যে বিশাল বিশাল কাচে ঢাকা শেলফ, বইয়ের বৈচিত্র অবশ্য সে রকম ছিলনা। ক্রেতাও নেই বললে চলে। হাতে সময় থাকলে ওই দোকানে নিজের খেয়ালে ঘুরে ফিরে বই দেখতাম। অন্য দিকে স্কুলের সামনে রাস্তার ওপারে খুবই ঠাসাঠাসি অবস্থায় ছিল 'নিউজ ফ্রন্ট' এবং আরো কিছু বই-ম্যাগাজিনের অত্যন্ত ব্যস্ত দোকান; চট্টগ্রামে খুব জনপ্রিয়। এখানে বই-ম্যাগাজিনের সমারোহ বেশি, ভীড়ের মধ্যে বই বা ম্যাগাজিন দেখা কঠিন হতো—কিন্তু তবুও দেখতাম। শুধু দেখতাম মাত্র, কেনার সুযোগ হতো না। কারণ এখনো হাতে পয়সা কিছু থাকলেও টাকা বড় একটা থাকতোনা। স্কুলে আসার সময় টিফিনে খরচ করার জন্য চার আনা (এক টাকার চার ভাগের এক ভাগ) করে পেতাম। সেই চার আনা থেকে ওপরে উন্নতি হতে আরো বেশ ক'বছর লেগে গিয়েছিলো। ইউনূস ভাই অবশ্য মাঝে মাঝে বই কিনে দিতেন। সালাম ভাইয়ের বরাবর অভ্যাস ছিল নিউজ ফ্রন্ট থেকে দেশী ও বিদেশী পত্রিকা ও ম্যাগাজিন কিনে আনা। এগুলোর প্রতি আমার আকর্ষণ ছিল প্রচণ্ড। ইলাস্ট্রেটেড উইকলি, মিরর ইত্যাদি ইংরেজি পত্রিকাও বড়দা কিনতেন। ছবি সমৃদ্ধ ছিল বলে লেখা-ছবি মিলে যতটা বুঝতাম তাতেই খুব ভাল লাগাতো। যেসব বই একেবারে নিজের করে পেতাম সেগুলোকে যখের ধনের মত মনে হতো। পাওয়া মাত্র খুবই আনন্দে নিজের নাম আর তারিখটি সাবধানে বইয়ের ভেতর লিখতে মুহূর্তমাত্র দেরী করতামনা। সারা জীবন সেই অভ্যাস বজায় রয়েছে।

বাইরে যেমন চার-আনী কৃচ্ছ সাধনা, স্কুলে যাবার সময় বাসায় খাওয়াটাও প্রায়শ ওরকম কৃচ্ছ সাধনার মধ্যে হতো। এর কারণ সকাল দশটার মধ্যে খেয়ে স্কুলে চলে যেতে হতো। এত সকালে বাজার এনে রান্নাবান্না বড় একটা হতো না। তাই প্রায় দিনই একটি সংক্ষিপ্ত ঝটপট তৈরি করার মত লাঞ্চের মেন্যু থাকতো। এমনি একটি সংক্ষিপ্ত মেন্যু হলো গরম ভাতের সঙ্গে ডিম পোচ, 'কাঁজি' আর চা পাতার ভর্তা। কাঁজি জিনিসটা ছিল তাৎক্ষণিক ভাবে তৈরি অম্বল—বয়াম থেকে বড়ইয়ের আচার বের করে তা কিছু সরষে তেল সহ ঠান্ডা পানিতে গুলে নেয়া হতো। ডাল বা ঝোলের বিকল্প হিসেবে ভাতের সঙ্গে খেতে এই টক তরলটি ভালই লাগতো! চায়ের পাতার ভর্তা মানে চা তৈরির পর ব্যবহৃত পাতাকে পেঁয়াজ কাঁচা মরিচ সহযোগে ভর্তা করা। ব্যবহৃত চায়ের পাতারও একটি নিজস্ব স্বাদ আছে বৈকি! বাড়িতে সারা দিন প্রচুর চা তৈরি হতো। তাই ব্যবহৃত চায়ের পাতার অভাব হতো না। অবশ্য একই রকম মেন্যুতে কখনো বা আলু ভর্তার ব্যবস্থাও থাকতো। আলুর ভর্তা আমার বিশেষ ভাবে প্রিয় খাবার ছিল, সঙ্গে যদি ডাল থাকতো তা হলে তো কথাই নেই। মনে রাখতে হবে আলু সে সময় সারা বছর পাওয়া যেতনা, কারণ কোল্ড স্টোরেজের চলন ছিলনা। একটি শীতকালীন সবজি হিসেবে এর আদরই ছিল আলাদা; আমরা বলতাম বিলাতী আলু।

স্কুলের পথে সোনার খনি

স্কুলের থেকে স্কুলের পথের গুরুত্ব বেশি মনে হওয়ার প্রধান কারণ অবশ্য পথের ওই সব প্রাকৃতিক অথবা মানুষসৃষ্ট চমকপ্রদ দৃশ্যাবলী নয়। বই-ম্যাগাজিন নাড়াচাড়া করার বইয়ের দোকানও নয়। সে কারণটি ছিল এই পথের ওপরেই এমন কিছু খুঁজে পেয়েছি যার ফলে বিচিত্র বই পড়ার অফুরন্ত সুযোগ পেতে আর কোনদিন কোন অসুবিধা হয়নি। ওখানেই ঐসময় একটি নয়, তিন তিনটি লাইব্রেরির দরজা আমার জন্য খুলে গিয়েছিল যেগুলোকে অফুরন্ত সোনার খনির মতই মনে হয়েছে। এগুলো সবই একই দালানে—লালদিঘির পাড়ে যে বাগানটি রয়েছে তা ঘেঁষে একই দালানের নিচের তলায় চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যাল পাবলিক লাইব্রেরি, উপরের তলায় ইউএসআইএস (ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস) লাইব্রেরি, এবং কিছুদিন পরে নিচের তলার অন্য অংশে বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি। প্রত্যেকটির সঙ্গে পরিচিত হবার কাহিনী একটু ভিন্ন ভিন্ন রকম।

ঐ বছরটিতে কলেজিয়েট স্কুলে ইউনূস ভাইদের পাঠ শেষ হবার পালা—ক্লাস টেনের ছাত্র হিসেবে। ইউনূস ভাইয়ের সহপাঠী আহসান ভাই (পরে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের স্বনামধন্য বিজ্ঞানী) আমাকে স্কাউটিঙের কারণে খুব ভাল করে চিনতেন এবং স্নেহ করতেন। তিনি এবার পরিবারের সঙ্গে চট্টগ্রাম থেকে ঢাকায় চলে যাবেন। পাবলিক লাইব্রেরিতে তাঁর একটি মেম্বারশিপ আছে; যার জন্য ১৫ টাকা ডেপোজিট হিসেবে জমা দেয়া আছে সেখানে। তিনি আর ওই ডেপোজিটটি তুলে নিতে চাননা—বরং তাঁর মেম্বারশিপটি আমার কাছে হস্তান্তরিত করতে চান। কিন্তু আমার বয়সে মেম্বার হওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্যার সমাধান করে দিলেন ওখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান তরুণ বয়সী মূসা সাহেব। তিনি বললেন মেম্বারশিপ আহসান ভাইয়েরই থাকবে, আমি শুধু তাঁর পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করে বই ধার করে নিয়ে যাব। এক সঙ্গে তিনটি বই, সময়মত ফেরত দিয়ে আরো বই। সেই থেকে পাবলিক লাইব্রেরিতে আমার যাওয়া আসা। সেই যে শুরু হলো বেশ কয়েক বছর ওভাবে চললো; যদিও পরের বছর থেকে এটি ঠিক স্কুলে যাওয়ার পথে আর পড়তোনা। খুব বেশিক্ষণ থাকা হতো না সেখানে। কাচের দরজা দেয়া আলমারির বাইরে থেকে বই বাছাই করলে সেই আলমারি খুলে দেখতে দেয়া হতো। উল্টে পাল্টে দেখে বই বাছাই চূড়ান্ত করতাম।

শিশুতোষ বই বলে কিছু তেমন ছিলনা—শিশুদের কথা মনে রেখে লাইব্রেরিটির পরিকল্পনা করা হয়নি। বড়দের বইই আমি পড়তাম—সবই বাংলা বই; বড়দের ইংরেজি বই পড়ার মত বিদ্যা তখনো হয়নি। নানা রকম বই পড়া হয়েছে সেখানে—ওই সময় থেকে পরবর্তী বেশ ক'বছর ধরে। এখানেই বিভিন্ন ধরনের বইয়ের প্রতি আমার আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে। মহৎ চিরায়ত সাহিত্য যে খুব বেশি পড়েছি তা বলা যাবেনা। আমার বরং ভাল লাগতো ইতিহাস, ডায়েরি, আত্মজীবনী—সব চেয়ে বেশি ভ্রমণ কাহিনী। এক এক সময় কিছু দিন একটি

বিষয়ে আগ্রহটি বেড়ে যেত, তখন খুঁজে খুঁজে সেগুলো বের করে পড়তাম। যেমন 'মহাপ্রস্থানের পথে' পড়লাম। একই রকম 'দেবতাত্মা হিমালয়' ইত্যাদি বই তো পড়লামই, হিমালয় অঞ্চলে ভ্রমণের এই একই বিষয়ের ওপর তার থেকে অখ্যাত বইগুলোও ছাড়লামনা। বেশ কিছুদিন এভাবে ডুবে রইলাম বরফ ঢাকা শৃঙ্গগুলো সামনে রেখে বন্ধুর পথে তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে কেদারনাথ, বদরীনাথ, হৃষিকেশ, অমরনাথ গুহা, সাধু সন্ন্যাসী, আধ্যাত্মিক মানুষ, আবার সাধারণ দর্শনার্থীদের সঙ্গে। এক সময় অখ্যাত একজন লেখকের সাদামাটা লন্ডন ভ্রমণের বর্ণনা ভাল লেগে গেল কারণ তিনি এমন কালে লন্ডনে ভ্রমণ করেছিলেন যখন সেখানকার বিখ্যাত পাতাল রেল সবে শুরু হয়েছে। অল্প অল্প জায়গায় সেই রেল চলছে, অন্যত্র কাজ চলছে। বাংলাদেশের একেবারে মামুলি অভিজ্ঞতায় বেড়ে ওঠা সেই লেখক অবাক বিস্ময়ে সেদিনের লন্ডনের চিত্র এঁকেছেন। এরকম অনেক পুরোনো দিনের বর্ণনা নিয়ে বই পড়তে খুব ভাল লাগতো।

কোন কোন বিষয়ের উপর পক্ষপাতিত্ব থাকলেও আসলে কোন ধরনের বইয়ে আমার কোন আপত্তি ছিলনা; কিন্তু বাধ সাধতেন মুসা সাহেব। তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই কেন জানি লাইব্রেরিতে আমার অভিভাবকত্ব নিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি এত অল্প বয়সে বিভিন্ন ধরনের বিষয়ে বই পড়তে আমার আগ্রহের প্রশংসা করতেন, অন্যদের কাছেও বলতেন এবং বই বাছাই করতে সহায়তা করতেন। কিন্তু আবার অন্যদিকে তিনি আমার জন্য এক রকম সেন্সরশীপ আরোপ করেছিলেন—কোন কোন বই আমার উপযুক্ত নয় বলে নিতে না-দিয়ে। বিভিন্ন সময় এক জন বয়োবৃদ্ধ ভদ্রলোককে পাবলিক লাইব্রেরিতে এসে বই ঘাঁটাঘাটি করতে দেখেছি, কিছুক্ষণ বসে পড়তেও দেখেছি। বয়সের ভারে কিছুটা দুর্বল হলেও চেহারাটি তাঁর খুবই বিশিষ্ট—আমার কাছে কিছুটা জিন্নাহর চেহারার মত মনে হতো—কানে ইয়ার ফোন লাগানো, সেটিও আমার জন্য একটি নতুন জিনিস ছিল। মুসা সাহেবই ফিস ফিস করে আমাকে একদিন বলেছিলেন যে ইনি নূর আহমদ চেয়ারম্যান। এই পরিচয় পেয়ে আমি খুব শিহরিত হলাম, এমন একজন ব্যক্তিত্বকে চোখের সামনে একই লাইব্রেরির সহপাঠক হিসেবে দেখে। এই সেই চট্টগ্রামের কিংবদন্তির মানুষটি—দীর্ঘ কাল চট্টগ্রাম পৌরসভার চেয়ারম্যান, তখনো পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের সদস্য, যেখানে তাঁর সর্বাধিক সংখ্যক প্রশ্ন করার রেকর্ড তখনো খুব সম্ভব অক্ষুণ্ন ছিল। সর্বোপরি ইনিই সেই চেয়ারম্যান যিনি পুরো পাকিস্তানে একমাত্র চট্টগ্রাম শহরেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়াটি বাধ্যতামূলক করে, না যাওয়াকে আইনত দণ্ডনীয় করেছিলেন। অভর্তিকৃত ও অনুপস্থিত শিশুদের অভিভাবকদের প্রতি দিলা মিয়া মাস্টার যেই তেজ দেখাতেন তার উৎসও এই বৃদ্ধ মানুষটি।

সে সময় ওই একই দালানের দ্বিতীয় তলায় আমার প্রবেশাধিকার ঘটেছিল আর একটি লাইব্রেরির উপলক্ষে—ইউএসআইএস লাইব্রেরি। তবে প্রথম দিকে

সেটি বই পড়তে নয়, সিনেমা দেখতে। পাবলিক লাইব্রেরিতে যাওয়া আসার সুবাদে জানতে পেরেছিলাম যে ওপরের তলায় রাতে মার্কিন তথ্য চিত্র দেখানো হয়। মুসা সাহেবই বলেছিলেন, কারণ তাঁর ছোট ভাই ওখানে কাজ করেন। এরপর থেকে প্রায়ই নিয়ম করেই ওই তথ্য চিত্রগুলো দেখতে যেতাম সন্ধ্যার পরে। এর জন্য অবশ্য সকালে স্কুলে যাবার পথেই ফ্রি টিকেট সংগ্রহ করে নিতাম। কোনটি বাংলায় আবার কোনটি ইংরেজিতে তথ্য চিত্রগুলো দেখানো হতো—প্রধানত আমেরিকান ইতিহাস, ওখানকার বিখ্যাত মানুষের জীবনী, ওখানকার জীবনযাত্রা, এসব নিয়েই ছবি। সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের, চিত্রকলার, এবং এমনি আরো নানা বিষয়ের ছবি থাকতো। আমার খুব ভাল লাগতো। টিকেট সংগ্রহ করতে গিয়েই একদিন জানলাম যে এখানে ওরা বাচ্চাদেরকেও লাইব্রেরির সদস্য করে থাকে। একটি ফরম পূরণ করে সদস্য হয়ে গেলাম। কয়েকদিন পর বই ধার করার জন্য একটি কার্ডও পেয়ে গেলাম। এটি দেখিয়ে বাচ্চাদের সেকশনের তিনটি করে বই বাসায় নিয়ে আসতে পারতাম। বড় হরফের পাতলা সব বই—কিন্তু চমৎকার রঙিন ছবিতে ভরা। পাবলিক লাইব্রেরিতে সব অবয়বে আকর্ষণহীন ভারী ভারী বই পড়তে হতো, কিন্তু এখানে বাচ্চাদের জন্য অদ্ভুত সব আকর্ষণীয় বই। ইংরেজিতে লেখা হলেও ছবির সঙ্গে মিলিয়ে আস্তে আস্তে পড়ার ও বোঝার অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেল। এখানেই আমি প্রথম বিজ্ঞানের বইয়ের দিকে ঝুঁকে পড়লাম। বই দেখে দেখে সম্ভব মত নানা কিছু তৈরির অভ্যাসও শুরু এখান থেকে। কাগজের পাখি তৈরি থেকে শুরু করে বোতলের মধ্যে ছিপির ভেতর দিয়ে শরবত খাওয়ার নল চালিয়ে রঙিন পানির থার্মোমিটার বানানো পর্যন্ত সব। সেটি আর এক কাহিনী, পরে বলা যাবে।

বোঝার আগ্রহই আমাকে ইংরেজিতে লেখা বই পড়ার চেষ্টায় নিয়ে গেছে—স্কুলে তা পড়ার প্রয়োজন হতোনা। বিশেষ করে ওই পর্যায়ে বৃত্তি পরীক্ষায় ইংরেজি ছিলনা বলে যেটুকু প্রয়োজন ছিল তাও আমাদের ক্ষেত্রে বাদ দেয়া হয়েছিল। আমার ইংরেজি শেখার হাতেখড়ি তাই ইউএসআইএস লাইব্রেরিতে—কিছুটা সিনেমার থেকে এবং তার চেয়ে বেশি আগ্রহের বইগুলো পড়ে। 'হাউ ডাস অ্যান অটোমোবাইল ওয়ার্ক' এর মত একটি শিশুতোষ বই পড়তে যে কতবার হোঁচট খেতে হয়েছে আর ছবির লেবেলিংগুলো দেখে বোঝার চেষ্টা করতে হয়েছে—তা শুধু বোঝার আগ্রহের কারণে হতে পেরেছে। শুধু তাই নয়, এ বইয়ের থেকে শেখা কোন কোন জিনিস আমি আমাদের দোকানের সামনে রাখা ট্রাকের তলায় লক্ষ্য করে মিলিয়ে নেবার চেষ্টাও করেছি। উদাহরণ স্বরূপ দেখেছি কেমন করে ক্র্যাঙ্ক শ্যাফটের সঙ্গে লাগানো বড় লম্বা দন্ডটি পাশের দিকে ঘুরলেও পেছনের গিয়ারের মাধ্যমে এটি চাকাকে সামনের দিকে ঘোরাচ্ছে। আর একটি সচিত্র ছোট্ট বইয়ের কথা বেশ মনে আছে যার নাম ছিল 'গ্রোইং আপ'। এটি থেকেই শিশুর জন্ম রহস্যটি প্রথম আমার কাছে স্পষ্ট হয়েছিল। তারপর থেকে এ

সম্পর্কে কোন ভুল ব্যাখ্যা আমাকে প্রভাবিত করতে পারেনি—কারণ ওখানকার বইয়ের উপর আমার আস্থা ছিল অবিচল। বড়দের সেকশনের বই নিতে পারতামনা বটে কিন্তু লাইব্রেরিতে বসে পড়তে পারতাম। সেক্ষেত্রে অবশ্য যে বেশ কিছু বাংলা অনুবাদ ছিল সেগুলো পড়তাম।

একটি বেশ বড়সড় বই গ্রোগ্রাসে পড়ে কয়েকদিনে শেষ করেছিলাম, খুবই উপভোগ করেছিলাম সেটি বেশ মনে আছে। বইটি হলো চার্লস লিন্ডবার্গের নিজের লেখা তাঁর বিমানে প্রথম আটলান্টিক পাড়ি দেয়ার কাহিনী 'স্পিরিট অব সেন্ট লুই' এর বাংলা অনুবাদ। ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা বইতে সেই দুর্দান্ত যাত্রায় (১৯২৭) প্রথম যুগের বিমান চালনার নানা কারিগরি খুঁটিনাটি থাকলেও সেগুলোই বরং বইটিকে আমার কাছে আরো বেশি আকর্ষণীয় করে তুলেছিল; যদিও এর সবকিছু যে ঠিক ভাবে বুঝেছি তা বলা যাবেনা। খুঁটিনাটি শুধু বিমান চালনার ছিলনা, আটলান্টিক পার হবার উপযুক্ত করে নিজের শহরের নামে 'স্পিরিট অব সেন্ট লুই' নাম দেয়া বিমানটিকে তৈরি করিয়ে নেবার জন্য বিমান কোম্পানির সঙ্গে তিনি যে কাজগুলো করেছেন, বিমানের কোন পরিবর্তনটি কেন করিয়ে নিয়েছিলেন, তার বর্ণনাও ছিল। বয়স তখন তাঁর মাত্র পঁচিশ, কিন্তু এর মধ্যেই ডাক-বহনকারী বিমান চালিয়ে চালিয়ে পাকা পাইলট শুধু নন, বিমানের গঠনের সব প্রযুক্তিতেও পাকা। এর আগে বেশ কয়েকজন আটলান্টিক পাড়ি দেবার চেষ্টা করে সফল হননি, কয়েকজন দুর্ঘটনায় মারাও গিয়েছেন। বিমান যুগের সেই প্রাথমিক অবস্থায় আটলান্টিক পাড়ি দেবার মতো দীর্ঘ যাত্রায় সেকালের একটি ইঞ্জিন নিয়ে চলার কোন প্রশ্নই ওঠার কথা নয়, অন্যদের ক্ষেত্রে তাই একাধিক ইঞ্জিন ছিল। দেড়-দুই দিনের একটানা যাত্রায় একজনের পক্ষে একা বিমান চালিয়ে যাওয়ার কথা কারো চিন্তার মধ্যেও আসেনি। কিন্তু লিন্ডবার্গ তাই করলেন—এক ইঞ্জিনের হালকা বিমান, তিনি একাই থাকবেন একাই চালাবেন; এমন কি নিরাপত্তার জন্য খুবই দরকারি রেডিও ট্রান্সমিটার (সে সময় যার ওজন নেহাত কম ছিলনা) এবং প্যারাসুটও নিতে তিনি অস্বীকার করেন; ওসবের ওজনের বদলে বরং কিছু বাড়তি তেল নেবার সুযোগের জন্য। নিউইয়র্ক থেকে শুরু করেছিলেন সেই দুর্দান্ত বিমান যাত্রা। কয়েক হাজার ফুট দিয়ে গেলেও বেশ কয়েকবার তাঁকে একেবারে নিচে নেমে আসতে হয়েছে, এমনকি আটলান্টিকের ঢেউয়ের মাত্র দশ ফুট ওপরে। খারাপ আবহাওয়া, বজ্র-বিদ্যুৎ, ডানায় বরফ জমা যত রকম দুর্যোগ হতে পারে সব হয়েছে; কিন্তু সব চাইতে বেশি যুদ্ধ করতে হয়েছে তাঁকে ঘুমের সঙ্গে। প্রায় চৌত্রিশ ঘণ্টার দীর্ঘ বিমান চালনায়, বার বার তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হয়ে বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলছিলেন, উচ্চতা হারিয়ে সমুদ্রের পানির কাছাকাছি চলে আসছিল স্পিরিট অব সেন্ট লুই। যখন আকাশে তারা দেখতে পাচ্ছিলেন তখন তার সাহায্যেই সঠিক পথ নির্ণয় করেছেন, অবস্থান নির্ণয় করেছেন। এর মধ্যে যখন যখন সুযোগ পেয়েছেন লগ বুকে নানা রকম তথ্য—উচ্চতা, গতিবেগ, অতিক্রান্ত

দূরত্ব ইত্যাদি নোট করেছেন, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ডায়েরির মত লিখে গেছেন। অবশেষে আয়ারল্যান্ডের ভূমি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়, ওই দেশ ও ইংল্যান্ড পার হয়ে প্যারিসের আইফেল টাওয়ারের চারদিকে চক্কর দিয়ে প্যারিস বিমান বন্দরে অবতরণ করেন। তখন সে মাঠ লোকে লোকারণ্য কারণ ইতোমধ্যে আয়ারল্যান্ডের কাছে সমুদ্রের একটি জেলে নৌকার চালক বিমানটি দেখে ফেলে কথাটি রাষ্ট্র করে দিয়েছিলো। যেমন দুর্দান্ত ছিল যাত্রাটি, বইটিতে লিন্ডবার্গ লিখেছেনও তা দুর্দান্ত ভাবে। বহু কাল পর ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান এরোনটিক মিউজিয়ামে ওই স্পিরিট অব সেন্ট লুই বিমানটিকে যখন ছাদের থেকে ঝোলানো অবস্থায় দেখেছি, তখন এই সব খুঁটিনাটি ঘটনা আবার মনে পড়ছিল—এর থেকে দৃষ্টি সরানো কঠিন হয়েছিলো।

আমার ওই দুটি লাইব্রেরি আবিষ্কারের আরো কিছুদিন পর পাবলিক লাইব্রেরির একই তলায় অন্য পাশে গড়ে ওঠেছিল বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি। ইতোমধ্যে লাইব্রেরির চমৎকার স্বাদ পাওয়া আমি এর সদস্য হতে দেরি করিনি। এর কাহিনীতে পার্থক্য হলো পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম ছাড়ার পরে ঢাকাতেও এটি সব সময় আমার কাছাকাছি ছিল, এবং আমার পড়াশোনার নিত্য সহায় ছিল, এখনো আছে। মজার ব্যাপার হলো চট্টগ্রাম বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে একজন তরুণ লাইব্রেরিয়ান আবেদিন সাহেব ও একজন তরুণ সহকারী ওয়াহাব সাহেবের সস্নেহ ঘনিষ্ঠ সাহায্য সহযোগিতা আমি পেতাম। তাঁদের দু'জনকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাড়ার বৃটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরিতে ছাত্র অবস্থায় ও শিক্ষকতার কালে পেয়েছি, বহু বছর ধরে। এমন কি ওয়াহাব সাহেব তাঁর চাকরি জীবনের প্রায় শেষের দিকে লাইব্রেরিতে আমাকে দেখলে প্রায়ই বলতেন উদয়ন স্কুলে পড়া আমার ছেলে কুশল কখন এসে বই নিয়ে গেছে। আবার তাকেও তিনি আমার গল্প করতেন। এই ব্যাপারে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়া অবস্থার বাবা ও ছেলের পাঠাভ্যাসের তুলনা করে তিনি খুব মজা পেতেন।

বন্ধুদের দলে ভীড়ে

লামার বাজার স্কুল থেকে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে স্থানান্তরের পর স্কুলে আসা যাওয়ার পথই যেরকম কিছু সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে, তেমনি নতুন বন্ধুরাও করে দিয়েছে। লামার বাজার স্কুলে তেমন কোন বন্ধু আমার ছিলনা, আসলে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাবার সুযোগও তেমন ছিলনা। মিউনিসিপ্যাল স্কুল কিন্তু ছিল তার বিপরীত। আমাদের বৃত্তির দলটিকে একসঙ্গে এত কাজ করতে হতো যে পরস্পরের চেনা জানার সুযোগ ছিল অনেক বেশি। আর বৃত্তির দলের বাইরেও বেশ ক'জন ইন্টেরেস্টিং বন্ধু ছিল এখানে। যাওয়ার পথে, ফেরার পথে, টিফিন ছুটিতে, ঘোরাঘুরির অভ্যাস ছিল এদের অনেকেরই। তাদের সঙ্গে জুটে কাছাকাছি নানা জায়গায় গিয়েছি; অনেক অভিজ্ঞতাও হয়েছে, যেগুলো ওরা না থাকলে হতোনা।

এই প্রথম খেলার জগতের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচিত হলাম। খেলা মানে তখন ফুটবল। এর আগে *আজাদ* পত্রিকায় ভিক্টোরিয়া, মোহামেডান, উয়ারী ইত্যাদি দলের জয় পরাজয় উৎসাহ নিয়ে দেখতাম—যে কোন প্রতিযোগিতায় যেমন কিছুটা উৎসাহ থাকে সে রকম। কিন্তু এখন বন্ধুদের দলে পড়ে মাঝে মাঝেই স্টেডিয়ামে চলে যেতাম—হয় খেলার অনুশীলনী দেখতে অথবা সত্যি সত্যি খেলা দেখতে। বন্ধুদের ফুটবল দলে খেলারও চেষ্টা করেছি—প্রধানত স্কুল থেকে রাস্তা পেরিয়ে বাদলদের প্রিন্টিং প্রেসের উঠানের মাঠে, আবার কখনো স্কুল থেকে অনেক দূরে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড অফিসের সামনের মাঠে। খেলায় উৎসাহ বেশি দিন থাকেনি, পারদর্শিতারও অভাব ছিল, যে কারণে প্রায়ই আমাকে গোলকীপার হিসেবে গোলের সামনে বেকার দাঁড় করিয়ে রাখা হতো। কিন্তু ওই স্টেডিয়ামে যাওয়া আসা অব্যাহত ছিল নানা কারণে। এমন একটি কারণ সৃষ্টি হয়েছিল বিশ্ববিখ্যাত ফ্রিষ্টাইল কুস্তিগীরদের চট্টগ্রাম আগমনে। বিদেশী কুস্তিগীররা এসে পৌঁছানোর আগে পাকিস্তানি কুস্তিগীররা এসে গিয়েছিলেন—তাঁরা অধিকাংশ সময় স্টেডিয়ামের একদিকে কসরত করতেন। যে ক'দিন ছিলেন আমরা কয়েক বন্ধু কয়েকবারই তাঁদের দেখতে গিয়েছি। তাঁরা প্রায় সবাই একই পরিবারের—পাঞ্জাবের গামা গোলাম মোহাম্মদের বংশধর। 'মল্লবীর গামা' শিরোনামে স্কুলের পাঠ্য বইতে আমরা গামা গোলাম মোহাম্মদের কথা পড়েছি, গদা হাতে, পাকানো গোঁফ ও বড় তাবিজ গলায় তাঁর ছবি দেখেছি। তাঁর মেয়ে মল্লবীর হামিদা বানুর কথা এবং ছবিও দেখেছি (গদা হাতে)। মূলত তাঁরা পূর্ব পাঞ্জাবের পাতিয়ালার মানুষ, সেখান থেকেই খ্যাতির শুরু। বিশেষ মজা পেয়েছি গামার খাদ্য তালিকা দেখে—ডজন ডজন ডিম, দৈ-ছানা ইত্যাদি ছাড়াও বিপুল পরিমাণ বাদাম বাটা এসবের কথা পড়ে চোখ কপালে তুলেছি। এখন আমাদের চট্টগ্রামে এসেছেন তাঁর ছেলেরা। সবার বড় ভুলু পাহলোয়ান—যাঁর চ্যালেঞ্জ ছিল ছোট ভাইদের পরাজিত করার আগে তাঁর সঙ্গে কেউ লড়তে পারবেনা। ফলে তাঁর কুস্তি দেখার সুযোগ কারো হয়নি। তবে অনুশীলনে তিনি থাকতেন—ইয়া বড় তাগড়া গোঁফ। সাদা লুঙ্গির উপর লম্বা কুর্তা পরা, গলায় তাবিজ। ভাইদের মধ্যে তিনিই একমাত্র ভারি দেহের। তাঁর ছোট ভাই আসলাম, আকরাম, গোগা— তাঁদের পেটা ছিমছাম শরীর, সবার ছোট গোগা তো একেবারে হালকা পাতলা সদ্য তরুণ। আজম ছিলেন দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আমাদের বন্ধুদের গুজব কারখানার মতে তিনি ছিলেন ওদের বাবুর্চি। তাঁদের দেখতাম সারাক্ষণ বুক ডন দিতে, অথবা শরীর দলাই মলাই করতে, অথবা এটা সেটা খেতে। আমরা বাচ্চা ছেলেরা আগ্রহ নিয়ে দেখতে ও কথা বলতে গেলে তাঁরা খুশি হয়ে আলাপ করতেন, এটা সেটা জিজ্ঞেস করতেন—নিজেরা বেশ গর্বিত বোধ করতাম।

শিগ্‌গীর তাঁদেরকে লড়তে দেখলাম স্টেডিয়ামের আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায়। এর মধ্যে বিদেশী কুস্তিগীররা এসে গিয়েছিলেন—জেবিস্কো, বার্ট এসেরটি, বিল

ভার্না, ওয়াং বাকলি ইত্যাদি কিছু নাম মনে পড়ছে, এমনকি তাদের চেহারাও চোখে ভাসছে। প্রধানত ইউরোপের নানা দেশ থেকে আসা এই কুস্তিগীররা। চীনা ওয়াং বাকলি ছাড়া বাকিদের বিশাল বিশাল শরীর কেমন যেন বিসদৃশ মনে হতো—পাকিস্তানি কুস্তিগীরদের মত গড়াপেটা নয়। চট্টগ্রামের রাস্তা দিয়ে তাদের নিয়ে ট্রাক শোভাযাত্রা করা হলো, মিউজিক সহকারে। সারা শহরে যথেষ্ট সাড়া পড়লো। বাসা থেকে আমরা সব ভাই ও আরো অন্যরা এক রাতে কুস্তি দেখতে গেলাম। স্টেডিয়ামে জমকালো পরিবেশ, কুস্তির এরিনাটি চমৎকার ভাবে আলোক সজ্জায় আলোকিত, স্টেডিয়াম মাত করা চমৎকার মিউজিক। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিশাল-দেহী বিদেশী কুস্তিগীররা পাকিস্তানিদের হাতে পরাজিত হলেন—আমাদের আনন্দ দেখে কে? বিদেশীদের কুপোকাত করার দৃশ্য সবাইকে খুব মজা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলাম কুস্তির চেয়ে নাটক বেশি হলো, বিনা কারণে ঘুষাঘুষি করা, রেগে কাঁপতে কাঁপতে গরগর করা, গালাগালি করে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয়া পরের দিনের জন্য ইত্যাদি। বিশেষ করে জেবিস্কো কুস্তির সময় তার ভাই গোগাকে অন্যায় ভাবে মেরেছে এই অপবাদে কুর্তা-লুঙ্গি পড়া আসলাম যেভাবে এরিনাতে ওঠে জেবিস্কোর মেদবহুল দেহকে পেটালেন তাকে নাটক ছাড়া কিছুই ভাবতে পারলামনা। দর্শকরা অবশ্য এ নিয়ে অনেক উত্তেজিত—এতে ছুঁড়ে দেয়া চ্যালেঞ্জের কুস্তি দেখতে পরের রাতে দর্শক অনেক বেড়ে গেল। বাসায় এসে এর কতটা খাঁটি কতটা নাটক এ নিয়ে সবার মধ্যে বিতর্ক চলছিল। আর ছোট্ট জাহাঙ্গীর পর পর কয়েকদিন ওয়াং বাকলির অনুকরণে ফ্লাইং কিক (লাফিয়ে ওঠে জোড় পায়ে লাথি মারা) দেয়ার চেষ্টা করতে করতে আহত হয়ে পড়লো।

পেশাদার ক্রিকেটের সঙ্গেও প্রথম চাক্ষুষ পরিচয় হলো একেবারে টেস্ট ক্রিকেটারদের দিয়ে—বন্ধুদের সঙ্গে স্টেডিয়ামে অনুশীলন দেখতে গিয়ে ও পরে আসল খেলা দেখে। এর মাধ্যমেই এই খেলাটি বুঝতে শিখলাম, ভালবাসতে শিখলাম। উপলক্ষটি ছিল ভিনু মানকাডের নেতৃত্বে ভারতীয় টেস্ট টিম তখন পাকিস্তান সফরে এসেছিল। ঢাকায় একটি টেস্ট ছিল। সেই সুবাদে চট্টগ্রামে একটি আন্তর্জাতিক ম্যাচ ছিল তিন দিনের।

আগেই স্টেডিয়ামে গিয়ে হানিফ, ওয়াকার, ইমতিয়াজ, ওয়াজির, ফজল মাহমুদ ও খান মোহাম্মদ—এসব খেলোয়াড়কে নেট প্র্যাকটিসে দেখে এসেছি। ভাইয়েরা, চাচারা এমনকি দোকানের কর্মচারীরা সহ সারা দিনের জন্য স্টেডিয়ামে খেলা দেখতে গেলাম। ক্রিকেটের মজাটাই আলাদা—রীতিমত একটি পিকনিক। ইউনূস ভাই ওই এক দিনেই আমাকে ক্রিকেট খেলার বহু খুটিনাটি বুঝিয়ে দিলেন—ক্রিকেটের সঙ্গে বাড়ির অন্যদের তেমন কোন পরিচয় ছিলনা। ভারতীয় দলের মানকাড, নরি কন্ট্রাক্টর, ফারুক ইঞ্জিনিয়ার কিংবদন্তির মত সব খেলোয়াড়কে দেখলাম। পত্রিকার কল্যাণে এসব নাম ও চেহারাগুলো মুখস্থ ছিল। গ্যালারিতে বসে সবার চেহারাটা স্পষ্ট ভাবে দেখলামনা। তবে দু'একজন যারা

বিভিন্ন সময়ে বাউন্ডারির কাছে ফিল্ডিং করতে এসেছেন তাদেরকে খুব লক্ষ্য করে দেখেছি। যথারীতি ফিরে এসে কয়েক দিন ধরেই খেলার ব্যবচ্ছেদ করছিলেন যে ক'জন খেলা বোঝেন তাঁরা। আমাদের দোকানের তরুণ কর্মচারী ফয়েজ কাকা—বার বার শুধু বলছিলেন আমাদের টিমের 'যাচ্ছে তা ফিল্ডিং' এর জন্যই পরাজিত হতে হলো। অন্য সবার ধারণা ফিল্ডিং কাকে বলে ফয়েজ তা মোটেই বোঝেননা, নেহাত অন্যদের কাছে শুনে বলছেন। সেই থেকে কয়েকদিন সবাই তাঁকে দেখলে বলতো 'যাচ্ছে তা ফিল্ডিং'।

এর কয়েকদিন পর ইউনূস ভাই কলকাতায় প্রকাশিত একটি বই কিনে নিয়ে এলেন—'খেলার রাজা ক্রিকেট'। বইটি তখন ও পরে এতবার পড়েছি এবং কিছুটা মনে মনে এবং কিছুটা বাস্তবে খেলা সম্পর্কে এর কোন কোন উপদেশ অনুসরণ করেছি যে অনেকটা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। বইটির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ব্যাটিং করা শেখানো। একই সঙ্গের জোড়া হিসবে আর একটি বই প্রকাশিত হয়েছে যা এর ভূমিকায় পড়েছি। সেটির নাম 'মজার খেলা ক্রিকেট'। সেটি বোলিং করা শেখানো নিয়ে। কিন্তু এই বইটি কখনো বাসায় আসেনি, আমারো পড়া হয়নি। যেহেতু এরপর আর কোন বই থেকে আর কখনো ক্রিকেট শেখার সুযোগ হয়নি, তাই ক্রিকেটের ব্যাট করার কায়দা কানুন অন্তত তাত্ত্বিক ভাবে যেটুকু জানি, বোলিং সম্বন্ধে তাও জানিনা—চিরকালের জন্য আমার জ্ঞানটি এক পেশে হয়ে রইলো। 'খেলার রাজা ক্রিকেট' আদর্শ ব্যাটিঙের উদাহরণ স্বরূপ ব্যবহার করা হয়েছে ভারতীয় টেস্ট টিমের আরো কিছুটা আগের কিংবদন্তিতুল্য নানা খেলোয়াড়ের ব্যাটিঙের ছবি ও বর্ণনা। কারো অন্ ড্রাইভের ভঙ্গি, কারো অফ ড্রাইভের, কারো 'ব্লক' করার, কারো 'ব্যাক ফুটে' খেলার, কারো বা 'কাট' করার, বা 'পুল' বা 'হুক' করে বল হাঁকানোর। এই বইয়ের দুটি ছবি ও সেগুলোর ক্যাপশন আমার চোখে ভাসছে—একটি ক্যাপশন হলো 'ভারতের ওপেনার পঙ্কজ রায় ও মোস্তাক আলী টেস্ট ওপেন করতে উইকেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন'; অন্যটির 'ভারতের ওপেনার পঙ্কজ রায় নিঁখুত স্টান্সে দাঁড়িয়ে আছেন'। তাছাড়া ওই বইতে মজার মজার কিছু কাহিনী ছিল—যেমন 'এল বি ডব্ল্যু' কেন চালু হলো, 'ডেড বলে'র এর নিয়মটি এলো কোন ঘটনার পর ইত্যাদি।

বন্ধুদের সঙ্গে স্টেডিয়াম ইত্যাদি জায়গায় ঘুরঘুর করাই শুধু একমাত্র ভ্রমণ ছিলনা। যেমন একদিন বৃত্তির দলের পড়াশোনার সময় কে একজন খবর দিল আরাকানের কাসেম রাজা আমাদের স্কুলের কাছেই একটি রেস্টুরেন্টে ম্যানেজারগিরি করছেন, দেখতে চাইলে যেতে পারি। কাসেম রাজার কথা বেশ কিছুদিন ধরে শুনছিলাম। আরাকানের রোহিঙ্গা মুসলিমদের উপর বার্মিজদের অত্যাচার বেড়ে গেলে সেখানে মুজাহিদ বাহিনীর পক্ষ থেকে তিনি নাকি নিজেকে রাজা ঘোষণা করেছিলেন; যুদ্ধে হেরে এখন চট্টগ্রামে পালিয়ে এসেছেন কপর্দকশূন্য অবস্থায়—ইত্যাদি গল্প শুনছিলাম। আসলে ১৯৪৮ সালে বার্মার

স্বাধীনতার সময় থেকে, এবং তারও আগে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানের পর থেকেই উত্তর আরাকানে আমাদের টেকনাফ সংলগ্ন রোহিঙ্গা অধ্যুষিত এলাকায় তাদের আন্দোলন চলছিল। আন্দোলনের একটি কারণ ছিল জাপানি দখলে থাকার সময় এখানে মংডু, ভূতিদং ইত্যাদি অঞ্চলের অনেক রোহিঙ্গা গ্রামবাসী বাস্তুচ্যুত হয়েছিল, যাদেরকে যুদ্ধের পর তাদেরকে স্বগ্রামে ফিরতে দেয়া হয়নি। স্বাধীন বার্মার পুনর্গঠনের সময় বার্মার অন্যান্য সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলের মত তারা উত্তর আরাকানে তাদের পৃথক রোহিঙ্গা অঙ্গরাজ্য দাবি করছিল। কখনো নিয়মতান্ত্রিক ও কখনো সশস্ত্র আন্দোলন করছিলো রোহিঙ্গারা মুজাহিদ দল গঠন করে। এক দিকে মংডু, ভূতিদং অঞ্চলের নির্বাচিত পার্লামেন্ট সদস্যদের (মুসলিম) নেতৃত্বে চলছিল রাজনৈতিক আন্দোলন, অন্যদিকে সময়ে সময়ে এর সামরিক শাখা মুজাহিদ বাহিনীকে অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে নামতে হয়েছিল—বার্মিজ সৈন্য বাহিনী ও রোহিঙ্গা রাজ্য বিরোধী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর আক্রমণের মুখে। পরে এক সময় আন্দোলনের শক্তি এতটা বিস্তৃত হয়েছিল যে ১৯৬০ সালে বার্মিজ পার্লামেন্ট নির্বাচনের সময় প্রধানমন্ত্রী উ নু প্রকারান্তে রোহিঙ্গা রাজ্যের দাবি স্বীকার করে নিয়েছিলেন। কিন্তু পরে নে উইনের সামরিক অভ্যুত্থানের কারণে এটি আর বাস্তবায়িত হতে পারেনি। কিন্তু এখন যখনকার কথা বলছি সেই ১৯৫৩-৫৪ সালে নিয়মতান্ত্রিক মুজাহিদ আন্দোলন কার্যত চাপের মুখে আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিল। মুজাহিদ বাহিনীর নানা গ্রুপের নেতৃত্বে এসেছিলেন নানা জন, এবং তারাই একটি সশস্ত্র আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। এই কাসেম রাজা খুব সম্ভব এমনি একটি গ্রুপের নেতা ছিলেন। এমন রাজাকে দেখার লোভ সামলানো যায় কী করে? স্কুলের পর বন্ধুদের সঙ্গে গেলাম সেই রেস্টুরেন্টে। রেস্টুরেন্টের লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে তাঁরা দেখিয়ে দিলেন ক্যাশে বসা কাসেম রাজাকে। দেখতে সাধারণ ছোটখাট মানুষ, মনোযোগ দিয়ে রেস্টুরেন্ট চালাচ্ছেন। দেখে মনে হলোনা তিনি কখনো কোন সেনাদল বা রাজ্য শাসন করতে পারেন, রেস্টুরেন্ট শাসন করতেই যেন তিনি বেশ মানানসই। এতদিন ধরে শোনা বীরত্বের কাহিনীর সঙ্গে তাঁকে ঠিক মেলাতে পারলাম না।

যোদ্ধা দেখতে গিয়ে এসেছে যেমন নিরাশ হয়েছি, উল্টো আবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখতে গিয়ে নিজেরা যুদ্ধের মধ্যে পড়ে গেছি, এমন ঘটনাও ঘটেছে। শোনলাম চট্টগ্রাম মেডিক্যাল স্কুলে এমনি একটি অনুষ্ঠান হবে সন্ধ্যার পর। সুজিৎ, বদি, বাদল আমরা এ ক'জন ভাবলাম এটি দেখবো। মেডিক্যাল স্কুলের জায়গাটি ভারি সুন্দর—আন্দর কিল্লার সামনে পাহাড়ের ওপর। ওখানেই চট্টগ্রামের বড় হাসপাতাল জেনারেল হসপিটাল, সঙ্গে মেডিক্যাল স্কুল। আসলে বক্সীর হাটে আমাদের বাসার ছাদ থেকে দর্শনীয় যে ভবনটি দূরে চোখে পড়তো তা হলো এই জেনারেল হসপিটাল। এর লাল ইটের সুন্দর আর্চগুলো ওই দূরত্ব থেকে ছোট ছোট খোপ খোপ খেলনার মত মনে হতো। কিন্তু যখন ওখানে গিয়েছি তখন

দেখেছি এর এক একটি কত বিশাল, তার পেছনে কত দরাজ বারান্দা ও ওয়ার্ড সমূহ। তখন চট্টগ্রামে মেডিক্যাল কলেজ ছিলনা, ছিল মেডিক্যাল স্কুল যেখানে ম্যাট্রিক পাশের পর ভর্তি হয়ে এল এম এফ (লাইসেনশিয়েটেড মেডিক্যাল ফ্যাকালটি) ডাক্তার হিসেবে সার্টিফিকেট পাওয়া যেত। অবশ্য পড়াশোনা সব মেডিক্যাল কলেজেরই নিয়ম অনুযায়ী ছিল—জেনারেল হসপিটালে ছাত্রদের শিক্ষা ও শিক্ষানবিশি হতো। ওখানে অনুষ্ঠান স্থলে গিয়ে বেশ সামনের দিকেই বসে পড়লাম। শোনলাম এটি হচ্ছে মেডিক্যাল স্কুল ছাত্র সংসদের নবনির্বাচিত সদস্যদের অভিষেক অনুষ্ঠান। প্রথম দিকে বক্তৃতা ইত্যাদি হবে তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্কুলের অধ্যক্ষ সংসদের সভাপতি—তিনি স্টেজে আছেন আরো কয়েকজন গণ্যমান্যের সঙ্গে। তাঁর পাশে নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক একজন বেশ লিকলিকে লম্বাটে তরুণ। পেছনে নব নির্বাচিত সংসদের অন্যান্য সদস্য—অনেকে বেশ অল্প বয়সী ছাত্র, বাকিরা কিছুটা সিনিয়র।

নবনির্বাচিতদের শপথ বাক্য পড়ালেন অধ্যক্ষ। তারপর সাধারণ সম্পাদক তাঁর লিখিত অভিষেক বক্তৃতা পড়তে শুরু করলেন—তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী ইংরেজিতে। হঠাৎ সভার নানা অংশে কিছু গুঞ্জন শোনা গেল, ক্রমে সে গুঞ্জন কোলাহলে পরিণত হলো। কোলাহল ছাপিয়ে তালে তালে শ্লোগান হিসেবে যা শোনলাম—'নো ইনস্টলেশন, নো ইনস্টলেশন'। বোঝা গেল বিরুদ্ধ দল অনুষ্ঠান করতে না দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা যেখানে বসেছি তার খানিকটা দূরে স্টেজের আরো কাছে বেশ লম্বা চুল একটি ছেলে দাঁড়িয়ে এই প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিচ্ছিল। দেখলাম তাঁকে আমি চিনি—ঐ করাচি জাম্বুরী ফেরতাদের একজন হিসেবে। তিনিই প্রথম শুরু করলেন ফল জাতীয় কিছু জিনিস স্টেজে ওই সাধারণ সম্পাদকের দিকে ছুঁড়ে দিতে, অন্যান্য বিভিন্ন দিক থেকে আরো নানা জিনিস বক্তার গায়ে বা কাছে এসে পড়তে লাগলো। এতক্ষণ হট্টগোলের মধ্যেও তিনি নির্বিকার ভাবে পড়ে যাচ্ছিলেন। এবার তিনি হুঙ্কার দিয়ে এক লাফে ষ্টেজ থেকে নেমে আমার পরিচিত সেই ছাত্র নেতার গায়ের ওপর পড়ে তার চুল ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে সারা হল জুড়ে শুরু হয়ে গেল তাণ্ডবলীলা। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে আমরা ভোঁ দৌড়। এমন দৌড় দিলাম যে দেখতে পারিনি বন্ধুরা কে কোথায় গেল। একেবারে লাল দিঘির সামনে মন্দিরের মতো জায়গাটির সামনে এসে বাদলকে পেলাম—দু'জনই হাঁপাচ্ছি। এই প্রথম ছাত্রদের মারামারি দেখলাম; এবং কাকতালীয়ভাবে ছাত্র রাজনীতির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সুখকর হলো না। কিন্তু পরের বছরেই ইউনূস ভাই ও তাঁর সহপাঠীদের মাধ্যমে চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র রাজনীতির যত কিছু কাছে থেকে দেখেছি তাতে এমন কিছু তো নয়ই, বরং মনে হয়েছে ছাত্ররা দুনিয়া জয় করতে যাচ্ছে। সে কথায় পরে যথাসময়ে আসা যাবে।

দুটি বিজ্ঞান প্রদর্শনী

মেডিক্যাল স্কুল ও জেনারেল হসপিটালের সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয় নয়। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে রোগী দেখতে ওখানে গিয়েছি। এমনিতেও পাহাড়ের উপরে বেড়াতে গিয়েছি বন্ধুদের সঙ্গে। ওই অভিষেক অনুষ্ঠানের কিছু আগে আর একবার গিয়েছিলাম কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে মেডিক্যাল স্কুলের বার্ষিক প্রদর্শনী দেখতে। কী দেখতে পাব ঠিক না বুঝেই বন্ধুর কথায় গিয়েছিলাম। কিন্তু গিয়ে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম—এত কিছু দেখার আছে, বোঝার আছে, আমাদের শরীরের মধ্যে এ কোন রাজ্য! কিন্তু ভীড়ের মধ্যে বেশিক্ষণ কাটাতে বন্ধুরা নারাজ, প্রদর্শনী দেখতে বা প্রদর্শক ছাত্রদের ভাষ্য শুনতে তাদের মধ্যে খুব আগ্রহ দেখা গেলনা। তাদের পীড়াপীড়িতে অল্পক্ষণের মধ্যে ফিরে আসতে হলো। মনে মনে ঠিক করলাম পরের দিন আবার আসবো, যতক্ষণ ইচ্ছে ততক্ষণ থেকে ভাল করে দেখবো। বাসায় ফিরে এর গল্প করাতে টুনু বললো সেও দেখতে চায় এটি। পরদিন ওকে নিয়েই গেলাম আবার প্রদর্শনীতে। সারা প্রদর্শনী জুড়ে একটি গন্ধ—সেটি ফর্মালিনের। কিছুটা অপ্রিয় গন্ধ হলেও আমার বেশ সওয়া হয়ে গিয়েছিল, মনে হলো টুনুরও কিছুক্ষণের মধ্যে সওয়া হয়ে গেল। ছোট বড় নানা বয়াম ও জারে মানুষের নানা অভ্যন্তরীণ অঙ্গ বা তার অংশ ফর্মালিনে ডুবিয়ে সংরক্ষণ করা রয়েছে। প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর সামনে কয়েকটি ছাত্র সুন্দর ভাবে এগুলো বুঝিয়ে দিচ্ছেন। প্রশ্ন করলে উত্তর দিচ্ছেন। এগুলোর সঙ্গে আছে কিছু বড় রঙিন ছবি ও প্লাস্টিকের মডেল ওই অঙ্গের ও আশপাশের। যেমন ফুসফুস আক্রান্ত হলে কী রকম হয় তা রোগাক্রান্ত এসব অঙ্গ সংরক্ষণ করে দেখানো হচ্ছে। পাকস্থলি, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র তার ভেতর বাহির দেখা যাচ্ছে সংরক্ষিত অংশে; ভেতরটা কী রকম জটিল তাও। পরিপাক তন্ত্রে থাকা নানা পরজীবী ইত্যাদিও আছে সংরক্ষণে। এগুলোর প্রভাবে কী হয় তাও দেখানো হয়েছে। সুস্থ অঙ্গও প্লাস্টিকের মডেলে রয়েছে; পুরো শরীরের মডেলে কোনটি কোথায় ফিট হয়ে যায় খুলে নিয়ে এবং আবার ফিট করে তা দেখানো হচ্ছে। আমাদেরকে সব চেয়ে বেশি কৌতূহলী করলো নবজাতক বাচ্চাদের বিষয়ে প্রদর্শনীতে। এক সারি জারের মধ্যে মায়ের পেটে ক্ষুদ্র ভ্রূণ থেকে ক্রমে বড় বড় বাচ্চা—সব শেষে একেবারে পূর্ণ বাচ্চা, শুধু প্রত্যেকের নাভীর সঙ্গে লম্বা দড়ির মত নাড়ী লাগানো রয়েছে। ছাত্র ছাত্রীরা বিস্তারিত বলছিল শিশু মায়ের পেটে কীভাবে বেড়ে ওঠে, মায়ের রক্ত থেকে কেমন করে খাদ্য পায় ইত্যাদি। টুনুকে আর আমাকে এত ছোট হয়েও মনোযোগ সহকারে শুনতে দেখে তাঁরা একটু অবাক হচ্ছিলেন বৈকি। যে প্রশ্নটি গোড়া থেকে আমার মনে ছিল প্রদর্শক ছাত্রী আগে থেকেই বললেন নানা কারণে মায়ের পেটে মারা যাওয়াতে এসব অসম্পূর্ণ বাচ্চাকে বের করে আনতে হয়েছে। নানান বয়সী নানা মানুষ মেডিক্যালের এই প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলেন—কিন্তু আমাদের বয়সী ছেলে মেয়ে খুব একটা চোখে পড়েনি। এসব দেখে ও শোনে মানুষের শরীর কীভাবে

কাজ করে, স্বাস্থ্য কীভাবে হানি হয়, বিজ্ঞান কীভাবে শরীরের রহস্য উদ্ঘাটন করছে, এজাতীয় চিন্তা কিছুদিন মাথায় বাসা বাঁধলো।

আর একটি প্রদর্শনী এ সময় বিজ্ঞানের প্রতি আমার মনকে খুব টেনে নিয়ে গিয়েছিল—যার পর থেকে আমার মধ্যে বিজ্ঞানের প্রতি একটি পক্ষপাতিত্ব স্পষ্ট ভাবে দেখা দেয়। এটি ছিল চট্টগ্রাম বন্দরে একটি আমেরিকান জাহাজে 'অ্যাটম ফর পীস' নামক ভাসমান প্রদর্শনী। বহু দেশ ঘুরে তখন প্রদর্শনীটি চট্টগ্রামে এসেছিলো আর প্রতিদিন বহু মানুষ ভীড় করে এটি দেখছিলেন। বড় ভাইদের সঙ্গে বাসা থেকে আমরা অনেকে গেলাম দেখতে। সময়টি ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অ্যাটম বোমায় হিরোশিমা ও নাগাসাকির ধ্বংসযজ্ঞের মাত্র বছর দশেক পর। ওই ঘটনার পর থেকে সারা দুনিয়ায় অ্যাটম বোমার বিরুদ্ধে বিশাল আন্দোলন গড়ে ওঠেছিল বিশেষ করে—বিজ্ঞানী, চিন্তাবিদ এবং তরুণদের মধ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের লস আলামোসে এই অ্যাটম বোমা গবেষণার জন্য নানা দেশের সেরা বিজ্ঞানীদেরকে কাজে লাগিয়ে যে 'প্রজেক্ট মানহাট্টান' আয়োজন করা হয়েছিল তার প্রধান বিজ্ঞানী রবার্ট ওপেনহাইমার, দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল প্রমুখও এই আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করেছিল পৃথিবীর মানুষকে বোঝাতে যে পরমাণু গবেষণা মানে শুধু মারণাস্ত্রের গবেষণা নয়। এই গবেষণা শান্তির কাজেও বিশ্বকে অনেক কিছু দিতে পারে।

প্রদর্শনীতে বিভিন্ন চলমান মডেল এবং জ্বলা-নেভা অসংখ্য বাতি ইত্যাদির সমন্বয়ে গড়া চলন্ত ডায়াগ্রামের মাধ্যমে পরমাণু বিজ্ঞানের ও তার প্রয়োগের নানা দিক তুলে ধরা হচ্ছিল। লেখাজোখা বেশির ভাগ ইংরেজিতে থাকলেও প্রদর্শকরা বাংলায় সব বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। জেটির ওপর দিয়ে জাহাজে উঠে প্রদর্শনীতে ঢুকতে হলো। বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পারমাণবিক রিঅ্যাকটারের কাজ ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল—এর জন্য নিউট্রনের আঘাতে কীভাবে ইউরেনিয়াম পরমাণুকে বিদীর্ণ করে শক্তি বের করে আনতে হয়; কন্ট্রোল রড তুলে নিলে কেমন করে 'চেইন রিঅ্যাকশন' শুরু হয়ে শক্তি উৎপাদন শুরু হয়। মডেলের মধ্যে বাতির আঙ্গিকে একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি, এমনি ধারায় অসংখ্য বিদীর্ণ হবার ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল। ভেতরে কমলা রঙের উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠে প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদনের ব্যাপারটি বুঝিয়ে দিচ্ছিল। তারপর সেখান থেকে উত্তপ্ত বাষ্প বের করে নিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন, এর নিরাপত্তার ব্যবস্থা সব। এখান থেকে বাড়তি হিসেবে যে তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরি হয় তার ব্যবহারটিই ছিল সব চেয়ে চমকপ্রদ। গাইগার কাউন্টার যন্ত্র তেজস্ক্রিয় জিনিসের কাছে আনলেই কট্ কট্ কট্ করে আওয়াজ করে, বাতি জ্বলে। খুব সামান্য তেজস্ক্রিয়তা থাকলেও এভাবে তা বোঝা যায়। মুরগির খাবারের কোন কোন অংশের সঙ্গে খুব সামান্য নিরাপদ তেজস্ক্রিয় বস্তু মিশিয়ে দিয়ে গবেষণা করা হয়েছে কোন খাবারটি তার ডিমের মধ্যে বেশি যায়। কারণ তা গেলে ডিমের মধ্যেও খাবারে মেশানো খানিকটা তেজস্ক্রিয়তা

যাবে আর গাইগার কাউন্টার ডিমের কাছে নিলে তা ধরা পড়বে। বাতিতে গড়া চলমান ডায়াগ্রামে সব কিছু দেখানো হলো কেমন করে মুরগি খাচ্ছে ওটা, তার রক্তে তেজস্ক্রিয়তা যাচ্ছে, যা আবার ডিমে যাচ্ছে, ডিম থেকে ধরা পড়ছে গাইগার কাউন্টার কাছে আনলে এক্ষেত্রেও কট্ কট্ আওয়াজে। এ জিনিসটিতেই আমি সবচেয়ে বেশি মজা পেয়েছিলাম। এভাবে মুরগির সঠিক খাবার বাছাই করে কেমন করে বড় পুষ্টিকর ডিম পাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে, তাও স্পষ্ট করা হয়েছে।

একই ভাবে দেখা গেল ওষুধের সঙ্গে তেজস্ক্রিয়তা মিশিয়ে কী করে গলার গ্ল্যান্ডের মধ্যে তা জমা লক্ষ্য করে রোগ নির্ণয় করা হচ্ছে, তার চিকিৎসা করা হচ্ছে। পুরো প্রদর্শনী শুধু পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিয়ে—কিন্তু আমার কাছে তা হয়ে পড়লো আধুনিক বিজ্ঞানের বিরাট একটি জানালা। যে ভাবে সব কিছু সাজানো হয়েছে, সহজ ভাষায় বোঝানো হয়েছে, তাতে এর কোন কিছুকে অতি জটিল, অতি দূরের জিনিস মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে চেষ্টা করলেই এসব বুঝতে পারবো, আমি বোঝাতেও পারবো, এমনকি করতেও পারবো। ওই যে একটি থেকে দুটি, দুটি থেকে চারটি করে লক্ষ লক্ষ অ্যাটমে বড় শক্তি তৈরি হওয়া, ওই যে ডিমের কাছে যন্ত্র আনলে কট্ কট্ শব্দ হওয়া—এসব নিয়ে বাড়ি ফিরে নানা জনের সঙ্গে সুযোগ গেলেই কথা বল্‌লাম। 'শান্তির জন্য পরমাণু' প্রদর্শনীতে বিজ্ঞানের আধুনিক বিষয় নিয়ে বুঝতে চেষ্টার বা কথা বলার যে সাহস বোধ করলাম সেটি অদ্ভুত একটি আনন্দ সৃষ্টি করলো।

শৈশবে শোক

জীবনের প্রথম মৃত্যু শোক সইতে হলো এই সময়—মাত্র কয়েক মাস বয়সে ছোট ভাই মোসাদ্দেক মারা গেল। কী হয়েছিলো, কখন থেকে হয়েছিলো, কেউ বুঝে উঠতে পারার আগেই সে মারা গেল। সে সময় শহরে কোন শিশু রোগ বিশেষজ্ঞ ছিলেননা। তারপরও পরিচিত ডাক্তাররা চিকিৎসার চেষ্টা করেছিলেন। যে ছোট্ট মোসাদ্দেককে কোলে নিয়ে, কান্না থামিয়ে, তার সঙ্গে হাসাহাসি করার চেষ্টা করে অনেক সময় কাটতো হঠাৎ করে সে আর থাকলোনা। এই প্রথম মৃত্যু শোক একেবারে কাছে চলে এলো। মামার হাতে তার ছোট্ট সাদা কাপড়ে ঢাকা দেহটি দিয়ে আমাদের সবাইকে তার পেছনে হেঁটে যেতে হলো চৈতন্যগলির কবরস্থানে।

আমাদের পরিবারে মৃত্যু নতুন ছিলনা। এর আগে আমার দুই বড় ভাই ও এক বড় বোন মারা গিয়েছে আমার জন্মের আগে। আমিনুর রহমান ছিল সবার বড় ভাই, ইউসুফ ও পাখি—ইউনূস ভাই ও সালাম ভাইয়ের মধ্যে। সবাই শিশু বয়সে মারা গিয়েছে—তাদের গল্পই শুধু শুনেছি, আর কল্পনা করেছি তারা কেমন ছিল, সবাই থাকলে কী মজাই না হতো। কিন্তু মোসাদ্দেকের মৃত্যু মর্মে মর্মে অনুভব করতে হয়েছে।

এর বেশ কিছু দিন আগে আরো একটি মৃত্যু ঘটেছিল যা একই রকম মর্মান্তিক। বুবুর মেয়ে বুলবুলির হঠাৎ একটি অদ্ভুত রোগ দেখা দিল। কেন জানিনা শুরুতে তার অসুখের কথা আমি জানতে পারিনি, হয়তো আমরা বাচ্চা বলে আমাদের জানানো হয়নি। ওইসময় একদিন বুবুর বাসায় গিয়েছি। যথারীতি বুলবুলির খোঁজ করলে আমাকে বলা হলো—এই তো বুলবুলি। লক্ষ্য করে দেখলাম কাজের ছেলের কোলে কঙ্কালসার একটি মেয়ে উদাস চোখে এক দিকে তাকিয়ে আছে। ছবির মত ফুটফুটে সুন্দর দৌড়াদৌড়ি করে বেড়ানো বুলবুলি যে এরকম হতে পারে আজ অবধি এটি আমি কল্পনা করতে পারিনা। সেদিনের মত বড় শক্ আমি বোধ হয় জীবনে আর কোন দিন পাইনি। পরবর্তী কালে মানুষের অসুখ ও চিকিৎসা সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছি, পড়েছি; কিন্তু এমন কোন রোগের কথা জানতে পারিনি যাতে কয়েকদিনের মধ্যে কারো এত পরিবর্তন হতে পারে। এর পরপর বুলবুলি মারা যায়।

ওই ছোট বয়সে একটি বড় দুর্ঘটনা আমি নিজেই এড়াতে পেরেছিলাম সেটি মনে পড়লে অনেক শান্তি পাই। নানার বাড়িতে বেড়াতে গেলে সাধারণত আমরা বাড়ির দেউড়িঘর ছাড়িয়ে নানাদের মসজিদের সামনের পুকুরে গোসল করতাম। অধিকাংশ সময় বড় কেউ থাকতো যার তত্ত্বাবধানে ছোটরা গোসল করতাম। একদিন সে রকম বড় কেউ ছিলনা ছিলাম শুধু আমি, আইয়ুব এবং জাহাঙ্গীর। সবাই পাকা ঘাটের উপর বসেই গোসল করার কথা। গোসল করে সবাই উঠে যাচ্ছি এমন সময় দেখলাম ছোট জাহাঙ্গীর কেমন করে জানি ঘাট ছাড়িয়ে পুকুরে পানির মধ্যে, এবং ক্রমে আরো দূরে চলে যাচেছ।

শহরে বলুয়ার দিঘিতে গোসল করার সময় স্কুলে যাবার আগের বয়সেই চৌধুরী খালু সাঁতার শিখিয়েছিলেন। এরপর সাঁতারের অভ্যাস খুব বেশি না থাকলেও কালেভদ্রে পুকুরে দাপাদাপি করেছি। সাঁতার যে জানি এ বিশ্বাস ছিল। তাই সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত ঘাট থেকে লাফিয়ে নেমে সাঁতরে গিয়ে জাহাঙ্গীরকে ধরে ফেলতে এবং তুলে আনতে পারলাম। পুকুর পাড়ে দেখলাম পাড়ার কয়েকটি ছেলে ছিল, একজন আমার থেকে বেশ কিছুটা বড়। সে বললো সে ঘটনাটি দেখেছে এবং অপেক্ষা করছিলো। বেগতিক দেখলে সেও ঝাঁপ দিত। কোন অঘটন ঘটার আগেই দুর্ঘটনা এড়াতে পেরেছিলাম সেদিন।

চুয়ান্নোর রাজনীতির ছোঁয়া

শিশুর চোখে রাজনীতি

যেহেতু একেবারেই ছোট বয়স থেকে বাসার সব আলোচনা ও আড্ডার আমি নিয়মিত শ্রোতা, আর যেহেতু সেই আলোচনার একটি বড় অংশ রাজনীতি, তাই রাজনীতির কথা সব সময় কানে এসেছে, তার থেকে আমি যখন যতটা বুঝি-না কেন। মনে পড়ে ১৯৫০-৫১ সালে, আমার স্কুলে ভর্তি হবার খানিকটা আগে বা পরে বাসায় বড় ভাইয়েরা, চাচারা ও মান্নান মাস্টারের মধ্যে আড্ডায় মাঝে মাঝে আইসোনামা'র (চাটগেঁয়েতে যা কোন নারীর ডাক নাম হতে পারে) কথা আর আমেরিকার কথা এক সঙ্গে ঘনঘন আলোচিত হচ্ছিল। আমার চিন্তা ছিল আইসোনামা'র মত গ্রাম্য মহিলার সঙ্গে আমেরিকার কী সম্পর্ক? পরে বুঝেছি মানুষটি ছিলেন আইজেনহাওয়ার, আর আলোচনাটি ছিল প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যানের পর প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করার জন্য তিনি রিপাবলিকান পার্টির নমিনেশন পাচ্ছেন কিনা, বা পাওয়ার পর জিততে পারবেন কিনা তা নিয়ে। বোঝাই যাচ্ছে শিশুর কানে রাজনৈতিক শব্দগুলো এক সময় বেশ আবছা ভাবেই আসছিল, তবে পরে তা আর এতটা আবছা ছিলনা। তাছাড়া সে শিশুর সাক্ষরতার উন্নয়নের পর বাসায় নিয়মিত রাখা *আজাদ* পত্রিকাও এদিকে তাকে সহায়তা দিয়েছে। এখন চলে আসি সেই ১৯৫৪ সালে। মিউনিসিপ্যাল স্কুলে আসা যাওয়ার এবং বন্ধুদের সঙ্গে ঘোরাঘুরির সুবাদে সে সময় রোজ রাস্তাঘাটে বেশ খানিক্ষণ কাটাতে হয়েছে। সে বছরটি ছিল প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের বছর। কাজেই শুধু বাসার আড্ডা নয়, পথের মিছিল, মাইকের ঘোষণা, আর রাজনৈতিক জনসভা এগুলোও বেশি বেশি নজরে পড়ার সুযোগ হচ্ছিল, কোন কোন সময় এগুলোতে সোৎসাহে উপস্থিতও থেকেছি।

যেমন এক সকালে স্কুলের কয়েক বন্ধু মিলে লক্ষ্য করলাম যে কয়েকটি ছোট ছোট মিছিল রেলওয়ে স্টেশনের দিকে যাচ্ছে; শোনলাম প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার

মোহাম্মদ আলী ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে আসছেন (জন্মগত নাম শুধু মোহাম্মদ আলী হলেও একই নামের অন্য এক গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদের থেকে আলাদা করতে, ও বগুড়া বাড়ি হওয়াতে, তিনি এই নামেই আখ্যায়িত হতেন)। কী মনে হলো আমরাও ক'জন মিছিল অনুসরণ করে স্টেশনে ঢুকে একেবারে প্লাটফরমে চলে গেলাম। ভীড়টি যে খুব প্রচণ্ড ছিল তা বলা যাবেনা। ট্রেনটি স্টেশনে ঢোকার সময়েই শুধু ট্রেনের বিশেষ কামরার দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য একটু হুড়োহুড়ি হলো। শহরের ও জেলার মুসলিম লীগ নেতারা ছিলেন, দু'একজনকে আগে দেখেছি, সবার হাতে ফুলের মালা। ওইসময় শ্লোগান হচ্ছিল শুধু 'উজিরে আজম জিন্দাবাদ' (উর্দুতে উজিরে আজম মানে হলো প্রধানমন্ত্রী)। আমাদের লক্ষ্য ছিল প্রধানমন্ত্রীকে এক নজর দেখবো, তা কিন্তু ঠিকই দেখতে পেরেছি। ছবিতে বহুবার দেখা স্যুট পরা মানুষটিকে ট্রেনের থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে অনেকে মালা পরাতে এবং আরো জোরে উজিরে আজমের জয়ধ্বনি দিতেও দেখলাম। এটি ছিল একটি নতুন অভিজ্ঞতা। ওই জায়গায় খুব বেশি পুলিশের যে উপস্থিতি ছিল এমনটিও মনে পড়েনা। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী এসেছেন, অথচ মোটেও তেমন জমকালো কিছু নেই, কেমন যেন ঘরোয়া ব্যাপার। আমাদের মত নেহাত ছোট কয়েকজন প্রাইমারি স্কুলের বালক একেবারে কাছে গিয়ে সব কিছু দেখলাম, তাতে কেউ বাধা দিলনা।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে এই প্রথম দেখলেও তাঁর কথা কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে শুনছিলাম, সেটি প্রধানমন্ত্রীর নিয়মিত মাসিক রেডিয়ো ভাষণে। আমাদের বাসায় রেডিয়ো ছিলনা। কিন্তু খালু, বড় দুই ভাই আর মান্নান মাস্টার মাসের ওই দিনে একেবারে নিয়ম করে সন্ধ্যা সাতটায় আব্বার বন্ধু হাজী বশরের কাপড়ের দোকানে রেডিয়োতে এই ভাষণ শুনতে যেতেন, এবং আমি অবশ্যই সঙ্গে থাকতাম। মিনিট পাঁচেকের হাঁটা পথ; যাওয়া আসার সময় এবং ভাষণের অপেক্ষায় থাকা সময়টুকু ছিল তাঁদের একটি সংক্ষিপ্ত রাজনৈতিক সেমিনার। আমি ছিলাম এর মনোযোগী শ্রোতা। ভাষণটিরও মনোযোগী শ্রোতা ছিলাম আমি। প্রথমে ইংরেজিতে প্রধানমন্ত্রী বলতেন, তারপর বাংলায় ও উর্দুতে অনুবাদ হতো। প্রধানমন্ত্রীর বাচনভঙ্গি আমার খুব ভাল লাগতো—বিশেষ করে 'ডিয়ার কান্ট্রিম্যান' বলে যেভাবে শুরু করতেন। আমার অবশ্য বাংলা অনুবাদটিই আসলে শোনা হতো—সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে বলতেন। তবে যদ্দূর মনে পড়ে ঘুরে ফিরে একটি বিষয় বার বার আসতো, তা হলো শিগ্‌গীর দেশের শাসনতন্ত্র রচনা শেষ হবে। তাতে সব মানুষের স্বার্থ রক্ষিত হবে। কিছুটা তাঁর কথায়, কিছুটা ওই চলন্ত সেমিনারের তুলকালাম আলোচনায়, আর হয়তো কিছুটা পরে আরো জেনে যা এখন মনে পড়ছে তিনি নিজে দুই কক্ষ বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট চাইছিলেন—উচ্চ কক্ষে পাঁচ প্রদেশের প্রত্যেকের সমান সংখ্যক প্রতিনিধি থাকবে, আর নিম্ন কক্ষ থাকবে জনসংখ্যার অনুপাতে, যার ফলে পূর্ববঙ্গের প্রতিনিধি হবে

বাকি সবার মিলিত সংখ্যার বেশি। তবে উভয় কক্ষের সম্মতি ছাড়া কোন আইন পাশ হবেনা।

বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে বাসার তরুণ তুর্কীরা পছন্দ করতেন না; কিন্তু আমি মনে মনে তাঁকে পছন্দ করতাম তাঁর স্মার্ট পোষাক ও বাচনের জন্য। অন্যরা তাঁকে পছন্দ না করার প্রধান কারণ যা পরে বুঝেছিলাম—মাত্র বছর খানেক আগে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ বলতে গেলে জোর করেই তখনকার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনকে বরখাস্ত করে নিজের খেয়াল খুশি মত মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে ওই পদে বসিয়েছিলেন। তিনি সে সময় যুক্তরাষ্ট্রে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। বগুড়ার নবাব বাড়ির মানুষ হলেও দেশে রাজনীতিবিদ হিসেবে তেমন কেউ তখন তাঁকে চিনতো না। আমেরিকান সরকারের তিনি নাকি পছন্দের লোক ছিলেন, তাছাড়া গভর্নর জেনারেল নিজে এবং প্রভাবশালী আমলারা ও মিলিটারিরা খাজা নাজিমকে চাইছিলেননা। আমেরিকার সঙ্গে একমত হয়ে তাঁরা চাচ্ছিলেন বিশ্বকম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে পাকিস্তান পরিপূর্ণ ভাবে মার্কিন মহলে থাকুক, যে কাজে নাজিমের চেয়ে বগুড়া সুবিধাজনক হবেন, কারণ তিনি খুবই মার্কিন ঘেঁষা মানুষ। এ জন্য বগুড়া দায়িত্ব নেবার পর মার্কিন সাহায্যও নাকি অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

সমরাস্ত্র আর বড় বড় প্রকল্পে সেই সাহায্য কেমন এসেছে না এসেছে সে খবর না রাখলেও মিউনিসিপ্যাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র আমিও কিন্তু সাহায্যের কিছু কিছু নগদ লাভ অনুভব করলাম। স্কুলে বড় বড় গুড়া দুধের টিন এলো যার ওপর আমেরিকার বন্ধুত্বের চিহ্ন হ্যান্ড-শেইকের ছবি থাকতো। ছাত্র-শিক্ষকের সবাই একটি করে টিন পেলাম বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য। মুঠো করে খাওয়া শুকনা সেই দুধের অপূর্ব স্বাদ ভুলিনি। এমনটি চলেছিল কয়েক বছর ধরে—পরের স্কুলগুলোতে কোন কোন সময় টিফিনের ছুটিতে এই দুধ গরম পানিতে গুলে স্কুল মিল্কের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শুধু তাই নয় একই রকম টিনে আসতো বাটার অয়েল (ঘিয়ের সমতুল্য)। পাউরুটির উপর তা লাগিয়ে ও চিনি দিয়ে স্যান্ডউইচের মত করে টিফিন দেয়া হতো। বাসায় খুবই সুন্দর লং গ্রেইন মার্কিন চালের ভাত খেয়েও খুব মজা পাচ্ছিলাম, এ চাল উন্নত মানের হলেও দাম কম ছিল সাহায্যের কল্যাণে। আরো একটি মার্কিন আকর্ষণ আমার জন্য ছিল; তা স্কুলের সঙ্গে থাকা লজেন্স, বিস্কুট, খাতা-পেন্সিলের দোকানে বিক্রি হতো। এ ছিল মুড়ির আকৃতির ছোট ছোট নানা রঙের মিষ্টি চকলেটের দানা। এগুলো ভরা থাকতো লম্বা বড় থার্মোমিটার আকারের স্বচ্ছ প্লাষ্টিকের নলের মধ্যে; নলের উপরে উড়ন্ত ভঙ্গিতে লাগানো থাকতো কাগজের খুব ছোট একটি মার্কিন পতাকা। এটি কিনতাম চকলেটের লোভে যতটা নয়, তার চেয়ে বেশি ওই নলের জন্য। আমি তখন বই দেখে দেখে এটি সেটি টুকটাক বিজ্ঞানের জিনিস বানাচ্ছিলাম। ওই প্লাষ্টিকের নল মোমবাতির আগুনের কাছে ধরলে অল্প তাপের আঁচে সহজে বাঁকিয়ে একে যে কোন আকৃতি দেয়া যেত।

নির্বাচনী রাজনীতি আমি প্রথম দেখেছি চট্টগ্রাম পৌরসভার নির্বাচনে (১৯৫৩), যা প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের কিছু আগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পৌরসভা জিনিসটির অস্তিত্ব আমার কাছে ধরা পড়তো কতগুলো অনুসঙ্গ থেকে। আমাদের স্কুলসহ সব সরকারী প্রাইমারি স্কুল চালাতো পৌরসভা—তাই পৌর সভার চেয়ারম্যান ও অন্যরা মাঝে মাঝে পরিদর্শনে আসতেন। আমি বই ধার করতাম পৌরসভার পাবলিক লাইব্রেরি থেকে। নানা প্রসঙ্গে পৌরসভার এক সময়ের দীর্ঘকালীন চেয়ারম্যান নূর আহমদ চেয়ারম্যানের কথা প্রায়ই আসতো। তিনি আর চট্টগ্রাম পৌরসভা প্রায় সমার্থক হয়ে গিয়েছিল, যদিও তিনি তখন আর চেয়ারম্যান নন। আরো চাক্ষুষ ভাবে পৌরসভা আমাদের কাছে ধরা দিত দুইটি ব্যতিক্রমী গাড়ির মাধ্যমে। এর একটি দরকারি কাজ করলেও এটির প্রতি আমাদের কোন আকর্ষণ ছিলনা, কারণ এটি ময়লা সংগ্রহের ট্রাক, আমাদের দোকানের সামনে দাঁড়ালে নাকে কাপড় দিতে হতো। একে সবাই বলতো 'লাট সাহেবের গাড়ি', অথবা 'নূর আহমদ চেয়ারম্যানের গাড়ি'। আমার আগ্রহ ছিল অন্য গাড়িটিতে যেটি ছিল পৌরসভার পক্ষ থেকে নাগরিকদের জন্য নানা জ্ঞাতব্য জানানো এবং ঘোষণা দেবার গাড়ি। এর চেহারা, কাজ কারবার, সবই ছিল ব্যতিক্রমী। খুব ছোট বেলায় যখন দেখেছি এর রং ছিল আগাগোড়া লাল। পরে এই রং পরিবর্তন করে নীল করা হয়েছিল—এই দুই রঙের কোনটি অন্য কোন গাড়ির সঙ্গে মেলেনা। এটি ছিল একটি কভার্ড ভ্যানের মত গাড়ি, পেছনের অংশের উপরের দিকে জালি দেয়া গোল কয়েকটি মাত্র জানালা ছিল। বাইরে থেকে কিছু দেখা যেত না। সামনে ড্রাইভার যেদিকে বসতো সেদিকটাও দূর থেকে ভাল ভাবে দেখা যেতনা। তাই বুঝতে পারতাম না ঘোষণাগুলো কে দিচ্ছে, আওয়াজটি কোন দিক থেকে বের হচ্ছে। মনে হতো ওই গাড়িটিই ঘোষণা দিচ্ছে। গাড়িটি আসতো সব দিন নয়, মাঝে মাঝে যখন জানাবার কিছু থাকতো। কিন্তু তার প্রত্যেকটি আচরণ ছিল একেবারে ছক বাঁধা, খুবই প্রত্যাশিত রকমের। গাড়িটি সব সময় টেরিবাজারের দিক থেকে বেশ ধীর গতিতে আসতো। আমাদের দোকান থেকে দু'এক দোকান এগিয়ে গিয়ে আছদগঞ্জের দিকে মোড় নেবার ঠিক আগের জায়গাটিতে দাঁড়াতো, কোনদিন এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। চিঁচিঁ করে একটি আওয়াজ তুলে মাইক প্রস্তুত হতো, বোঝা যেত এবার ঘোষণা আসবে। মনে হয় প্রায় সব সময় একই কণ্ঠ শুনেছি। একটি ভারিক্কি, যান্ত্রিক গলা খুবই আনুষ্ঠানিক উচ্চারণে শুরু করতো : 'সম্মানিত নগরবাসীর জন্য একটি ঘোষণা..'। এর পর হয়তো বলা হতো পৌর ট্যাক্স প্রদানের সর্বশেষ তারিখের কথা, অথবা হয়তো পৌরসভার বেওয়ারিশ কুকুর নিধন কার্যক্রমের খুঁটিনাটি ইত্যাদি রকমের অন্য কোন ঘোষণা। সব ঘোষণাই আর একবার সম্পূর্ণ পুনরাবৃত্তি করা হতো। তারপর আছদগঞ্জের দিকে মোড় ঘুরে গাড়িটি চলে যেত ধীরে ধীরে। আমরা ক্রমে বড় হয়েছি এসব ঘোষণা শুনতে শুনতে, কিন্তু ওই ঘোষক গাড়িটি বরাবর একই রকম ছিল।

সেবার পৌরসভার নির্বাচনের ডামাডোলটি আমাদের ছোটদের খুব কাছে চলে এসেছিল। আমাদের এলাকার ওয়ার্ড কমিশনারের নির্বাচন হবে, তাঁরাই পরে চেয়ারম্যান নির্বাচন করবেন। এখানে দু'জন প্রার্থী ছিলেন—একজন মুসলিম লীগের কামাল খান সাহেব, অন্য জন আওয়ামী মুসলিম লীগের (পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ) এম এ গণি সাহেব। তাঁরা দুজনেই আমাদের বাসার খুব কাছের পাথরঘাটা এলাকার বাসিন্দা। কামাল সাহেবকে আগে থেকে চিনতাম কারণ আমাদের প্রতিবেশী দোকানের নূরুল আলমের সঙ্গে যখন তাঁর আনসার ট্রেনিংএ গিয়েছিলাম—সেখানে তরুণ কামাল সাহেবকে মুকুল ফৌজের নেতৃত্ব দিতে দেখেছি। মুকুল ফৌজ ছিল তখনকার নামকরা শিশু কিশোর সংগঠন—সারা প্রদেশ ব্যাপী। *আজাদ* পত্রিকায় তাদের একটি পাতা থাকতো। ওখানে দেখেছি তাঁর বাঁশির তালে তালে ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের প্যারেড করতে, এক জনের পিঠে আর একজন উঠে পিরামিড তৈরি করতে। এম এ গণি সাহেবকে দেখেছি অল্প কিছুদিন আগে বাসায় এসে বড়দার সঙ্গে কথা বলতে। বড়দা তখন আওয়ামী লীগের সমর্থক ছিলেন। তিনি বড়দাকে বোঝাচ্ছিলেন কী ভাবে এবার এই ওয়ার্ডে মুসলিম লীগের একচেটিয়াত্ব ভাঙ্গা যাবে। এ কাজে বড়দার সাহায্য চাইছিলেন তিনি।

ওয়ার্ড নির্বাচনটি একেবারে আমাদের কাছে চলে এলো যখন আব্বা কামাল সাহেবের একটি নির্বাচনী সভা আমাদের দোকানের বারান্দায় করার অনুমতি দিলেন। এই অনুমতি তিনি দিলেন রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী সাহেবের কারণে; তিনি এতে প্রধান অতিথি থাকবেন। রফিক উদ্দিন সিদ্দিকী (সবাই ডাকতো রফিক মিয়া) চট্টগ্রামের অত্যন্ত সম্মানিত ব্যক্তি, তখন পৌরসভার চেয়ারম্যান। আলো জ্বালিয়ে, মাইক সহযোগে রাতের এই জনসভাটি হলো, সামনের রাস্তায় ও আশপাশের দোকানের বারান্দায়ও মানুষ বসে বা দাঁড়িয়ে শুনলেন। স্থানীয় সব সমস্যা নিয়েই কথাবার্তা। রফিক মিয়া আমাদের স্কুল পরিদর্শনে আসার কারণে তাঁকে দেখেছি—খুবই শরীফ মানুষ, নম্রভাষী। সে সময় ছাত্রদের পক্ষ থেকে এক দিনের ছুটির দরখাস্ত নিয়ে আমিই গিয়েছিলাম, তিনি হেসে দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। এখন এমন মানুষের বক্তৃতা আমাদের দোকানের সামনেই শোনলাম। এ সভার পর এম এ গণি সাহেব আব্বাকে ধরলেন, তাঁকেও এখানে প্রচার সভা করার অনুমতি দিতে হবে। আব্বা বুঝিয়ে বললেন সেটি রফিক মিয়ার সম্মানে দিয়েছিলেন, তাঁকে আব্বা অনেক শ্রদ্ধা করেন বলে। এমনিতে কাউকেই সভা করতে দেয়ার পক্ষপাতি তিনি নন। গণি সাহেব বুঝলেন, তিনি আমাদের পাশেই আর একটি দোকানের সামনে সভা করলেন, আব্বাকে সহ আমাদের সবাইকে আমন্ত্রণ করলেন—আমরা গেলাম। এখানে কে কি বলেছিলেন তা মনে নেই, তবে গণির প্রশংসায় গাওয়া গানটির একটুখানি মনে আছে—'ব্রাদার ব্রাদার পাথরঘাটার এম এ গণি...'। পৌরসভা নির্বাচনে এভাবে দুটি সভা একেবারে বাড়ির কাছে হলো, সব আয়োজন চোখের সামনে দেখলাম, এ ছিল একটি অনন্য অভিজ্ঞতা।

যুক্তফ্রন্টের নির্বাচন

মিউনিসিপ্যাল প্রাইমারিতে আমার বছরটির প্রথম দিকটা কেটেছে প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনী ডামাডোলে। নির্বাচনটি হয়েছিল ১৯৫৪এর ৮ থেকে ১১ই মার্চ। আসলে ডামাডোল শুরু হয়ে গিয়েছিল আগের বছরের শেষ দিকটাতেই। প্রথম দিকে বাসায় জোর তর্ক বিতর্ক শুনেছি যুক্তফ্রন্ট গঠন নিয়ে। আসলে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে শক্তিশালী নির্বাচনী প্রতিপক্ষ গড়ে তুলতে শেরেবাংলা ফজলুল হক ও মাওলানা ভাসানীকে অনেকে একই সঙ্গে পেতে চাইছিলেন। ভাসানী তো আওয়ামী লীগের সভাপতি, কিন্তু ফজলুল হকের সে সময় কোন দল ছিলনা। তবে অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী এই কিংবদন্তির রাজনীতিবিদ একাই এক শ। রাতারাতি নতুন দল তিনি গড়ে নিলেন—'কৃষক শ্রমিক পার্টি'। মানুষের চাহিদায় হক-ভাসানীর যুক্তফ্রন্টও হলো, যদিও কাজটি সহজ হয়নি। হক সাহেবের বায়না অনেক, আওয়ামী লীগও কম যায়না। তাছাড়া সবাই চাইলো যত ব্যাপক ভাবে সম্ভব সব মুসলিম লীগ বিরোধীদের এর সঙ্গে যুক্ত করতে। আসলে বামপন্থী 'পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ' আর 'গণতন্ত্রী পার্টির' সমর্থকরাই বিশেষ করে জোর দিচ্ছিলেন যুক্তফ্রন্ট গড়তে। তাই তাঁরা তো থাকলেনই, ধর্মীয় দল নেজামে ইসলামকেও সঙ্গে নিতে রাজি হলেন। এই সবাইকে নিয়েই গঠিত হয়েছিল যুক্তফ্রন্ট। অবশ্য যুক্তফ্রন্ট বলতে সবাই বুঝছিলো মূলত হক-ভাসানীকে। ওই নাম দুটিই সবার মুখে বার বার এক সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছিল। আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় প্রধান এবং অবিভক্ত বাংলার আর একজন প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর নামও থাকতো, তবে যেহেতু তিনি প্রদেশে নয় বরং কেন্দ্রের রাজনীতিতে বেশি জড়িত তাই তাঁর স্থানটি ছিল ভিন্ন। যেই বোঝাপড়া হয়েছিল তাতে যুক্তফ্রন্ট জিতলে হক সাহেব পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবেন, আর কেন্দ্রে এর প্রভাব ভালভাবে পড়লে সোহরাওয়ার্দী হবেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী।

'যুক্তফ্রন্টের' সঙ্গে অন্য যে শব্দটি শুনতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম তা হলো 'একুশ দফা'। নির্বাচন যত ঘনিয়ে এলো অন্যদের সঙ্গে আমার লালদিঘির ময়দানে জনসভায় যাওয়ার সুযোগ তত বাড়লো। তখনকার দিনে জনসভায় যাওয়াটি বোধ হয় খুব স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। আব্বার সঙ্গে গিয়েছি, খালুর সঙ্গে গিয়েছি, বড় ভাইদের সঙ্গেও গিয়েছি—একা খুব একটা গিয়েছি বলে মনে পড়ে না, যদিও জায়গাটি বাসার খুব কাছে, আমার স্কুলে যাতায়তের পথেই। মনে হয় বড় কোন নেতা যখনই এসেছেন নির্বাচন উপলক্ষে, বাসার লোকজনের জনসভায় যাওয়া সহজে বাদ যেতনা। একুশ দফার নানা দফা নিয়েই যুক্তফ্রন্টের সভায় বক্তারা বলতেন, তবে কোন কোন দফার উপর গুরুত্ব পড়বে তা নির্ভর করতো এটি যুক্তফ্রন্টের শরিক দলের মধ্যে কোনটির সভা তার ওপর। অবশ্য প্রায় সব বক্তারই কথায় থাকতো, পত্রিকা জুড়েও থাকতো, বাসার তর্কবিতর্কেও থাকতো

বলে যে দফাগুলো বেশি মনে পড়ে তা হলো—বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে, পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন আদায় করা হবে, এবং স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি অনুসরণ করা হবে। একুশ দফার আর একটি দফা আমার কাছে বিশেষ ভাবে প্রিয় ছিল—তা হলো পাকিস্তান নৌ-বাহিনীর সদর দফতর চট্টগ্রামে নিয়ে আসা হবে। এর লক্ষ্য ছিল পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার দায়িত্ব পূর্ব বাংলার হাতেই থাকবে। কিন্তু আমি ভাবছিলাম 'পিএনএস বাবরের' মত দারুণ সব যুদ্ধ জাহাজগুলো চট্টগ্রামের বন্দরেই থাকবে, মোহাম্মদ হোসেন ভাইয়ের মত আমরা অনেকেই তার নৌসেনা হতে পারবো। তিনি যে একবার আমাকে 'বাবরে' নিয়ে গিয়েছিলেন—তার যাদুকরী প্রভাব আমি তখনো ভুলিনি।

যুক্তফ্রন্ট নিয়ে বেশ কিছু প্যাঁচ লেগেছিল সারা প্রদেশেই—এত শরিকের মধ্যে নমিনেশন ভাগ করে দিতে গিয়ে। এরকম একটি নমিনেশন সমস্যার আলোচনা বাসায় শুনে শুনে তাতে আমার কিছু আগ্রহ জন্মেছিল। এটি ছিল চট্টগ্রামের ডবল মুরিং এলাকা থেকে আওয়ামী লীগের এম এ আজিজ (বর্তমান এম এ আজিজ স্টেডিয়াম খ্যাত) নাকি কৃষক শ্রমিক পার্টির মাহমুদুন্নবী চৌধুরী যুক্তফ্রন্টের নমিনেশন পাবেন তা নিয়ে। মাহমুদুন্নবী চৌধুরীকে (পরে মন্ত্রী। বিএনপি নেতা সাবেক মন্ত্রী আমীর খসরু মাহমুদের বাবা) আমরা ছোটরা চিনতাম 'নবী স্টোরের' জন্য, তাঁকে সবাই নবী চৌধুরী বলেই জানে। বাসার কাছে আন্দর কিল্লা ও টেরিবাজারে থাকা দুটি ফ্যাশন দুরস্ত দোকান 'নবী স্টোর' এবং 'আফগান স্টোর' থেকেই প্রতি ঈদে আমাদের কাপড় জামা কেনা হতো। আফগান স্টোরের মালিক একজন পাঠান—দশাসই মানুষটিকে দোকানে বসে থাকতে দেখতাম। তেমনি কখনো কখনো নবী চৌধুরীকেও দোকানে দেখতাম; সে কারণেই পরিচিতি। ঘটনাটির প্রতি আমার আগ্রহের কারণও এটি। শুনেছি নমিনেশন নিয়ে এই সমস্যা প্রায় ভাঙ্গনের পর্যায়ে চলে গিয়েছিল, দুই দলের কেউ ছাড়বেনা। শেষ পর্যন্ত হক সাহেব বুদ্ধি করে ব্যাপারটি ফয়সালা করার পুরো এখতিয়ার আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতা সোহরাওয়ার্দীর ওপর দিয়ে দিয়েছিলেন। আর সোহরাওয়ার্দী ভাঙ্গন ঠেকাতে নিজের দলের এম এ আজিজের বদলে নবী চৌধুরীকেই নমিনেশন দিয়েছিলেন।

একের পর এক বড় নেতা আসছিলেন চট্টগ্রামে—যুক্তফ্রন্টের এবং মুসলিম লীগের। আর তাঁদের কারো কারো জনসভায় গিয়ে তাঁদেরকে দেখার ও শোনার সুযোগ হয়েছে, সেই সঙ্গে নির্বাচনী প্রচারের উৎসব দেখার। যুক্তফ্রন্টের প্রতীক নৌকা আর মুসলিম লীগের হারিকেনে সারা শহর ঢেকে গিয়েছিল। জনসভার আশে পাশে তো প্রতীকের মচ্ছব লেগে যেত। ছোট ছোট মিছিল আসতো বিশাল বিশাল প্রতীক সঙ্গে নিয়ে। শেরেবাংলা ফজলুল হককে এরকম একটি সভাতেই দেখেছি। তিনি চট্টগ্রামের যুক্তফ্রন্টের সব প্রার্থীকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের সবার সঙ্গে আলিঙ্গন করেছিলেন। আমাদের এলাকার প্রার্থী আওয়ামী

লীগের তরুণ শ্রমিক নেতা জহুর আহমদ চৌধুরী (পরে বংলাদেশে মন্ত্রী)। এলাকায় রাতদিন মাইকের প্রচারের কারণে নামটি আমাদের কাছে সব চেয়ে বেশি পরিচিত। হক সাহেবের তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেয়াটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করলাম। অতি বয়োজ্যেষ্ঠ ভারী দেহের হক সাহেব, লিকলিকে তরুণ জহুর আহমদ চৌধুরী দুজনের গায়েই পাতলা শেরোয়ানী, অনেকটা লম্বা কুর্তার মতো—উভয়ের আলিঙ্গনটি লক্ষ্য করলাম।

জনসভায় আমার প্রিয় অংশ থাকতো এর গানগুলো। প্রথম দিকে চলতো গানের পর গান, কোন কোনটি নতুন তৈরি, কোন কোনটি জনপ্রিয় গানের প্যারোডি—ফিল্মের গান, আধুনিক গান, চাটগেঁয়ে লোকগীতি ইত্যাদি। যেমন মনে আছে আধুনিক গানের সুরে :

'কৃষক শ্রমিক, আওয়ামী লীগ, নেজামে ইসলাম
যুক্তফ্রন্টের ডাক এসেছে, আসছে মানুষ ডান ও বাম
ও ভোটারগণ, দাও রাঙিয়ে মন...'

অথবা চাটগেঁয়ে গানে :

'হুন্যানি ভাই গইন্যার বাপ
ভোট দিবার লাই খইই পাঠাইছে'

অথবা মুসলিম লীগের সভায় হিন্দি ফিল্মের গানের সুরে :

'জিন্নার বাণী ভুলব না কো এই করেছি পণ,
তুলে ধর লীগ নিশান, লীগ নিশান'।

মাওলানা ভাসানীর জনসভায় দেখেছি শুরুতে অনেক্ষণ একের পর এক গান; এবং তারপর আগত নেতাদের মধ্যে আওয়ামী লীগের তরুণ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বেশ কিছুক্ষণ বক্তৃতায় শ্রোতাদেরকে মগ্ন করে রাখলেন। কারণ তিনি কিছু গল্পের মাধ্যমে তাঁর কথাগুলো বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন। একটি গল্প মনে আছে—এক অতি ক্ষুধার্ত মানুষ পেটের জ্বালায় দোকানে রাখা ঝোলাগুড়ের হাড়ির কাছে ঘুর ঘুর করছিল, সাহসে কুলাচ্ছিলনা সে সেখান থেকে খায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত না পেরে নিজের হাতটি হাড়ির মধ্যে চট করে কিছুটা ডুবিয়ে বের করে আনলো। তারপর হাত থেকে গুড় চাটতে চাটতে বলছিল 'ভয় করলেই ভয়, সাঁধাই দিলে কিছু না'; এভাবে মুসলিম লীগ শাহীও হলো কাগুজে বাঘ, সাহস ভরে এর মোকাবেলা করলে এটি উড়ে যাবে। ভাসানী দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন, প্রার্থীদের পরিচিত করলেন, এক একটি করে একুশ দফা ব্যাখ্যা করলেন। মনে হলো এর প্রত্যেকটির সঙ্গে তাঁর অনেক আবেগ জড়িত। মাঝে বেশি শ্লোগান বা গোলমালে বাধাগ্রস্ত হলে তিনি 'খামুশ' 'খামুশ' বলে সবাইকে থামাচ্ছেন।

কয়েকটি সভায় গিয়েছি আব্বার সঙ্গে। আব্বা খুব বেশি না হলেও বেশ কয়েকটি সভায় গিয়েছেন। তবে দল হিসেবে নয়, নেতা হিসেবেই ঠিক করতেন

কোনটিতে যাবেন—ফজলুল হকের সভায় গেছেন, আবার উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের বিখ্যাত মুসলিম লীগ নেতা আবদুল কাইয়ুম খান যখন এসেছেন মুসলিম লীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রচারে তখন আমাকে নিয়ে গিয়েছেন। আব্বা তখন বলছিলেন যে এই কাইয়ুম খানের কারণেই পাঠানরা পাকিস্তানে এসেছে। নইলে তাদের নেতা খান আবদুল গাফ্ফার খান (সীমান্ত গান্ধী) কংগ্রেসী ছিলেন, ভারতে যোগ দিতে চেয়েছিলেন। সব কিছু মজা করে দেখছিলাম এবং সব দলের সভায় যাচ্ছিলাম বটে, তবে গোড়া থেকেই সবার কথা থেকে বুঝতে পারছিলাম যুক্তফ্রন্ট ভাল ভাবে জিতলেই আমাদের বিজয় হবে। সোজা কথা তখন পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনায় আমাদের হাত থাকবে বেশি, নিজেদের বিষয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নেব। বাংলা রাষ্ট্রভাষা হবে। চট্টগ্রামে নৌবাহিনীর সদর দফতর হবে।

নির্বাচনের আগের দিনগুলোতে বাসার সামনে বক্সীর হাট রোডের দৃশ্য ছিল রিক্সার বা ঘোড়ার গাড়ির মাইক থেকে একটানা প্রচারের শব্দ—প্রায় অভিন্ন ভঙ্গিতে অভিন্ন কথা—'আগামী সাধারণ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থী গরীবের দরদী, মজলুমের বন্ধু, জনাব জহুর আহমদ চৌধুরীকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে জয় যুক্ত করুন'। প্রায় একই রকম কথায় মুসলিম লীগের মনোনীত প্রার্থী রফিক উদ্দিন সিদ্দিকীর (রফিক মিয়ার) মাইকিং। রফিক মিয়াই শুধু আগে থেকে আমার পরিচিত ছিলেন—স্কুলে পৌর চেয়ারম্যান হিসেবে পরিদর্শনে, এবং পৌর সভা নির্বাচনে আমাদের দোকানের বারান্দার জনসভায়। তাঁর মাইকিং এবং পোস্টারে অন্যান্য কথার সঙ্গে একটা কথা গুরুত্ব পেয়েছে দেখলাম তা হলো তিনি ছিলেন 'কাহার পাড়া মিলিটারি নির্যাতনের বিরুদ্ধে অকুতোভয় সেনানী'। আব্বাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম ঘটনাটি দেশবিভাগের পূর্বের। কসাই পেশার লোক অধ্যুষিত চট্টগ্রামের কাহার পাড়ার স্থানীয় একটি অসন্তোষকে কেন্দ্র করে মিলিটারির লোকরা অভিযান চালিয়ে বেশ কিছু মানুষ হত্যা করেছিল। রফিক মিয়া তখন বৃটিশ মিলিটারি বিরোধী একটি সাহসী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন মুসলিম লীগের হয়ে—আমি যে নম্র মানুষটিকে চিনতাম এটি তার সঙ্গে মেলেনা।

ছোট ছোট নির্বাচনী মিছিলের শ্লোগানগুলো আমাদের বাসার প্রায় ব্যাকগ্রাউণ্ড মিউজিকের মতো হয়ে পড়েছিল—'ভোট দেবেন কাহাকে—জহুর আহমদ চৌধুরীকে'। রফিক মিয়ারও মিছিল ছিল, কিন্তু তুলনায় কম। মনে হয় যুক্তফ্রন্টের জোয়ার অন্তত এখানে ইতোমধ্যেই বোঝা যাচ্ছিল। ছোট জাহাঙ্গীরের মুখে জড়িয়ে ফেলা 'জম্মদ চৌধুরীকে' শ্লোগান শোনার জন্য আমরাও তাকে সহ নিয়ে বাসায় ছোটদের মিছিলে শ্লোগান দিতাম। জাহাঙ্গীরের অন্য শ্লোগানটি ছিল 'বাত্তান, উয়াববো' (পাকিস্তান জিন্দাবাদ)।

পাশাপাশি আরো কিছু নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল—সেগুলো সংখ্যালঘু ধর্মের মানুষদের সংরক্ষিত আসনের ও নারী আসনের প্রার্থীদের। নির্বাচনটি ছিল 'পৃথক নির্বাচনের'—বৃটিশ আমল থেকে যে নিয়ম চলে আসছিল; এতে প্রত্যেক

সম্প্রদায় শুধু নিজেদের মধ্যে ভোট করে নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনে প্রতিনিধি পাঠাতো। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল জিততে পারলে পাকিস্তানের শাসনতন্ত্র প্রণয়নে এটি সব সম্প্রদায়ের 'যুক্ত নির্বাচন' প্রবর্তন করবে। কিন্তু আপাতত এই নির্বাচনটি হচ্ছে পৃথক নির্বাচনে; তাই কংগ্রেস, কম্যুনিস্ট পার্টি, তফসিলী ফেডারেশন এসব দল আলাদা ভাবে নির্বাচন করছে—যেখানে প্রার্থী ও ভোটার সবই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। কাজেই গরুর গাড়ি (কংগ্রেস), কাস্তে হাতুড়ি (কম্যুনিস্ট পার্টি) এসব মার্কাও দেখা যাচ্ছিল, এসব মার্কা-হাতে প্রচারও ছিল। তবে নৌকা আর হারিকেনের বন্যার মধ্যে তা ছিল কিছুটা নিস্প্রভ।

ভোটের দিন আমি একটি ব্যতিক্রমী কাজ করলাম। বাসা থেকে যারা ভোট দিতে যাচ্ছে তাদের কারো সঙ্গে নয়, একা একা আমাদের কাছের একটি ভোট কেন্দ্র দেখতে গেলাম। দেখলাম দীর্ঘ লাইনে মানুষ ভোট দিতে দাঁড়িয়েছে। সেখানে দু'চারজনকে চিনলেও ঠিক কথা বলার মত চেনা নয় কেউ। কিন্তু একজনকে পেলাম যাঁর সঙ্গে কথা বলা যায়; তিনি ইউনূস মিস্ত্রি—আমাদের পরিবারের ছোট বড় কাঠের কাজগুলো তিনি করেন, পরিবারের সবার বন্ধুস্থানীয় মানুষ, আমাকে খুব স্নেহ করেন। তাঁর কাছে গিয়ে বল্লাম 'ভোট কাকে দেবেন?। তিনি বললেন 'তুমিই বলো দাও কাকে দেব'। আমি বল্লাম 'যুক্তফ্রন্টকে'। তিনি আশ্বস্ত করলেন ভোট তিনি সেভাবেই দেবেন। আমি খুশি মনেই ফিরে এলাম কিছুক্ষণ পর, যুক্তফ্রন্টের একটি ভোট তো বাড়িয়েছি।

সন্ধ্যার পর পর ভোটের ফলাফল আসতে শুরু করলো, আমাদের কাছের আসনগুলোর। কয়েকজন বিজয়ী প্রার্থীকে দেখলাম ছোট মিছিলের সঙ্গে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে। এগুলো দেখার জন্য দোকানের সামনে বারান্দায় আগ্রহ ভরে অপেক্ষা করলাম। রাত সাত-আটটার মধ্যেই জহুর আহমদ চৌধুরীকে দেখলাম অল্প কিছু সমর্থক নিয়ে মিছিলে হেঁটে যেতে। গলায় অনেক ক'টা ফুলের মালা। মাথার ওপর অন্যরা একটি হ্যাজাক বাতি ধরে রয়েছে—তারই আলোকে তিনি আলোকিত। আসলে এগুলো ছিল এক রকম ধন্যবাদ জানানোর মিছিল। তিনি সালাম দিতে দিতে চলছেন, রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে অনেকে হাত তুলে সালামের প্রত্যুত্তর দিচ্ছেন। কেউ কেউ এগিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে হাত মিলাচ্ছেন। মিছিলে শ্লোগান উঠছে 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ', 'হক-ভাসানী জিন্দাবাদ', 'সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ', 'জহুর আহমদ চৌধুরী জিন্দাবাদ'। গলা ফাটানো শ্লোগান নয়, তবে যথেষ্ট আনন্দের। আর একটু পরে ঠিক একই ভাবে গেলেন মাহমুদুন্নবী চৌধুরী। একই ভাবে মাথার উপর হ্যাজাক বাতি ধরা, তিনি সালাম দিতে দিতে, হাত মেলাতে মেলাতে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছেন। একটু বেশি রাতের দিকে গেলেন প্রফেসর আসহাব উদ্দিন। যুক্তফ্রন্টের এই প্রার্থীর কথা আমি আগেই শুনেছিলাম, এবং তাঁকে চিনতাম লেখক হিসেবে। তাঁর 'ধার' নামের রম্য রচনার বই আমাদের বাসায় ছিল, এবং আমি তা পড়ে মজা পেয়েছি। কলেজের অধ্যাপক এই সুলেখক

মানুষটি বামপন্থী রাজনীতি করেন। যদিও অনেকের কাছে তিনি কম্যুনিস্ট, যুক্তফ্রন্টের টিকেট পেয়েছিলেন গণতন্ত্রী দলের সদস্য হিসেবে। যুক্তফ্রন্টের এ পর্যন্ত যাদের কথা শুনেছি তার মধ্যে তিনিই একজন ক্ষুরধার বুদ্ধিজীবী: হেঁটে যাবার সময় দেখলাম অধ্যাপক সুলভ সাদাসিধে মানুষ, ঢিলেঢালা ভাবে চলেছেন। বিজয়ী আরো দু'একজন যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীর মিছিল দেখলাম, তাঁদের নাম মনে পড়ছে না।

পরদিন হাজী বশরের দোকানে গিয়ে রেডিয়ো শোনার মাধ্যমে প্রথম ধারণা করতে পারলাম যুক্তফ্রন্টের জয়ের মাত্রা। তখন জাতীয় পত্রিকাগুলো চট্টগ্রামেও দিনেরটি দিনে আসতোনা। একদিন পর আমরা পেতাম। পত্রিকার উপর লেখা থাকতো ঢাকা ৮ মার্চ, মফস্বল ৯ মার্চ। যতগুলো আসনের খবর পাওয়া গেছে প্রায় সবগুলো আসনে যুক্তফ্রন্ট জিতেছে। বড় খবর হলো প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন হেরে গেছেন যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী এক তরুণের কাছে। সারা চট্টগ্রামে যুক্তফ্রন্টের বাইরে জিতেছেন মাত্র একজন—ফজলুল কাদের চৌধুরী, স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে। সংখ্যালঘু আসনে কংগ্রেস অনেকগুলো আসন পেয়েছে, বহু আসন পেয়েছে তফসিলী ফেডারেশনও। কম্যুনিস্ট পার্টির কয়েক জন জিতেছেন। চট্টগ্রামে কংগ্রেসের নেলি সেন গুপ্ত এবং কম্যুনিস্ট পার্টির পূর্ণেন্দু দস্তিদার—এই দুই বিজয়ী প্রার্থীর নাম আগে থেকে জানতাম; নেলি সেনগুপ্তকে আগে দেখেছিও। পূর্ণেন্দু দস্তিদার অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের একজন বিপ্লবী হিসেবে খুবই পরিচিত ছিলেন।

ঐ নির্বাচনী আবহের মধ্যে আমাদের পরিবারে একটি খুশির খবর এসেছে আমাদের একজন নতুন ভাইয়ের জন্ম। ওর নামকরণ নিয়েও এক ধরনের যুক্তফ্রন্ট করা হলো। বহু নামের মধ্যে ফাইনালিস্ট ছিল দুটি নাম—আবু রাশেদ ও সাইফুদ্দিন। কেউ যেহেতু তার অগ্রাধিকার ছাড়েনা, কাজেই ঠিক হলো দুটি নাম একত্র করে রাখা হবে আবু রাশেদ মুহাম্মদ সাইফুদ্দিন। এর পরের মাসগুলোতে আমরা বেশি বেশি করে তাকে নিয়েই সক্রিয় হয়ে পড়লাম।

বন্যা ও গ্লোব মাস্টার

নির্বাচনের পর খুব বেশি দিন রাজনীতির ওরকম ছোঁয়া আর আমার দৈনন্দিন জীবনে বজায় থাকেনি। আসলে রাজনীতিটাই চুপসে গিয়েছিল তখন, আর সেইসঙ্গে এতে বাসার লোকজনের উৎসাহও। শরিক দলগুলোর মধ্যে, বিশেষ করে হক সাহেবের সঙ্গে আওয়ামী লীগের বনিবনা না হওয়াতে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা পুরাপুরি গড়তেই সময় লাগলো যথেষ্ট। তারপর গঠনের পর এটি কয়েক মাসের বেশি টিকতে পারলোনা। আদমজী জুট মিল ও কর্ণফুলী পেপার মিলের বাঙালি-বিহারি দাঙ্গাকে সরকারের ব্যর্থতা বলে, কলকাতায় সফরে গিয়ে আবেগ ভরে হক সাহেব যুক্ত বাংলার কথা বলেছেন এমন খবরকে দেশদ্রোহিতা আখ্যা দিয়ে, গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করেন (৩০ মে,

১৯৫৪)। এর বদলে পূর্ব বঙ্গে গভর্নরের শাসন, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের শাসন জারি করা হলো। এই জারি যেই ধারায় করা হয়েছিল সেই ৯২-ক ধারা কথাটি আমাদের কাছে খুব পরিচিত হয়ে উঠলো। কট্টর এক সাবেক মিলিটারি আমলা মেজর জেনারেল ইসকান্দর মির্জাকে প্রদেশের গভর্নর করে পাঠানো হলো এই শাসনভার গ্রহণের জন্য।

আস্তে আস্তে আপাতত আমাদের জীবনের আশপাশ থেকে রাজনীতি উধাও হয়ে গেল; যুক্তফ্রন্টের কথাও চলে গেল সাময়িক বিস্মৃতিতে। হক সাহেব রাজনীতি ছেড়ে দেবেন বলে প্রতিজ্ঞা করেছেন, ভাসানী দেশের বাইরে বাইরে ঘুরছেন—গভর্নর জেনারেল সাহেব নাকি বলেছেন ফিরলেই তাঁকে গুলি করা হবে তাঁর নানা 'দেশদ্রোহিতা'মূলক কথার জন্য। সোহরাওয়ার্দীও হয়ে পড়েছেন রাজনীতিতে নিরুদ্দেশ।

এদিকে আমাদের বৃত্তির বছরের মাঝামাঝিতে চলে আসতে 'প্রশ্নোত্তরিকা' থেকে সহজে মাথা তুলতে দিচ্ছিলেন না গরম মাস্টার। তাই বলে লালদিঘি পারের সেই লাইব্রেরিগুলো থেকে 'আউট বই' এনে সেগুলো পড়ার কাজেও বিরাম ছিলনা। ওই সখের পড়া, সখের কাজগুলো যেই বিরতিটুকু দিত সেটি প্রশ্নোত্তরিকার অত্যাচারটিকে সহনীয় করতো। এর মধ্যে নতুন একটি ঘটনা ঘটলো—পূর্ব বাংলার নানা জায়গায় বন্যা দেখা দিল যা দেখতে দেখতে ভয়াবহ রূপ নিলো। প্রথমে কয়েক হাজার কিন্তু শিগ্‌গীর লক্ষ লক্ষ মানুষ গৃহহারা ও জলবন্দী হয়ে পড়লো। চট্টগ্রামে যদিও বন্যা সেভাবে হয়নি, কিন্তু বন্যা ত্রাণের উদ্যোগটি এখানেও চোখে পড়ার মত হলো। এমন দৃশ্য আমি আগে কখনো দেখিনি; স্কুল, কলেজ, ক্লাব, সংগঠন, রাজনৈতিক দল সবখান থেকে কর্মীরা দলে দলে ত্রাণ কাজে বেরিয়ে এলো। রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে ওরা ত্রাণের অর্থ সংগ্রহ করলো। অনেকে গান গেয়ে গেয়ে দোকানে দোকানে, বাড়িতে বাড়িতে, গিয়ে ত্রাণ চাইলো। বিভিন্ন সংগঠনের লোকজন, এবং হাই স্কুল ও কলেজের ছাত্ররা ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে বন্যা কবলিত অঞ্চলে চলেও গিয়েছিল সেগুলো বিতরণ করতে ত্রাণের কাজ করতে। *আজাদ* পত্রিকায় বন্যার আর ত্রাণের ছবি ও সংবাদ প্রতি দিন দেখছিলাম। এসব নিয়ে মান্নান মাস্টার আমাকে বন্যার ওপর একটি রচনা লিখতে দিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে রচনা বইকে অনুসরণ না করে নিজের মত করে লেখার একটি অভ্যাস আমার মধ্যে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। নিজে বন্যা না দেখলেও যা পত্রিকায় পড়ছিলাম, ত্রাণের যে কিছু তৎপরতা চোখে দেখছিলাম, তার ভিত্তিতে রচনাটি লিখলাম।

লেখাটি বেশ ভাল হলো, বড়দা এটি দেখে বললেন 'ঠিক এভাবে প্রদেশের গভর্নরের কাছে একটি চিঠি লিখোনা কেন, কারণ তিনিই তো বন্যা ত্রাণের কাজে সর্বোচ্চ দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন, সেই সঙ্গে তাঁর সাহায্য ভাণ্ডারে ছোট কিছু দানও পাঠাতে পার তোমার টিফিন থেকে জমানোর কথা বলে।' আসলে তখনো আমার

টিফিনের বরাদ্দ এত কম ছিল যে তার জমা থেকে দশ-পনরো টাকা পাঠানোও সম্ভব ছিলনা। বড়দাই পাঠাবার জন্য বিশ টাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। চিঠিটি কিন্তু নিজের হাতে নিজের মত করেই লিখলাম, সেই সঙ্গে মানি অর্ডার করে বিশ টাকা বন্যা ত্রাণ, সবই সরাসরি পাঠালাম গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জার বরাবরে। আশা করেছিলাম যে একটি প্রাপ্তি স্বীকার আসবে। সপ্তাখানেক পর যা পেলাম সেটি কিন্তু আশাতিরিক্ত। গভর্নর হাউসের নাম, সিল ইত্যাদি সুন্দর ভাবে খচিত একটি খামে আমার নামে একটি চিঠি এসেছে। চিঠির কাগজটি আরো সুন্দর—খুবই আনুষ্ঠানিক লেটার হেড। টাইপ করা চিঠিতে বন্যা নিয়ে আমার উদ্বেগের জন্য ও সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জানানো হয়েছে। লেখাটিরও প্রশংসা করা হয়েছে। চিঠিতে আমার স্কুলের নামও ছিল। চিঠিতে স্বাক্ষর করেছেন 'গভর্নরের পক্ষে' এই কথা লিখে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি। চিঠিটি স্কুলে নিয়ে গিয়ে দেখালে গরম মাস্টার সেটি ক্লাসে পড়ে শোনালেন—এ নিয়ে সবাই বেশ উচ্ছ্বসিত। ক্লাসের এবং অন্য ক্লাসেরও সবাই একজন থেকে আরেক জন হাতে নিয়ে একবার দেখতে গিয়ে এমন সুন্দর কড়কড়ে কাগজটির বেহাল দশা হয়ে গেল।

সেবারকার বন্যা ত্রাণের প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনা আমাকে বেশ নাড়া দিয়েছিল তা হলো অনেক ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে আমেরিকা থেকে দুটি বিশাল বিমানের ঢাকায় এসে অবতরণ। এই বিমানের নাম গ্লোব মাস্টার—এটিই ওই সময় পর্যন্ত পৃথিবীর সব চেয়ে বড় বিমান। পত্রিকায় বিমানটির ছবি দেখলাম। সবার মুখে মুখে ওই গ্লোব মাস্টারের কথা শুনছিলাম। বিমান ব্যাপারটির প্রতিই আমার একটু বাড়তি উৎসাহ ছিল আগে থেকেই। এই গ্লোব মাস্টারের পেটের ভেতর যে বিরাট গুদাম, তা মূলত তৈরি হয়েছে সামরিক সরঞ্জাম বহনের জন্য। এখন আমাদের জন্য সেটি ত্রাণ সামগ্রী বহনের কাজে ব্যবহৃত হলো। সেই আমলের সাধারণ বিমানগুলো সব এমন মামুলি সাইজের হতো যে গ্লোব মাস্টারটি ছিল একটি দানবের মত। চারটি বড় বড় প্রপেলার ইঞ্জিন এর সামনে। বিশাল ওজনের সামগ্রী নিয়ে এটি চলে এসেছে এক টানা পাঁচ হাজার কিলোমিটার পথ উড়ে। ছবি দেখলাম কীভাবে পেছনের দিকটা ফাঁক হয়ে গিয়ে সেখান থেকে মাল নামানো হচ্ছে বিশাল বিশাল বাক্স পেটরাতে। বিমান নিয়ে আমার এত উৎসাহ, কিন্তু সত্যিকার বিমানে তখনো কোনদিন ওঠা হয়নি, এমনকি সামনাসামনি কাছ থেকে একটি বিমান দেখাও হয়নি, যদিও উড়ন্ত অবস্থায় দেখেছি। এর কিছুদিন আগে বিমানে চড়ার একটি সুযোগ পেতে পেতে মিস্ করেছিলাম। পাকিস্তান ইন্টারন্যাশনাল এয়ার লাইন্স (পিআইএ) স্থানীয় পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে জানিয়েছিল যে পনেরো মিনিট শহরের উপর দিয়ে ঘোরানোর জন্য তারা একটি টিকেট বিক্রি করবে, যার দাম খুব বেশি নয়। বড়দা নিজের জন্য এই টিকেট কিনতে যাচ্ছিলেন। আমি বায়না ধরলাম আমার জন্যও একটি টিকেট কিনতে

হবে। বড়দা রাজি হলেন। কথা ছিল যে যথেষ্ট সংখ্যক টিকেট যদি বিক্রি হয় তা হলে পরের নির্দিষ্ট দিনে শহরের কে সি দে রোডের পি আই এ অফিস থেকে বাসে আমাদেরকে পতেঙ্গার কাছে লাল দিয়ার মাঠে বিমান বন্দরে নিয়ে যাবে। টিকেট কিনে আনা হলো—সুন্দর যথারীতি কড়কড়ে বিমান টিকেট, প্রত্যেকের নাম লেখা। টিকেট আসার পর থেকে বিমানে ওড়ার আশায় বেশ উত্তেজনা বোধ করছিলাম। কিন্তু হায় এর মধ্যে একদিন বড়দা খবর আনলেন, আমার এ যাত্রা আর বিমান চড়া হবেনা, কারণ যথেষ্ট টিকেট বিক্রি না হওয়াতে পরিকল্পনাটি বাতিল হয়েছে, টিকেটের টাকা ফেরত দেয়া হয়েছে।

তখন পর্যন্ত বড়দা বা আমি বিমানে না চড়তে পারলেও ইউনূস ভাই কিন্তু এর আগে বেশ চুটিয়ে ঘন ঘন কয়েকবার বিমান ভ্রমণ করেছেন। তিনি 'শাহীন এয়ার স্কাউট' দলে নাম লিখিয়েছিলেন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন ছাই রঙের ইউনিফর্ম পরে তিনি ওখানে যেতেন। প্রাথমিক এয়ার স্কাউটিং প্রশিক্ষণের কিছু পর তাঁদেরকে এক-এক জন করে ছোট বিমানে আকাশে নিয়ে বিমান চালনা দেখানো হয়েছে। পাইলটের পাশে বসে তিনি যা যা দেখতেন সেই গল্প বাসায় ফিরে আমাদের কাছে করতেন। পাইলট সামনের স্টিকটি টেনে নিজের দিকে আনলে বিমান নাক উঁচু করে ওপরের দিকে উঠতে থাকে, আবার স্টিকটি সামনের দিকে ঠেলে দিলে বিমানের নাকটি সামনে ঝুঁকে পড়ে নিচের দিকে নামতে থাকে। বাম বা ডান পায়ের প্যাডেল দেবে বিমানকে বড় বৃত্তাকার পথে চক্কর খাওয়ানো যায়, অথবা ডানে বামে মোড় নেয়া যায়। সে সময় আবার স্টিকটিকেও বাম বা ডান পাশে নিয়ে যেদিকে বাঁকবে সেদিকে কাত করা হয় বিমানকে। তাঁদেরকে নাকি মাঝে মাঝে স্টিকটি নিজেই একটু আধটু নাড়াচাড়া করে বিমানকে এদিক ওদিক করতে দেয়া হয়েছে। তাঁর মুখে এসব কথা শুনে আমি নিজেই মনে মনে বিমান চালনার উত্তেজনা অনুভব করতাম। ইউ এস আই এস লাইব্রেরির শিশুতোষ বইয়ে এভাবে বিমান নিয়ন্ত্রণের বিষয়টির কার্যকারণও দেখেছিলাম এর কিছুদিন পর।

এ সময় ঘটনাচক্রে আমি কাগজের বিমানের একটি বিশাল বহর বানিয়ে ফেলেছিলাম। ব্যাপারটি এরকম—গরমের ছুটির অবকাশে আমার সেই অনিবার্য ঘটনাটি ঘটলো যার আশঙ্কা এতদিন ধরে করে আসছিলাম। আমার মুসলমানী হলো। যদিও সনাতন পদ্ধতিতেই হলো তবুও ঘাট ফরহাদ বেগে সাহেব মিয়া দাদুর সঙ্গে দেখা সেই ছেলেটির কেইসের মত ভয়াবহ কিছু হলোনা। প্রথম ব্যাথা ইত্যাদি কাটিয়ে ওঠার পর এর একটি ইতিবাচক দিকও আবিষ্কার করলাম—ইচ্ছে মত কাটানোর একটানা অবসর পাওয়া। বড়কুল নামক কামরায় যেখানে আমার এখন চব্বিশ ঘণ্টাই অবস্থান, তার পুরো দৈর্ঘ জুড়ে দেয়ালের সঙ্গে লাগানো বেশ উঁচুতে একটি অপ্রশস্ত পাকা তাক ছিল। ওখানে কাছে টেবিল নিয়ে গিয়ে তার ওপর দাঁড়ালে ওই তাকে হাত দেয়া যায়, কিন্তু আমার তখন যে উচ্চতা তাতে তাকের উপর কী আছে তা দেখা যায়না। প্রত্যেক বার আন্দাজে হাত দিয়ে এর

নানা জায়গায় হাতড়ালে পুরোনো কিছু খাতাপত্র, দু'একটি বই, সঙ্গে কিছু পোকা মাকড়, মাকড়সার ঝুল ইত্যাদি উঠে আসতো। নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে বহুবার ওভাবে হাত চালাবার সুযোগ পেয়ে বেশ কিছু বইয়ের সন্ধান ওখানে পেলাম, যা আগে পাইনি। যেমন দুটির কথা মনে গাছে—'গেস্টাপোর কবলে মোহন' এবং 'মোহন ও রমা'। আর একটি চটি বই পেয়েছিলাম যার নাম 'এই মহাযুদ্ধে'। ওতে তালিকার মত করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক কিছু তথ্য দেয়া ছিল, যেমন কোন পক্ষের সৈন্য সংখ্যা কোন রণাঙ্গনে কত ছিল, কার বিমান সংখ্যা কত, ট্যাঙ্ক কত ইত্যাদি। কিন্তু আমার কাছে বিশেষ ভাবে ভাল লাগলো দুই পক্ষেরই বিভিন্ন রকম জঙ্গি বিমান, যুদ্ধ জাহাজ, ট্যাঙ্ক ইত্যাদির পরিচয়—প্রত্যেকটির ছবি, মডেলের নাম, সঙ্গের সমরাস্ত্র এবং বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সহ।

হয়তো ওই বইয়ের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে আমি কাগজ ভাঁজ করে নানা ঢঙের ও নানা সাইজের অনেক বিমান ও জাহাজ বানাতে শুরু করলাম; জাপানিরা যাকে বলে 'অরিগামি'—এই সেই বিদ্যা। মৌলিক বিমান ও মৌলিক জাহাজ এভাবে তৈরির কায়দা আগে থেকে জানা ছিল। তখন নতুন যা করছিলাম এক একটিতে এক এক রকম করে সম্ভব মত পরিবর্তন আনা এবং তাতে কাঠি, কাগজ রোল করে তৈরি নল তথা মেশিনগান বা কামান দিয়ে সজ্জিত করা। বাসার কাজের ছেলে, আমাদের নেতা সেকান্দরের বুদ্ধি এসব ক্ষেত্রে আমার চেয়ে অনেক বেশি খেলে। তার সহায়তা নিলাম প্রচুর। সে একটি নতুন জিনিস দোয়াত বানাতে শিখিয়েছিল কাগজ ভাঁজ করে, যাতে এটি চৌকা ফাঁপা বাক্সের মত হতো, উপরের দিকে দোয়াতের একটি খোলা মুখ থাকতো। দেখলাম এটিকে দোয়াত না বলে একটি ট্যাঙ্ক বলেও চালিয়ে দেয়া যায় ওই ওপরের খোলা মুখটাতে টারেট ও কামানের মত কিছু লাগিয়ে নিলে। এভাবে একটি দুটি নয় অনেক বিমান, জাহাজ, ট্যাঙ্ক বানিয়ে সেগুলো কামরার মেঝের একটি জায়গায় সুন্দর করে সন্নিবেশিত করেছিলাম। নতুন কেউ এলে দেখাতাম। আমার সহপাঠী কয়েক জন মুসলমানীর কারণে আমাকে দেখতে এসেছিলো। আমি অসুস্থ হিসেবে নিজেকে না দেখিয়ে তাদেরকে বরং আমার সমরাস্ত্রের বহর দেখালাম—ভাবখানা যেন একজন পাকা জেনারেল তার সমর সক্ষমতার মহড়া দিচ্ছে।

'এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি'

ঢাকা যাওয়া

লামার বাজার স্কুলে ওয়ান-টুতে পড়ার সময় থেকে আমার একটি লক্ষ্য ছিল কোন দিন ঢাকায় বেড়াতে যাওয়া। ঢাকা ভ্রমণ সম্পর্কে নানা লোভনীয় খবর পাচ্ছিলাম, বাসা থেকে ওখানে যাওয়া নানা ভ্রমণকারীর কাছ থেকে। তাদের মধ্যে এক নম্বরে ছিলেন আমাদের চৌধুরী খালু। একে তো আমাদের দোকানের ম্যানেজার হিসেবে তাঁকে সোনা, রূপা, শাঁখা এবং এসবের কিছু তৈরি অলঙ্কার আনতে অথবা অর্ডার দিতে প্রায়ই ঢাকা যেতে হতো, তার উপর তিনি সব কিছুকে চাগিয়ে চাগিয়ে বেশি লোভনীয় করে বলতে ছিলেন সিদ্ধহস্ত। ঢাকায় তাঁর বিচরণ ক্ষেত্র নবাবপুর, ইসলামপুর, মালিটোলা, শাঁখারিপট্টি, সদরঘাট ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি এমন ভাবে বলতেন যেন ওগুলো কোন রূপকথার রাজ্য। তবে তাঁর গল্পের জোরটি সব সময় থাকতো উপাদেয় খাবার দাবারের ওপর। নবাবপুরে 'ইসলামিয়া' ও 'আল ইসলাম' নামক রেস্টুরেন্টের খাসির 'গ্লাসির' বর্ণনা তিনি এমন ভাবে দিতেন এ যেন আরব্য সুলতানের তাঁবুর মাঝখানে রাখা আস্ত দুম্বার ভোজ। যেহেতু গ্লাসি জিনিসটি যে ঠিক কী তা আমি জানতামনা, তিনিও জানাবার কোন চেষ্টা করেননি, তাই কল্পনায় এমনি যে কোন জিনিস ভেবে নিতে অসুবিধা হতো না। ইসলামপুর রোডের কালাচাঁদ গন্ধবণিকের মিষ্টি দোকানের নানা মিষ্টির বর্ণনা তিনি এক এক করে দিতেন—পান্তুয়া, কালোজাম, বাদশাভোগ, মোহনভোগ ইত্যাদি; ক্লাইম্যাক্সটি করতেন কালাচাঁদের অপূর্ব সৃষ্টি 'অ্যাটম বোম' দিয়ে। এই অ্যাটম বোমে নাকি ছোট একটু ফুটো করা মাত্রই ভেতরের মিষ্টির আসল সারাৎসার রঙিন রস যেন একটি বিস্ফোরণের মত বেরিয়ে আসে। এসব শুনলে কে মাথা ঠিক রাখতে পারে! অথচ তিনি এসব মিষ্টি কখনো আমাদেরকে এনে দেখাতেন না, বরং আনতেন মরণচাঁদ ঘোষের দই, ট্রেনে কেনা ভৈরবের সাগর কলা, আর ঢাকার বড় ফুলকপি (যদি শীতের দিন হতো)। চট্টগ্রামে তখন নেহাতই ছোট চাঁপা কলা, বিচিওয়ালা

বাংলা কলা ছাড়া কলা তেমন কিছু পাওয়া যেতনা, আর ফুলকপিও আদৌ পাওয়া গেলে হতো খুব ছোট। আসলে এখনকার মত শীতের সবজিগুলো তখনো সহজলভ্য হয়নি। টম্যাটোকে তখনো বলা হতো বিলাতী বেগুণ, আর আলুকে বিলাতী আলু।

সেই শিশু বয়সে যতবার কারো সঙ্গে ঢাকা যাওয়ার জন্য বায়না ধরেছি, ততবারই কোন পাত্তা দেয়া হয়নি। একবার কথাও দেয়া হয়েছিল, কিন্তু আসল সময় যখন এলো তখন দেখলাম ওটা ছিল নেহাত কথার কথা, বরং সেকান্দর না কে জানি ওসময় আশাহত আমার গায়ের উপর একটি চাদর ফেলে দিয়ে বলেছিল 'এই তো ঢাকা গিয়েছে'। সঙ্গে সঙ্গে ছোট ভাইবোনদের হাত তালি। খুব অপমানিত বোধ করেছিলাম এতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই চৌধুরী খালুর সঙ্গেই আমার প্রথম ঢাকা যাওয়া হয়েছে, মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির আগে আগে (১৯৫৩)।

রাতের ঢাকা মেইল, ইন্টার ক্লাস কামরায় যে যেমনটি পেরেছে শোয়ার, বা একটু খানি কাত হবার সুযোগ করে নিয়েছে। কেউ কেউ উপরে মাল রাখার তাকের উপরেই বিছানা পেতেছে, কেউ কামরার মেঝেতে 'হোল্ড অলটি' গুটিয়ে রেখেছে, যখন যাত্রীর আনাগোনা কমবে, তখন ওটা খুলে নেবে। সেকালে হোল্ড অল নামক এই জিনিসটি পুরো ক্যানভাসে তৈরি হতো যার মধ্যে লেপ তোষকের বিছানা থাকতো। সবকিছু রোল করে নিলে বড় একটি ব্যাগের মত বন্ধ করে বহন করা যেতো। আমার নিজের কাছে ঘুমাবার এ সব আয়োজনের কোন মূল্য ছিলনা, কারণ সে রাতে ঘুমাবার কোন ইচ্ছে আমার ছিলনা। বরং জানালা দিয়ে একের পর এক স্টেশন দেখে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল আমার। চট্টগ্রাম স্টেশনের আওতা পার হতেই তো লাল-সবুজ অনেক আলোর এক মায়াবী পরিবেশের মধ্য দিয়ে গেলাম। তারপর অন্ধকারের বুক চিরে চলেছে রাতের রেলগাড়ি। সীতাকুণ্ড স্টেশনেও গিয়ে যথেষ্ট রাত হলেও চা-গরম ওয়ালা তখনো বেশ সক্রিয়, স্টেশনও সরগরম। কিন্তু এরপর ফেনী জংশনে অনেকটা ঝিমিয়ে পড়া স্টেশনে যেন ট্রেন আসার মুহূর্তে শুধু কিছু যাত্রীর আর কুলীদের ব্যস্ত পদচারণা। তারপর ট্রেনের কামরার মৃদু আলোতে দেখছি সহযাত্রীদের শুধু ঘুম আর ঘুম। বাইরে ঝিক ঝিক শব্দ যা ছোট খাট ব্রিজের ওপর কখনো কখনো ঝম ঝম শব্দে রূপান্তরিত হচ্ছে। আমি একটানা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছি। মনের মধ্যে যেন চলছে বইয়ে পড়া সেই কবিতা (রবীন্দ্রনাথের) :

'এ প্রাণ রাতের রেলগাড়ি
দিল পাড়ি—
কামরায় গাড়ি-ভরা ঘুম
রজনী নিঝুম।'

গভীর রাতেও চেষ্টা করেছি প্ল্যাটফরমে ঢোকার প্রান্তে থাকা স্টেশনের নাম ফলকটি এবং একই স্টেশনের প্লাটফরম ছেড়ে যাওয়ার প্রান্তের ফলকে লেখা নামটি আবার পড়ে নিতে। পড়ার মত আলো ওখানটায় প্রায় সব জায়গায় ছিল। বড় করে বাংলায়, কোনায় ইংরেজিতে, অন্য কোনায় উর্দুতে। যে সব ছোট ছোট স্টেশনে ট্রেন থামেনি সেখানেও এই নাম পড়ার চেষ্টা করেছি। এভাবে চোখে পড়েছে কৈবল্যধাম, শশীদল, ভাতশালা ইত্যাদি সব নাম।

এক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঘুমের বা ঝিমানির কোলে আত্মসমর্পন করলেও শেষ রাত বা ভোরের দিকেই শুরু হলো আসল মজা, বলতে পেলে মেঘনার উপর ভৈরব সেতু থেকে। সেই একেবারে আধো আলোতে কুয়াশা ঢাকা নদী, সেতুর ওপর দিয়ে ঝমাঝম শব্দে চলা ট্রেন, ঘুমন্ত স্টেশনের জেগে ওঠা, রেল রাস্তার বাঁধের অনেক উঁচু থেকে নিচের ভৈরব শহর দেখা। পরে আড়িখোলায় ট্রেনটি অনেক্ষণ থাকলো, এটি নাকি ব্রেকফাস্ট স্টেশন। খালুর এসব খুব পরিচিত। তিনি চা-গরম ওয়ালাকে ডেকে নিলেন—সেই সঙ্গে বয়েল ডিম ওয়ালাকেও। পাউরুটি, বয়েল ডিম আর চায়ের এই প্রাতরাশ অতি উপভোগ্য হলো স্থান কাল পাত্রের কারণে—যেমন তেমন নয় ঢাকা মেইলে ব্রেকফাস্ট স্টেশনে আছি বলে কথা। স্টেশনে দেখলাম সাদা পোষাকের উপর চাপরাশের মত লাল ক্রস ব্যান্ড পরা রেলওয়ে রেস্টুরেন্টের ওয়েটাররা কাপড়ে ঢাকা চায়ের ট্রে নিয়ে ছুটাছুটি করছে ফার্স্ট বা সেকেন্ড ক্লাস কামরাগুলোর দিকে—সেখানে সাহেব যাত্রীরা রয়েছেন—নানা রকম ভি আই পি। তাঁদের জন্যও এটি ব্রেকফাস্ট স্টেশন। তাই যথেষ্ট সময় নিয়ে বেশ আয়েসী ট্রেন এই ঢাকা মেইল। আমার কিন্তু তাতে আপত্তি নেই, যত সময় তত দেখার সুযোগ। নরসিংদি স্টেশনে সাগর কলার রাজত্ব। এর আগে এক সঙ্গে সাগর কলা দেখেছি দু'এক ডজন মাত্র। এখন দেখছি 'রাশি রাশি ভারা ভারা'—বিশাল বিশাল কলা। 'সাগর কলা, সাগর কলা' রব তুলে অনেক বিক্রেতা ট্রেনে উঠে এসেছে। দূর থেকে আসা যাত্রীদের মধ্যে কলা কেনার ধুম। তার পরেই সুন্দর একটি ছোট নদীর পারে 'ঘোড়াশাল ফ্ল্যাগ' স্টেশন। ফ্ল্যাগ কেন বলা হলো তা জানিনা, কিন্তু এ জন্য আরো বেশি ভাল লাগলো।

টঙ্গী জংশন, মনে হলো এখানে অনেক খানি জায়গা জুড়ে বেশ ব্যস্ততা, স্টেশনের পাশ দিয়ে চলে গেছে দীর্ঘ রাস্তা। তার একখানে অনেকগুলো ছোট ছোট বাসে ডাকাডাকি করছে একটানা, এক সুরে—'ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা...'। তথাকথিত মুড়ির টিনের মতই ছোট ছোট বাস এগুলো। টঙ্গী তখন ঢাকা শহর থেকে অনেক দূর বিচ্ছিন্ন জায়গা—মাঝখানে মোটের ওপর গ্রামীণ দৃশ্য দিয়েই বিচ্ছিন্ন। অবশেষে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে গিয়ে ঢাকার দেখা মিল্‌লো। প্রথম হকচকিয়ে যাওয়ার মত অভিজ্ঞতা হলো সেই বিখ্যাত হাতীর পুলের তলা দিয়ে যাওয়া—বিশাল একটি কুঁজের মত উঠতি-নামতির এই পুল—এ যে বেশ পুরোনো আমলের তা বোঝাই যায় (এখন এই পুল বিলুপ্ত হয়েছে)। এর মধ্যেই কয়েকটি

লেভেল ক্রসিং পার হয়ে এসেছি, কিন্তু এখন একটু পর পরই দেখছি ভীড় করে রিকশা, বাস ইত্যাদি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তায় লেভেল ক্রসিঙে—আমাদের ট্রেনকে যেতে দেবার জন্য। সে সময় ঢাকা শহরের একটি প্রতীকই ছিল এই লেভেল ক্রসিং। নীলক্ষেতের ক্রসিঙের পরই দেখা গেল বিখ্যাত সলিমুল্লাহ মুসলিম হল—প্রথমে চোখে পড়লো এর চক চক করা হলুদ গম্বুজগুলো—কতবার কত ভাবে শুনেছি এর কথা। এর পর মেডিক্যাল কলেজ যা আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিংও বটে। এগুলোর একেবারে গা ঘেঁষেই যাচ্ছিলাম; মাঝখানে আবার পলাশীর লেভেল ক্রসিং। খালু সব কিছু বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন—তাঁর পরিচিত কারো কারো সঙ্গে এসব ভবনের অনেক সম্পর্ক, গ্রামের ধন্য সব মেধাবী ছাত্ররা—যারা মেডিক্যাল কলেজে কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েছে।

অবশেষে ঢাকা স্টেশন, যা ফুলবাড়িয়া স্টেশন বলেও পরিচিত স্টেশনটির জায়গার নামে, যেমন চট্টগ্রাম রেলওয়ে স্টেশনটি আমাদের কাছে বটতলী স্টেশন নামেও পরিচিত ছিল। কিন্তু ঢাকা স্টেশনটিকে মনে হলো নেহাত মামুলি আর একটি স্টেশন হিসেবে, যেই ঢাকার কথা কল্পনা করে এসেছি মোটেই তার উপযুক্ত নয়। রেলওয়ের রাজ্যে চট্টগ্রাম তখন রাজধানী; যেমন তার স্টেশনের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যের পুরোনো বিশাল দোতলা ভবন, তেমনি পাহাড়ের উপর পূর্ব রেলওয়ের হেড কোয়ার্টার আরো জমকালো স্থাপত্যের রেলওয়ে বিল্ডিং। ঢাকা স্টেশনে আমরা নেমে গেলাম বটে, কিন্তু ট্রেনের শেষ গন্তব্য এটি নয়; তা হলো নারায়ণগঞ্জ। চট্টগ্রাম থেকে আসা ঢাকা মেইল আসলে কিন্তু চট্টগ্রাম আর নারায়ণগঞ্জের মধ্যের ট্রেন। নারায়ণগঞ্জ তখনো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর এবং নদী বন্দর। এখান থেকে স্টিমার চলে যাচ্ছে প্রদেশের নানা দিকে।

আমাদের গন্তব্য মালিটোলায় স্বর্ণ ব্যবসায়ীর গদিতে, তাঁরই আতিথ্যে থাকব আমরা। আসলে খালু তাঁর নিত্য বিজনেস ট্রিপে এসেছেন, আমি তাতে একজন ফালতু মাত্র। কাজেই আমার ঢাকা সফরও সেবার তাঁর কাজের এলাকাতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু তাতে এক মুহূর্তের জন্যও আমার মহা আগ্রহে ঢাকা দেখা বন্ধ থাকেনি। খালুর কাজ ছিল 'সুবোধের গদিতে'—অর্থাৎ সুবোধ বাবু নামের স্বর্ণের একজন বড় পাইকারি ব্যবসায়ীর ব্যবসা স্থলে। বড় একটি চৌকির মত উঁচু জায়গায় চারদিকে অনুচ্চ রেলিং দিয়ে ঘেরা সুবোধের গদি। সুবোধ বাবু মানুষটি কিন্তু বেঢপ রকমের মোটা, মনে হয় যেন যে বৈঠকি ভঙ্গিতে তিনি ওই চৌকির উপর যে বসেছেন কোনদিন ওখান থেকে উঠবেন না। কখনো তিনি, কখনো তাঁর সহকারী স্বর্ণের সুন্দর বার ছেনি দিয়ে কেটে কেটে যাকে দেয়ার দিচ্ছিলেন ওজন করে। সব কিছুতে একটি বনেদি সেকেলে ভাব।

খালু জানতেন আমার বড় এজেন্ডা ছিল 'ইসলামিয়া', 'আল ইসলাম' আর 'কালাচাঁদ গন্ধবণিকে' তাঁর এতদিনের বর্ণিত সুখ্যাদ্যগুলোর স্বাদ নেয়া। ঘন সুরুয়ার মধ্যে ডোবানো খাসির গ্লাসি পরোটা দিয়ে খেতে অনবদ্য লাগলো। তার

চেয়েও বড় টার্গেট কালাচাঁদ গন্ধবণিকের 'অ্যাটম বোম'। ইসলামপুর রোডের যে জায়গাটিতে শাঁখারি পট্টির গলিটা এসে মিলেছে ঠিক সেখানেই সে সময় ছিল 'কালাচাঁদ গন্ধবণিক' আর 'সীতারাম ভান্ডার' নামে পাশাপাশি দুটি বিখ্যাত মিষ্টির দোকান। বেশ কিছুদিন পর কোন এক শিশু পত্রিকায় একটি ছড়া পড়েছিলাম যার পুরোটা না হলেও ভাবটি মনে আছে। শুরুর লাইনটা ছিল :

'কালাচাঁদ ডেকে বলে সীতারাম ভাইরে'।

তার বক্তব্যটি ছিল সীতারাম যেন তাকে কিছু মিষ্টি খেতে দেয়, কারণ ময়রার নিজের দোকানের মিষ্টি খেতে নেই, খেলে মিষ্টির পয়সা পাওয়া যাবেনা। তাই শেষ পর্যন্ত কালাচাঁদ ও সীতারাম পরস্পর মিষ্টি বিনিময় করে খেলো। ওই ছড়াটিতে মিষ্টিগুলোর জিভে জল আসার মত বর্ণনা ছিল—যেমন একটি লাইন ছিল

'হায়রে অ্যাটম বোম পেট ফেটে যায়।'

খালুর সঙ্গে গিয়ে সেই অ্যাটম বোমাটিই খেয়েছি এবং দেখেছি; বুঝেছি তাঁর বর্ণনায় অতিরঞ্জন ছিলনা মোটেই। তবে কালাচাঁদ গন্ধবণিকে প্লেট-চামচের কোন আয়োজন ছিলনা। সবাই মিষ্টি খাচ্ছে শালপাতার ঠোঙ্গায়। শুকনা বড় বড় শালপাতাগুলোকে সুঁচের মত সরু ছোট অনেকগুলো কাঠি দিয়ে পরস্পরের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জোড়া দিয়ে দিয়ে বাটির আকারে ঠোঙ্গা তৈরি করে রাখা হয়েছে অনেকগুলো।

খালুর কর্ম এলাকার মধ্যেই ঢাকার যতগুলো অলি গলির ভেতর দিয়ে ঘুরতে হলো তাতে বেশ একটি ধারণা হয়ে গেল এই গলির শহর সম্পর্কে। বিশেষ করে ইসলামপুরের দিক থেকে শাঁখারি পট্টিতে ঢুকে ভিক্টোরিয়া পার্কের (এখন বাহাদুর শাহ পার্ক) দিকে বের হবার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা তা কখনো ভোলা যায়না। অত্যন্ত ভীড়, অত্যন্ত ব্যস্ত, আর অত্যন্ত প্রাচীন জরাজীর্ণ বড় বড় জটিল দালান দুই দিকেই। মনে হয় এর খোপ খাপে অসংখ্য মানুষ থাকে। অদ্ভুত রকম সব করাতের মত ধারালো বিভিন্ন অস্ত্র দিয়ে বড় বড় শঙ্খকে কেটে সুন্দর সুন্দর নানা ডিজাইনের শাখায় পরিণত করা হয়েছে। অস্ত্রগুলোর কোনটা সোজা, কোনটা বক্রাকার, কোনটা একেবারে গোড়ার নালের মত, কোন কোনটি আবার বেশ ছোট। সমানে এগুলো শাঁখা কাটছে, আর সৃষ্টি হচ্ছে প্রচুর আওয়াজের। তবে একটু দাঁড়িয়ে ভাল করে লক্ষ্য করে দেখেছি কী অপূর্ব সৌকর্যে তাঁরা অস্ত্রগুলো চালিয়ে কীসের থেকে কী সৃষ্টি করে চলেছেন। আমাদের বাসার মধ্যে একেবারে শিশু বয়স থেকেই আমি অলঙ্কারের কুশলি কারিগরদের নৈপুণ্য দেখে এসেছি, এখানে তার অন্য একটি মাত্রা দেখলাম। শাঁখারি পট্টি থেকে বের হবার পর পর খালু একটি কথা বল্‌লেন মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। তিনি বললেন চল্লিশের দশকে এমন কি পঞ্চাশের দশকের শুরুতেও ঢাকাতে ঘন ঘন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

হতো। দাঙ্গার সময় নাকি শাঁখারি পট্টিতে কোন মুসলিম ঢুকলে আর বেরিয়ে আসতে পারতো না।

প্রথম সুযোগেই সদরঘাট গিয়েছি, তখন সদরঘাট ছিল ঢাকা শহরের প্রধান বেড়াবার এলাকা, মানুষের মিলন কেন্দ্র। নদীর ধারে সুন্দর বেড়াবার পথ ছিল—বেশ হাওয়া খেয়ে হাঁটা যেত। এক জায়গায় অনেকগুলো বজরা নৌকা ঘাটে রয়েছে—দেখলাম এগুলো স্থায়ী ভাবে এখানেই থাকে। ওগুলোর মধ্যে কয়েকটি ভাসমান রেস্টুরেন্ট ও ভাসমান হোটেল হিসেবে কাজ করছিল। পারে দাঁড়িয়ে নদীতে নৌকা, লঞ্চ ইত্যাদির চলাচল দেখার মধ্যে সুন্দর নদীর পারের আবহটি তখনো বজায় ছিল, যদিও তুলনামূলক ভাবে একটু ভীড়। নবাব বাড়িটিও দেখা যাচ্ছিল সোয়ারি ঘাটের দিকে। সে সময় নবাব বাড়ি ভেতরে গিয়ে দেখা যেতনা কারণ নবাবদের পরিবারের নানা শাখা তখনো তাতে বাস করতেন। সদরঘাটে আমার প্রধান দর্শনীয় লক্ষ্য বস্তু ছিল মীর জুমলার কামান, যা 'সদর ঘাটের কামান' বলেও পরিচিতি ছিল। এরপর আর খুব বেশিদিন কিন্তু এটি আর সদরঘাটে থাকেনি। কামানটিকে ঘিরে দেখলাম অনেক লোকজন। কামানের দেহটি বেশ সিঁদুর চর্চিত। হিন্দুদের অনেকে কোন কারণে একে পবিত্র বলে মনে করতো। দেখলাম কেউ কেউ মাপকাঠি নিয়ে বার বার কামানটির মাপজোক করছে। এর কারণ হিসেবে বলা হলো যে এতে এমন একটি অলৌকিক ব্যাপার আছে যে যতবার মাপা হয় কামানটির কিছুটা ভিন্ন দৈর্ঘ্য পাওয়া যায়।

রাতে আমাদের ঘুমোবার ব্যবস্থা হলো মালিটোলার যে ঘরটিতে সেটি ছিল 'নাগর মহল' সিনেমার পর্দার লাগোয়া ঠিক পেছনে। ফলে শুয়ে শুয়ে সিনেমার নাইট শো'র ডায়লগ আর গান শুনতে পাচ্ছিলাম বেশ সজোরেই। এটিও একটি অদ্ভুত অভিজ্ঞতা—সিনেমা হলের সঙ্গেই রাত কাটানো। এভাবে এক সময় সারাদিন হাঁটাহাঁটি করা ক্লান্ত শরীরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, সিনেমার নাইট শো'রও এক সময় ইতি হয়েছে।

পরের বছর (১৯৫৪) আবার ঢাকা গিয়ে কিন্তু অন্য রকমের ঢাকাকে দেখেছিলাম। সেবার গিয়েছিলাম ইউনূস ভাই ও তাঁর সহপাঠী মাহবুব ভাইয়ের সঙ্গে (মাহবুব চৌধুরী, যিনি পরে বহু বছর আমৃত্যু ইউনূস ভাইয়ের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহকর্মী ছিলেন)। এবার রাতের ঢাকা মেইলে বেশ খানিক্ষণ সময় কাটলো খুব আড্ডাবাজ কিন্তু সংস্কৃতিমনা কিছু মানুষের মধ্যে। ট্রেনটি যে শুরুতে একটি ধাক্কা দিয়ে চলা শুরুর বদলে খুবই মসৃণ ভাবে প্রায় বুঝতে না দিয়ে চলা শুরু করলো তার ব্যাখ্যা দিয়েই তাঁরা আড্ডা শুরু করেছিলেন। খুব সম্প্রতি স্টিম ইঞ্জিনের বদলে এই ট্রেন পেয়েছে আধুনিক ডিজেল-ইলেকট্রিক ইঞ্জিন—এটি তারই ফল। এই দলটির ঢাকা যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল সেখানে ঘোড়দৌড় দেখা। রেইস কোর্সের ময়দানে (এখন যেটি বৃক্ষ সুশোভিত সোহরাওয়ার্দী উদ্যান তা সে সময় খোলা মাঠ ছিল ঘোড় দৌড়ের জন্য কাঠের রেলিং দেয়া বৃত্তাকার পথ সহ)।

প্রতি সপ্তায় নিয়মিত ঘোড় দৌড় ছিল ঢাকার একটি পুরোনো ঐতিহ্যের অংশ—সেই বৃটিশ আমল থেকে। কিছুদিন বন্ধ থাকার পর পরের সপ্তাহে এটি আবার শুরু হচ্ছে, তাই তাঁদের ঢাকা যাওয়া। তাঁদের, এবং ইউনূস ভাই মাহবুব ভাইয়ের এক টানা আড্ডার কারণে রাতের রেল গাড়িটি বেশ উপভোগ্য ভাবেই কাটলো, যতক্ষণ না এক সময়ে সীটের উপর ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঢাকায় এবার ঠাঁই হয়েছে নবাবপুর রোডে 'ঢাকা বোর্ডিঙে'। ঘোরাফেরা অধিকাংশ রিক্সায়। চট্টগ্রামের তুলনায় ঢাকায় তখনই যথেষ্ট রিক্সা। ভীড়ের পথে হাঁটার সময় এই রিক্সাগুলো আমাদের জন্য একটি সমস্যার সৃষ্টি করছিল, কারণ এদের সতর্ক করার পদ্ধতি হলো সাইকেলের মতো বেল বাজানো। চট্টগ্রামের রিক্সায় তখন এই কাজটি করা হতো রাবার বলের মত জিনিস টিপে ভেঁপু বাজাবার মাধ্যমে, যা বাসে-ট্রাকেও ব্যবহৃত হতো আরো বড় ভেঁপুর আকারে। কাজেই অনভ্যস্ত আমরা পেছন থেকে রিক্সা এলো তাকে সাইকেল মনে করে অল্প সাইড দিয়ে ধাক্কা খাওয়ার যোগাড় হতো। এবার ঢাকা ভ্রমণটিকে মনে হলো দুই শহরের কাহিনী। একটি সেই পুরোনো শহর, ভীড়ের শহর যেটি গতবার দেখেছি; আর একটি নতুন ঢাকা, এবারই ভাল করে দেখলাম—সবকিছু কী ঝকঝকে, কী দরাজ, কী সুন্দর! কখনো নবাবপুরের রেল ক্রসিংটি পার হয়েই চলে আসছি—এক শহর থেকে অন্য শহরে, চট্ করে গভর্নমেন্ট হাউজ, গুলিস্তান সিনেমা, স্টেডিয়াম—মিলিয়ে সম্পূর্ণ অন্য আবহে চলে আসা। অন্যদিকে বক্সিবাজার দিয়ে আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও মেডিক্যালে চলে এলেও ঘটে শহর বদলের পালা। ওই দু'দিক দিয়েই বার বার এ-শহর ও-শহর করছিলাম, কারণ নবাবপুরে থাকলেও ইউনূস ভাইদের কাজ ছিল এদিকেই বেশি। সব চাইতে সুন্দর লাগতো কার্জন হলের সামনের রাস্তা, মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল আর আর্টস বিল্ডিঙের সামনের রাস্তা, এবং সলিমুল্লাহ হলের সামনে রাস্তা। কতবার রিক্সায় এগুলোর সামনে দিয়ে গেলাম—দুপাশে কেমন সুন্দর বৃক্ষবীথি, অনেক ক্ষেত্রে দুদিকের ডাল-পাতা উপরে মিশে গিয়ে পুরো রাস্তার উপর কী সুন্দর চাঁদোয়া; অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকার মতো। কার্জন হলের সামনের রাস্তায় তিন ভিন্ন ভিন্ন সড়ক—গাড়ির, রিক্সার, এবং মানুষের—কী বিশাল ব্যাপার—কিন্তু সেই তুলনায় গাড়ি, রিক্সা বা মানুষ কত কম! কার্জন হলের ভেতরের আঙ্গিনায় উদ্যান ও ভবন দেখলাম সসম্ভ্রমে। তিন জনেই গিয়ে হলের সামনের ভিত্তি ফলকটি দেখলাম। সেই ১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গের মাধ্যমে সৃষ্ট নতুন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ-আসামের এই রাজধানীতে লেফটেনেন্ট গভর্নরের স্থাপন করা ভিত্তি প্রস্তর—ইউনূস ভাই আর মাহবুব ভাই এর ইতিহাস আলোচনা করছিলেন। এই লাল ইটের প্রাসাদগুলো আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান ভবন। বড় ছাত্র ছাত্রীদের (ছাত্রী খুব কম) দেখছিলাম ওর মধ্যে ঘুরতে, গল্প করতে। অবাক লাগলো এমন সব প্রাসাদ, এমন উদ্যান—এটি শুধু লেখাপড়া করার জায়গা। এক

আত্মীয় ছাত্রের খোঁজে আমরা সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে গেলাম। তখন সবাই একে শুধু 'মুসলিম হল' বলতো। এর কারণ শুরুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মুসলিম ছাত্রদের জন্য এটিই ছিল হল। মুসলিম ছাত্রীরাও এই হলেরই অ্যাটাচ্ড ছিল। হিন্দু ছাত্রদের জন্য ছিল 'জগন্নাথ হল'। আর হিন্দু-মুসলিম উভয় ছাত্রের জন্য ছিল 'ঢাকা হল' (বর্তমান শহীদুল্লাহ হল)। পরে অবশ্য 'ফজলুল হক হল'ও তৈরি হয়েছে। মোগলদের শালিমার গার্ডেনের ছবি দেখেছি, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে মনে হলো তাই সত্যি সত্যি দেখলাম—একেবারে সমান সমান চৌকা চৌকা করে তৈরি বাদশাহী প্রাসাদের মধ্যে সুন্দর ভাবে নানা আকৃতিতে ছাঁটা ঝোপ গাছের কেয়ারি করা উদ্যান, তার মাঝখানে আবার প্রাসাদের দুই অংশকে যোগ করা সোজা বাগান-পথ। এখানে ছাত্ররা থাকে, এই বাদশাহী পরিবেশে লেখাপড়া করে, দেখে মাথা ঘুরে গেল।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে এগিয়ে গিয়ে একেবারে দুটি আনকোরা নতুন দর্শনীয় স্থান দেখলাম। একটি খুব আধুনিক মার্কেট তৈরি করা হয়েছে—একেবারে গোলাকৃতি বিশাল মার্কেট, বাইরের দিকটি শুধু দেয়াল ঘেরা, কয়েকটি মোগলাই বুলান্দ দরওয়াজা দিয়ে মার্কেটে ঢুকা যায়। বৃত্তাকার পথ শুধু হাঁটার, দুপাশে একই রকমের দোকান—হেঁটে হেঁটে দেখতে থাকলে আবার অজান্তে একই জায়গায় চলে আসি। এর নাম দেয়া হয়েছে 'গভর্নমেন্ট নিউমার্কেট'। কাছেই আর একটি দর্শনীয় স্থান হলো বিশাল এলাকা জুড়ে একই রকম নতুন সব সুন্দর দালান, মাঝখানে প্রচুর জায়গা, খেলার মাঠ, ঘোরার জায়গা, ঘরোয়া রাস্তা—কত কিছু। এখানে নাকি উচ্চ পদস্থ সরকারী কর্মচারীরা থাকে—নাম 'আজিমপুর কলোনি'। এগুলোর কথা চট্টগ্রাম থেকে শুনে এসেছি, সবই একেবারে আধুনিক ঢাকার প্রতীক তখন। ওই কলোনির সামান্য দূরেই দেখলাম অন্য রকম প্রচুর বাসাবাড়ি—এগুলোও সরকারী কর্মচারীদের ব্যবহারের জন্য। অনেকটা মিলিটারি ব্যারাকের মত অস্থায়ী ভাবে তৈরি বলে এগুলোকে বলা হতো ব্যারাক—'পলাশী ব্যারাক' এবং 'নীলক্ষেত ব্যারাক'। পাকা ভিটা কিন্তু বেড়ার ঘর। এর বাইরের কিছু শাল কাণ্ডের খাম্বা কামানের মত কাত করা, এরকম অনেক সারিবদ্ধ তেরচা খাম্বা ঘরগুলোকে ঠেস দিয়ে খাড়া রাখতে সাহায্য করছে। এখানে দৃষ্টি আকর্ষণের ব্যাপার হলো এমন সব ঘর কিন্তু একটি দুটি নয়; সারি সারি একের পাশে এক, এক সারির পেছনে আরেক সারি এমন করে চলছেই। ইউনূস ভাই বোঝালেন প্রদেশের নতুন রাজধানী হয়ে উঠার পর শহরে অনেক সরকারী কর্মচারীকে জায়গা দিতে হয়েছে—যেখানে যেভাবে পারা যায়, নানা ভাবে তাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেডিক্যাল হাসপাতালের সামনে দিয়ে নিমতলীর দিকে এগিয়ে গেলে বিশাল করে 'এক্সরে' লেখা একটি ছোট ভবনের (যক্ষ্মা চিকিৎসা কেন্দ্র) সামনে রাখা ছিল একটি ছোট এরোপ্লেন—জ্বলজ্যান্ত একটি এরোপ্লেন। কেন যে সেটি ওখানে ছিল

জানতে পারিনি। এই আমার প্রথম সামনা সামনি এরোপ্লেন দেখা তাও ঢাকার রাজপথের পাশে! এরপর কয়েকবার এর সামনে দিয়ে যাওয়া আসা হয়েছে—প্রত্যেকবার মনোযোগ দিয়ে দেখেছি এটিকে।

সেবার ঢাকা যাওয়ার পেছনে ইউনূস ভাই ও মাহবুব ভাইয়ের বিশেষ একটি কারণ ছিল। পরের বছর বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে যোগদানের জন্য দু'জনই দরখাস্ত করতে চান। নবাবপুরে একটি দোকানে থেকে কয়েক শীট ফুলস্কেপ সাইজের কাগজ কিনে নেয়া হলো। ঢাকা বোর্ডিঙে বসে তাঁরা নিজের হাতে যার যার দরখাস্ত লিখলেন। তারপর স্কাউট অফিসে এলাম দরখাস্ত দুটি জমা দিতে। মাহবুব ভাই চট্টগ্রামে কলেজিয়েট স্কুলে হোস্টেলে থাকতেন। ঢাকার স্কুলের একটি ক্রিকেট টিম সেখানে খেলতে গিয়েছিল। তখন তাদের দেখাশোনার কিছু দায়িত্ব তাঁর উপরেও বর্তিয়েছিল। ওই টিমের কয়েকজন সদস্য থাকে ঢাকার শান্তি নগরে। তাদের সঙ্গে দেখা করতে শান্তিনগরে যেতে হবে। রিক্সায় সবুজ খোলা জায়গার মাঝখান দিয়ে রাস্তায় চলেছি, মাঝে মাঝে অল্প স্বল্প বাসাবাড়ি। এর মধ্য দিয়ে অনেক্ষণ চলার পর এলো শান্তিনগর—ওখানেও একই রকম খোলামেলা পরিবেশ। এই ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাদের অনেক বন্ধুও হৈচৈ করে এলো আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতে। খুব মজা হলো সেদিনের শান্তিনগরে।

'২০ বক্সীর হাট রোড'

ঢাকা যাত্রা, ঢাকায় ঘোরা এসব ক'দিনের সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করলো বটে, কিন্তু আমার মূল জগত ওই ২০ বক্সীর হাটের জগত। সেই পঞ্চম শ্রেণীতে থাকা কালে '২০ বক্সীর হাট রোড' নামেই একটি রম্যরচনা লিখেছিলাম নিজের আগ্রহে, নিজের আনন্দে। এর বিষয়বস্তু ছিল এখানকার জীবনের ব্যতিক্রমী সব মানুষ ও ঘটনা। লেখাটি নিজের কাছে ভাল লেগেছিল বলে মান্নান মাস্টারকে দেখাই। তিনি এত মজা পেলেন যে বাসার সবাইকে পড়ালেন এটি—এবং শেষ পর্যন্ত এটি গরম মাস্টারের হাতে চলে গেল। তিনিও খুব পছন্দ করেছিলেন, তাঁর অন্য ছাত্রদেরকেও পড়িয়েছিলেন।

ঐ রম্যরচনায় আমি আমাদের বাসাকে একটি রেডিয়ো স্টেশন হিসেবে দেখিয়েছিলাম—সেখান থেকে চব্বিশ ঘণ্টা ননষ্টপ ব্রডকাষ্টিং হতো। স্টেশনটি মূলত মায়ের দখলে ছিল—তিনিই ঘোষক, তিনিই শিল্পী, তিনিই এর প্রধান নিয়ন্ত্রক, তবে অন্যরাও রয়েছে এতে। রেডিয়ো স্টেশনকে বাসার কেন্দ্রবিন্দু করে তোলার পেছনে একটি কারণও ছিল—তা হলো রেডিয়ো জিনিসটি নিয়ে আমার দারুণ মায়া ভরা আগ্রহ; অথচ আমাদের নিজেদের বাসায় রেডিয়ো ছিলনা, তখন পর্যন্ত। আব্বা মনে করতেন রেডিয়ো থাকলে আমাদের লেখাপড়ার ক্ষতি হবে, তাছাড়া এটিও ঠিক যে রেডিয়ো তখনো ঘরে ঘরে থাকার মত এত সহজলভ্য ছিলনা, একে একটি বিলাসিতার আইটেম মনে করা হতো। আব্বা অবশ্য

জানতেন না যে বাড়িতে আমার যেটুকু লেখাপড়া তখন হচ্ছে—তা সে স্কুলেরই হোক আর নিজস্ব আগ্রহেরই হোক—তার পুরোটুকুই চলছিল আমার পড়ার ঘরের জানালা বরাবর ঠিক নিচে অন্য রাস্তার সঙ্গে থাকা সাতকানিয়া বস্ত্রালয়ের রেডিয়োর সংগীতের আবহের মধ্যে। ওখান থেকে 'রেডিয়ো পাকিস্তানের' বাংলা খবরটুকু ছাড়া বাকি সময় সারাক্ষণ বেশ জোরালো কণ্ঠে শোনতাম 'বিবিধ ভারতীর' হিন্দি গান আর তার ফাঁকে ফাঁকে 'সরদি-দরদ কি লীয়ে এসপ্রো লীজিয়ে' ধরনের সংক্ষিপ্ত বিজ্ঞাপন। কোন দিন যদি রেডিয়ো না বাজতো, তা হলে আমার সব কাজ পানশে, নিরানন্দ হয়ে পড়তো।

কাজেই আমার রম্যরচনায়ও মায়ের পরিচালিত রেডিয়ো স্টেশনটি এত গুরুত্ব পেয়েছে। সেখান থেকে 'আবহাওয়ার' পূর্বাভাষও মিলতো নিয়মিত—কখনো 'মেঘের' কখনো 'রৌদ্রের', কখনো বা 'বৃষ্টির বা প্রবল ঝড়ের'। বলা বাহুল্য এগুলো তাঁর নিজের মুডের উপরেই নির্ভরশীল ছিল। আমার চার নম্বর খালু, দুই নম্বর মামা ছিলেন এই রচনার বিশেষ চরিত্র; তাঁদের এই নম্বর-প্রাপ্তির ঘটনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যা ডিটেকটিভ উপন্যাসের বিভিন্ন কোড ব্যবহারকেও হার মানায়। খালু হলেন সবজান্তা—আমাদের স্থানীয় ইতিহাস, ভূগোল, ব্যবসা-বাণিজ্য সব কিছুর শেষ কথা পাওয়া যাবে তাঁর কাছে। আর তরুণ বয়সী মামা নুরুল আবসার হলেন নেহাত ছিচকাঁদুনে বালকের মত 'অভিযোগ বাক্স'—সারাক্ষণ অভিযোগ করছেন ভাগিনাদের কোনজন তাঁর শান্তি কী ভাবে বিঘ্নিত করছে তা নিয়ে। দোকানদারিতে নবাগত মামার মাস্টার অনেক, ছাত্র শুধু একা তিনি নিজে। এমনকি দোকানের তরুণ কর্মচারী ফয়েজও তাঁর মাস্টার। ফয়েজ হলেন সেই ব্যক্তি যিনি ক্রিকেট খেলা না বুঝেও মন্তব্য করেন 'যাচ্ছে তা ফিল্ডিং'। তাঁর একটি মুদ্রাদোষ ছিল—কথায় কথায় বলতেন 'আমার সঙ্গে বাঁ বোঁ করবেনা'। এই বাঁ বোঁ শব্দটি কী ভাবে তিনি আবিষ্কার করলেন এ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোকপাত ছিল ওই রম্যরচনায়। আশার বাপ দাদু আপাতত খাদ্য মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকলেও তিনি ছিলেন ত্রিকালদর্শী। আমার প্রবল প্রতাপশালী প্রয়াত দাদার কথা তিনি এমন ভাবে বলেন যেন তিনি তাঁর ইয়ার-দোস্ত ছিলেন। এমনি ভাবে একটি একটি করে উন্মোচন করা হয়েছিল ২০ বক্সীর হাট রোডের নানা চরিত্রকে। রম্যরচনাটিতে আলোচিত অনেকের আগ্রহ এতে সৃষ্টি হবে তা তো স্বাভাবিক, যারা আলোচিত নয় তাদের মধ্যেও কিছুটা আগ্রহ দেখা দিয়েছিল।

সেই বাল্যকালে বক্সীর হাটে আমাদের জীবনের খুব উপভোগ্য একটি সময় ছিল আমাদের প্রাতযাত্রায়। অনেক দিনই খুব ভোরে উঠে আমরা ছোটরা দল বেঁধে শহরের একেবারে মাঝখানের বড় একটি অঞ্চল জুড়ে ঘুরে আসতাম। এটি খুব নিয়মিত হতো রোজার সময়। সেহরির সময় আমরা সবাই উঠে যেতাম, সেটি ছিল একটি উৎসবের মত। প্রাতযাত্রায় আমাদের টিম লিডার থাকতো সেকান্দর; আর আমি, টুনু, আইয়ুব, আজম, ও নেহাত শিশু জাহাঙ্গীর সহ আমরা ফুল টিমই

থাকতাম হাঁটার দলে: সঙ্গে কখনো ছোট একটি প্র্যামে শোয়া বা আধশোয়া অবস্থায় থাকতো আবু রাশেদ। ওই প্র্যাম ঠেলবার অধিকার ছিল শুধু সেকান্দরের, টুনুর, আর আমার। আমাদের সেই ভোরের যাত্রা শুরু হতো তখনো অতি স্বল্প ব্যস্ততার রাস্তায় বিভিন্ন মসজিদে ফজরের নামাজের মুসল্লিদের সান্নিধ্যে, আর কোন কোন প্রভাত ফেরিওয়ালার ডাক শুনতে শুনতে। এর মধ্যে বেশি সরব থাকতো মাখন-বিস্কুট ওয়ালারা। যাত্রার পথে পথেই এই ডাক শোনা যে—'মাখন-বিস্কুট, বিস্কুট-মাখন'। তাদের কাছে ডালায় থাকতো কলাপাতার ছোট টুকরাকে তিন কোণা প্যাকেটে পরিণত করা ঠোঙ্গা যার কলাপাতার ভেতরের দিকে বাতাসার মত চেপ্টা গোল একটু খানি নরম মাখন লাগানো থাকতো। ঠোঙ্গাটিকে বন্ধ রাখা হতো দাঁতের খিলানের মতো ছোট একটি নারকেল পাতার কাঠি দিয়ে। ওই কাঠিটিই মাখন তুলে খাওয়ার জন্যও ব্যবহৃত হতো। ছোট একটি চ্যাপ্টা টিনের মধ্যে বিস্কুটও থাকতো মাখন-বিস্কুট ওয়ালার বিশেষ ধরনের বিস্কুট, বেশ স্বাদের। কখনো কখনো ডালপুরী ওয়ালার সাক্ষাতও মিলেতো যারা বড় একটি সসপ্যান আকৃতির ডেগচি মাথায় বয়ে নিতো আর ডাক দিতো 'ডাইল পুরীইইই'। এগুলো বোধ হয় ছিল আশু প্রাতরাশ করবে যারা, রোজার সময় সেহরিতে খাবে যারা তাদের জন্য। ও সময় অবশ্য আরো পরের আরো ভাল প্রাতরাশের আয়োজনগুলো শুরু হতে দেখতাম; নানা চায়ের দোকানের কয়লার চুলাগুলো জ্বালাবার প্রচেষ্টার মধ্যে। ব্যাপারটা সোজা কাজ ছিলনা। অনেক বহনযোগ্য চুলাকে রাস্তার উপরেই নিয়ে আসা হতো এই কাজে। কোন রকমে কয়লায় একটু আগুন লাগিয়ে তাকে ক্রমাগত হাতে বাতাস করতে হতো, নলের মধ্য দিয়ে ফু দিয়ে যেতে হতো যতক্ষণ না কয়লায় ভাল করে আগুন ধরে ওঠে। চারদিকে বেশ ধোঁয়াও ছড়িয়ে পড়তো তাতে। হিন্দু বণিক অধ্যুষিত বক্সীর হাটের দোকানগুলোতে তখন আহ্নিকের কাজও চলতে দেখতাম—দোকানে, বারান্দায় পানির ছিটা দিয়ে, একটু ধূপ-ধুনা জ্বেলে মন্ত্র পড়ে মাথায় ঠেকিয়ে প্রভাত আহ্নিক।

আমাদের যাত্রার সাধারণ রুটটি নেহাত কম দীর্ঘ হতো না। লালদিঘির পার হয়ে প্রায়ই চলে যেতাম কোর্ট বিল্ডিঙের পাহাড়ে। সেখান থেকে নেমে নিচের রাস্তা দিয়ে আবার একটু উঠতাম পাহাড়ের ঢালে জিন্নাহ পার্কে। ফেরার রাস্তাটি সব সময় যাওয়ার রাস্তা থেকে আলাদা হতো। প্রায়ই বাসায় ফিরতাম মূল বক্সীর হাট রোডের বদলে একটু পাড়াগেঁয়ে বিকল্প রাস্তা দিয়ে যাকে বলা হতো পাছের রাস্তা। ওই রাস্তার মজাটি হলো ওখানে ছিল অনেক গেরস্ত বাসাবাড়ি এবং সেগুলোর সাথে শিউলি, বকুল ইত্যাদি ফুলের গাছ। এসব গাছ তলায় ঝরে পড়া ফুল সংগ্রহটিকে আমরা একটি আনন্দদায়ক কাজ মনে করতাম। আমাদের মত আরো কিছু বালক বালিকাকে আমরা ওখান থেকে ফুল সংগ্রহ করতে দেখতাম ডালি নিয়ে গিয়ে। আমাদের ওই প্রাতযাত্রার অ্যাডভেঞ্চারের মধ্যে কচিৎ

দু'একবার মিস-অ্যাডভেঞ্চার করে ফেলেছিলাম পার্কের বাগানের ফুল ছিড়তে গিয়ে। নানা বয়সী শিশুর এরকম টিমের সঙ্গে ছিলাম বলে অল্প শাস্তিতে পার পেয়ে গেছি। এখন ভাবতে অবাক লাগে যে চট্টগ্রাম শহরের এতখানি বিভিন্ন রকম এলাকার মধ্য দিয়ে একেবারে কোলের শিশু থেকে শুরু করে এত ছোট কয়েক জন ছেলে মেয়ে দিনের পর দিন এতক্ষণ ধরে ঘোরাফেরা করেছি, এ নিয়ে কাউকে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হতে দেখেনি, বা নিরাপত্তার অভাব হবে মনে করে কেউ কোনদিন মানাও করেনি।

আমাদের এই উজ্জ্বল খুশির দিন কিন্তু সব সময় খুশির থাকেনি। তার বয়স এক বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই মোসাদ্দেকের মত আবু রাশেদকেও আমরা হারিয়ে ফেলেছিলাম—সেই অজানা অসুখে, যা বলতে গেলে তেমন কোন চিকিৎসার সুযোগ দেয়নি। পুরো পরিবার দারুণ ভাবে মুষড়ে পড়েছে এতে; আমাদের ছোটদের দলটি তো নির্বাক হয়ে গেলাম। তখন কিছুদিন সব চেয়ে ছোট জাহাঙ্গীর সবার মনোযোগ আর উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠলো। আপদ বালাই থেকে রক্ষার জন্য তার কান ফুটো করে তাতে সোনার বালি লাগানো হলো (একটি খুঁত সৃষ্টি করার জন্য)। ওই সময় সে একবার অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়িশুদ্ধ মানুষ অসম্ভব রকম উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। মনে পড়ে আমি নিজেও তখন নীরবে আল্লাহকে ডাকতাম তার অসুখ সারিয়ে দেবার জন্য। এমনিতেও দীর্ঘকাল জাহাঙ্গীর ছিল সবার মধ্যমণি। ইউনূস ভাই তাকে ডাকতেন 'মিষ্টি' বলে। মিষ্টির জন্য নিত্য নতুন মজার খেলা আবিষ্কার করা তখন তাঁর একটি কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বক্সীর হাটে প্রযুক্তির চমক

বক্সীর হাটে আমাদের জীবনযাত্রায় প্রথম দিকে উন্নত প্রযুক্তির খুব বেশি ছোঁয়া ছিলনা। কলের গান, রেডিয়ো, মেন্টল বাতি এগুলো সব কিছু আমরা বাইরে বাইরে দেখেছি, মজাও পেয়েছি, কিন্তু ঘরে কখনো নয়। এবার প্রযুক্তির কিছু কিছু চমক ঘরেও আসতে আরম্ভ করলো। তার মধ্যে একটি ছিল ফ্লোরোসেন্ট বাতি—যা এলো দোকানের খোলতাই বাড়াবার জন্য। দোকানের দেয়ালে তো লাগানোই হলো, শো-কেইসের ভেতরেও ছোট ছোট এই টিউব লাইট লাগানো হলো। এই চমৎকার সাদা বাতিগুলো শহরে দেখতে শুরু করেছি তা তখন বেশি দিনের কথা নয়। এখন এদের আলোতে আমাদের দোকান ও তার শো-কেইসে রাখা অলঙ্কার ঝলমল হয়ে উঠলো। বাতিটি হাতের কাছে চলে আসাতে তার অদ্ভুত মন-মেজাজের সঙ্গেও পরিচিত হলাম। এতদিন সুইচ টেপার সঙ্গে সঙ্গে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে এটিই জানতাম। এখন দেখলাম ব্যাপারটি এত সোজা নয়। সেই আমলের টিউব লাইট জ্বালাতে একটু ঝক্কি পোহাতে হতো। এরকম প্রত্যেক বাতির জন্য মূল সুইচ ছাড়াও কলিং বেল বাজানোর জন্য যে টেপা সুইচ আছে সে রকমও একটি করে থাকতো। এটি টিপে টিপে বাতির দুই প্রান্তকে সাধারণ

ফিলামেন্ট বাতির মতো লাল করে তুলতে হতো। সে অবস্থায় মর্জি-মেজাজ ভাল হলে হঠাৎ করে সাদা মূল বাতিটায় আলো জ্বলে উঠতো। সাধারণত দুই এক টেপায় কাজ হতোনা, বার বার টিপে চেষ্টা করতে হতো। একবার বাতি জ্বলে গেলে অবশ্য আর সমস্যা হতোনা। এভাবে দোকানের সবগুলো বাতি জ্বালাতে প্রতি সন্ধ্যায় একটু সময় লাগতো বৈ কি!

কিছুদিনের মধ্যে দোকানের সামনে চোখে পড়ার মত একটি আধুনিক সাইনবোর্ডের আয়োজন করা হলো—এ-মাথা থেকে ও-মাথা দশাসই সাইনবোর্ড। ইউনূস ভাই এর ডিজাইন করতে অগ্রণী হলেন, শরণাপন্ন হলেন তাঁর আর্টিস্ট ওস্তাদ আহমদ হোসেনের কাছে। তিনিই করে দিলেন এই দৃষ্টি-নন্দন নতুন সাইন বোর্ড। কিন্তু আমার প্রসঙ্গ সাইনবোর্ড নিয়ে যতটা নয়, তার দু'পাশে লাগানো অতি শক্তিশালী সাদা আলোটি নিয়ে তার চেয়ে বেশি। এমন শক্তিশালী আলো আমি আগে কখনো দেখিনি—মার্কারি ভেপর ল্যাম্প। সন্ধ্যায় সুইচ টিপে দিলে প্রথমে খুব মৃদুভাবে জ্বলতো, আস্তে আস্তে তার ঔজ্জ্বল্য বাড়তো, কিছুক্ষণের মধ্যে আলোর বন্যায় সাইনবোর্ডটি ভাসিয়ে দিত।

আলো নিয়ে আমার ঔৎসুক্য বহু আগে থেকেই। ঘাট ফরহাদ বেগের বিদ্যুৎ-বিহীন বাড়িতে যে সুন্দর চিমনির অয়েল ল্যাম্পগুলো আসতো তা আমার খুব ভাল লাগতো। গ্রামের বাড়িতে বিয়েতে বা মিলাদে যে হ্যাজাক বাতিগুলো জ্বালানো হতো সেগুলোও আমার খুব মনোযোগ কাড়তো—যারা ওগুলো জ্বালাতো, নিভু নিভু হয়ে এলে আবার চাঙা করতো, পেছনে পেছনে থেকে তাদের কাজ লক্ষ্য করতাম। এমন উজ্জ্বল আলো সেই বাতি থেকে বেরুতো—অবাক হবার মতো। আমাদের গ্রামে বারোয়ারি কাজের জন্য এরকম বেশ কয়েকটি বাতি রাখা ছিল। দেখতাম এটি জ্বালাবার জন্য একটি পিষ্টন বার বার ভেতর-বার করে পাম্প করতে হতো। তখন বুঝতামনা এই পাম্প করার অর্থ কী? তবে এটি দেখেছি যে কিছুক্ষণ পাম্প করার পর পিস্টনটি ঢোকাতে বেশ কষ্ট হচ্ছে। পরে জেনেছি এমনি ভাবে পাম্প করে বাতাসের চাপ বাড়িয়ে এর ভেতর জ্বালানি হিসেবে দেয়া তরল স্পিরিটকে মিহি কুয়াশার মতো করে ওপর থেকে ঝুলে থাকা ওই ছোট্ট সাদা বেলুনের মত মেন্টলের উপর তা ফেলা হতো। এই কুয়াশায় আগুন ধরালে সেটি এত উত্তপ্ত হয়ে পুড়তো যে মেন্টলটিকে খুবই উজ্জ্বল করে তুলতো। সব চেয়ে মজা লাগতো যখন প্যাকেট থেকে খুলে নতুন একটি মেন্টল লাগানো হতো। একে মশারির কাপড়ের মতো সূক্ষ্ম নেটের ভাঁজ করা এক টুকরা বেলুনাকৃতির কাপড়ই মনে হতো। ওটি কী করে বাতির মধ্যে ফুলে দৃঢ় হয়ে এত আলো ছড়াতো সে এক বিস্ময়। হ্যাজাক বাতির মধ্যে আবার কোন কোনটির আলো অপেক্ষাকৃত আরো বেশি হতো, কোন কোনটির উপর একটুখানি ছাদও থাকতো। কেন জানি ওগুলোকে আমরা বলতাম 'চৌদ্দ লাইট'।

ঐ মিউনিসিপ্যাল স্কুলে পড়ার সময়েই আমাদের বাড়িতে প্রথম টেলিফোন এসেছিলো। বাসার বা দোকানের দরকারের চেয়েও এর বেশি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল চট্টগ্রাম জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে আব্বার যোগাযোগ-প্রয়োজনীয়তা বেড়ে গিয়েছিল বলে। টেলিফোন করার মত খুব বেশি মানুষ না থাকাতে অনেক কৌতূহল থাকা সত্ত্বেও যন্ত্রটি ব্যবহার করার সুযোগ খুব বেশি হতোনা আমার। আমাদের নম্বরটি ছিল টু ফোর ফাইভ থ্রি। এর পর বহু বছর এই নম্বরই ছিল। এর থেকেই বোঝা যায় চট্টগ্রাম অঞ্চলে তখন কী ধরনের সংখ্যায় টেলিফোন ছিল। ডায়াল ঘুরিয়ে সরাসরি কোথাও ফোন করার পদ্ধতি আমাদের ওখানে অল্প কিছু দিন আগে প্রথম চালু হয়েছে। আমাদের বাসার কাছে ইদ্রিস মামাদের যে দোকান সেখানে আগে থেকে টেলিফোন ছিল। তাঁদের ওখানে যে টেলিফোন সেট তখন অব্যবহৃত ভাবে পড়েছিল তাতে কিন্তু ডায়াল ছিলনা। শোনেছি ওটি যখন ব্যবহৃত হতো তখন রিসিভার তুললেই কেন্দ্রীয় সুইচবোর্ড থেকে অপারেটর 'নাম্বার প্লিজ' বলে কোন নম্বরে ফোন করতে চাই জিজ্ঞেস করতো, এবং সেটি বললে সেই নাম্বারের সঙ্গে লাগিয়ে দিত। আমাদের টেলিফোনটির অস্তিত্ব বেশ টের পেতাম যখন ঢাকায় ট্রাঙ্ককল করার প্রয়োজন পড়তো তখন। ট্রাঙ্ককলে সেসময় খুব জোরে কথা বলতে হতো, আমরা সারা বাড়ি থেকে শোনতে পেতাম। তাছাড়া ট্রাঙ্কল 'বুক' করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হতো লাইন পাওয়ার জন্য। জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বাবু খুব ভারী গলার মানুষ। তিনি মাঝে মাঝে ঢাকায় ফোন করতে আসতেন। আমরা তখন তাঁর বেশ বাজখাই আওয়াজে চিৎকার করা কথার কারণে বাসার কোথাও কোন কাজ করতে পারতামনা।

একদিন দেখলাম আমাদের দোকানের সব চেয়ে বড় যে নিক্তিটি ছিল তার চেহারা বদলে গেছে এই নিক্তিটিতে বড় বড় রূপার গয়নাগুলো ওজন করা হতো। অনেক দিনের ব্যবহারে বিবর্ণ হয়ে গিয়েছিল—বিশেষ করে যেখানটিতে হাত দিয়ে চাপতে হতো সে জায়গার রঙতো একেবারেই ওঠে গিয়েছিল। এখন হঠাৎ দেখছি যে এটি অদ্ভুত সুন্দর চকচকে হয়ে এসেছে আগাগোড়া—যেন এটি নিজেই রূপার তৈরি। শুনলাম একে সিলভার প্লেটিং করা হয়েছে। এরপর একে একে অন্য নিক্তিগুলোরও উন্নতি হলো। সেগুলো ছোট, এদের করা হলো গোল্ড প্লেটিং। আগে সুন্দর সোনার গিল্টি করা কলম দেখেছি। নিক্তির মত বড় জিনিসকেও যে গিল্টি করা যায় সেটি প্রথম দেখলাম। কারখানার অ্যাসিডের মধ্যে ডুবিয়ে তাতে বিদ্যুৎ চালিয়ে নাকি গিল্টি করা হয়।

এসব নিক্তি কাচের বাক্সের মধ্যে সযত্নে থাকতো, খুবই সূক্ষ্ম ভাবে ওজন নেয়া যেত। ওজনের যে ছোট বাটখারা হতো সে বড় মজার। একেবারে সূক্ষ্ম বাটখারা তৈরি হতো রতি নামের খুব ছোট কূঁচের বীজ থেকে যার ওজনকেও 'রতি' বলা হতো। একটু সামান্য কালো ছোপ দেয়া বাকিটা চকচকে লাল এই

রতিগুলো দেখতে খুব সুন্দর। অন্যান্য কিছু বাটখারা তৈরি হতো বৃটিশ আমলের ধাতব টাকা থেকে—পুরো টাকাটা হুবহু এক তোলাই হতো। সোনা মাপার জন্য তোলাকে ভরিও বলা হয়। ১০০ রতিতে হতো এক ভরি। এরকম ৮০ তোলায় বা ভরিতে এক সের। টাকাকে অর্ধেক বা এক চতুর্থাংশ করে কেটে আধা তোলা বা সিকি তোলা বাটখারা পাওয়া যেত। মজার ব্যাপার হলো এখানে যে নতুন ক'টি প্রযুক্তি আসার কথা বললাম, যা তখন দর্শকের মত দেখে চমৎকৃত হয়েছি, দু'তিন বছরের মধ্যে তার কোন কোনটি আমি কিন্তু নিজেই এক ভাবে তৈরি করেছি আমার নিজের 'ল্যাবোরেটরিতে'। যেমন সেখানে টেলিফোন তৈরি করেছি, বিবর্ণ ধাতব জিনিসকে গিল্টিও করেছি। এসব কথা যথাস্থানে বলা যাবে।

গিল্টি করা কলমের কথা উঠেছে, কারণ তখন আমরা ফাউন্টেন পেন ব্যবহার করা শুরু করেছি, এর আগে আমাদের দৌড় ছিল কাঠ পেন্সিল পর্যন্ত। তখনকার অতি সাদামাটা 'পাইলট' পেন নিয়েও আমাদের সৌখিনতার শেষ ছিলনা। ওই পেনে আলাদা ড্রপার দিয়ে কালি ভরে নিতে হতো। পরের উন্নত কলমগুলোর মধ্যে থাকা টিউবের ব্যবস্থায় কলম দিয়েই কালি তুলে নিতে পারতাম দোয়াত থেকে। কালি নিয়েও আমাদের খুনসুটির সীমা ছিলনা। সস্তা রয়্যাল-ব্লু রঙের 'সোয়ান' কালি থেকে ব্লু-ব্ল্যাক রঙের 'পার্কার' কালিতে উন্নীত হতে সময় লেগেছে। পরীক্ষার সময় কলমের সঙ্গে কালির দোয়াতও নিয়ে যেতাম, পাছে কালি ফুরিয়ে যায়। কোনদিন পরীক্ষায় কলমের কালি ফুরাবার ঘটনা ঘটেনি। কিন্তু এই যে দোয়াত নিয়ে যাওয়া তা ঘুমে দুঃস্বপ্নের মধ্যে নানা অনর্থ ঘটিয়েছে। বহুবার দুঃস্বপ্ন দেখেছি যে পরীক্ষার খাতার উপর কালির দোয়াত উল্টিয়ে সব নষ্ট করে দিয়েছি। এখন বুঝি পরীক্ষা নিয়ে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস সত্ত্বেও এতে অনর্থ ঘটা নিয়ে কেমন মানসিক উদ্বেগের লক্ষণ এসব স্বপ্ন। পরীক্ষা নিয়ে আর এক ধরনের মানসিক অনুভূতি তখন হতো যা বহুকাল পরে পরীক্ষার পর্ব ছেড়ে আসার পরেও অনুভব করেছি। এটি হলো হেমন্তের প্রথম শিশির পায়ে লাগার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে কেমন যেন ছ্যাৎ করে ওঠা—একই সঙ্গে উদ্বেগ ও সুখানুভূতির এক অতি জটিল মিশ্রণ একই সঙ্গে হওয়া। পরে আমি ব্যাপারটিকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছি—ওই শিশির নভেম্বর-ডিসেম্বরের পরীক্ষার আসন্নতা অবচেতন মনে স্মরণ করিয়ে দিত। সেই সঙ্গে পরীক্ষার পর যে সারাদিন নিজের পছন্দের কাজগুলো করার অবাধ স্বাধীনতা পাব সেই সম্ভাবনায় পুলকিতও হতাম। এরই ফলশ্রুতি ওই মিশ্র অনুভূতি।

বৃত্তি পরীক্ষা ও স্কুল বদল

সেই বহু প্রতীক্ষিত প্রাইমারি বৃত্তি পরীক্ষা ঘনিয়ে এলো, অথচ এদিকে গরম মাস্টার বদলি হয়ে ঝাউতলা প্রাইমারি স্কুলের হেড মাস্টার হয়েছেন। ফলে আমাদের কোচিং ঝাউতলায় স্থানান্তরিত হলো। স্কুল ছুটির পর পুরো দল হেঁটে

ঝাউতলায় চলে যেতাম। খুব দূরের পথ নয়, বিকেলে হেঁটে যেতে ভালই লাগতো। বৃত্তির শেষ দিকের প্রস্তুতিগুলো এভাবেই চল্‌লো। অন্য রকম কিছু প্রস্তুতিও চল্‌লো। মিউনিসিপ্যাল স্কুলের আমাদের একজন শিক্ষকের নেতৃত্বে এক রাতে চট্টগ্রামের নানা প্রধান মাজারে আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো পরীক্ষায় ভাল করার জন্য প্রার্থনা করতে। এভাবে আমানত শাহের ও বদর শাহের মাজারে যাওয়া হলো। এই দুই আউলিয়া চট্টগ্রামে ইসলামের পত্তনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে আছেন। সব সময় সামনে দিয়ে আসা যাওয়া করলেও মাজারের ভেতরের প্রাচীন স্থাপত্যগুলো কখনো দেখিনি, ভক্তদের আকুতিও দেখিনি, এই প্রথম দেখলাম। অনেক কিংবদন্তি জড়িয়ে আছে এই দুই সাধকের সঙ্গে। বিশেষ করে বদর শাহের এখানে এসে চাটি বা চেরাগ জ্বালিয়ে জ্বিন-পরীদের উৎখাত করা থেকে চট্টগ্রামের যে নামকরণ সেটি শৈশব থেকেই শুনেছি। টিলার উপর কদম মোবারক ও গরীবউল্লাহ শাহের মাজারে গেলাম। দোয়া নেয়ার কোন ত্রুটি হলোনা।

আমাদের সীট পড়েছে মিউনিসিপ্যাল হাই স্কুলে, আমাদের স্কুলের ঠিক পেছনেই যে স্কুল। এদিক থেকে ভাল হলো যে দূরে কোন অজানা জায়গায় যেতে হচ্ছেনা। বই খাতা কাঠি লজেন্স ইত্যাদি বিক্রির জন্য স্কুলের কাছে যে বুড়া মিয়ার দোকান ছিল তিনি বল্‌লেন পরীক্ষার সময় তিনি ওদিকটায় থাকবেন। সবার জন্য কচি ডাব আর কমলা লেবুর ব্যবস্থা রাখবেন। কাজেই কোন দিক থেকেই পরীক্ষার সময় যত্ন-আত্তির অভাব হলো না—ভাল ভাবেই পরীক্ষা হয়ে গেল।

পরীক্ষা শেষের ওই শীতের দিনগুলো দারুণ উপভোগ করলাম। এটি আমি সব সময় করেছি, পরীক্ষার পরের জন্য আগে থেকে লোভনীয় কিছু বই বাছাই করে রাখতাম—যা পরে একেবারে হাতপা ছেড়ে দিয়ে আরাম করে পড়বো। সেবারও তাই করেছিলাম। ইউ এস আই এস লাইব্রেরিতে গিয়ে সিনেমা দেখে, বই ঘেঁটে, বই নিয়ে এসে, এক ফাঁকে লালদিঘির পার্কের ভেতর দিয়ে গিয়ে দিঘিতে তেলাপিয়া মাছের ঝাঁকের খেলা দেখে তারপর বাড়ি ফিরে গা এলিয়ে আরাম করে আনন্দের বই পড়া—এটিই ছিল আমার পরীক্ষা শেষের উপভোগের চরম মাত্রা। পরীক্ষার আগে এই দিনগুলোর লোভে লোভে নিজেকে দিয়ে কিছু নিরানন্দ খাটনিও খাটিয়ে নিতাম। প্ল্যান করে যে কোথাও বেড়াতে যাব, বা অন্য কিছু করবো সেরকম সুযোগও ছিলনা, দরকারও অনুভব করতামনা। অবশ্য ওদিকে কলেজিয়েট স্কুলে পরীক্ষার মৌসুম শেষ হলে সেখানে একটানা স্কাউটিঙের ডাক পড়তো, পরীক্ষা শেষে সেটিও কম লোভনীয় ছিলনা।

ষষ্ঠ শ্রেণীতে নতুন স্কুলে যাব, সেই আনন্দটিও কম ছিলনা। এবার যাব আরো চমৎকার একটি স্কুলে—গভর্নমেন্ট এম ই স্কুলে। চট্টগ্রাম কলেজের সামনে পাহাড়ের উপর সুন্দর বাংলো বাড়ির মত কয়েকটি ঘর নিয়ে এই স্কুলটিকে দূর থেকে বহুবার দেখেছি, ইউনূস ভাই এক সময় এখানে পড়তেন। আসলে স্বাভাবিক ভাবে আমার এখন সরাসরি কলেজিয়েট স্কুলে যাওয়ার কথা। ইউনূস

ভাই সদ্য এই স্কুল শেষ করেছেন, ওখানে ইতোমধ্যেই আমি স্কাউটিং করি, আর ওই স্কুলে পঞ্চম থেকেই দশম শ্রেণী পর্যন্ত সব ক্লাস আছে। অন্য দিকে এম ই স্কুলে মাত্র ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত আছে—কারণ এটি একটি মাইনর স্কুল। আসলে এই কারণেই মাত্র এক বছরের জন্য সেখানে যাওয়া—মাইনর বৃত্তি দেয়ার জন্য। সে সময় স্কুলে বৃত্তি পরীক্ষা এই দুই রকমেরই ছিল। পঞ্চম শ্রেণীর শেষে প্রাইমারি বৃত্তি, আর ষষ্ঠ শ্রেণীর পর মাইনর বৃত্তি।

মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা দেবার জন্য এক বছরের নতুন স্কুলে যেতে আমাকে মোটেই বেশি উৎসাহিত করতে হয়নি। কারণ বৃত্তি পাওয়ার মজাটি আমি খুব বুঝে ফেলেছি—প্রাইমারি বৃত্তিতে ফার্স্ট হয়েছি। এই পরীক্ষাটি প্রতিটি জেলায় আলাদা আলাদা ভাবে হয়ে থাকে জেলা স্কুল বোর্ডের তত্ত্বাবধানে—চট্টগ্রাম জেলায় আমি ফার্স্ট হয়েছি। ফলাফল প্রকাশের পরের দিনই স্থানীয় পত্রিকায় আমার ছবি ছাপা হলো—চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক আজান' ও 'দৈনিক পূর্ব পাকিস্তানে'। আরো দুটি পত্রিকা এখান থেকে তখন বের হতো ইংরেজি পত্রিকা 'দি ইস্টার্ন এক্সামিনার' এবং অনিয়মিত ভাবে 'দৈনিক পাঞ্চজন্য'। অল্প কিছু দিন পরে 'দি ইউনিটি' নামে আরো একটি ইংরেজি পত্রিকা যোগ হয়েছিলো। পত্রিকায় নিজের ছবি দেখার যে আনন্দ তাতে পরবর্তী বৃত্তি পরীক্ষায় আবার চান্স নিতে কার না লোভ হবে। তাছাড়া টাকার লোভটিও কম ছিলনা। প্রাইমারি বৃত্তি মাসে পঁচিশ টাকা। এরপর আমার অর্থকষ্ট অর্থাৎ বই কেনার অর্থকষ্ট আর থাকার কথা নয়। এক বছর এই বৃত্তি চলবে। তারপর বৃত্তি পেলে টাকার পরিমাণ আরো বেশি—সেটি চলবে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। এমন সুযোগ কে ছাড়ে! উপরি পাওনা হলো সামনে স্কুলের মূল বেতনটি দিতে হবেনা। তাতে অবশ্য সরাসরি আমার কোন লাভ নেই।

দুঃখ হলো শুধু একটিই, মিউনিসিপ্যাল স্কুলে আমাদের বন্ধুর দলটি ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম। অধিকাংশই চলে গেল নানা হাই স্কুলে—বলতে গেলে আমিই শুধু মাইনর স্কুলে। দু'একজনকে অবশ্য এক বছর পর কলেজিয়েট স্কুলে আবার পেয়েছিলাম। স্কুলে যাবার পথটিও এখন বদলে গেলে। আগে লালদিঘির পার হয়ে আমার লাইব্রেরিগুলোর পাশ দিয়ে যাতায়ত করতাম। এখন অন্য পথে আন্দরকিল্লা হয়ে পাহাড় কাটা উঁচু নিচু পথ দিয়ে যেতে হতো নতুন স্কুলে। অতি চমৎকার পথ, হাঁটাটা খুব উপভোগ্য হতো। বাসে যেতে চাইলে টাউন এরিয়ার এক নম্বর বাস ধরতে হতো বক্সীর হাট পুলিশ বীট স্টপেজ থেকে। বাসে একই পথে গিয়ে কলেজ গেইট নামলেই হলো। আমার নতুন স্কুল চট্টগ্রাম কলেজের ঠিক সামনে।

দেব পাহাড়ের ওপরে-নিচে

মিডল ইংলিশ স্কুল

আমার নতুন স্কুলের নাম গভর্নমেন্ট এম ই স্কুল। মূলতঃ যেভাবে ছিল এম ই স্কুল মানে হলো মিডল ইংলিশ স্কুল; যদিও পরে পরিবর্তিত অবস্থায় কেউ কেউ একে মডেল ইংলিশ স্কুলও বলেছেন। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য এটি হাইস্কুলে রূপান্তরিত হয়েছে—নাম চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট হাই স্কুল। আমি যে সময় ওই স্কুলে ভর্তি হচ্ছি তখন হাই স্কুলকে বলা হতো এইচ ই স্কুল অর্থাৎ হাই ইংলিশ স্কুল, আর ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত থাকা মাইনর স্কুলকে বলা হতো মিডল ইংলিশ স্কুল। বৃটিশ আমলে এদেশে আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হওয়ার পর থেকে এ স্কুলগুলো ইংলিশ স্কুল বলে পরিচিত হয়েছে দেশীয় সনাতন ধাঁচের বিদ্যালয়ের বিপরীতে। সে সময় এই নতুন ধারার স্কুলগুলোর মাধ্যম ছিল ইংরেজি, ভারত বিভাগের আগে আগে পর্যন্ত সেই নিয়মই চালু ছিল। তার একটি রেশ আমাদের সময়েও থেকে গিয়েছিলো। এই স্কুলে একজন শিক্ষকের পদবী ছিল 'ভার্নেকুলার মাস্টার', অনুবাদ করলে যা দাঁড়ায় দেশীয় ভাষার শিক্ষক। আমরা তাঁকে বলতাম ভি এম স্যার। ঔপনিবেশিক আমলের অনেক কিছু তখনো দিব্যি বর্তমান।

এরকম এম ই স্কুল দেশে সে সময় আর কতগুলো ছিল জানিনা, তবে চট্টগ্রাম গভর্নমেন্ট এম ই স্কুল বহু দিন ধরে খুবই নামকরা স্কুল। এটি আসলে আরো বড় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশ ছিল—তা হলো একটি টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের, যাকে নর্মাল স্কুলও বলা হতো। মুখের কথায় এর আরেক নাম ছিল গুরু ট্রেনিং স্কুল। আমাদের এম ই স্কুল ছিল ওই ট্রেনিং স্কুলের প্র্যাকটিস টিচিং করার জায়গা। বছরের কোন কোন সময় ওখানকার ছাত্ররা আমাদের ক্লাস নিতে আসতেন, তাঁদেরকে পর্যবেক্ষণ করা হতো, এবং এর বিচারে তাঁরা নম্বর পেতেন।

আমাদের স্কুলের ক্লাসগুলো ছিল একটি পাহাড়ের সব চেয়ে নিচের দিকের ধাপে। স্কুলের অফিসটি ছিল তার চেয়ে একটু উঁচু ধাপে। উভয়েই সুন্দর

কটেজের মত করে তৈরি, ওপরে টালির ছাদ। পাহাড়ের আরো ওপরের ধাপে ছিল টিচার্স ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ক্লাসগুলো, তারো ওপরে প্রিন্সিপ্যালের অফিস। এভাবে সুন্দর ধাপে ধাপে বিন্যস্ত ছিল আমাদের স্কুল ও তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ইনস্টিটিউট। ওই ইনস্টিটিউটের স্তরেই পাহাড়কে কেটে খানিকটা জায়গা সমতল করে তৈরি হয়েছিল তাঁদের ও আমাদের খেলার মাঠ। ওখানে পেছনে ছিল ট্রেইনী শিক্ষকদের হোস্টেল। খেলার মাঠ থেকে উপরের দিকে তাকালে দেখতাম সুদূর উচ্চতায় আর একটি কলেজ—ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ, যাকে চলতি কথায় 'বুড়া মাদ্রাসা' বলা হতো। মাদ্রাসা থেকে এসে যে সব ছাত্র অন্যদের মতো ইংরেজি মাধ্যমের ইন্টারমিডিয়েট (আজকের ভাষায় উচ্চ মাধ্যমিক) পড়তো তাদের জন্য এই কলেজ—চট্টগ্রামের আর একটি ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। চাচা সোবহান এক সময় এর মাদ্রাসা সেকশনে পড়তেন। আমাদের খেলার মাঠ থেকে, বা আরো নিচ থেকে একে পাহাড়ের চূড়ায় একটি ক্যাসেলের মত মনে হতো আমার কাছে, যেখানে বহুধাপ সিড়ি বেয়ে তবে পৌঁছানো যায়।

এই যে পাহাড়, আমাদের ক্লাসগুলোর পেছনে থেকেই তার জঙ্গলাকীর্ণ উচ্চতা শুরু হয়ে গিয়েছে। অরণ্যে ঢাকা এই পাহাড়ের শ্রেণী একটু একটু চড়াই-উৎরাই করে ওদিকে অনেক উচ্চতা ও অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। সেখানে খুব সম্ভবত এটি চট্টগ্রামের অন্যান্য পাহাড় শ্রেণীর সঙ্গে মিশেছে। আমাদের দৃষ্টি প্রায়ই ওদিকে গেলেও এই পাহাড় জঙ্গল ভেদ করে নিজেদের বেশীদূর যাওয়া হয়নি। এ পাহাড়ের নাম দেব পাহাড়। এর মধ্যে আমরা মাঝে মাঝে যেটুকু ভেতরে যেতাম তা দেবপাহাড়ের বুনো ফুল সংগ্রহ করার জন্য। স্কুলের নানা অনুষ্ঠানে এবং দীর্ঘ ছুটিতে যাবার আগে স্কুলকে সাজাবার নিয়ম ছিল; আর এ জন্যই বুনো ফুলের প্রয়োজন হতো। তবে দেব পাহাড়ের সুদূর গহীন অভ্যন্তর সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল কম ছিলনা। জনশ্রুতি ছিল সেখানে এক সন্ন্যাসী বাস করেন যিনি এম এ পাশ, কিন্তু সন্ন্যাস গ্রহণের পর আর লোকচক্ষুর সামনে আসেন না।

আমাদের স্কুল থেকে নেমে গেলেই দেব পাহাড় শেষ হয়ে আমরা কলেজ রোডে চলে আসি। এটি কলেজ রোড, কারণ আমাদের স্কুলের সামনে রাস্তা পার হলেই ওপাশে শুরু হয় চট্টগ্রাম কলেজের সুন্দর ঢেউ-খেলানো ক্যাম্পাস।

এই প্রথম একটি স্কুলে সরকারী কেতাদুরস্ত ভাব লক্ষ্য করলাম। শিক্ষকদের ক্লাস নেয়া, কথা বলার মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিকতা রক্ষার চেষ্টা রয়েছে। ইংরেজির গুরুত্বটিও টের পেলাম, কারণ ইংরেজি শেখাবার উপর যথেষ্ট জোর দেয়া হচ্ছে, ক্লাসে ইংরেজিতে কথোপকথনের চেষ্টা করা হচ্ছে, হেডমাস্টারের ও অন্যান্য শিক্ষকের সব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ইংরেজিতে হচ্ছে। আমাদের শিক্ষকরা ক্লাসে উপকরণ ব্যবহারের চেষ্টা করতেন। এই প্রথম জ্যামিতি শেখানো শুরু হলো এবং সেটি পড়াবার সময় কাঠের বড় কম্পাস (যেখানে পেন্সিলের জায়গায় চক ব্যবহৃত

হতো), বড় চাঁদা, ইত্যাদি উপকরণ এলো। ভূগোলের ক্লাসে গ্লোব আর ম্যাপ এলো, ইতিহাসের ক্লাসেও ঐতিহাসিক ম্যাপ। বিশেষ করে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের ছাত্ররা যখন প্র্যাকটিস ক্লাস নিতে আসতেন তাঁরা আকর্ষণীয় সব উপকরণ নিয়ে আসতেন, যার অনেকগুলো তাঁরা নিজেরাই তৈরি করতেন; তৈরি করার কৌশল তাঁদেরকে শেখানো হতো। এর মধ্যে থাকতো নানা রকম ম্যাপ ও গ্লোব, বিজ্ঞানের নানা মডেল—যেমন সূর্যের চারদিকে পৃথিবীকে ঘুরিয়ে দেখানো যেত মডেলে; আহ্নিক গতি, বার্ষিক গতি, ঋতু পরিবর্তন, চাঁদের ছায়ায় সূর্যগ্রহণ ইত্যাদিও করে দেখানো যেত মডেলে। আমি মাঝে মাঝে ট্রেনিং ইনস্টিটিউটে গিয়ে দেখেছি কী নিপুণ হাতে তাঁরা পেপিয়ার ম্যাশে দিয়ে (একটি চাঁছের উপর পরতের পর পরতে আঠা দিয়ে কাগজ সেঁটে) নানা গ্লোব তৈরি করতেন। তারপর একে শিরিষ দিয়ে ঘষে উপরে বিশেষ ভাবে কাটা ম্যাপের ফালি সেঁটে দিতেন।

এম ই স্কুলে শিক্ষা দানের আধুনিকতার আরো একটি নমুনা ওখানে ভর্তি হবার কিছুদিনের মধ্যে পেয়ে গেলাম। আমাদেরকে নিয়ে যাওয়া হলো একটি শিক্ষা সফরে কালুরঘাট শিল্প অঞ্চলে এ কে খান ম্যাচ ফ্যাক্টরিতে। শিক্ষা সফর মানে সত্যি সত্যি শিক্ষার জন্যই সফর। আমাদেরকে বলাই হয়েছিল খাতা নিয়ে যেতে এবং প্রচুর নোট নিতে। কারখানায় গিয়ে প্রথমে আমরা একটি হলঘরে বসে একটি সচিত্র প্রেজেন্টেশন শোনলাম। স্লাইড প্রজেক্টারের মাধ্যমে ছবি ও ডায়াগ্রাম দেখিয়ে আমাদেরকে সব কিছু বোঝানো হলো। সেই আমলের স্লাইড প্রজেক্টারগুলো আজকের মত এত ছিমছাম ছিলনা, ছিল বেশ ঢাউস যন্ত্র। শুনেছি একে 'ম্যাজিক লণ্ঠন'ও বলা হতো। কোন বনে কী ধরনের গাছ সংগ্রহ করা হয় ম্যাচের বাক্স ও ম্যাচ কাঠি তৈরির জন্য সেটি দেখানো হলো। সংক্ষেপে সেগুলোর তৈরি প্রযুক্তি সম্পর্কেও একটি ধারণা দেয়া হলো। অন্য দিকে কারখানার শ্রমিকদের কাজ, তাদের তদারকি ও ব্যবস্থাপনার স্তরগুলোও বোঝানো হলো—একেবারে দৈনিক বেতনের শ্রমিক থেকে শুরু করে শীর্ষ জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত। এর মাধ্যমে তুলে ধরা হলো ফ্যাক্টরীর পুরো কর্মযজ্ঞকে। একজন ফোরম্যান, একজন সুপারভাইজার, বা একজন মেশিনম্যানের পৃথক দায়িত্বগুলো কী তাও বোঝাবার চেষ্টা করা হলো। আমাদেরকে প্রশ্ন করতে দেয়া হলো; এবং ধৈর্য ধরে সে সব প্রশ্নের উত্তর দেয়া হলো।

এরপর শুরু হলো সত্যি সত্যি কারখানা দর্শন। প্রেজেন্টেশনে যেমন ভাবে বর্ণনা করা হয়েছিল ঠিক সেই ক্রম অনুযায়ীই আমাদেরকে কারখানার নানা অংশের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হলো। শুরুতে বাইরে মাঠে এক জায়গায় এক সাইজের অনেকগুলো গাছের গুঁড়ি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখা হয়েছে। এতগুলো গাছ যে এমন হুবহু এক রকম একই মাপের হতে পারে তা ভাবা কঠিন। মনে হয় এও অর্ডার দিয়ে তৈরি করানো হয়েছে। এরপর এক এক করে এগুলোকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কারখানার ভেতরে করাত কলে। একটি কল মনে হলো ঠিক আমার

পেন্সিল চাঁছার কলের একটি বিরাট সংস্করণ—বিশাল ছুরির উপর গুঁড়িটিকে ঘোরানো হচ্ছে, যেমন করে আমি পেন্সিলকে ঘোরাই আর পেন্সিলের পাতলা ছাঁটগুলো বাঁকা হয়ে বেরিয়ে আসে ক্রমাগত। তফাৎটুকু হলো এখানে চাঁছা গুঁড়িটির কোন ব্যবহার নেই, যেমন আছে আমার চাঁছা পেন্সিলটির। বরং বেরিয়ে আসা ওই পাতলা কাঠের ছাঁট অর্থাৎ ভিনিয়ারগুলোই আসল ব্যবহারযোগ্য জিনিস যা দিয়ে ম্যাচের বাক্স তৈরি হচ্ছে। ওই অতি পাতলা কাঠকে কেটে, ভাঁজ করে ম্যাচ বাক্সের বাইরের খোল ও ভেতরের আসা যাওয়া করা অংশ—এই দুটিই তৈরি হয়ে যাচ্ছে স্বয়ংক্রিয় কিছু যন্ত্রে। বাইরেরটিতে অন্য আর এক যন্ত্রে আপনা আপনি কোম্পানির লেবেল লেগে যাচ্ছে, দু'পাশে খসখসে কাঠি-ঘষার অংশও ওভাবে লেগে যাচ্ছে—আঠার সাহায্যে। মেশিনের সঙ্গে মানুষও আছে, তবে তাদের কাজ শুধু লক্ষ্য রাখা—মেশিন ঠিক মতো কাজ করছে কিনা, কোনটি কোথাও আটকে গেল কিনা, নষ্ট হয়ে যাওয়া বাক্সগুলো ঠিক মত বাতিল করা হলো কিনা ইত্যাদি। ওই রকম পাতলা করা কাঠকে যান্ত্রিক ছুরি অসংখ্যবার উঠানামা করে কুচি কুচি করে কেটে আর একদিকে তৈরি হচ্ছে ম্যাচের কাঠি—লক্ষ লক্ষ কাঠি একেবারে একই সাইজের। এর প্রত্যেকটির এক প্রান্তে বারুদ লাগিয়ে দিচ্ছে অন্য একটি যন্ত্র। মজার ব্যাপার হলো কারখানার কোন কোন অংশে ঘরের ফ্লোর নষ্ট হওয়া পরিত্যক্ত এরকম কাঠিতে ঢাকা—যেন কাঠি দিয়ে তৈরি একটি নরম কার্পেটের উপর দিয়ে হাঁটছি এখানে। এক জায়গায় দেখলাম শত শত নারী শ্রমিক অদ্ভুত নিপুণতার সঙ্গে বাক্সে কাঠি ভরার কাজ করছে। এক বারেই আন্দাজ করে হাতে ঠিক নির্দিষ্ট সংখ্যক কাঠি তুলে নিচ্ছে এবং তা হাতের ওই একই ঘোরানোর মধ্যেই বাক্সের ভেতরের অংশে রেখে সেটি বাইরের খোলের অংশের মধ্যে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। পুরো কাজটিতে দুই এক সেকেণ্ডের বেশি সময় কারো লাগছেনা। এক জন নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যক বাক্স ভরলো কিনা, প্রত্যেক বাক্সে কাঠির সংখ্যা ঠিক আছে কিনা, এসব কিছুক্ষণ পর পর চেক করে দেখার জন্য মানুষ রয়েছে। দু'একটি কাঠি বেশি বা কম হওয়া ছাড়া অন্য ভুল নাকি হয়ই না। যদি হয় তা হলে জরিমানা, চাকুরিচ্যুতি ইত্যাদি শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। এরপর ম্যাচ বাক্সগুলো ছোট প্যাকেটে, সেগুলোর আবার বড় প্যাকেটে—এমনি ধারায় প্যাকেট করা, লেবেল লাগানো, বাইরে পাঠানোর জন্য বড় বাক্স বন্দী করার ব্যবস্থা—এ সবই শুধু বাকি থাকে।

ফুর্তি করে কেক খেয়ে আমরা শিক্ষা সফর শেষ করলাম বটে, কিন্তু এর পর কয়েকদিন ধরে স্কুলে এর 'শিক্ষা' অংশটির মূল্যায়ন চল্‌লো; আর সেটি ঘটলো প্রায় প্রত্যেকটি ক্লাসে—বাংলা, ইংরেজি, গণিত, বিজ্ঞান কোন ক্লাসেই বাদ গেলনা। কোনটিতে বলা হলো পুরো কারখানার বর্ণনা দাও, কোনটিতে গাছ থেকে ম্যাচ বক্স এই পুরো রূপান্তরের কাহিনীটি একটি ডায়াগ্রামের মধ্য দিয়ে লেখো, কোনটিতে ৫ মিটার লম্বা ও ৫০ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি গাছের গুঁড়ি থেকে ১

মিলিমিটার পুরু কী আয়তনের ভিনিয়ার পাওয়া যাবে হিসেব কর, অথবা কোনটিতে কারখানার কী কী পদে মানুষ রয়েছে, তার কোনটির কী কী কাজ; এভাবে কোন ক্লাসেই কারখানা আমাদের পিছু ছাড়লোনা। ইংরেজি ক্লাসেও ছোট অনুচ্ছেদ লিখতে হলো একে নিয়ে।

এরকম নতুন নতুন কায়দায় ও উপকরণে শিক্ষার এ আয়োজনটি আমার আসলে খুবই পছন্দ হয়েছে—'প্রশ্নোত্তরিকা' আর 'যাদব' নির্ভর কসরতের চেয়ে এটি ঢের বেশি আনন্দের। একটি জায়গাতে শুধু আমার কাজটি কঠিন হলো, তা হচ্ছে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ক্লাসে যথেষ্ট ইংরেজি চর্চা করে আসা মিডল ইংলিশ স্কুলের সহপাঠীদের সঙ্গে ইংরেজিতে পাল্লা দেয়া। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ইংরেজির উপস্থিতি খুব ক্ষীণ ছিল। প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় তো এটি ছিলইনা। এপর্যন্ত আমার ইংরেজি জ্ঞানের অনেকটুকুই শুধু স্বশিক্ষা ভিত্তিক—সেখানে ভুল শুদ্ধ মিলিয়ে পড়ার (নীরবে) বেশ খানিকটা চর্চা থাকলেও লেখার চর্চা একেবারে ছিলনা, গ্রামারের তো নয়ই। এই দিকে আমাকে তৎপর হতে হলো। কিন্তু লাইব্রেরিগুলোর কল্যাণে ইংরেজির সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পূর্ব পরিচয় যথেষ্ট সহায়ক হলো বৈকি।

নানা চর্চার সুযোগ

এম ই স্কুলে প্রাইমারি বৃত্তি ও মাইনর বৃত্তি উভয়ের উপর গুরুত্ব দেয়া হতো, ফলাফলও বেশ ভাল হতো। কিন্তু মিউনিসিপ্যাল স্কুলের মত সারা বছর এর জন্য আদাজল খেয়ে লেগে থাকার ব্যাপারটি ছিল না। লেখাপড়া যা কিছু তা পুরো ক্লাসের জন্যই হতো, ক্লাসের পরীক্ষায় যারা ভাল করতো তাদের নিয়েই বৃত্তির দল তৈরি হতো। সেই দলকে কিছু সহায়তা দিতেন সেকান্দর স্যার। তবে সেকান্দর স্যারের সেটিই বড় পরিচয় নয়। দেখলাম সব স্কুলেই সবাইকে ছাড়িয়ে ছাত্রদের কাছে দু'একটি সু-উচ্চ ব্যক্তিত্ব বড় প্রভাব রাখে—যেমন দেখেছি লামার বাজার স্কুলে দিলা মিয়া মাস্টার, মিউনিসিপ্যাল স্কুলে গরম মাস্টার, এখানে এম ই স্কুলে তেমনি সেকান্দর স্যার। অথচ তিনি স্কুলে সব চেয়ে আধুনিক ব্যক্তিটি নন্—বরং কিছুটা সেকেলে, বয়সও সবার বেশি, তখন অবসরে যাবার কাছাকাছি চলে এসেছেন। বেশ কেতাদুরস্ত শিক্ষকদের ভীড়ে একমাত্র তাঁর বাংলা উচ্চারণই খুব প্রমিত নয়, বরং নোয়াখালীর আঞ্চলিক ভাষার টানে যথেষ্ট আকীর্ণ। নিজের এসব অসুবিধা যে এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে থাকতোনা সেটি বুঝতাম তাঁর অফুরন্ত প্রাণশক্তি ও ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হবার অদম্য আগ্রহ দেখে। ছাত্রদের সঙ্গে তিনিই গান, তিনিই নাচেন, তিনিই হাসেন, তিনিই উপদেশ দেন, তিনিই শাসন করেন। আমরা বনফুল দিয়ে স্কুল সাজাতাম তাঁর তত্ত্বাবধানে, খেলার মাঠে পিটি করতাম তাঁর হুইসেলের তালে তালে, স্কাউট ক্যাম্প ফায়ারে গান গেয়ে ধান কাটা নৃত্য করার সময় লক্ষ্য রাখতাম তিনি কীভাবে গাইছেন বা নাচছেন—

আয় রে ভাই ধান কাটিতে খসাখস খসাখস।
বাম হাতে ধরে ঝুঁটি, ডান হাতে ধরে কাঁচি
তার পরেতে মারি পোচ খসাখস খসাখস...

অন্য দিকে প্রত্যেকের রেজাল্টের উঠতি-পড়তির দিকে তাঁর কড়া নজর এবং যার যার সমস্যা সমাধানেও। সব কিছুর মধ্যে একটি নীতিকথা বা শিক্ষণীয় খুঁজে পাওয়া তাঁর অভ্যাস। যদিও এক্ষেত্রে সব সময় আমরা মনে মনে তাঁর সঙ্গে একমত হতামনা। যেমন স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ছাত্রদেরকে ফ্রি সিনেমা দেখাবার ব্যবস্থা হলে, সেকান্দর স্যারই আমাদেরকে নিয়ে গেলেন 'সিনেমা প্যালেসে' 'অ্যাডভেঞ্চার অব রবিন হুড' ছবিটি দেখতে। পরের দিন ক্লাসে তিনি যথারীতি এই সিনেমা থেকে শিক্ষণীয় বিষয় আলোচনা করলেন। রবিন হুডের বীরত্ব, প্রকৃত রাজা রিচার্ডকে তাঁর সিংহাসন ফিরে পেতে সহায়তা দেয়া, রক্তচোষা ধনীদের থেকে টাকা লুট করে গরীবদের মধ্যে তা বিতরণ করে দেয়া—এসবের প্রশংসা করেও তিনি বললেন এর মধ্যেই তিনি পরাক্রমশালী ইংরাজ সাম্রাজ্যের পতনের বীজ দেখতে পেয়েছিলেন। আর পতনের সে বীজটি হলো তাদের নারীপুরুষের বেলেল্লাপনা—যা রবিন হুডদের আচরণে সেই মধ্যযুগেও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠেছিল। এ সব বিষয়ে সেকান্দর স্যারের সঙ্গে তর্ক করা শোভনীয় নয় বলে ছাত্রদের নীরবতা যে ক্লাসের নীরব সম্মতি নয় সেটি বেশ বুঝতে পারছিলাম। অন্যান্য অনেক বিষয়ে আবার তাঁর মতামত ছিল অত্যন্ত আধুনিক—যেমন তিনি বলতেন লেখাপড়া সব সময় আনন্দের সঙ্গে করতে হবে, নেচে-গেয়ে করতে হবে।

এম ই স্কুলের সহপাঠীদের কারো কারো কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ছে তাদের ব্যতিক্রমী সক্ষমতার কারণে। যেমন লেখাপড়ায় কম মনোযোগী ক্লাসের সব চেয়ে ঢ্যাঙ্গা ছেলে বিনয়ভূষণ মালোর কথাই ধরা যাক। ক্লাসের যে ক'জন ছাত্র পেছনে বসে গরমের দিনে দড়ি টেনে টেনে টানা পাখাটি চালাবার জন্য স্বেচ্ছাসেবী হতো বিনয় থাকতো তাদের অগ্রণী। এরকম টানা পাখার কথা আগে সাহেব-সুবাদের প্রসঙ্গে শুনেছিলাম—বিদ্যুৎবিহীন অঞ্চলে পাঙখাওয়ালারা এটি টেনে তাদেরকে বাতাস করতো। আমাদের ক্লাসেই এই পাখা প্রথম দেখলাম—ফ্রেমের মধ্যে লাগিয়ে কাঁথার মত কাপড়ের প্রায় কামরা-জোড়া প্রশস্ত এই ঝালরটি ঝোলানো ছিল, সঙ্গে লাগানো দড়ি টেনে একে সামনে-পেছনে দোলানো যেত। বিনয়ের প্রতিভা ছিল যাদুবিদ্যায়, স্কুলের সব অনুষ্ঠানে সে ম্যাজিশিয়ান হিসেবে যাদু দেখাত। যেমন একটি দুই মুখ খোলা চোঙের ভেতর থেকে সে প্রায় অফুরন্ত ভাবে রঙিন কাগজের ফিতা বের করে আনতে পারতো। স্কুলের কোন অনুষ্ঠানে যখন সে যাদু দেখাত তখন আলখাল্লা, পাগড়ি সব পরতো ঠিক যাদুকর পি সি সরকারের মত। যাদুবিদ্যা এবং এসব কায়দা কানুন সে শিখেছিল তার বড় ভাইয়ের কাছে—যিনি আলাদীন নামে চট্টগ্রামে ও তার

বাইরে যাদুকর হিসেবে বিখ্যাত ছিলেন। বিনয়কেও আমাদের কাছে কম কিছু মনে হতো না।

ক্লাসে আমরা অনেকেই গান গাইতাম; কিন্তু সত্যিকার শিল্পী ছিল দু'জন—নাসির আর জহুর। নাসিরকে আমার মনে হতো হিন্দি গানের একজন ছোটখাট কুন্দলাল সায়গল। রেডিয়োতে বিবিধ ভারতীতে বা মাইকে কলের গান থেকে যে রকম গলার হিন্দি গান শুনি অনেকটা সেই পর্যায়ের। সে যখন গাইত 'অ্যায়স্যা দিন আয়েগা, যব মাট্টি মে সব মিল যায়েগা...তখন আমরা ব্যাকুল হয়ে পড়তাম। জহুরকে আমরা ডাকতাম 'পণ্ডিত' বলে—তার কণ্ঠে গ্রাম বাংলার মথিত করা সুরগুলো অপূর্ব শোনাত। তার গলার টানে 'আমি কোন কূল হতে কোন কূলে যাব, কাহারে শুধাই—রে-, নদীর কূল নাই কিনার নাই—রে' আমাদেরকে অকূল মাঝ দরিয়ায় নিয়ে যেতে পারতো মুহূর্তের মধ্যে। অন্য এক বন্ধু আরেফিনকে আমরা ডাকতাম 'আলপিন', কারণ তার সূক্ষ্ম রসিকতার হুল আলপিনের মতোই ফুটা যেত। অতি ছোটখাট দেখতে এই ছেলেটি ছিল আমাদের নিয়মিত কৌতুক মাস্টার।

আমাদের ক্লাসে ও নিচের ক্লাসগুলোতে কেউ কেউ ছিল যারা নিজেরা বেশ বুদ্ধিদীপ্ত ছিল কিন্তু একই সঙ্গে প্রত্যেকের বাবাও ছিল বেশ বিখ্যাত। এর আগে যখন মিউনিসিপ্যাল স্কুল থেকে আমি প্রাইমারি বৃত্তি দিয়ে প্রথম হয়েছিলাম তাতে জেলায় দ্বিতীয় হয়েছিল এম ই স্কুলেরই মোমেন (বর্তমানে খ্যাতনামা কার্ডিওলজিষ্ট)। ওর ইংরেজি ভিত্তি কিন্তু খুব মজবুত তাই ওখানে ক্লাসে আমি তার কাছে দ্বিতীয় হয়ে গেলাম। শুধু তাই নয় পরে সব পরীক্ষায় ওখানে ও কলেজিয়েট স্কুলে কখনো সে প্রথম, আবার কখনো আমি প্রথম—এভাবে চলেছে দশম শ্রেণী পর্যন্ত। মোমেন ছিল চট্টগ্রাম কলেজের নামকরা ইংরেজির অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদের ছেলে, (পরে আমাদের সময়ে ওই কলেজের কিংবদন্তি তুল্য অধ্যক্ষ) ওর ছোট ভাই মতিন পড়তো পঞ্চম শ্রেণীতে। ওইসময় এম ই স্কুলে ইয়াফেস ওসমান পড়তো (পরে স্থপতি, বিজ্ঞান মন্ত্রী) পঞ্চম শ্রেণীতে—সাহিত্যিক শওকত ওসমানের ছেলে। তৃতীয় শ্রেণীতে পড়তো মাহমুদ—কবি ওহিদুল আলমের ছেলে (ড. মাহমুদুল আলম, পরে অর্থনীতিবিদ ও অধ্যাপক)। কবি ওহিদুল আলমকে আমি কলেজিয়েট স্কুলে আমাদের ইংরেজি শিক্ষক হিসেবে পরে পেয়েছি। এম ই স্কুলে আমার সহপাঠী ও সমসাময়িক ওই ছেলেরা ছিল খুবই সপ্রতিভ এবং সমবয়সী-বয়োকনিষ্ঠ নির্বিশেষে আপন জন। স্কুলের নানা অনুষ্ঠানে তাদের কারো গান, কারো আবৃত্তি, কারো ছড়া পাঠ—এসব এমন ভাবে মনে গেঁথে আছে, যেন মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। মনে পড়ে স্কুলের কোন অনুষ্ঠানে বাইরের কোন প্রধান অতিথি থাকলে আমাদের সহপাঠী আশরাফের কাজ ছিল একটি ফুলের মালা হাতে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেয়ে গেয়ে মালা পরানো—'হে অতিথি, আজিকে তিথি, বনকুসুমে গেঁথেছি মালা...'। এই বনকুসুম আমরাই দেব পাহাড় থেকে খুঁজে আনতাম।

বিশ্বযাত্রীর পত্র

আমি যে বছর (১৯৫৫) দেব পাহাড়ের ঢালে এম ই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র ইউনূস ভাই তখন ওই পাহাড়ের সামনের চট্টগ্রাম কলেজে সদ্য ভর্তি হয়েছেন। তিনি ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ইস্ট পাকিস্তান সেকেণ্ডারি এডুকেশন বোর্ড, ঢাকার মধ্যে মেধা তালিকায় ত্রয়োদশ স্থানে থাকায় আমরা সবাই খুবই উল্লসিত। আরো উল্লসিত হলাম যখন জানলাম শিগ্‌গীর তিনি বিশ্ব ভ্রমণে যাচ্ছেন। কয়েকটি দেশ ভ্রমণ করে পাকিস্তান স্কাউট প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে অংশ নেবেন কানাডার নায়াগ্রা অন কি লেইক নামক স্থানে অষ্টম বিশ্ব জাম্বুরীতে (আগস্ট ১৮-২৮, ১৯৫৫)। সেখান থেকে প্রথমে সমুদ্র ভ্রমণ করে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে তারপর নিজেদের কেনা মাইক্রোবাস নিজেরা চালিয়ে তাঁরা স্থল পথে পুরো ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের উপর দিয়ে দেশে ফিরবেন। এমন ভ্রমণের কথা শুধু বইয়েই পড়েছি দারুণ অ্যাডভেঞ্চার গল্প হিসেবে। এখন ইউনূস ভাই সত্যি সত্যি এমনি একটি ভ্রমণ করবেন মাসের পর মাস ধরে—এটি ভাবতেই আনন্দে আমার পেট ফেটে যচ্ছিল। তাই কলেজে ভর্তি হয়েও শুরুর দিকে তাঁর ক্লাস করা হলোনা, বরং চলে গেলেন করাচিতে। সেখানে পাকিস্তানের নানা অঞ্চল থেকে আসা আরো অন্যান্য স্কাউটের সঙ্গে ট্রেনিং। তারপর সেই বিশ্বভ্রমণে বের হয়ে পড়া।

ইউনূস ভাইয়ের বিশ্ব ভ্রমণের পুরো সময়টা আমাদের কাছে এসেছে কিছু দিন পর পরই চিঠির আকারে। ওই চিঠির মাধ্যমেই আমি আমার ভূগোল জ্ঞান প্রয়োগ করে তাঁকে অনুসরণ করে গেছি। ঘন ঘন যেটি আসতো তা হলো পিকচার পোস্ট কার্ড—অল্প কিছু কথা লেখা, তবে যতটুকু জায়গা আছে তা সবটুকু চমকপ্রদ বর্ণনায় ঠাসা। ছবিটাও বলতো অনেক কথা। তবে তাঁর পূর্ণাঙ্গ চিঠিগুলো আসতো অ্যারোগ্রামের মাধ্যমে। অ্যারোগ্রাম জিনিসটি আজকাল বোধ হয় কেউ চিনবেনা। সেকালে চিঠি সারফেস মেল (ট্রেনে বা জাহাজে যেত) ও এয়ারমেল এই দু'রকমই হতো—বিদেশেও চিঠি মাত্রই বিমানে যাবে এমন কথা ছিলনা, যদি বিমানে পাঠাতে চাই তা হলে 'বাই এয়ারমেইল' কথাটি লিখে দিয়ে সে ভাবে বেশি ডাক মাশুল দিতে হতো। ডাক মাশুল কিছু কম লাগতো যদি চিঠিটি অ্যারোগ্রামে ওপর লেখা হয়। এটি একটি পাতলা হালকা নীল রঙের কাগজ যার উপর চিঠিটি লিখে এতে ছাপানো দাগ অনুসরণ করে ভাঁজ করে ফেললে এবং কিনারায় আঠা লাগানো কিছু জায়গা মুড়ে সেঁটে দিলে নিজেই একটি খামের আকার ধারণ করে। এর উপর ডাকটিকেটের মত মাশুল দেয়ার সিল, অ্যারোগ্রামের প্রতীক, প্রাপকের ও প্রেরকের ঠিকানা লেখার জায়গা—সবই ছাপানো থাকে। ঠিকানা লিখে পোস্ট করে দিলেই হলো। পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে অন্য যে কোন জায়গায় পাঠাতে একই সাশ্রয়ী খরচ। বাড়তি সুবিধা হলো চিঠি লেখার জন্য আলাদা কাগজ লাগছেনা, অসুবিধা হলো চিঠি ওই

অ্যারোগ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ আয়তনে লিখতে হয়, এর সঙ্গে অন্য কিছু অন্তর্ভুক্ত করা যায়না। ইউনূস ভাইয়ের অ্যারোগ্রামগুলো লেখা হতো প্রধানত আব্বা অথবা বড়দার কাছে। কিন্তু আমরা সবাই কাড়াকাড়ি করে পড়তাম এগুলো। পিকচার পোস্ট কার্ডগুলো কখনো কখনো আমাদের নানা জনকেও লেখা হতো। ইউনূস ভাইয়ের অভিজ্ঞতা ও বর্ণনাগুলো এমন দুর্দান্ত হতো যে এগুলো পড়ে মনে হতো নিজেই বিশ্ব ভ্রমণের মজা পাচ্ছি। পরে রবীন্দ্রনাথের 'জাপান যাত্রী' বইটিতে দেখেছি জাহাজে করে নানা বন্দর ছুয়ে দিতে দিতে জাপানের দিকে যাওয়ার সময় কবির মনে হয়েছে এ যেন ম্যাপে আঙ্গুল বুলিয়ে দেশ দেখার মত বন্দরে বন্দরে জাহাজ বুলিয়ে দেখা। আমি যেন চিঠি পড়ে পড়ে একই ভাবে এক এক করে দেশগুলো দেখছিলাম—এমনই উত্তেজনা-আনন্দে মগ্ন ছিলাম তাঁর ভ্রমণ নিয়ে ওই কটি মাস।

যাওয়ার পথে হল্যান্ডে বেশ কয়েকদিন ছিলেন; সেখান থেকে ঘন ঘন বেশ কিছু চমৎকার পিকচার কার্ডে ওই দেশটিকে যেন পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিলেন—কার্ডের ছবি ছিল ফুলের মার্কেট, বায়ুকল, কাঠের জুতা; ও সব নিয়েই তো হল্যান্ড! অ্যারোগ্রামে এসেছে আরো বিস্তারিত বর্ণনা। যখন পথে ছিলেন তখন বিমানের দেয়া পিকচার কার্ডে সংক্ষেপে লিখে হোস্টেসকে দিয়ে দিয়েছেন পোস্ট করে দিতে। এভাবে নিউয়র্ক হয়ে কানাডা যাবার পথে এসেছে নিউয়র্কের মানহাট্টান দ্বীপের সেই গগনচুম্বী দালানগুলোর ছবি। এরপর কানাডায় জাম্বুরীর শুরু; নায়াগ্রা জলপ্রপাতের নানা রকম বর্ণনা, ছবি। জাম্বুরী মাঠে সারা বিশ্বের যে একটি ছোট সংস্করণ সৃষ্টি হয়েছিল তার বর্ণনাও পেয়েছি। তারপর জাম্বুরী শেষে—কানাডা ও আমেরিকা ভ্রমণের নানা কাহিনী। মজার ব্যাপার হলো আমরা শুধু চিঠির পাঠক ছিলামনা, চিঠির নানা অংশকে ছোটদের দল নানা কৌতুক-খেলায়ও পরিণত করেছি ইতোমধ্যেই। যেমন আমস্টার্ডামের রাস্তার দৃশ্যে কোকা কোলার বিজ্ঞাপনে লেখা 'ট্রিংক কোকা কোলা, ইস কাল্ট' (ড্রিংক কোকা কোলা, আইস কোল্ড) বার বার আওড়িয়ে একটি নতুন ভাষা ডাচ্ বলার আনন্দ পেতাম। ইউনূস ভাই লিখেছিলেন জাম্বুরীতে তাঁদের জিন্নাহ টুপিগুলোর নাকি দারুণ চাহিদা ছিল; অনেক দামি জিনিসের বিনিময়ে সেগুলো বদল হয়ে গিয়েছিলো। এর কারণ বুঝতে পেরেছিলেন পরে যখন আমেরিকায় রাস্তায় বাচ্চারা জিন্না টুপি পরিহিত তাঁদেরকে 'ডেভী ক্রকে ডেভী ক্রকে' বলতে বলতে অনুসরণ করতো। ডেভী ক্রকে ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর রেড ইন্ডিয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নতুন নতুন জায়গা দখলের সেই ফ্রন্টিয়ার দিনগুলোর এক কিংবদন্তির নায়ক। ভবঘুরে, বেপরোয়া চরিত্র আর তার মাথায় খরগোসের মত ছোট পশুর গোটা চামড়ার টুপির জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন, টুপিতে চামড়াটি প্রায় অবিকল থাকতো বলে পেছনে লেজের দিকের চামড়াটিও ঝুলতো। আমরা ছোট ভাইদেরকে জিন্নাহ টুপি পরিয়ে 'ডেভী ক্রকে ডেভী ক্রকে' বলে খেপানো শুরু করলাম।

ইউনূস ভাইয়েরা আমেরিকা থেকে ইংল্যান্ডে এসেছিলেন সামুদ্রিক জাহাজ 'এম এস ইটালিয়ায়' আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে। লন্ডনে পৌঁছে এক সঙ্গে অনেকগুলো চিঠি পোস্ট করেছিলেন যেগুলো আমরাও প্রায় এক সঙ্গে পেলাম। সপ্তাহাধিক কাল এম এস ইটালিয়ায় কাটানোর অভিজ্ঞতার কথা ছিল সেখানে। আসলে দূর পাল্লার ভ্রমণের সেটি ছিল একটি যুগের অবসানের কাল, সাধারণ যাতায়াতে সামুদ্রিক জাহাজের কাল ফুরিয়ে এসেছিল, তখনো বিমানের সঙ্গে সঙ্গে এই জাহাজি সার্ভিসগুলো কিছু কিছু চালু ছিল। এম এস ইটালিয়ায় ওই দিনগুলোর বর্ণনায় তারই স্বাদ পেলাম। জাহাজের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে বিশেষ দাওয়াত খাওয়া, ডেকের মধ্যে ঘোরাফেরা করে সমুদ্র দেখা, উড়ন্ত মাছের ঝাঁকের সাক্ষাত; রাতে চিত্ত বিনোদনের ব্যবস্থা, মুভি দেখা, আবার বিচিত্রানুষ্ঠানে পাকিস্তানি স্কাউটদের গান গাওয়া, নাচা; সহযাত্রীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠা, জাহাজের লগবুক থেকে তার অগ্রগতির রিপোর্ট পাওয়া—ইত্যাদি কত কিছু। জার্মানিতে ফোক্স ভাগন কোম্পানির কারখানা থেকে সরাসরি তিনটি মাইক্রোবাস কিনে তাঁরা যখন স্থল পথে ইউরোপ পাড়ি দেয়া শুরু করলেন তখনই চিঠিগুলো রীতিমত অ্যাডভেঞ্চারে রূপ পেলো। কারণ দুর্দান্ত সব ঘটনা ঘটে চলেছিল। অস্ট্রিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নির্জন পথে রাত্রে গাড়ি চালাতে গিয়ে বিকল গাড়িকে ট্রাকের পেছনে বেঁধে দেয়া, যুগোশ্লাভিয়ার খুবই দরিদ্র চেহারার শহর ও গ্রামের ভেতরে থাকার কষ্ট, খাবারের কষ্ট—মার্শাল টিটোর সেই প্রথম আমলের কম্যুনিস্ট শাসনে কট্টর আইন-কানুনের মধ্যে বেহাল অবস্থা। এরই মধ্যে দুর্ঘটনায় মাইক্রোবাস উল্টে কয়েকটি ছেলের আহত হওয়া। হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে গিয়ে বেশি দিন কাটাতে হওয়াতে ভিসা সমস্যা, চেক ভাঙ্গাতে না পেরে অর্থ সংকট, খাবারের অভাবে ক্ষেত থেকে ভুট্টা চুরি করে খেয়ে ক্ষিধে মেটানো, একটি গাড়ি দুর্ঘটনায় সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাওয়াতে তিন গাড়ির মানুষকে দুই গাড়িতে চাপাচাপি করে বসে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দেয়া, তাঁবু খাটানোর জন্য নিরাপদ জায়গার অভাব—এমনি সব পরিস্থিতিতে লেখা চিঠি, যার কোন কোনটি গাড়ির হেড লাইটের আলোতে তাঁবুর সামনে বসে লেখা। পরে অবশ্য গ্রিসে ও তুরস্কে অনেক আনন্দের মধ্যে ও দারুণ সব দর্শনীয় দৃশ্য দেখে ও অনেক আদরের আতিথ্য লাভ করে তার ক্ষতিপূরণও হয়েছে। ভাগ্যিস দুঃখের দিনের চিঠিগুলো পরের ওই সুখের সময়েই পোস্ট করা হয়েছে, নইলে আমাদের দুশ্চিন্তার সীমা থাকতোনা।

চিঠি লেখা ও পোস্ট করার মধ্যে যেমন সময়ের ব্যবধান থাকতো, তেমনি আমাদের দিক থেকে তাঁর কাছে উত্তর দেয়াটিও বেশ ঘুর-প্যাঁচে করতে হতো। লিখতে হতো এমন কোন দেশে পাকিস্তানি দূতাবাসের ঠিকানায় যেখানে তাঁরা বেশ কিছু দিন পরে এসে পৌছাবেন—এভাবে লেখা হয়েছে লন্ডনে, আঙ্কারায়, দামেস্কে বা বাগদাদে পাকিস্তানি দূতাবাসে। তাঁরা যখন যেখানে পৌছে দূতাবাসে

গিয়েছেন তখন চিঠি তাঁর হাতে দিয়ে দেয়া হয়েছে। চিঠিগুলোর কল্যাণে আমাদের কথাবার্তার মধ্যে মজা করে কিছু বিদেশী শব্দ ঢুকে গেল, কারণ ইউনূস ভাই ইচ্ছে করেই যেখানে গিয়েছেন, সেখানকার দুই একটি বুলি আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেমন গ্রিক ভাষায় 'ধন্যবাদ হলো 'এফখারিস্তো'। হিন্দি ছবি আওয়ারার সেই বিখ্যাত গান 'আওয়ারা হুঁ' গানটি তখন তুরস্কে তখন সবার মুখে মুখে, বিশেষ করে ভারতীয় চেহারার ছেলেদের দেখে তো সেটি গাওয়ার আগ্রহ বেড়ে যেতো—কিন্তু তুর্কী ভাষায় 'আওয়ারা হুঁ', হয়ে গেছে একই সুরে 'আবারাইয়্যাম'। দামেস্কের বড় বাজারে কিছু কিনতে ভীষণ দামাদামি করতে হয়, দামে রাজি না হলে দোকানী মাথা ওপর-নিচ দুলিয়ে বলে (আমাদের জন্য যা রাজি হবার ভঙ্গি) 'মাফি, লা, ওয়াহেদ কালাম' (মাফ করবেন, না, আমার এক কথা)।

ইউনূস ভাইয়েরা মরুভূমির ধূধূ বালির উপর দিয়ে গাড়িতে সিরিয়া থেকে ইরাক গিয়েছিলেন। বড় পীর সাহেবের মাজার, নজফে হযরত আলীর মসজিদ, কারবালা—এসব জায়গা দেখে ইউনূস ভাই যে সব চিঠি লিখেছেন সেগুলোই ছিল আব্বার সব চেয়ে প্রিয়। যাকেই পেয়েছেন তিনি সে চিঠিগুলো পড়ে শুনিয়েছেন। এ ধরনের কোন কোন দ্রষ্টব্যের কথা আব্বা নিজেই ইউনূস ভাইকে দেখতে স্মরণ করিয়ে দিতেন। করাচি পৌঁছার পর ইউনূস ভাই সরাসরি বিমানে ঢাকায় না এসে বোম্বাই হয়ে ট্রেনে কলকাতায় আসতে চাইলে আব্বা সম্মতি তো দিলেনই বরং বলে দিলেন বোম্বাই ও কলকাতায় কী কী দেখতে হবে, এসব জায়গা তাঁর পরিচিত ছিল।

অবশেষে আমাদের বিশ্ব পর্যটক ঢাকা থেকে ট্রেনে চট্টগ্রাম ফিরে এলেন। তারপর থেকে বহুদিন গল্পের সাগরে ভেসেছি—চিঠিতে যে সব কথা আভাসে ইঙ্গিতে ছিল, এখন তা সবিস্তারে। এক দিকে এসব গল্প, অন্যদিকে ইউনূস ভাইয়ের নিয়ে আসা নানা টুকিটাকি আমাদের ভাবসাবই বদলে দিল; আমাদের পরিবেশে এমনকি পোষাকে দূর দূরান্তের রূপ-গন্ধ চলে এল। কোন কোন খুব ছোট খাট জিনিসেও দূর জগতের কোন রোমান্টিক অনুষঙ্গ পেয়ে চলে যাচ্ছিলাম সম্পূর্ণ ভিন জগতে। যেমন মার্কিন স্কাউটদের ন্যাশনাল স্কার্ফের (গলার স্কাউট রুমাল) সঙ্গে জাতীয় প্রতীক ঈগলের মূর্তিতে স্কার্ফ বাঁধার ওয়াগল্—প্লাষ্টিকের অথচ সুন্দর চকচকে ধাতব তামাটে বর্ণের; এতেই এমন মায়া ছিল যে মুহূর্তে দেশের সীমানা পার করে অন্য দেশের অজানা আবহের অদ্ভুত একটি শিহরণ দিতো। এমনি আর এক জগতে নিয়ে গেল কানাডা থেকে আনা রাবারের ছোট ছোট রেড ইণ্ডিয়ানদের মূর্তি—কুঠার হাতে নাচের বিভিন্ন ভঙ্গিতে এক একটি। সবগুলোকে মাঝে মাঝে চক্রাকারে সাজাচ্ছি, কখনো এলামেলো ভাবে—মনে মনে কল্পনা করছি আশপাশের জঙ্গল, বৃত্তের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে রেড ইণ্ডিয়ানদের

যুদ্ধ নৃত্য। হল্যান্ড থেকে এসেছিলো সেখানকার ঐতিহ্যবাহী কাঠের জুতা, পরার কায়দা ছিলনা—দেয়ালে ঝোলানো হয়েছিল। আর ছিল বায়ুকল যার ডানাগুলোকে আমরা আঙ্গুল দিয়ে ঘোরাতে পারতাম। যে গাড়িগুলো দিয়ে তাঁরা মহাদেশ পাড়ি দিয়েছিলেন তারই একটি ছোট্ট মডেল উপহার পেয়েছিলেন ফোক্স ভাগন কোম্পানি থেকে। ওটির চাকা, বডি সব হুবহু ওই মাইক্রোবাস—চমৎকার চালানো যেত। যখনই এটি দেখতাম তাঁদের সেই দুস্তর পারাবার পাড়ি দেয়ার গল্প মনে আসতো। আমার পরার জন্য এসেছিলো যে ব্লু জীন্সের প্যান্ট, আজকালকার ব্লু জীন্স থেকে তার পুরো মর্ম বোঝা যাবেনা—সে ছিল রীতিমত 'কাউ বয় প্যান্ট' (তখন ব্লু জীন্সকে বলা হতো তাই)। পুরু কাপড়ের প্যান্ট তাতে মোটা সেলাইগুলো তো তাকিয়ে রয়েছেই, সে সঙ্গে জোড়ার জায়গাগুলোতে পেতলের সুন্দর রিভেটের মতো মারা; সামনের বেশ বড় সড় তামাটে রঙের সুন্দর ধাতব বক্‌লেস—একজোড়া কাউবয় বুটের আদলে; পেছনের পকেটের উপর সেলাই ও ধাতব রিভেট আরো স্পষ্ট, তার ঠিক উপরে চামড়ার তৈরি কোম্পানির বড় লেবেল স্পষ্ট সেলাইয়ের ফোঁড়ে ফোঁড়ে একেবারে আষ্টেপৃষ্ঠে লাগানো। সব মিলে দারুণ স্মার্ট ব্যাপারস্যাপার। এটি পরের ক'বছর আমার খুব গর্বের পরিধেয় ছিল—দু'একটি ছোটখাট কাহিনীও সৃষ্টি করেছে যা পরে বলা যাবে।

ইউনূস ভাই কয়েকটি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রও এনেছিলেন—যেমন একটি হলো বালি ঘড়ি—একটি কাচ পাত্র থেকে আরেকটিতে সব বালি পড়ে গিয়ে তিন মিনিট সময় মাপতো আর একটি ঘণ্টা বাজাতো। আরেকটি ছিল অদ্ভুত একটি আর্দ্রতা মাপার যন্ত্র। গোল মুদ্রার আকার ও আকৃতির একটি তুলতুলে প্যাড একটি ছোট বোর্ডে লাগানো ছিল। খুব শুষ্ক দিনে এটি থাকতো গোলাপী রঙের। বাতাসে আর্দ্রতা যত বাড়তো ততই এটির রঙ নীলাভ হতে থাকতো এবং ঘামে ছপ ছপ হাঁসফাঁস করা দিনগুলোতে যখন বাতাসের আর্দ্রতা চরমে তখন এটি হতো একেবারেই নীল, এমনকি খুব ক্ষুদ্র ফোটায় পানিও দেখা যেত এর আশপাশে। ওই বোর্ডের উপর একটি ছোট্ট লাল রঙের থার্মোমিটারও লাগানো ছিল, ঘরের উত্তাপ মাপার জন্য। সে সময় নেহাত কৌতূহলের জিনিস হিসেবে থাকলেও, বছর দু'য়েক পর এগুলো আমার নিজের আবহাওয়া কেন্দ্র, নিজের ল্যাবোরেটরি তৈরির পেছনে বড় প্রেরণা হয়ে দাঁড়িয়েছিল—সে কথাও হবে যথাস্থানে।

কানাডায় বিশ্ব জাম্বুরী সংগীতের শেষ লাইনটি ছিল—'নিউ হরাইজন্স আর কলিং ইউ'। এর একটি স্টিকারও ছিল যেখানে বয়স্কাউট বেশে একটি ছেলে দুই হাতকে চোঙা ফোকার মতো মুখের সামনে ধরে এই কথাটি বলছে। ইউনূস ভাই কিছুটা বড় করে এই ছবিটাই একটি ছোট পোস্টারের মত করে আঁকলেন ও বাসার দুই নম্বরে আমাদের পড়ার ঘরে লাগিয়ে দিলেন। সেই থেকে বহুদিন প্রতিদিন ওই আহবান দেখেছি, উপলব্ধিও করেছি—'নিউ হরাইজন্স আর কলিং ইউ'; নব দিগন্ত ডাকিছে তোমায়।

চট্টগ্রাম কলেজে নির্বাচন দেখা

এম ই স্কুলে পড়ার সময় সামনের রাস্তাটি পার হয়ে এটা সেটা অনুষ্ঠানাদিতে মাঝে মাঝে চট্টগ্রাম কলেজে চলে যেতাম। তবে কলেজ সংসদ নির্বাচনের মত জমজমাট ঘটনা ভোলার নয়—প্রায় সারাদিন সেদিন ওখানে কাটিয়েছি। দুটি দলের মধ্যে নির্বাচন—একটির নাম 'স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'—সংক্ষেপে ডাকা হতো 'ওয়েলফেয়ার'; আর অন্য দলটির নাম 'ইউনাইটেড স্টুডেন্টস প্রগ্রেসিভ পার্টি', সংক্ষেপে 'ইউ এস পি পি'। ইউ এস পি পি সম্পর্কে আমার বেশ কিছু জানা ছিল কারণ ইউনূস ভাই তখন এই বামপন্থী ছাত্র দলটির সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। এর মুখপত্র 'দু'পাতা' নামক কাগজটি সম্পাদনাও করেন তিনি। এ সবের কাজ হতো আমাদের বাসায়। ইউ এস পি পি কী ভাবে চলবে এসব নিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে ইউনূস ভাইয়ের নানা আলাপ প্রায়ই শোনতাম। যেমন সে সময় তাঁর নতুন ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে শাকুর ভাইকে প্রথম দেখেছিলাম (পরে সচিব ও বিখ্যাত কথাশিল্পী আবদুস শাকুর)। তখন শাকুর ভাই ছিলেন কম্যুনিস্ট মতাদর্শে পুরোপুরি দীক্ষিত, যদিও তিনি মাদ্রাসার লেখাপড়ার সর্বোচ্চ কৃতিত্ব মতাজুল মোহাদ্দেসীন উপাধি লাভ করে তখন চট্টগ্রাম কলেজে বিজ্ঞানের ইন্টারমিডিয়েটের (বর্তমানের এইচ এস সি) ছাত্র। ইউনূস ভাই দলকে সরাসরি কম্যুনিস্ট পার্টির জাতীয় রাজনীতির উপর নির্ভরশীল করতে দিতে নারাজ ছিলেন, যেটি এতদিন ধরে হয়ে আসছিলো। এই বিতর্কে আরো নিশ্চয়ই অনেকে জড়িত ছিলেন, কিন্তু আমাদের পড়ার ঘরে আমি শোনতাম ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে শাকুর ভাইয়ের বিতর্ক, এ সম্পর্কে আমার তখনকার জ্ঞান এইটুকুতেই সীমাবদ্ধ ছিল। তাদের কথা থেকে এও বুঝতাম যে ইউনূস ভাইয়ের মতামতটি ইউ এস পি পি'তে সাধারণ কমিটি প্রবল ভাবে সমর্থন করছে, তাই দলের কমিটি থেকে কয়েকজন বয়স্ক প্রভাবশালী পুরোনো রাজনীতিবিদ বাদ পড়তে যাচ্ছিলেন। এটি যেন না করা হয় সেই অনুরোধ নিয়ে চট্টগ্রামের অত্যন্ত বিশিষ্ট বামপন্থী যুবনেতা একদিন বাসায় এসেছিলেন ইউনূস ভাইয়ে কাছে—তিনি হলেন আবদুল্লাহ আল হারুন (পরে বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা; বি এন পি নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী আবদুল্লাহ আল নোমানের বড় ভাই)। আমার সামনেই তিনি ইউনূস ভাইকে অনেক বুঝিয়েছিলেন কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে ইউএসপিপির সরাসরি সম্পর্ক এভাবে দুর্বল না করতে। কিন্তু বিষয়টি শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ীই সুরাহা হয়েছিল, ইউনূস ভাইয়ের উদ্যোগে। এই ঘটনাও প্রমাণ করে যে ইউ এস পি পি চট্টগ্রামের সাধারণ রাজনীতিতেও যথেষ্ট গুরুত্ব রাখতো। এও মনে রাখতে হবে যে এমন একটি ছাত্রদলের নীতি নির্ধারণের কুশীলব ছিলেন ইউনূস ভাইয়ের মত ইন্টারমেডিয়েট (তখনকার এইচএসসি) শ্রেণীর ছাত্ররা। কলেজের ছাত্ররা ছাড়াও *দু'পাতার* অনেক মুগ্ধ পাঠক ছিল। যেমন এ পত্রিকায় শাকুর ভাই 'ছারপোকা' ছদ্মনামে যে অনবদ্য হুল ফুটানো কলাম লিখতেন তা আমার মত অপ্রাপ্ত বয়স্ক পাঠকের কাছেও অনবদ্য মনে হতো।

নির্বাচনের প্রস্তুতির যে তোড়াজোড়ের কথা বাসা থেকে শুনেছি তাতে এত বড় ঘটনা মিস্ করার কোন ইচ্ছে আমার ছিলনা। সকাল থেকেই, কলেজের গেটের থেকে একটু ভেতরে এগিয়ে তৈরি করা ইউ এস পি পি'র ক্যাম্পে বসে থেকে খুবই আগ্রহের সঙ্গে সব কিছু লক্ষ্য করছিলাম। অন্য দিকে ওয়েলফেয়ারের ক্যাম্প ছিল আর একটু ভেতরে দিকে নিম গাছতলা নামে পরিচিত জায়গায়। দু'একবার ওখান থেকেও হেঁটে এসেছি। দু'জায়গাতেই খুব উঁচু করে গাড়া বাঁশ থেকে ঝোলানো প্ল্যাকার্ডে প্রার্থীদের নাম বড় বড় করে লেখা ছিল।

আর ছিল প্রচুর পোস্টার। সুন্দর হস্তাক্ষরে পোস্টার পেপারের উপর লেখা এই সব পোস্টার। সে সময় ছাত্র রাজনীতিতে ছাপানো পোস্টারের স্থান ছিলনা। একই রকম অনেকগুলো পোস্টার করা হয়েছে স্টেনসিল পদ্ধতিতে। মোটা বোর্ডের কাগজে পোস্টারের বক্তব্য বা গ্রাফিক অংশের আদলে ছিদ্র কাটা হতো। এরপর ওই কাটা অংশের ভেতর দিয়ে কাগজে রঙ লাগিয়ে লাগিয়ে অনেক পোস্টার করা যেত। ইউনূস ভাই এ সব কাজে খুব পারদর্শী ছিলেন। ইউ এস পি পি'র প্রার্থীদের মধ্যে ইউনূস ভাই ছিলেন, আমার পরিচিত তাঁর দু'একজন বন্ধুও ছিলেন। মাইকে একটানা বক্তৃতা চলছিল। কয়েক জন দীর্ঘক্ষণ বক্তৃতা দিয়ে চলেছিলেন পালা করে নিজেদের মধ্যে। ইউ এস পি পি'র বক্তাদের মূল বক্তব্য ছিল ওয়েলফেয়ার মুসলিম লীগের দালাল—মৃত প্রায় লীগশাহীর পতনকে ঠেকিয়ে রাখাই তাদের চেষ্টা। ওয়েলফেয়ারের কথা ছিল সেটি মোটেই নয়, তারা কলেজকে বর্ণচোরা কম্যুনিস্টদের রাজনীতির লীলাক্ষেত্র বানাতে চান্না, বরং সংসদ যেন ছাত্রদের নিজেদের সমস্যা নিয়ে কাজ করে, পাকিস্তানের নিজস্ব কৃষ্টি 'তাহজীব তমুদ্দুনের' চর্চা করে সেটিই দেখতে চায়। ইউ এস পি পি ক্যাম্পে বেলাল ভাইয়ের বক্তৃতা, শ্লোগান, গান ইত্যাদি খুব চলছিল। কলেজিয়েট স্কুলে ইউনূস ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হিসেবে বেলাল ভাই এক্কেবারে ছোট্ট বয়স থেকেই আমার খুব আপনজন। তখন থেকেই দেখছি তিনি স্বভাব কবি—মুখে মুখে ছড়া, কবিতা রচনা করতে পারেন, বিশেষ করে কবির গানের ছন্দ অনুকরণ করে প্যারোডি রচনা করতে তাঁর তুলনা নেই। ইউ এস পি পি'র নির্বাচনী ক্যাম্পে সব চেয়ে জমিয়ে গান গাইছিলেন শাকুর ভাই আর বেলাল ভাই—তাঁদেরই প্যারোডি করা গান। উত্তম-সুচিত্রা অভিনীত 'শাপমোচন' ছবির গান 'শোন বন্ধু শোন প্রাণহীন এই শহরের ইতিকথা' গানটি তখন সবার মুখে মুখে। নির্বাচন উপলক্ষে সে গান হয়ে গেল 'শোন বন্ধু শোন লাজহীন এই ওয়েলফেয়ারের কথা; ক্ষমতার লোভে, নিদারুণ ক্ষোভে, তাদের মর্ম ব্যথা।' অথবা হেমন্ত মুখোপধ্যায়ের বিখ্যাত আধুনিক সংগীত 'ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস আজিকে হলো সাথীর' প্যারোডি করা হলো 'ডর লেগেছে, ওয়েলফেয়ার আজিকে হবে মাটি, নিম গাছতলার স্বপ্নপুরে নিভিছে তাদের বাতি..।'

ওয়েলফেয়ার যে ইউ এস পি পি'কে কম্যুনিস্ট চর বলে আক্রমণ করছে তার জবাবে আবৃত্তি করা হলো সুন্দর এক রস রচনা—যাতে দেখানো হলো তারা সব কিছুতে এখন 'লাল' (কম্যুনিস্ট) দেখছে :

'হায় লাল মিয়া দাদু তোমার নামটি না বদলালে তারা তো তোমাকেও কম্যুনিস্ট বলবে। হায় লালদিঘি তুমি আবার কোন কম্যুনিস্টদের দালালী করলে তোমার মাঠের জনসভায়। হায় লাল দিয়া (চট্টগ্রাম বিমান বন্দর) তোমার মাঠে কি সবই কম্যুনিস্ট বিমান? হায় লালমাই, তোমার পাহাড়ের চূড়ায় তারা শুধু কম্যুনিস্ট ঝাণ্ডা দেখছে'।

একই রকম কথা জারি গানের ধূয়ার আকারেও প্রচার করা হলো। ওয়েলফেয়ারের অপপ্রচার যে ভাঙ্গা কলের গানের রেকর্ডের মত শুধু একই কথা বলে চলেছে—সেটি দেখানোর জন্য জারি গানে মূল গায়ক বলে : 'কম্যুনিস্টদের পাল্লায় পড়ে চট্টগ্রাম কলেজ; তখন সবাই মিলে ধূয়া তুলে : 'গেল গেল রে'।

মাঝে মাঝেই কিন্তু এই সরস ব্যঙ্গ কৌতুকের তাল কেটে গিয়ে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল—দুই পক্ষের জ্বালাময়ী ভাষণের পর একে মিছিল নিয়ে অন্যের ক্যাম্পের দিকে এগিয়ে গেলে এরকম উত্তেজনার সৃষ্টি হচ্ছিল। কিন্তু কোন সময়েই মনে হয়নি যে তা সত্যি সত্যি হাতাহাতির পর্যায়ে চলে যেতে পারে। উভয় পক্ষে আগাগোড়া যারা নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন স্পষ্টত তারা ছিলেন নিরীহ সজ্জন তরুণ। একটি বিষয় ছিল লক্ষণীয় উভয় ক্যাম্পে অল্প কয়েক জন ছাত্রীর উপস্থিতি থাকলেও, তাদের খুব বড় কোন ভূমিকা নির্বাচনের দিন দেখিনি।

কলেজের ভোটাররা মনে হয় অধিক সংখ্যায় ওয়েলফেয়ারের প্রচারণাকেই বিশ্বাস করেছিল, কারণ সেবার ইউনূস ভাই সহ ইউ এস পি পি'র কয়েকজন প্রার্থী জয়ী হলেও জিএস সহ (তখন ভিপি পদটি ছিলনা) অধিকাংশ জয়ী প্রার্থী ওয়েলফেয়ারেরই ছিল। পরে অবশ্য ইউনূস ভাইদের নির্বাচন পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের আলোচনায় দেখলাম কেউ কেউ বেশি দায়ী করছেন ইউ এস পি পি'র জিএস প্রার্থী রউফ সাহেবের চট্টগ্রামের স্থানীয় মানুষ না হওয়াটিকে।

সারাদিন চট্টগ্রাম কলেজের নির্বাচন দেখা—সেটি ছিল বলা যায় একটি ব্যতিক্রমী বিরতি। নইলে মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা সন্নিকটবর্তী হওয়াতে পরীক্ষা প্রস্তুতিতে মনোযোগ বাড়াতে হয়েছিল এ সময়। বৃত্তির পাঠ্য বস্তুতে এবার দুটি নতুন জিনিস এসেছে। তার একটি হলো ইংরেজি, বিশেষ করে ইংরেজি গ্রামার; অন্যটি হলো জ্যমিতি। জ্যামিতি জিনিসটিকে বেশ ব্যতিক্রমী দারুণ জিনিস বলে মনে হচ্ছিল—বিশেষ করে যুক্তি দিয়ে, কখনো বিপরীত যুক্তি দিয়ে একের পর এক থিওরেম প্রমাণ করার বিষয়টি দারুণ লাগতো। একটি প্রমাণ করার পর সেটির সিদ্ধান্তটি ব্যবহার করে আর একটি উপপাদ্য প্রমাণ করা—আর তারপর বেশ তৃপ্তির সঙ্গে লেখা কিউ ই ডি—'ইহাই উপপাদ্য বিষয়'। তবে সমস্যাটি ছিল বৃত্তির জন্য জরুরি ছিল মূল উপপাদ্যটি নয় তার প্রত্যেকটির নানা ছোট ছোট

লেজ যাকে বলা হয় 'এক্সট্রা' সেগুলো প্রমাণ কর। এগুলো কত রকমের যে হতে পারে তার সীমা নেই। কাজেই প্রচুর চর্চা দরকার, আবার সেই প্রশ্নোত্তরিকার শরণাপন্ন হয়ে। ওতে যে সব পুরোনো প্রশ্নের সমাবেশ করা হয়েছিল তার মধ্যে আগেরগুলো ইংরেজি ভাষায় লেখা, কারণ সে আমলে মাইনর পরীক্ষার প্রশ্ন ইংরেজিতে হতো। এতে গণিতের একই জিনিসগুলোর ইংরেজি নামও জানা হয়ে গেল, যা বহু পরে কলেজে গিয়ে খুব কাজে লেগেছে।

বিশেষ করে ইংরেজি আর অঙ্কের জন্য কয়েক মাস ভাল একজন শিক্ষকের কাছে প্রাইভেট পড়তে গেলাম। তিনি হলেন কলেজিয়েট স্কুলে ইউনূস ভাইয়ের প্রাক্তন শিক্ষক প্রফুল্ল ভট্টাচার্য। তিনি খুব নামকরা শিক্ষক ছিলেন কিন্তু প্রাইভেট বড় একটা পড়াতেন না। আমাকে পড়াতে রাজি হওয়াটি ছিল আমার জন্য সৌভাগ্যের ব্যাপার। প্রতিদিন ভোরে শহরের ফিরিঙ্গি বাজার এলাকায় তাঁর বাসায় যেতাম, সেখান থেকে ফিরে স্কুলে যেতাম। হেঁটে ওখানে যাওয়ার পথটি বেশ ইন্টেরেস্টিং ছিল। ওখানে ছিল চট্টগ্রামের নাম করা স্কুলগুলোর একটি সেন্ট প্লাসিড স্কুল, অনেকে একে 'গির্জা স্কুল'ও বলতো—কারণ ক্যাথলিক চার্চের সঙ্গেই এর অবস্থান, চার্চের পরিচালিত স্কুল। শিক্ষকদের অনেকেই হতেন পাদরি; কেউ কেউ বিদেশী, অনেকে দেশী। কলেজিয়েট স্কুলে স্কাউটিঙের সঙ্গে জড়িত থাকার কারণে শহরের স্কাউট সমাবেশে তাঁদের কয়েকজনকে বেশ জনপ্রিয় স্কাউট মাস্টার হিসেবে দেখেছি। এভাবে ব্রাদার পল, এবং ব্রাদার জার্লাথের কথা মনে আছে—তাঁরা উভয়ে কানাডিয়ান। আর এক জনের কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে তিনি জেফরি প্যারাইরা, খাঁটি চাটগেঁয়ে মানুষ—ইউনূস ভাইয়ের বন্ধু, পরে সেন্ট প্লাসিডের শিক্ষক ও স্কাউট মাস্টার হয়েছিলেন। বহু কাল পর কারিতাস বাংলাদেশের প্রধান এবং দেশের একজন অগ্রগণ্য এনজিও নেতা হিসেবে তাঁর সঙ্গে আমার মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে। ফিরিঙ্গি বাজারের ভেতর দিয়ে যেতাম প্রফুল্ল বাবুর বাসায়। এখানকার অধিকাংশ মানুষ স্থানীয় খৃস্টান। তাদের অনেকের কায়দা কানুন বিলেতি ঢঙ্গের হতো, যেমন বয়স্কা মহিলারাও ফ্রক বা স্কার্ট পরতো। যেদিন রোববারের প্রার্থনার সময় যেতাম গির্জায় ঘণ্টা ধ্বনি শোনতাম। নারীপুরুষ ছেলেমেয়ে অনেককে দলে দলে গির্জায় যেতে দেখতাম। বিলাতী কায়দার প্যারাম্বুলেটর ঠেলে শিশুদেরও নিয়ে যেতে দেখতাম। কখনো গির্জার ভেতর থেকে তাদের প্রার্থনা সংগীত শুনতে পেতাম। এগুলো আমার জন্য নতুন অভিজ্ঞতা। তবে পরে বুঝেছি এই খৃস্টান সম্প্রদায়টির অনেকেই পর্তুগীজদের ভাবধারাতেই বেশি দীক্ষিত, ইংরেজদের নয়। চট্টগ্রামে ইংরেজদের অনেক আগে যখন পর্তুগীজরা এসেছিল তখনই ওরা ধর্মান্তরিত হয়েছে—নামগুলোও এই রোজারিও, প্যারাইরা, ইত্যাদি পর্তুগীজ নাম।

চট্টগ্রামে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের প্রথম একটি বসত গড়ে উঠেছিল ১৫৩০ সালের দিকে। শুরুতে বাংলার সুলতানদের সঙ্গে ও পরে আরাকান রাজোর সঙ্গে

সমঝোতা করে তারা চট্টগ্রাম বন্দরকে তাদের বাণিজ্যের কাজে চমৎকার ভাবে ব্যবহার করছিল—একে নাম দিয়েছিল পোর্টো গ্রান্ডে (মহা বন্দর)। বাণিজ্যের কাজেই চট্টগ্রামে সে সময় তারা বেশ কয়েকটি দুর্গ ও ফ্যাক্টরি নির্মাণ করেছিল। আমাদের স্কুলের কাছে পাহাড়ের উপর বুড়া মাদ্রাসা, টিলার উপর চট্টগ্রাম মুসলিম হাই স্কুল ভবনও নাকি ওই পর্তুগীজ দুর্গ ছিল আদিতে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যথারীতি এসেছিলেন পাদরিরা ধর্ম প্রচার করতে, বেশ কিছু স্থানীয় মানুষকে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন। তাছাড়া পর্তুগীজদের সঙ্গে স্থানীয়দের কিছু কিছু বৈবাহিক সম্পর্কও হয়েছিলো যার ফলে একটি মিশ্র খৃস্টান সম্প্রদায়ও গড়ে উঠেছিল। বন্দরের কাছে ফিরিঙ্গি বাজার হয়ে উঠেছিল তাদের প্রধান একটি বসত। ১৬০০ শতকের শেষের দিকে মোগল নৌবহর চট্টগ্রাম থেকে পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদেরকে উচ্ছেদ করে দিয়েছিল।

প্রফুল্ল বাবু খুব ব্যতিক্রমী কায়দায় পড়াতেন। আর তাঁর এই ব্যতিক্রমী পদ্ধতিগুলো আমি সোৎসাহে ব্যবহার করতাম বলে তিনি আমার প্রশংসা করতেন। জ্যামিতির এক্সট্রা ইত্যাদির যুক্তিগুলো স্পষ্ট করার জন্য তিনি কাঁচি দিয়ে কাগজ কেটে ত্রিভুজ তৈরি করতেন। ইংরেজি গ্রামারের যেখানে বেশি ভুল হয় সেগুলো মনে রাখার সুবিধার জন্য তিনি কতগুলো শ্লোক তৈরি করে দিয়েছিলেন। যেমন :

'দুটি কর্তা যুক্ত হলে 'or' 'nor' দিয়া
শেষোক্ত কর্তার হবে অনুগামী ক্রিয়া।

ইউনূস ভাইদের কাছে কলেজিয়েট স্কুলে প্রফুল্ল বাবুর কড়া মাস্টারির কথা শুনেছিলাম। অমনোযোগী ছাত্রদের প্রতি তাঁর বাক্যবাণ নাকি সব চেয়ে দুর্দান্ত ছেলেটিকেও ভস্ম করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। আমি কিন্তু শুধু তাঁকেই একজন অতি স্নেহশীল উৎসাহদাতা শিক্ষক হিসেবে পেলাম না, একটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত পরিবারকে পেলাম তাঁর স্ত্রী স্নেহময়ী 'মাসীমার' নেতৃত্বে। আমি ভোরে যখন তাঁদের বাড়িতে পৌছতাম তখন পরিবারের ব্যস্ত সময়। আমাদের মতো তাঁদেরো ছিল অনেক ছেলেমেয়ের বড় পরিবার। প্রায়শ ওই সময়েই প্রাতরাশের ডাক পড়তো, সব তৈরি করে মাসীমা ছেলেমেয়ে সবাইকে জড়ো করার চেষ্টা করতেন। যেভাবে সবাইকে ডাকতেন আমি খুব মজা পেতাম—কারণ তাদের নামগুলো ছিল জোড়ায় জোড়ায়; তিনি এক নিশ্বাসে বলে যেতেন—'হাবলু-বাবলু, অনু-রুনু, বুড়ি-টুসি, বড়মনু-ছোটমনু—সবাই খেতে আস।' এতদিন পর দু'একটি নাম হয়তো আমার ভুলও হতে পারে, তবে আমি এমনি কিছুই শোনতাম। প্রায়শ মাসীমা আমার জন্যও এটা সেটা ভালমন্দ খাবার নিয়ে এসে আদর করে খাওয়াতেন। ছেলেমেয়েদের মধ্যে বড়দেরকে আমি তখন কিছুটা চিনতাম, পরে আরো বেশি। সবার বড় ভাই ইউনূস ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন। পঙ্কজ ভট্টচার্য (হাবলু) তখন কলেজিয়েট স্কুলে পড়তেন, আমার একটু উপরের ক্লাসে (পরে প্রখ্যাত বামপন্থী

রাজনীতিবিদ, ন্যাপ, গণ ফোরাম, ঐক্য ন্যাপের নেতা), বোন অনিমা ভট্টচার্য পরে চট্টগ্রাম কলেজে আমার সমসাময়িক ছিলেন।

অবশেষে নানা প্রস্তুতির ভেতর দিয়ে যেতে যেতে মাইনর বৃত্তি পরীক্ষা এসে গেল। সেন্টার পড়লো কলেজিয়েট স্কুলে—পরিচিত পরিবেশ, অনেক শিক্ষকও চেনা; তাঁরা খোঁজ খবর করলেন। তাই কোন টেনশন হলোনা নতুন জায়গায় পরীক্ষা দিচ্ছি বলে। ফলাফল যা আশঙ্কা করেছিলাম তাই হলো, প্রথম হতে পারলামনা, ইংরেজিতে মোমেনের অধিক পারদর্শিতা স্পষ্ট। সে প্রথম হলো, আমি দ্বিতীয়—এবার শুধু চট্টগ্রাম জেলার মধ্যে নয়, কয়েকটি জেলা মিলে চট্টগ্রাম রেঞ্জের মধ্যে। নগদ লাভ হলো বৃত্তির পরিমাণটি বেশ বড়—মাসে পঞ্চাশ টাকা। আমাকে আর পায় কে! নতুন স্কুলে ভর্তির আয়োজন চল্‌লো। এবার কলেজিয়েট স্কুল—এক দিকে নতুন, আবার অন্য দিকে যথেষ্ট পরিচিত। মাইনর বৃত্তি পাওয়া, নতুন স্কুলে যাওয়া, তার সঙ্গে আরো একটি দারুণ সুসংবাদ যোগ হলো ভাই মইনুল আনামের জন্ম। মইনুকে নিয়ে পরিবারে আনন্দের জোয়ার বইলো—সে জোয়ার ছড়িয়ে গেল আশপাশেও। ইদ্রিসের মা অর্থাৎ আমার আশার মা নানী তো তাকে সারাক্ষণ দখল করে রাখতে চান—নানা ভাবে সাজিয়ে রাখেন, তার সঙ্গে খেলেন; আমাদেরকে চান্সই দেননা। একটু বড় হয়ে যখন সে বসতে পারে, তখন আশার বাপ নানা নিজে তাকে তাঁদের দোকানে বসিয়ে রেখে হাতের কাছের নানা জিনিস, যেমন টেলিফোন ইত্যাদি দিয়ে খেলতে দেন।

আমাদের অবস্থা তো বলাই বাহুল্য। অন্য সবাই এখন তার থেকে বেশ বড়। আমাদের সবার নতুন নতুন খেলার ও কাজের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়লো এখন মইনু। জন্মেই সে যেন হঠাৎ করে এসে পড়লো এক দঙ্গল হৈচৈ করা ছেলেমেয়ের মধ্যে। এর মধ্যে প্রায়ই আব্বাও এসে যোগ দেন, ছেলেমেয়েদের মতই হৈচৈ করেন। কাকে ছেড়ে কার দিকে যে সে মনোযোগ দেবে বুঝতে পারেনা।

বিশালত্বের পাঠশালা

অতুলনীয় কলেজিয়েট

আমার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু অষ্টম শ্রেণীর পর চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুল থেকে অন্য স্কুলে চলে গিয়েছিল। চলে যাওয়ার কারণ ছিল এখানে থাকলে নবম ও দশম শ্রেণীতে রোজকার বাধ্যতামূলক সামরিক ট্রেনিং গ্রহণ করতে হবে—জুনিয়র ক্যাডেট কোরের অংশ হিসেবে। তাদের ধারণা এতে অনেক পরিশ্রম, লেখাপড়ারও ক্ষতি হতে পারে। এতে আমি খুব অবাক হয়েছি। আমার কাছে কলেজিয়েটের মানেই ছিল চারদিকে সর্বব্যাপ্ত সব চ্যালেঞ্জ, যাকে আমরা বরং মনে করেছি সর্বব্যাপ্ত সব সুযোগ, নিজেকে বিকশিত করার। জুনিয়র ক্যাডেট কোর ছিল তারই একটি অংশ মাত্র। বিচিত্র ব্যক্তিত্বের শিক্ষকদের আসা-যাওয়া, ছাত্রদেরকে নানা রকম অভিজ্ঞতার স্বাদ দেয়া, স্কাউটিংকে বিশ্বজোড়া বিস্তারে নিয়ে যাওয়া, যে দিকেই তাকাই এই ব্যতিক্রমী স্কুলকে দেখতে পাই অতুলনীয় কলেজিয়েট হিসেবে।

এক কথায় যদি বলতে হয় আমার স্মৃতির চট্টগ্রাম কলেজিয়েট হলো বিশালত্বের একটি প্রতীক—বিভিন্ন রকম অর্থে। যেমন এর ক্যাম্পাসটির কথাই ধরা যাক। স্কুলের পৌঁছার অনেক আগে থেকেই আমাকে এর বিস্তীর্ণ মাঠের উপর দিয়ে হাঁটতে হতো—কারণ মাঠের উপর দিয়ে যাত্রা শর্টকাট হয়। এত বড় মাঠ যে একা একটি স্কুলের থাকতে পার তা কল্পনাই করা যায়না; এটি এমন মাঠ যার নানা দিকে চলতে পারে এবং চলতোও এক সঙ্গে অনেক রকম ক্রিয়া-কলাপ, নানা স্পোর্টস, নানা খেলা। স্কুলের প্রধান ভবনের সামনে মাঠের কিছু অংশ আলাদা করে ঘেরা—এখানে শুধু আমাদের অ্যাসেম্বলি ও ক্লাসের ফাঁকে প্রয়োজনীয় হাঁটাচলা। মাঠের বাকি অংশ অন্যরাও ব্যবহার করতো—চট্টগ্রামের ইন্টার-স্কুল যাবতীয় খেলা-ধূলা, স্পোর্টসও এখানে হতো—কাজেই আমাদের স্কুল থেকেই আমরা চট্টগ্রামের নানা স্কুলের নানা সমাবেশ দেখতে পেতাম। লাল ইটের এক

তলা ভবন—একেবারে গ্রাফ পেপারের ছকে আঁকা ইংরেজি E অক্ষরের আকৃতিতে। এ ভবনটির বয়স অনেক, শতাব্দীর শুরুর দিকে তৈরি হয়ে শুধু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় কয়েক বছর ভবনটি স্কুলের বদলে যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হয়েছিল। E এর মাঝখানের দাগটি যেখানে রয়েছে সেখানে সামনের দিকে এগিয়ে আসা বড় হলঘরটি আমাদের কমন রুম এবং অনুষ্ঠানাদিতে একত্র হবার জায়গা। এর একদিকে পঞ্চম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ক্লাসগুলো, প্রত্যেকটি দুই সেকশন করে। কমন রুমের অন্য দিকে নবম ও দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান ল্যাবোরেটরি, বিশেষ কিছু বিষয়ের ক্লাস রুম, হেডমাস্টারের অফিস, শিক্ষক রুম ও নানা অফিস। এই মূল ভবনের পাশে ও পেছনে বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে আরো বহু অপেক্ষাকৃত ছোট দালান—একই লাল ইটের—সবই এক তলা। স্কাউট ডেন (স্কাউটিং কাজের কক্ষ), জুনিয়র ক্যাডেট কোরের কর্ম এলাকা—যেখানে তার জিমনাস্টিক্স, ইনডোর স্পোর্টস, আর রাইফেল সাজিয়ে রাখার জায়গা; বিভিন্ন ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর ক্লাসের আলাদা ঘর—আরবি, সংস্কৃত, উর্দু, ম্যাপ-রিডিং ইত্যাদি; স্কুল হোস্টেল, হেডমাস্টারের বাসস্থান—আরো কত কী! সব কিছু খোলামেলা, ছড়ানো—অনেকটা সবার জন্য উন্মুক্ত।

এই ক্যাম্পাসে খুব ছোট বেলা থেকে অনেকের সমাবেশ দেখেছি। ইউনূস ভাইদের করাচি জাম্বুরীর সময় এখান থেকেই সারা চট্টগ্রামের দল প্রস্তুতি নিয়ে রওয়ানা হতে দেখেছি। এখানেই দেখেছি এ স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর শ'খানেক ক্যাডেটের পরিদর্শনে এসেছেন অন্যান্য কয়েকজন জেনারেল ও বড় সামরিক কর্মকর্তা সহ পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান; তাঁর পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সকল অনুষঙ্গ নিয়ে তাদের ন্যাশনাল স্যালুট প্রেজেন্ট আর্ম গ্রহণ করেছেন (১৯৫৪)। আমি দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় বিশ্বজাম্বুরীতে যোগ দিতে পাকিস্তানের নানা অঞ্চল থেকে এগার জন স্কাউট এখানে এসেই একত্র হয়েছে, কয়েকদিন এই ক্যাম্পাসে থেকেছে, যাত্রা শুরু করেছে; আমিও যার একজন ছিলাম (১৯৫৯)। এখানেই আমাদের সেই কমন রুমে কবি জসীমউদ্দীন আমাদেরকে 'সোজন বাদিয়ার ঘাট' থেকে অংশ বিশেষ আবৃত্তি করে, একক অভিনয় করে শুনিয়েছেন, দেখিয়েছেন। এখানেই আব্বাসউদ্দীন আমাদেরকে গান গেয়ে শুনিয়েছেন, কুচবিহারে তাঁর বাল্যকালের গল্প করেছেন। এই কমন রুমেই প্রত্যেকদিন টিফিন ছুটিতে পিং পং ইত্যাদি খেলার ফাঁকে ফাঁকে ছাত্ররা প্রতিদিন দেখেছে বহু দিনের সংরক্ষিত অনার বোর্ড, যেখানে ম্যাট্রিকে প্রদেশে প্রথম স্থান অধিকারী এ স্কুলের মনোয়ার ভাইয়ের নাম ছিল (প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ সংখ্যাতত্ত্ববিদ ড.মনোয়ার হোসেন)। এই অনার বোর্ডে মেধা তালিকায় স্থান পাওয়ায় ইউনূস ভাইয়ের এবং পরে আমার নামও সংযোজিত হয়েছিলো। প্রথম মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত স্পুটনিকের যুগে আমরা কলেজিয়েটে ছিলাম। আমার কাছে মনে হয়েছে—আমাদের স্কুলটি ছিল এর ছাত্রদের জন্য একটি দারুণ উৎক্ষেপন

কেন্দ্র—'...থ্রি, টু, ওয়ান, লিফ্‌ট অফ' বলে আমাদেরকে অজানা উচ্চতায় ছুঁড়ে দেয়াই তার কাজ।

যাবতীয় সব কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আমরা কলেজিয়েটের ছাত্ররা পরস্পরের কাছাকাছি এসেছি ক্রমাগত। দেখেছি আমাদের স্কুলটি যেন পুরো বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ। এখানকার বন্ধুদের মধ্য দিয়েই পুরো দেশকে দেখেছি। গল্প হতো যার যার পূর্ব অভিজ্ঞতার, অনেকের ক্ষেত্রে সেটি তার নিজের গ্রামের বা শহরের যেখানে সে বেড়ে উঠেছে, অন্যদের ক্ষেত্রে বাবার চাকরি উপলক্ষে যে সব জায়গায় তারা দীর্ঘদিন ধরে বাস করেছে। যেমন মঞ্জু বহুদিন চট্টগ্রামে বাস করলেও তার মধ্য দিয়ে পেয়েছি সিরাজগঞ্জের বেলকুচিকে যেখানে চলছে অসংখ্য তাঁতের টুকটাক, কুতুবের অনেক কিছু কক্সবাজারের দুলা হাজারার গল্প ঘিরে পরে যেখানে ওই স্কুলে থাকতেই ওদের বাড়িতে গিয়ে চলেছে আমাদের পাহাড়ি বনের অভিযান। এভাবে কাজী নাসির নিয়ে এসেছিলো ফরিদপুরের ডামুড্যার কাহিনী, শমসের যশোরের, মুজিব পাবনার, মাহবুব মীরসরাইয়ের, তসলিম বরিশালের, মোস্তাফিজ নোয়াখালির, শাহজাহান ঢাকার—এবং এমনি অন্যান্যরা। অনেকে তাদের পূর্বাভিজ্ঞতার এই প্রতিনিধিত্ব খুব জোরালো ভাবে করেছে। যেমন সিলেটের মোমিনুল হকের কথা ধরা যাক। সে আমাকে সিলেটি ভাষা প্রায় শিখিয়েই ছেড়েছিল। আর 'উরি উরি মাছ দি চাইলতার টাঙ্গা খাইতে যে কী অজাত মজা লাগে' তা ওর অপূর্ব বর্ণনা থেকে ওই টক্ খাবারটি না খেয়েই বরাবর অনুভব করে গেছি।

এখানে বন্ধুদের কারো কারো সঙ্গে জড়িয়ে গিয়েছিলাম একই কল্পনায় মেতে—এবং এই জড়ানো কোন কোন ক্ষেত্রে জীবনব্যাপী বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছে। গানের মুগ্ধতায় এমনটি ঘটেছে বোরহানের সঙ্গে (বোরহান সিদ্দিকী, পরে আই জি পি, সচিব, এবং সংগীত শিল্পী); এটি পরে বিস্তৃত হয়েছে একই সঙ্গে নানা উদ্যোগী কাজ করতে গিয়ে, কলেজিয়েট স্কুলে তো বটেই, তারপর কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, কর্ম জীবনে। গান আমরা অনেকেই গাইতাম, কিন্তু বোরহান ছিল গায়ক। তার প্রিয় গান 'আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্র ছায়ায় লুকোচুরির খেলারে ভাই লুকোচুরির খেলা', অথবা 'বাঁশি বাজিস না রে মরি ভুখের জ্বালায়..' তন্ময় হয়ে সবাইকে শুনতে হতো। কলেজিয়েট স্কুলে থাকা কালে আমাদের বাসার টেইপরেকর্ডারে বোরহানের কয়েকটি গান টেইপ করা হয়েছিল। তারপর অনেক টেইপের সঙ্গে এটিও হারিয়ে যায়। প্রায় পঞ্চাশ বছর পর হঠাৎ করে পুরোনো একটি ট্রাঙ্কে একেবারে প্রায় গলে যাওয়া চট্‌চটে এই সব টেইপ খুঁজে পাওয়া যায়। প্রযুক্তির কৌশলে এমন নাজুক অবস্থার টেইপের সকল সুর-শব্দ হুবহু তার সমস্ত সৌকর্যে পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়েছে বলে এখনো সিডি'তে বোরহানের সেই কৈশোরের গানগুলো শুনতে পারছি, এবং অনায়াসে সেই যুগে ফিরে যেতে পারছি।

শহীদুল হোসেনের সঙ্গে (পরে কানাডা প্রবাসী প্রকৌশলী) ঘনিষ্ঠতা ছিল সেই সপ্তম শ্রেণীতে 'শাহীন' ও 'সেতারা' নামক দুটি কিশোর ম্যাগাজিনের সমজদার হিসেবে। ওই 'শুকতারার' যুগের পর আমরা কিশোর সাহিত্যের এক রকম খরার মধ্যে বাস করছিলাম। মাঝখানে কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'রবিবার' একটি কিশোর ম্যাগাজিনের কিছু সংখ্যা পেয়েছিলাম। ওতে বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক সুনির্মল বসুর চমৎকার সব ছড়া থাকতো যার একটি এমন মজার এবং এমন ছন্দের যে ভোলা বড় শক্ত—

'ইকড়ি মিকড়ি চাম চিকড়ি
চলো ভাই যাই ফতেপুর সিক্‌রি'
ফতেপুর সিক্‌রির বুলঅন্দ দরজা
দেখতেই বল্‌লো ঘর যা ঘর যা...'

কিন্তু সেই 'রবিবার' আর বেশি দিন পাইনি। এ সময় অনেক আশ্বাস নিয়ে দেশেই প্রকাশ শুরু হয়েছিল দুটি নতুন কিশোর ম্যাগাজিন—'শাহীন' আর 'সেতারা'। শব্দগুলোর অর্থ এখন অপরিচিত মনে হলেও তখন কিন্তু তা ছিলনা। 'শাহীন' মানে তরুণ পরিব্রাজী পাখি, আর 'সেতারা' মানে তারা। শাহীন ছিল একটু বড় কিশোর-কিশোরীদের জন্য, সেতারা আরো ছোটদের জন্য। প্রতি পনরো দিন অন্তর ডাকযোগে আমাদের কাছে আসতো এই দুটি ম্যাগাজিন, না আসা পর্যন্ত শহীদ আর আমি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। শুধু পড়ে উপভোগ করতামনা, আমাদের পরিকল্পনা ছিল আমরা এ পত্রিকা দু'টিতে লিখবো, এবং আমাদের লেখা সেখানে গৃহীত হবে। কিন্তু হায়, শাহীন সেতারাও বেশীদিন টেকেনি। অতএব কিশোর সাহিত্যে আমাদেরকে একমাত্র *আজাদ* পত্রিকার 'মুকুলের মহফিল' এবং পরে ইত্তেফাক পত্রিকার 'কচিকাচার আসরে'র ওপরেই নির্ভর করতে হয়েছে। লেখার সুযোগও পরে খানিকটা এখানেই পেয়েছি। তবে আমার উচ্চাকাঙ্খার বা সাহসের কোন অভাব ছিলনা এক্ষেত্রে। ওই সময়েই একবার আমার মাথায় চাপলো আমরাই একটি কিশোর পত্রিকা বের করে ছাপাবো। নামও ঠিক করে ফেলেছিলাম—'কচি হাত'। ইউনূস ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চাইলে তিনি তাঁর সাহিত্যিক বন্ধু শাকুর ভাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন আমাকে। নিরালা সিনেমার এলাকার ভেতরে শাকুর ভাইয়ের বাসায় গিয়েছিলাম এ বিষয়ে আলাপ করতে। তিনি নিরুৎসাহিত করেননি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ নিয়ে এগোতে পারিনি।

কলেজিয়েটে আমার নানা প্রজেক্টের নিত্য সঙ্গী ছিল শামসুল হোসাইন, যাকে সবাই 'বাহাদুর' হিসেবেই বেশি ডাকতো (ড. শামসুল হোসাইন, ইতিহাসবিদ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক)। সে আমার এক ক্লাস নিচে পড়লেও আমাদের কর্মকাণ্ডে একথা বোঝার কোন উপায় ছিল না—কলেজিয়েটের আবহটাই ছিল এ রকম। সংগ্রাহক, আয়োজক, এবং

প্রদর্শক—পরবর্তীকালের এই সব ভূমিকা সে সময়েই বাহাদুরের মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্কাউটিঙের ভেতরে বাইরে তার এই সক্ষমতাগুলো আমাদের বহু যৌথ কাজকে সমৃদ্ধ করেছে। ইউনূস ভাই বিশ্ব জাম্বুরী থেকে স্কাউটিং সম্পর্কে যত টুকিটাকি নিয়ে এসেছিলেন, অন্যভাবেও আমরা যে সংগ্রহ গড়তে পেরেছি, বাহাদুর সবগুলোকে একটি অর্থপূর্ণ রূপ দিয়েছে। পরবর্তী কালে জীবনের বহু প্রকল্পে আমরা যে এক সঙ্গে কাজ করতে পেরেছি, এখনো করছি, তার একটি কারণ হলো সৃজনশীল কাজে তার অদ্ভুত নেশা, যার জন্ম কলেজিয়েটের সেই সপ্তম অষ্টম শ্রেণীর দিনগুলোতে।

আনন্দলোকে

কলেজিয়েট স্কুলে ছাত্র হবার আগে থেকেই স্কাউটিঙের সুবাদে কাজী সাহেবকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম, কিন্তু ছাত্র হবার পর আর বেশি দিন পাইনি। তবে কাব স্কাউটে আমাদের 'আকেলা' যিনি ছিলেন সেই কাব টিচার মোখলেস স্যার এখন আমাদের ড্রইং টিচারও হলেন। ড্রইং টিচার হিসেবে স্কুলের শিক্ষকতায় তাঁর ভূমিকা খুব আহামরি কিছু না হলেও, স্কুলের পুরোটি আবহে তাঁর অন্য ভূমিকা ছিল খুবই বড়। এর কারণ তিনি সারা স্কুলে একটি আনন্দ জগত তৈরি করতে সাহায্য করেছিলেন। তাঁর একটি প্রিয় কাজই ছিল কারণে অকারণে শিক্ষকবিহীন যে কোন একটি ক্লাসে ঢুকে পড়ে নিজের প্রিয় চিৎকারটি তাদের দিয়ে করানো—'আনন্দ লাগেরে আনন্দ লাগে'। কোন সময় ক্লাসে ছাত্রদেরকে অমনোযোগী ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে দেখলে তিনি কোন ভূমিকা ছাড়াই বলে উঠতেন—'ক্লাস রেডি ফর আইসক্রীম'। তখন সবাই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সোডা ওয়াটারের বোতল খোলার মত 'ফস্‌স্‌' একটি শব্দ করে তারপর গল্‌ গল্‌ করে ওই সোডাওয়াটার পান করার মত শব্দ করতো, তারপর তৃপ্তির ঢেকুর তুলে বলতো 'আহ কী মজা!' ওগুলোর সব কিছু ছিল তাঁর ছাত্রদেরকে চাঙ্গা করার উপায়। শতবার করলেও ছাত্ররা মোখলেস স্যারের এই সব অদ্ভুত কাণ্ডে সহযোগিতা করতে ক্লান্ত হতোনা, মজাই পেত। ছাত্রদেরকে মৃদু শাসন করারও তাঁর কিছু পদ্ধতি ছিল। ক্লাসে খুব গোলমাল হলে বা অনেকে মিলে দোষের কিছু করে ফেললে তিনি ঢুকে বলতেন 'ক্লাস রেডি, ওয়ান'। তখন সবাই কান স্পর্শ করে বলতো 'লজ্জা পেয়েছি', তিনি বলতেন 'টু', তখন সবাই হাত নামিয়ে বলতো 'ক্ষমা চাই। তবে তাঁর আনন্দ জগতের প্রধান উপাদান ছিল তাৎক্ষণিক ভাবে ছন্দ মিলিয়ে কথা বলা। এভাবে ছন্দ মিলিয়ে কথা বলে তিনি অনেক গুরুতর পরিস্থিতিকে সহজ করে দিতেন। যেমন হয়তো আমাদের দপ্তরী রাসমোহনকে তলব করে ডাকা আরম্ভ করলেন 'রাসমোহন রাস মোহন'; রাসমোহনদা শশব্যস্ত হয়ে তাঁর কাছে আসলে তিনি ওই ছন্দ মিলিয়ে শুধু বললেন 'আছ কেমন'। প্রায়শ

বলার জন্য তাঁর আর কতগুলো ছন্দিত বাক্য সব সময় তৈরি থাকতো। এর একটি ছিল—'যদি করি যত্ন, আমার প্রত্যেকটি ছেলে হবে এক একটি রত্ন'।

আমাদের সময়ে কলেজিয়েট স্কুলে আমরা কয়েকজন হেড মাস্টার পেয়েছিলাম। তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বধারী ছিলেন অল্পকিছু দিনের জন্য আসা আবদুল কুদ্দুস ভূঁইয়া। তিনি এসেছিলেন সদ্য স্থাপিত ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজ থেকে। সেখানে তিনি ক্যাডেট কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ কর্নেল ব্রাউনের সহকারী (পরে বার্সার) ছিলেন। দীর্ঘ পেটা শরীরের স্মার্ট মানুষ ছিলেন তিনি, তাঁর নো-ননসেন্স দৃষ্টিভঙ্গি, শৃঙ্খলার উপর গুরুত্ব, অথচ সবার মধ্যে সৃজনশীলতাকে উৎসাহ প্রদানের চেষ্টাকে আমার কাছে মনে হতো আনন্দলোক সৃষ্টিরই ভিন্ন একটি পথ। ক্লাস শুরু হবার আগে সব ক্লাসের ছাত্রদের একত্রে যে অ্যাসেম্বলী স্কুলের ঠিক সামনে হতো সেখানে প্রত্যেক দিন তিনি দু'একটি জরুরি কথা ইংরেজিতে সুন্দর করে গুছিয়ে বলতেন। তাতে সমসাময়িক কিছু কিছু বিষয়ে আলোচনা থাকতো। শুধু যে আসন্ন পরীক্ষার কথা বা এরকম কিছু থাকতো, তা মোটেই নয়; বরং কোন একটি স্কাউট ইভেন্ট, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা কিংবা সামনে কোন বিখ্যাত মানুষের ভিজিট এসবের জন্যও আমাদেরকে প্রস্তুত করা হতো। স্কুলে ভর্তি হবার (জানুয়ারি ১৯৫৬) অল্প কিছু দিনের মধ্যে তাঁর সঙ্গে আমার একটি ঠোকাঠুকি হয়ে গিয়েছিল। কোন কারণে স্কুলের বারান্দা দিয়ে হাঁটছি, সেখানে হেডমাস্টার সাহেবের সামনে পড়ে গেলে তিনি আমাকে থামালেন। কারণটি হলো আমার পরনের প্যান্টটি। ওই যে ইউনূস ভাই আমেরিকা থেকে কাউ বয় প্যান্টটি আমার জন্য এনেছিলেন সেটিই আমার পরনে ছিল; স্কুলে প্রায়ই আমি সেটি পরে যেতাম। বলে রাখা ভাল যে স্কুলে তখন ইউনিফর্মের চলন হয়নি, কোন পর্যায়ের কোন স্কুলেই ইউনিফর্ম দেখতামনা। হেডমাস্টার স্যার প্যান্টটির দিকে খুব ভাল করে তাকালেন—এর মধ্যে তামার বোতাম, রিভেট, বক্‌লেস বিশেষ করে নিচের থেকে বেশ খানিকটা গুটিয়ে পরে অপেক্ষাকৃত লম্বা প্যান্টকে আমার সমান করে নেয়া, পেছনে সেলাই করা চামড়ার লেবেল—সব কিছু। তিনি মনে হয় ভাবছিলেন এটি স্কুলের অলিখিত, অব্যক্ত ড্রেস কোডের সঙ্গে সঙ্গতি সম্পন্ন হতে পারে কিনা। দেখলাম তাঁর প্রধান আপত্তিটি হলো নিচের দিকটি গুটিয়ে পরা; বললেন 'এটি কেটে ফেলবে'। আমি তখন প্রায় অঙ্গ-হানির প্রস্তাবের মতো আঁৎকে উঠার মতো প্রতিক্রিয়া দেখালাম। তিনি বোধ হয় বুঝতে পারলেন যে এই প্যান্টের এমনিই ধারা। তবে চামড়ার লেবেলটিকে তিনি আসলেই বাড়াবাড়ি বলে ধরে নিলেন। এমন সখের প্যান্ট পরে স্কুলে না আসতে পারার চরম সিদ্ধান্ত থেকে বেঁচে গিয়ে আমি হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। বিপদটি শুধু লেবেলের উপর দিয়ে গেল।

প্রথম দিকে আমাদের ইংরেজি শিক্ষক ছিলেন হরিলাল সাহা। চমৎকার পাট করা ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একেবারে নিখুঁত বাবু তিনি। স্কুলের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্র

সংগীত গেয়ে তিনি আমাদেরকে মুগ্ধ করতেন। নীতিতে কঠোর থেকেও অতি মিষ্টি স্বভাবের মানুষ যে হতে পারে তিনি ছিলেন তার সুন্দর উদাহরণ। এমনকি ইংরেজি পড়াবার মধ্যেও তিনি এমনি আবহ সৃষ্টির চেষ্টা করতেন। যেমন একদিন কথা প্রসঙ্গে 'প্রকৃতির মাধুর্য' এই কথাটির ইংরেজি করার প্রয়োজন হলো। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলে আমরা 'সুইটনেস অব নেচার', 'ডেলাইটফুলনেস অব নেচার' ইত্যাদি নানা উত্তর দেবার চেষ্টা করলাম। তিনি বললেন সব চেয়ে ভাল উত্তর হবে 'সোয়াভিটি অব নেচার'। ওই 'সোয়াভিটি' শব্দটি তিনি এমন ভাবে উচ্চারণ করলেন যেন যত মাধুর্য ওই উচ্চারণের মধ্যেই। তাঁর একটি চেষ্টা ছিল দরকারি সব জিনিস যেন আমরা নিজেরা নিজের মত করেই ইংরেজিতে লিখি। অনেক সময় অন্য সবাই যেন ভুলগুলো বুঝতে পারে সে জন্য এরকম লেখাগুলো তিনি সবাইকে পড়ে শোনাতেন। অষ্টম শ্রেণীতে আমাদের ক্লাস টিচার ছিলেন বলে ছুটির দরখাস্তও নিজের হাতে লিখে তাঁকেই দিতে হতো, এবং তিনি সেগুলোর ইংরেজি দেখতেন, পড়েও শোনাতেন। আমাদের এক দুষ্টবুদ্ধি সহপাঠী অকপটে নিজের কথা লেখার জন্য তাঁর উপদেশটি একটু বেশি মাত্রায় পালন করেছিল একদিন। হরি বাবু যথারীতি তার ছুটির দরখাস্তটিও সবাইকে পড়ে শোনাচ্ছিলেন—'...আই কুড নট অ্যাটেন্ড স্কুল ফর ফাইভ ডে'জ বিক'জ অব দি ম্যারেজ সিরেমোনি অব মাই ফাদার ' (কথাটি সত্য ছিল)। সবাই খুব হাসাহাসি শুরু করলো। যদিও দরখাস্তের লেখক বন্ধুটির মধ্যে কোন ভাবান্তর দেখা গেলনা, কিন্তু স্যারের ফর্সা মুখটি একেবারে লাল হয়ে দরখাস্ত পড়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো।

আমাদের নতুন হেড মৌলভি বদলি হয়ে এসেছিলেন মৌলভিবাজার গভর্নমেন্ট স্কুল থেকে। তাঁর প্রায় সব বাক্যই শুরু হতো 'আমাদের মৌলভিবাজার স্কুলে কিন্তু এটি এ ভাবে হতো না...'। তাঁর কথায় মনে হতো মৌলভিবাজার স্কুল যেন বিশ্বের কেন্দ্র এবং তিনি তার এক কক্ষচ্যুত গ্রহ। আমরাও এর সুযোগ নিয়ে পড়া ধরা ইত্যাদি অপ্রিয় কাজ থেকে তাঁর মনোযোগ যখন অন্যদিকে ফেরাতে চাইতাম তখন বলতাম 'স্যার, মৌলভিবাজারের ছেলেরা অঙ্কে কেমন ছিল'—বা ওরকম অন্য কিছু। আমার সঙ্গে তাঁর বেশি জানাশোনা হয়েছে পরে যখন আমি আরবিকে ঐচ্ছিক ক্লাসিক্যাল ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে নিয়ে তাঁর ক্লাস করতাম। যে জিনিসটি আমার ভাল লাগতো তা হলো তিনি আরবিকে শুধু ধর্ম শিক্ষার বাহন হিসেবে ব্যবহার না করে আধুনিক ভাষা হিসেবে আমাদেরকে এটি শেখাবার চেষ্টা করতেন। আমাদের সঙ্গে আরবিতে প্রশ্নোত্তর চালাবার চেষ্টা করতেন। আমার মনে আছে বেশ কিছু আরবি আধুনিক কবিতা আমাদের বই থেকে তিনি পড়াবার চেষ্টা করেছেন। এর মধ্যে একটি আবৃত্তি করে আমরা খুব মজা পেতাম কারণ এর নামের অর্থ ছিল 'আমরা মিশরের বালিকা'। কবিতাটিতে আধুনিক মিশরের বালিকাদের আশা আকাঙ্খার কথা বলা হয়েছে। কবিতাটি ভুলে গেছি, কিন্তু জটিল আরবি ব্যাকরণের নানা নিয়ম মনে রাখার জন্য যে আরবি ছড়াগুলো তিনি

আমাদের মুখস্থ করাতেন সেগুলো দিব্যি মনে আছে। যেমন আমরা খুব করে মুখস্থ বলতে শিখেছিলাম :

'হুরফে হালকে সিত্তাতে ইয়া নূরে আইন
হামজা হাও, হাও, খাও, আইনো গাইন'

অর্থাৎ

'হে আমার চোখের জ্যোতি, হালকি অক্ষরগুলো ছয় প্রকার
হামজা ও হা ও হা ও খা ও আইন ও গাইন।'

মনে রাখা দরকার যে আরবি ভাষায় হা অক্ষরটি দু'রকম থাকাতেই এটি দুবার এসেছে। শিক্ষক-ছাত্র মিলে যে আনন্দলোক আমরা তৈরি করেছিলাম তা যে সব ছাত্রের সইছিল তা কিন্তু নয়। নানা ক্লাসে কিছু জেঠা ছেলে ছিলো যারা এটি নষ্ট করতে তৎপর ছিলো। আজকাল টেলিভিশনে আমেরিকার হাই স্কুলে কিছু ছাত্রের মধ্যে মারপিট, গুরুতর অপরাধ, ছাত্র-শিক্ষকদেরকে মানসিক যাতনা ইত্যাদি নিয়ে কিছু কিছু সিরিয়াল নাটক অভিনীত হতে দেখা যায়, যার মধ্যে জনপ্রিয় একটির নাম 'বোষ্টন হাই'। যদিও তুলনায় আমাদের কলেজিয়েট স্কুলের চিত্র এর ধারে কাছে নয়, কিন্তু অবাক লাগে যে সেই শান্তির যুগেও আমাদের স্কুলের কোন কোন ছাত্র, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে দু'চারজনের গ্যাং যথেষ্ট দুশ্চিন্তা স্কুল কর্তৃপক্ষের জন্য সৃষ্টি করতো। এরকম 'মার-দাঙ্গা' ছাত্রদের এক জনের নাম ছাত্রদের মুখে মুখে ফিরতো—'টাঙ্গী' (ট্যাঙ্ক)। এটি অন্যদের দেয়া নাম—অস্বাভাবিক রকম বেশি পানি খেত বলেই এই নাম। তার যে গ্যাং তারা নাকি প্রধানত সক্রিয় হতো আন্তঃস্কুল ফুটবল খেলার সময় গায়ে পড়ে মারামারি লাগিয়ে। অবশ্য এসব ক্ষেত্রে অন্য কিছু স্কুলের রেকর্ড আরো খারাপ ছিল—প্রায়শ সব কিছু সেয়ানে সেয়ানে হতো। টাঙ্গীর কীর্তিকলাপ আমাকে কোন দিন দেখতে হয়নি, কিন্তু সেগুলোর কথা শুনতে হতো। কলেজিয়েটের মাঠের ওই পারে 'লাল ঘর' নামে পরিচিত একটি পোড়োবাড়ির মত ছিল। সবাই ওটির দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলতো, টাঙ্গীর বিরোধিতা যারা করে তাদেরকে নাকি পিটিয়ে তারা ওখানে ফেলে রাখে। স্পষ্টত এর অধিকাংশই অতিরঞ্জিত, নইলে স্কুলের খাতায় বেশিদিন তাদের নাম টিকে থাকার কথা নয়।

ওসব বাইরে বাইরে মারদাঙ্গা আমাদেরকে বেশি বিচলিত না করলেও ক্লাসের মধ্যেও চলতো সূক্ষ্ম পলিটিক্স, যেগুলো আমাদেরকে রীতিমত ভাবিয়ে তুলতো। আমি ক্লাসের ক্যাপ্টেন নির্বাচিত হয়েছিলাম সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীতে। এর দৈনন্দিন কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কিছু কিছু জেঠা-ছেলের একটানা বাধার ফলে সৃষ্ট মনোযাতনাগুলো আমাদের আনন্দলোকে সাময়িক মেঘ সৃস্টি করতো। এটি প্রধানত ঘটতো স্কুলে ও ক্লাসে কৃত্রিম দলাদলি সৃষ্টি করে, ভাল উদ্যোগগুলোকে বাধাগ্রস্ত করে, অথবা ভাল সরল ছেলেদের বিরুদ্ধে অসত্য অপবাদ দিয়ে। ক্যাপ্টেন হবার সুবাদে, এবং নানা উদ্যোগে নেতৃত্ব নিতে গিয়ে, স্কুলের প্রথম

দিকে আমাকে এগুলোর যথেষ্ট সম্মুখীন হতে হয়েছে। চার বছরে পূর্ণাঙ্গ হিসেবটি যখন নিই তখন কলেজিয়েট স্কুলের আকাশছোয়া বিশালত্বের কাছে আজ এসব হাস্যকর ভাবে তুচ্ছ ঘটনা মনে হবে। কিন্তু তখনকার দৈনন্দিন মনের শান্তির কথা বিবেচনা করলে এগুলোর যথেষ্ট নেতিবাচক গুরুত্ব ছিল বৈকি।

নানা অনুশীলন, নানা খেয়াল

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের একটি অনন্য ব্যবস্থা যে ছিল নবম ও দশম শ্রেণীতে বাধ্যতামূলকভাবে জুনিয়র ক্যাডেট কোরে সামরিক প্রশিক্ষণ, যেটি আগেই বলেছি। পুরো পাকিস্তানে মাত্র দুটি স্কুলে এই ব্যবস্থা ছিল—পূর্ব পাকিস্তানে আমাদের স্কুলে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে একটি স্কুলে। এর জন্য একটি বিশাল আয়োজন স্কুলে ছিল, যেটি যথাস্থানে বলা যাবে, কারণ এর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়েছি নবম শ্রেণীতে ওঠার পর। কিন্তু এক অদ্ভুত যোগাযোগে স্কুলে ভর্তি হবার পর পর ওই সপ্তম শ্রেণীতেই আমি একটি আনুষঙ্গিক সুযোগ পেয়ে গিয়েছিলাম। সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে স্কুলে একটি সামরিক কায়দার উন্নত মানের ব্যান্ড পার্টি গড়ে তোলা হবে, এবং এ জন্য সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী থেকে নির্বাচিতদের নিয়ে ট্রেনিং দেয়া হবে। প্রার্থীদেরকে তিনটি গ্রুপে নির্বাচনের জন্য ক্যান্টনমেন্ট থেকে কয়েকজন ব্যান্ড-মেজর (আর্মি ব্যান্ডের ননকমিশনড অফিসার) এসেছিলেন। সাইড ড্রাম, ব্যাগ পাইপ এবং বিউগল—এই তিনটিই ছিল গ্রুপ। আমি সাইড ড্রামে প্রার্থী হলাম। স্কুলের অ্যাসেম্বলিতে ড্রাম বাজাতাম বলে খানিকটা অভ্যাস ছিল; নানা রকম টেস্টে আমি উতরে গেলাম। বিউগল গ্রুপটির ট্রেনিং বিলম্বিত হলেও সাইড ড্রাম ও ব্যাগ পাইপের ট্রেনিং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল।

সপ্তায় কয়েক দিন স্কুল ছুটির পর ট্রেনিং হতো। সাইড ড্রামের জন্য একজন প্রশিক্ষক ব্যান্ড-মেজর ক্যান্টনমেন্ট থেকে আসতেন। সাইড ড্রাম হলো মার্চ করা বা দাঁড়ানো অবস্থায় শরীরের এক পাশে ঝোলানো ড্রাম—বেশ লম্বাটে ড্রাম, আমরা ঝোলালে ড্রাম প্রায় মাটি ছোয়ার অবস্থা হয়। আমাদের ব্যান্ড পার্টির সব যন্ত্রপাতি ইতোমধ্যে চলে এসেছিলো—সাইড ড্রাম, বিগ ড্রাম, ব্যাগ পাইপ, বিউগল এবং আরো কিছু আনুষঙ্গিক—এমন কি সামনে থাকা ব্যান্ড লিডারের ধাতব মাথাওয়ালা চমৎকার দন্ডটিও। ব্যান্ড পার্টি নির্বাচিত হয়ে গেলে আমাদের মাপমত ইউনিফর্ম তৈরির জন্য কাপড়ও চলে এসেছিল—সামরিক বাহিনীর ব্যবস্থাপনা বলে কথা।

শুরুর দিকে আমাদের প্রশিক্ষণটি ড্রামের উপর যত না হয়েছে তার চেয়ে বেশি হয়েছে টেবিলের উপর কাঠি দিয়ে প্র্যাকটিস করে। এ জন্য একটি নির্দিষ্ট টেবিল ছিল। চমৎকার দুটি ড্রাম স্টিক দেয়া হয়েছিল আমাদেরকে। স্কুলের প্রশিক্ষণ ও প্র্যাকটিস শেষ করে বাড়িতে নিয়ে যেতাম ওগুলো, যাতে সেখানেও প্র্যাকটিস করতে পারি। প্রথমে তাল লয় সম্পর্কে কিছু জ্ঞান দানের পর

আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল বেশ কয়েকটি গৎ বাজাতে। এই গৎগুলোকে বলা হতো 'রুল', এদের অধীনে ছিল আবার কিছু 'সাব রুল'। এক নম্বর রুল, দুই নম্বর রুল এমনি ধারার নাম ছিল এদের। বিভিন্ন রুলের সংমিশ্রণেই গড়ে উঠতো ড্রামের বাজনা। কিন্তু শুরুতে রুলগুলো আয়ত্ত করাটি খুব জরুরি ছিল। এজন্য বাজনার সঙ্গে সঙ্গে রুলের বোলগুলো মুখে উচ্চারণ করতে হতো, তাতে বাজনাটি শুদ্ধ হতো। যেমন এক নম্বর রুলের কিছুটা বোল ছিল এরকম :

'পোর ডাগা ডাগা ডাম, পাম ডাগা ডাগা ডাম
পাম পোররাম, পোররাম পাম পাম।'

এত প্র্যাকটিস আমি করেছিলাম যে, আজ এত দিন পরে দুটি স্টিক যদি হাতে দেয়া হয় তা হলে এরকম অনেকগুলো রুল এখনো নিখুঁত ভাবে বাজাতে পারবো, এবং ওই বোলগুলোও মুখস্থ বলতে পারবো সঙ্গে সঙ্গে। প্র্যাকটিসের স্বীকৃতিটি তখনই সঙ্গে সঙ্গে পেয়েছিলাম। আমি খুব শিগ্‌গীর ব্যান্ড-মেজরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম, এবং অন্যদেরকে দেখিয়ে দেয়ার, এবং তিনি না থাকলে সমলয়ে বাজনা পরিচালনা করার দায়িত্ব পেলাম। সাইড ড্রামে আমার অধিকাংশ সহশিক্ষার্থী ছিল আমার থেকে এক ক্লাস ওপরের অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র। তাদের দু'জনের সঙ্গে খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল এই ব্যাণ্ডের ক্লাস করতে গিয়ে। একজন হলো রাজু (রাজুউল হাসান, পরে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকারের শীর্ষ-স্থানীয় কূটনীতিবিদ) এসে বললো 'ডাক্তার, তুমি আমাকে ক্লাসের পরও খানিক্ষণ দেখিয়ে দেবে'। সে সময় স্কুলে অনেকে আমাকে 'ডাক্তার' বলে ডাকতো আমি একটি ছোট কালো সুটকেসে বইপত্র নিয়ে স্কুলে যেতাম বলে। ইউনূস ভাই তাঁর আর্টের চর্চা করে ওর উপর খুব সুন্দর করে আমার নামটি সাইনবোর্ড লেখার পেইন্ট দিয়ে লিখে দিয়েছিলেন। ওই কালো সুটকেসটি আমার এক রকম ট্রেডমার্ক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রায় একই ভাবে বন্ধুত্ব হয়েছিল অষ্টম শ্রেণীর মুকিতের সঙ্গে। মুকিত বহুকাল পর মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তান বিমান সংস্থা পি আই এ'র পাইলট থাকা অবস্থায় পালিয়ে গিয়ে মুক্তি বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল। আসামের ডিমাপুরে যে নয়জন বৈমানিক একত্র হয়ে মুক্তিযুদ্ধে প্রথম বিমান যুদ্ধ শুরু করেছিলেন মুকিত তাদের একজন ছিল; পরে বাংলাদেশ বিমান ও খ্যাতনামা কিছু বিদেশী বিমান সংস্থায় সিনিয়র পাইলট হিসেবে কাজ করেছে।

ড্রাম বাজানোর স্টিক দুটি বাড়িতে নিয়ে আসতাম বলে সেখানেও সব কাজের ফাঁকে ফাঁকে চলতো আমার প্র্যাকটিস—আমার ওই 'পোর ডাগা ডাগা ডাম' আওড়ানো আর টেবিল পেটানোতে বাড়ির সবাই মোটামুটি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তবে ওখানে আমার আসল সমজদার যে ছিল তার বয়স এক বছরের খুব বেশি ছিলনা—সে সবার ছোট ভাই মইনু। ওই ড্রাম স্টিকগুলো হাতে পাওয়াটি তার জন্য অত্যন্ত জরুরি ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যতক্ষণ না হাতে তুলে দিতাম চিৎকার করে কেঁদে বাড়ি মাত করতো। হাতে দিলে ভীষণ খুশি,

ইচ্ছে মত যেখানে সেখানে পেটাত, কারণ আমাকেও সে পেটাতেই দেখেছে। ব্যান্ড পার্টির ক্লাসের সময় আমি মাঝে মাঝে ব্যাগ পাইপের প্রশিক্ষণগুলো গিয়ে দেখতাম। সেটি আরো বেশ মিউজিক্যাল ব্যাপার—সা, রে, গা, মা তুলে তাদের কাজ শুরু হয়ে তা তখন জটিলতর সংগীতের দিকে এগিয়ে গেছে। ব্যাগ পাইপের ব্যাগ লাগানো থাকতোনা ওদের প্র্যাকটিসের সময়, শুধু পাইপ থাকতো। আমার কাছে এর সুর কেমন জানি এক রকম বিষণ্ন সুর বলে মনে হতো। এত আয়োজন, এত প্র্যাকটিস কিন্তু হায় আমাদের ব্যান্ড পার্টিটা তার পূর্ণ জৌলুসে কোনদিন দাঁড়াতে পারেনি। কোন এক অজ্ঞাত কারণে মাঝপথেই এর অগ্রযাত্রা থেমে গিয়েছিলো। তখন খুবই খারাপ লাগলেও, পরে কিন্তু ওই অভিজ্ঞতাটুকুকেই অনেক বড় প্রাপ্তি মনে হয়েছে—আমাদের ব্যান্ড-মেজরের (যাকে ওস্তাদজি ডাকতাম) সযত্ন, সস্নেহ শিক্ষা, নতুন বন্ধু লাভ, তাদের সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা একত্র অনুশীলন ইত্যাদি।

ওই সময়টাতেই আমরা কয়েক বন্ধুর এক নতুন খেয়াল মাথায় চাপলো। শুনেছিলাম পশ্চিম পাকিস্তানের সারগোদায় এয়ার ফোর্স পাবলিক স্কুলে ভর্তি হওয়া যায় সপ্তম শ্রেণীতেই; আর তা করতে পারলে পাইলট অফিসার হিসেবে এয়ারফোর্সে যাওয়া একেবারেই অবধারিত। বোরহান, মুকিত, আর আমি এক সঙ্গে ঠিক করলাম সারগোদায় ভর্তি হবার চেষ্টা করবো। এমনিতেই বিমান জিনিসটির সঙ্গে আমার আগে থেকেই সব রোমান্টিক কল্পনা। এখনতো আমরা তিনজন ছোটখাট মানুষকে আকাশী নীল রঙের ফ্লাইট ক্যাডেট পোষাকে কল্পনায় দেখতে শুরু করে দিয়েছিলাম। কিন্তু অন্য অনেক কিছুর মত সারগোদায় যাওয়ার পরিকল্পনা আমাদের আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। শুধু মুকিত অন্য ভাবে পরে ঠিকই বৈমানিক হয়েছিল। আমার যে ওই লাইনে কোন ভবিষ্যৎ নেই সেটি টের পেয়েছিলাম ওই বছরেই কিছু পরের দিকে, যখন লেডি হেল্‌থ ভিজিটর স্কুলে পরিদর্শনের জন্য এসেছিলেন।

হেলথ ভিজিটর

প্রতি বছর একবার করে স্কুলে হেলথ ভিজিটর আসা নাকি নিয়ম ছিল। তাঁরা কয়েকজন কয়েক দিন ধরে এসে ক্লাসে ক্লাসে গিয়ে স্কুলের ছেলেদের দু'একটি সাধারণ স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতেন। বছর বছর বিশেষ মৌসুমে স্কুলে আরো একটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ করা হতো তা হলো বসন্তের টিকা দেয়া। সে সময় প্রায় প্রতি বছর ফাল্গুন-চৈত্র মাসে মারাত্মক বসন্ত রোগের ছোঁয়াচে প্রাদুর্ভাব দেখা দিত; অনেক মানুষ মারা যেত, যারা বেঁচে উঠত তাদের মুখ ও দেহে বসন্তের দৃষ্টিকটু দাগগুলো সারা জীবন বহন করতে হতো—আমাদের পরিচিত অনেক মানুষেরই সে দাগ ছিল। ওইসময় সিনেমা হলে গেলে শুরুতেই দেখানো হতো সতর্কতামূলক স্লাইড—রোগাক্রান্তদের ভীতিকর ছবিসহ গম্ভীর কণ্ঠে আওয়াজ

আস্‌তো 'প্রদেশে বসন্তের মহামারী শুরু হয়েছে। অবিলম্বে টিকা নিন, টিকা নিন'। আমাদের প্রায় প্রত্যেকের হাতের এক জায়গায় খুব বড় সড় দাগ আছে, যা ওইসময়ে প্রথম টিকা নেয়ার চিহ্ন, খুব ছোট বেলায় নেয়া। ছুরি দিয়ে কেটে কেটে দিয়ে ভাল ভাবে ওটা দিতে হতো, এবং অনেক পেকে ফুলে উঠে পরে স্থায়ী দাগ হয়ে যেত। এর পরেরগুলো অবশ্য তুলনামূলক ভাবে সহজে নেয়া। একটি হ্যান্ডেলের মাথায় সিকি মুদ্রার আকারের বৃত্তাকার জায়গায় অনেকগুলো দু'তিন মিলিমিটার লম্বা সুঁচ লাগানো থাকতো। হাতের চামড়ার উপর এক ফোটা টিকার তরল পদার্থ ফেলে ঠিক ও জায়গায় সুঁচওয়ালা বৃত্তটি একটু চেপে মোচড় দিয়ে ঘুরিয়ে নেয়া হতো। তাতে যে সামান্য আঁচড় কেটে রক্ত দেখা দিত তার সঙ্গে টিকা লেগে একাকার হয়ে যেত, ভেতরেও ঢুকতো একটু। এর পরে সামান্য ঘায়ের মত হতো, জ্বরও উঠতো, কিন্তু স্থায়ী কোন দাগ পড়তো না। প্রায়শ কলেরাও মহামারী রূপে দেখা দিত বলে স্কুলে পরের দিকে কলেরার টিকা ইনজেকশান রূপে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এটিকে আমরা খুব ভয় করতাম, কারণ বেশ ব্যথার ব্যাপার ছিল। পরে অবশ্য খুবই দ্রুত এক ঝটকায় দেয়া কলেরা শট্ দেবার প্রচলন হয়েছিল। স্কুলে আমরা লম্বা লাইনে দাঁড়াতাম। মুহূর্তের মধ্যে এক একজনকে শট দেয়া হয়ে যেতো। আমার স্কুল জীবনের অনেক পরে সারা পৃথিবীকে বহু চেষ্টায় বসন্তমুক্ত ঘোষণার (১৯৭৯) পর থেকে কারো আর বসন্তের টিকা দেয়ার প্রয়োজন হয়নি। কলেরার শট অবশ্য কখনো তেমন ব্যাপক ভাবে দেয়া হয়নি, খুব কার্যকর নয় বলে। পরে এটি দেয়া একেবারেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের স্কুলে এবারের হেল্‌থ ভিজিটর আসার সঙ্গে অবশ্য বসন্ত বা কলেরার টিকা দেবার কোন সম্পর্ক ছিলনা।

আমাদের ক্লাসে এসে বসলেন বছর তিরিশেক বয়সের একজন মহিলা। প্রত্যেককে ডেকে ডেকে মুখ হা করিয়ে এটি সেটি দেখলেন। তারপর কিছুটা সময় নিয়ে যেটি করলেন তা হলো চোখ পরীক্ষা। আমাদের সাহায্য নিয়ে তিনি এক দিকের থেকে ছাত্রদের সরিয়ে একটু জায়গা সৃষ্টি করলেন। দেয়ালে একটি চার্ট টাঙ্গালেন যেখানে সবার উপরে খুব বড় করে E অক্ষরটি লেখা আছে, তারপরের লাইনে এর চেয়ে একটু ছোট আকারের এলামেলো ক্রমে আরো দু'তিনটি অক্ষর, পরের লাইনে আরো ছোট আরো বেশি সংখ্যক অক্ষর তাও এলোমেলো ক্রমে, এমনি ভাবে দশ-এগারো লাইন যার একেবারে নিচের অক্ষরগুলো দেখা যায় কি যায়না এমন ছোট। এখন ফিতা দিয়ে মেপে চার্ট থেকে বিশ ফুট দূরের একটি চেয়ারে এক এক জনকে বসিয়ে অক্ষরগুলো পড়তে দেয়া হলো। আমি শেষের দিকের বেশ কয়েকটি লাইনই পড়তে পারলামনা যেগুলো অন্যরা অনায়াসে পড়লো। হেলথ ভিজিটর আমাকে ঝেড়ে বকা দিলেন—দূরের জিনিস দেখতে আমার যে এত অসুবিধা তা আমি এত দিন কাউকে বললাম না কেন? আমি ও লা জওয়াব। দূরে কম দেখার চোখের অসুখটি নাকি আমার ইতোমধ্যেই অনেকখানি

এগিয়ে গেছে, যথাসময়ে চশমা নিলে যেটি হয়তো এতখানি হতো না। হ্যাঁ স্কুলে সব সময় সামনের বেঞ্চে বসতাম অন্য কোন কারণে না হলেও ব্ল্যাকবোর্ড ভাল দেখার জন্য। এ ছাড়া কোন দিনই মনে হয়নি যে আমার কোন সমস্যা আছে। হেলথ ভিজিটর তাঁর প্যাডে লিখে আমাকে একটি ব্যবস্থাপত্র দিলেন চোখের জন্য অবিলম্বে ডাক্তার দেখাতে।

সে সময় চট্টগ্রামে কোন চক্ষু বিশেষজ্ঞ ছিলেন না। জেনারেল প্র্যাকটিশনারই দেখলেন, ওই একই রকম চার্ট দিয়ে; আমার নেগেটিভ পাওয়ার, শুরুতেই নিতে হলো মাইনাস ৩.২৫ পাওয়ারের চশমা, রীতিমত পুরু কাচের। সেই থেকে চশমা আমার চিরসঙ্গী, রাতে ঘুমানোর সময় ছাড়া খোলার কোন উপায় ছিলনা। কারণ নিয়ম মত বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নেগেটিভ পাওয়ার বেড়েই চলেছিল (একেবারে পঁচিশ-ত্রিশ বছর বয়স না হওয়া পর্যন্ত), আর চশমার উপর নির্ভরশীলতাও বেড়েছে। শরীরের একরকম অঙ্গ হয়ে পড়ার ফলে কখনো কখনো চশমা নিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছি, কিংবা বেখেয়ালে চশমার উপর দিয়েই পানি দিয়ে মুখ ধোয়ার চেষ্টা করেছি। এসব কখনো বড় অসুবিধা মনে হয়নি, শুধু স্কুল জীবনে একটি অসুবিধা ছাড়া। এটি হলো স্কাউটিং বা জুনিয়র ক্যাডেট কোরের নানা ক্যাম্প ইত্যাদিতে রাত কাটাতে হলে বন্ধুরা আমার দুর্বল জায়গাটি বুঝে রাতে চশমা চুরি করতো, পরের দিন আমার হাতড়িয়ে চলার মজা দেখতে। অবশ্য এর অন্যান্য নানা দিকও ছিল। শুরুতে অভিভাবকরা খুব শোরগোল তুলেছিল আমার অল্প স্বল্প যে কোন আলোতে একটানা বই পড়ার অভ্যাসকে চোখের রোগের জন্য দায়ী করে, সেটি আমার মধ্যে কোন ভাবান্তর আনতে পারেনি। ওদিকে ডাক্তার সাহেব ভিটামিন ইত্যাদির অভাবকে দায়ী করছিলেন এবং সে জন্য নানা ক্যাপসুল এবং কডলিভার অয়েল নামক এক অপ্রিয় জিনিস আমার জন্য বাধ্যতামূলক করেছিলেন। সেই থেকে বোতলের গায়ে বিরাট এক মাছ বহনকারী মানুষের ছবি সহ ওই বিস্বাদ বস্তুটি আমার খুব পরিচিত। 'দূরদৃষ্টির' অভাব মায়োপিয়ার জন্য ভিটামিন ঘাটতিকে দায়ী করার ব্যাপারটি অবশ্য পরে চিকিৎসা শাস্ত্রে তেমন কলকে পায়নি। ইতিবাচক দিকের মধ্যে আমি চশমা জিনিসটিকে বেশ ফ্যাশনের বিষয় হিসেবে নিয়ে এর ফ্রেম, কাচ ইত্যাদি নির্বাচনকে বেশ উপভোগ করেছি। অপটিক্সের দোকানের ঝলমলে আলো এবং পরিবেশ, নতুন চশমায় ঝকঝকে দেখা এসবও আমার বেশ প্রিয় অভিজ্ঞতা ছিল। প্রায় প্রতি ছয় মাস অন্তর চোখ দেখিয়ে চশমা বদলাতে হতো বলে এই অভিজ্ঞতা বার বার আসতো। তার চেয়েও বড় কথা হলো এটি আমাকে বার বার ঢাকায় যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছে—কারণ উপমহাদেশের বিখ্যাত চক্ষু বিশেষজ্ঞ টি আহমদ ও রেফাত উল্লাহ ঢাকায় থাকেন। এরপর থেকে আমার চশমার ব্যবস্থাপত্র ঢাকা থেকেই নিয়েছি। ভাবতে ভাল লাগে দেরিতে হলেও আমার চোখের চিকিৎসা শুরু হতে পেরেছিল স্কুলে নিয়মিত হেলথ ভিজিটরের কারণে।

ঢাকায় আমি যেতাম ডাঃ টি আহমদের কাছে। ইতোমধ্যেই তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে, দীর্ঘ দাড়ি মন্ডিত শান্ত সৌম্য চেহারা তাঁর। সারা প্রদেশ থেকে প্রচুর রোগীতে ঠাসা থাকতো তাঁর চেম্বার। যে ঘরটিতে চোখের পরীক্ষা করতেন আলো-অন্ধকারে যথেষ্ট মায়াবী একটি পরিবেশ থাকতো সেখানে। আমার অষ্টম শ্রেণীর ফাইনাল পরীক্ষার পর যখন ঢাকা গিয়ে ডা. টি আহমদকে চোখ দেখাতে গিয়েছি, তিনি চেম্বারের এক পাশে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন রোজ সকালে কোরান পড়ি কিনা, আমি বল্‌লাম এখন নিয়মিত পড়িনা। তিনি বল্‌লেন রোজ ভোরে উঠে কোরান তেলাওয়াত করতে হবে চোখ ভাল রাখতে হলে। সেটি করলে চশমার পাওয়ার এভাবে বাড়বেনা। আমি কিন্তু কোরান পাঠ আর চোখের পাওয়ারের সম্পর্ক স্থাপনের এই বিষয়টি সে সময়েও তাঁর কাছ থেকে আশা করিনি।

প্রত্যেক বছর জানুয়ারিতে স্কুলে যখন নতুন ছেলেরা আসতো আমার মধ্যে অদ্ভুত এক আনন্দের অনুভূতি কাজ করতো। আমাদের ক্লাসেও অবধারিত ভাবে নতুন কেউ কেউ আসতো। সরকারী কর্মচারীদের ছেলেরা বড় সংখ্যায় কলেজিয়েটে ভর্তি হতো বলে বদলীর চাকরির কারণে বিভিন্ন ক্লাসে নতুন ছাত্র আসতো। তবে শুরুর পঞ্চম শ্রেণীতে ছোটদের আসার ব্যাপারটিই আমাকে বেশি আনন্দ দিত—এক সঙ্গে এক ঝাঁক নতুন মুখের সাক্ষাৎ পেতাম। ওদের কেউ কেউ আমাদের সহপাঠী বা অন্য বন্ধুদের ভাই—তাদেরকে সঙ্গে সঙ্গেই নিজেরো পরিবারভুক্ত করতাম। ছোট বড় সব নতুনদের অনেককেই শিগ্‌গীর স্কুলের স্কাউটিঙে, অনুষ্ঠানাদিতে, এবং খেলাধূলায় পেতাম। অনেকে তাদের নতুন নতুন ধরনের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে আমাদের জীবনকে আরো সমৃদ্ধতর করতো যা ভালো লাগতো। এই যে নতুনদের আগমনে অদ্ভুত আনন্দ এটি কিন্তু কখনো আমাকে ছেড়ে যায়নি—কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে, বিভাগে, পরে শিক্ষক থাকাকালীন প্রতি বছর এক গুচ্ছ নতুন ছাত্র ছাত্রীরা সব সময় আমার জন্য একটি আনন্দ আবহ বয়ে নিয়ে আসতো।

ছোট বড় সবাইকে পাওয়া যেত স্কুলের বিশাল মাঠে নানা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায়। নিজে কখনো অংশ না নিলেও স্পোর্টসের যে সৌকর্য তা আমাকে খুব আকর্ষণ করতো। তার সঙ্গে স্মৃতিতে একাত্ম হয়ে আছে এসবের কয়েকজন আয়োজকের কথা। তাদের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ চরিত্র ছিলেন চট্টগ্রামের ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস অর্গানাইজার—যিনি আমার সহপাঠী বন্ধু মীর শওকত আলীর বাবা। তাঁর আরো এক ছেলে আমাদের সিনিয়র ছিলেন স্কুলে—মীর মোবাশ্বার আলী (বুয়েটের স্থাপত্য অনুষদের এককালীন ডীন)। তাঁর অদ্ভুত প্রাণবন্ত পরিচালনায় আমাদের কাছে বিভিন্ন স্পোর্টস অনুষ্ঠানগুলো হয়ে পড়তো একটি কোরিওগ্রাফ করা ক্লাসিক্যাল ব্যালে নৃত্যানুষ্ঠানের মতো। সেই পরিণত বয়সে তিনি যেই গরিমা নিয়ে মাঠে ছুটাছুটি করে আর তাঁর অনবরত ঘোষণার মাধ্যমে মাঠের নানা অংশে

একই সঙ্গে ঘটে যাওয়া নানা দর্শনীয় ঘটনাকে ছন্দিত ব্যালের মত এক সূত্রে গেঁথে দিতেন, তা না দেখলে বোঝা যাবেনা। কখনো শামিয়ানার সামনের মাইকে, কখনো মাঠের নানা জায়গা থেকে মেগাফোনের চোঙায় ভরাট উচ্চ কণ্ঠের কথার বিশেষ বিশেষ শব্দে জোর দিয়ে, বিশেষ জায়গায় টান দিয়ে তাঁর 'কম্পিটিটরস অন্ ইউর মার্ক'; 'নেক্সট, জেভেলিন থ্রোয়ার্স—টেইক ইউর পজিশন'; 'ফার্স্ট চিটাগাং গভর্নমেন্ট মুসলিম হাই, সেকেন্ড...' উইনার্স টু দি ভিক্টরি স্ট্যান্ড'; 'কংগ্রাচুলেশন উইনার্স'..., এসবে চলতে থাকতো আমাদের দর্শন ও শ্রবণ। আর একজন মানুষের উপস্থিতি মাঝে মাঝে আমাদের স্পোর্টসে ঘটতো। তাঁর খুব কাজ থাকতোনা, কিন্তু যেটুকু থাকতো সেটি তার দেহাবয়বের সঙ্গে মিলে আমাদের জন্য খুব চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতো। তিনি ছিলেন চট্টগ্রাম কমার্স কলেজের ভিজিটিং প্রফেসর একজন বেশ বয়স্ক আমেরিকান—অর্টিজ কফী। বিশাল বেঢপ রকমের মোটা দেহ নিয়ে দৌড় শুরুর স্থানটির গোড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতেন তিনি, যেন ওখানে স্থাপিত একটি মজবুত স্তম্ভের মত, উত্তোলিত হাতে ধরা থাকতো একটি পিস্তল।

'অন্ ইউর মার্ক', 'গেট সেট' বলে পিস্তলটি ফোটাতেন। বেশ ক'বছর ধরে তাঁকে এখানে এই ভূমিকায় দেখেছি। স্পষ্টত তিনিও আমাদের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং এতে তাঁর এইটুকু ভূমিকা খুব উপভোগ করতেন।

প্রজাতন্ত্র মোবারক

সংবিধান সংবাদ

চুয়ান্নোর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, এর পর পর পূর্ব বাংলায় হক মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দিয়ে এতে কেন্দ্রের শাসন ৯২-ক ধারা প্রবর্তন, প্রদেশের রাজনীতিকে একেবারে থিতিয়ে দিয়েছিলো। এ সময় এক নতুন চাঞ্চল্যকর খবরে অবস্থার খানিক পরিবর্তন ঘটেছিলো। গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ হঠাৎ গণপরিষদ ভেঙ্গে দিলেন, অথচ প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে তাঁর পদে বজায় রাখলেন (২৪ অক্টোবর, ১৯৫৪)। গভর্নর জেনারেল এভাবে গণপরিষদ ভেঙ্গে দিতে পারেন না এমন কথা বলে এ আদেশকে সিন্ধু হাইকোর্টে চ্যালেঞ্জ করলেন এক সাহসী বঙ্গসন্তান গণপরিষদের স্পীকার মৌলভী তমিজউদ্দিন খান—মুসলিম লীগেরই সদস্য। সিন্ধু হাইকোর্টে তিনি জিতলেনও কিন্তু পরে আপিলে ফেডারেল কোর্টে হেরে গেলেন। বিভিন্ন প্রাদেশিক পরিষদের ভোটে নতুন গণপরিষদ গঠিত হলে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিরা অধিকাংশই গেল যুক্তফ্রন্ট ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দলগুলো থেকে। যুক্তফ্রন্ট অবশ্য তখন আর ঐক্যবদ্ধ নেই, আওয়ামী লীগ বের হয়ে গেছে, এই দলের প্রতিনিধিরা আলাদা ভাবে গেল; বাকিরা এখনো নিজেদের জন্য যুক্তফ্রন্ট নামটি বজায় রেখেছে। পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলোতেও কিন্তু মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে গেল, কারণ তার অনেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা রিপাবলিকান পার্টি নামে নতুন দল গঠন করে বের হয়ে এসেছেন—নতুন গণপরিষদে এই নতুন দলের সদস্যও কম নয়। রিপাবলিকান পার্টি গঠনের একটি বড় কারণ ছিল সরকার তখন পশ্চিম পাকিস্তানের সব প্রদেশকে একটি মাত্র প্রদেশ করে ফেলার পথে এগিয়ে যাচ্ছিল, আর এই নতুন দল তার ঘোরতর বিরোধী ছিল। এটি সেই 'ওয়ান ইউনিটের' কথা, চুয়ান্নোর নির্বাচনের সময় থেকেই যা শুনছিলাম। ছোট প্রদেশগুলোর অন্যান্য অনেকেও এর খুব বিরোধী ছিল। কিন্তু পূর্ববাংলার অধিকাংশ গণপরিষদ সদস্য ছিল এক রকম নিমরাজি—এটি তাদের তেমন কোন ব্যাপার নয়।

অদ্ভুতভাবে নতুন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা গঠনের সময় কিন্তু গণপরিষদ বড় কোন ভূমিকা রাখলোনা। গোলাম মোহাম্মদের পছন্দ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী বগুড়া ব্যতিক্রমী এক মন্ত্রীসভা তৈরি করলেন—যাকে বলা হলো 'ক্যাবিনেট অব ট্যালেন্টস'। অদ্ভুত সব সমন্বয় ঘটলো সেখানে—সেনা প্রধান জেনারেল আইয়ুব খান তাতে মন্ত্রী হলেন, পূর্ব বাংলার ৯২-ক ধারা কালীন গভর্নর ইস্কান্দর মির্জাও মন্ত্রী হলেন (তিনিও মূলত সেনাবাহিনীর মানুষ)। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সোহরাওয়ার্দী তাতে আইন মন্ত্রী হলেন। কিছু পরে ফজলুল হকও যোগ দিলেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী হিসেবে—যাকে গোলাম মোহাম্মদ মাত্র কিছু দিন আগে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়েছিলেন। ওদিকে নানা রকম সব আপোষের ফলে ৯২-ক ধারা প্রত্যাহার করে পূর্ব বাংলায় আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হলো (৬ জুন ১৯৫৫)—আওয়ামী লীগবিহীন মন্ত্রীসভা। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু দলের যোগ দেয়াতে এটি সংখ্যাগরিষ্ঠতায় টিকে গেল। কেন্দ্রে শিগ্‌গীর আবার পরিবর্তন হলো। ট্যালেন্ট ক্যাবিনেট বেশি দিন চল্‌লো না। কারণ এর স্থপতি গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদকে পদত্যাগ করতে হলো। ওই ক্যাবিনেটের একজন শক্তিশালী সদস্য ইস্কান্দর মির্জা এবার গভর্নর জেনারেল হলেন এবং মোহাম্মদ আলী বগুড়াকে পদচ্যুত করে ক্যাবিনেটের আরেকজন সদস্য চৌধুরী মোহাম্মদ আলীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করলেন (১০ আগস্ট, ১৯৫৫)। তিনি কেন্দ্রে মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট এবং কংগ্রেসের (পূর্ব বাংলার সংখ্যালঘুদের একটি দল) সমন্বয়ে সরকার গড়লেন খুবই সুকৌশলে। ফজলুল হক মন্ত্রী রইলেন এখানেও—কিন্তু সোহরাওয়ার্দী এবার বিরোধী দলে। তাহলেও চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কতগুলো অসাধ্য সাধন করলেন। নানা মত ও পথের মানুষকে নানা ভাবে বুঝ দিয়ে একটি সংবিধান রচনা করে তাতে অধিকাংশকে প্রায় রাজিও করিয়ে ফেল্‌লেন ছাপ্পান্নো সালের প্রথম দিকেই। এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানে এমন বিতর্কিত সেই ওয়ান ইউনিটও কার্যকর করে ফেল্‌লেন সীমান্ত গান্ধী আবদুল গাফ্‌ফার খানের ভাই ডাঃ খান সাহেবকে নতুন একীভূত প্রদেশ পশ্চিম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করে।

সংবিধান চূড়ান্ত করার সময় সেই পুরোনো কথাগুলো নানা ভাবে এলো। ওয়ান ইউনিট তো হয়েই গেল, বাকি রইলো 'প্যারিটি' অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের জন-সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় পরিষদে, মন্ত্রীসভায় ও অন্যান্য কিছু কিছু ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যা-সাম্যের ফরমুলা মেনে নেয়া। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের সময় এর ঘোরতর বিরোধিতা করলেও এখন সোহরাওয়ার্দী, ফজলুল হক ও অন্যরা শেষ পর্যন্ত এটি মেনে নিলেন। একটি দিকে অবশ্য সোহরাওয়ার্দীর মুখ রক্ষা হলো—সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ওই যে পৃথক নির্বাচন চলে আসছিলো, সেটি রহিত করে যুক্ত নির্বাচন মেনে নেয়া হলো— অসম্প্রদায়িকতার পথে একটি বাধা দূর হলো। চুয়ান্নোতে যুক্তফ্রন্ট এটি দাবি করেছিল, এবং

সম্প্রতি সোহরাওয়ার্দী বিপুল আপত্তির মুখেও এর জন্য জোর প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু অন্যদিকে সংবিধান দেশকে 'ইসলামী প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করলো। কট্টর ইসলামী কিছু অবশ্য এতে ছিলনা—প্রেসিডেন্ট মুসলিম হবে, কোরান ও সুন্নাহর পরিপন্থী কোন আইন হবে না, এমনি কিছু সাধারণ কথা ছাড়া আর গাল ভরা নামটি ছাড়া। তাই সোহরাওয়ার্দীসহ অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির সমর্থক বিরোধী দলের অধিকাংশই অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা মেনে নিলেন। উর্দু ও বাংলা উভয়ে সমান মর্যাদায় পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা হলো বটে কিন্তু সব চেয়ে বড় যে বিষয়টি পূর্ব বাংলার নেতারা পেলেন না সেটি হলো চুয়ান্নোতে যুক্তফ্রন্টের সেই বড় দাবি 'পূর্ণ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন'। এ সংবিধানে তা সোনার হরিণ হয়েই থাকলো। এর অভাবে এখানেই সেই বীজ নিহিত হয়ে থাকলো, যা অল্প কিছু দিনের মধ্যে পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগকে ভাঙ্গলো (ভাসানীর ন্যাপ গঠনের মাধ্যমে) এবং বহু পরে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকেও ভাঙ্গলো। সব দিকের সব দলের এতগুলো বড় বড় আপোষ করার পেছনে একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হয়তো ছিল যে দ্রুত পাকিস্তানকে একটি সাংবিধানিক গণতন্ত্রে নিয়ে আসা। তাছাড়া পাকিস্তানব্যাপী একটি সাধারণ নির্বাচন শিগ্‌গীর করার মূলোটাও সবার সামনে ঝুলছিলো। তাই সংবিধান চূড়ান্ত হওয়াতে এবং এর ভিত্তিতে ২৩ মার্চ ১৯৫৬, দেশকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণার খবরে সবাই কমবেশি খুশি হয়েছিল; সবাই তাকাতে চাইছিল সামনের দিকে। চট্টগ্রামে আমাদের বাসায়, স্কুলে, সর্বত্র আমরাও মহাখুশিতে তৈরি হচ্ছিলাম প্রজাতন্ত্রকে স্বাগত জানাতে। সব দিকে জয়ধ্বনিতে, ব্যানারে, পোস্টারে প্রচার হলো—'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র মোবারক'।

বাসযাত্রী হয়ে দেশের গান

প্রজাতন্ত্র হলে আমাদের কী কী পরিবর্তন হবে তা নানা জায়গায় শুনছিলাম। রাণী এলিজাবেথ আর আমাদের রাষ্ট্রপ্রধান থাকবেননা তাঁর গভর্নর জেনারেলের মাধ্যমে। এখন আমাদের থাকবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট। স্কুলে ক্যাডেট কোরের বড় ওস্তাদজি হাবিলদার মেজর অনেককে জড়ো করে দেখাচ্ছিলেন (আমি তখনো তাঁর ছাত্র হইনি) যে তাঁর হাতের কব্জিতে হাবিলদার মেজর র‍্যাঙ্ক বোঝাতে পেতলের তৈরি যে রাণীর মুকুটটি এতদিন কালো চামড়ার বেল্টে ঘড়ির মত বাঁধা থাকতো তার জায়গায় ইতোমধ্যে তাঁর কাছে চলে এসেছে পেতলের চাঁদতারা—একই ভাবে বাঁধার জন্য। কারণ তিনি এখন 'রয়্যাল' পাকিস্তান আর্মির নয়, পাকিস্তান আর্মির একজন হাবিলদার মেজর। স্কুলে যেমন রঙিন কাগজ, বাহারি ফিতা, কাগজের ফুল, পতাকার সারি ইত্যাদি দিয়ে সাজাতে লেগে গিয়েছি সবাই—বাসায়ও তাই। বাসায় একটি নতুন আলোক সজ্জার ব্যবস্থা করা হলো, বাজারে কুমোর থেকে অনেকগুলো ছোট ছোট মাটির প্রদীপ কিনে এনে। আলাদা করে প্রত্যেকটিতে সলতে দিয়ে, সামান্য তেল দিয়ে ছাদের কার্ণিশে জ্বালিয়ে দেয়া হবে এগুলো।

এদিকে একটি ব্যতিক্রমী আয়োজনে আমি কিছুটা শরিক হয়ে পড়লাম। প্রধানত ইউনূস ভাইয়ের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম কলেজের ইউএসপিপি ও এর কিছু বন্ধু সংগঠনের উদ্যোগে প্রজাতন্ত্র দিবসে সারা শহর ঘুরে জাগরণী গান ও জাগরণী কথা শোনাবার একটি পরিকল্পনা করা হলো। এর প্রস্তুতি চল্‌লো কয়েক দিন ধরে। তার কোন কোনটিতে আমি উপস্থিত থাকতে পারলাম। ইউনূস ভাইয়ের কোন সৌখিন বন্ধু বিদেশ থেকে একটি টেইপ রেকর্ডার এনেছিলেন। চট্টগ্রামে তখন একেবারেই নতুন জিনিস এই টেইপ রেকর্ডার। স্থির হলো এই টেইপ রেকর্ডারে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে চলার মত অনেক দেশাত্মবোধক গান রেকর্ড করা হবে এবং তার ফাঁকে ফাঁকে জাগরণী কথা। প্রজাতন্ত্র দিবসে একটি সুসজ্জিত বাসে করে পুরো শহর ঘুরে সারাদিন এগুলো শোনানো হবে মাইকে। কথাগুলো ইউনূস ভাই রচনা করলেন, কণ্ঠও দিলেন। 'এই দেশ আমাদের সকলের, একে গড়ে তোলার কাজ আমাদের সকলের'; 'প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা দিবসে সবার প্রতি মোবারকবাদ'; 'গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠাই হবে আমাদের প্রজাতন্ত্রের মূলমন্ত্র'—এরকম কথাই ছিল সেখানে। আর গানগুলো গাইবে চট্টগ্রাম কৃষ্টি কেন্দ্রের সদস্যরা। চট্টগ্রামে তখন দুটি নাম করা সংগীত গোষ্ঠী ছিল—একটি 'আর্য সংগীত' এবং অন্যটি 'কৃষ্টি কেন্দ্র'। প্রথমটি প্রধানত শাস্ত্রীয় সংগীত ও অনুরূপ রেয়াজ ও সাধনার জন্য বিশিষ্ট ছিল; আর কৃষ্টি কেন্দ্র বামপন্থী গণসংগীতের জন্যই বেশি জনপ্রিয় ছিল। ইউনূস ভাইদের উদ্যোগের অন্যতম সহযোগী ছিল কৃষ্টি কেন্দ্র। এ কাজে মূল গায়ক থাকবেন বিখ্যাত হরি পাল (হরিপ্রসন্ন পাল)—অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোরাসের মূল গায়ক, কোন কোনটি তাঁর একক কণ্ঠে। এই হরি পালের গান সামনাসামনি বসে শোনার জন্য আমি গভীর রাত পর্যন্ত রেকর্ডিঙে তাঁদের সঙ্গে থেকেছি। তাঁর বলিষ্ঠ ভরাট কণ্ঠটি যেন গণসংগীতের জন্যই বিশেষ ভাবে তৈরি হয়েছিল।

রক্তের মন্দির সোপান তলে,
কত প্রাণ হলো বলি দান,
লেখা আছে অশ্রু জলে।

এ গান তাঁর কণ্ঠে যে না শুনেছে সে বুঝবেনা, এর দ্যোতনা কী। অনেকগুলো গান রেকর্ড করা হলো—অধিকাংশ বাংলায়, কিছু উর্দুতে এবং চাটগেঁয়েতে। 'স্বপ্ন নীল দেশ আমার, দেশ আমার'; 'প্রাণে প্রাণ মিল করে দাও, মিল করে দাও'; 'সমুদ্র উচ্ছল জনতা তরঙ্গ কে রোখে, কে রোখে'; ঝঞ্ঝা ঝড় মৃত্যু দুর্বিপাক, ভয় যারা পায় তাদের ছায়া দূর মিলাক'; 'হাম আজাদী কি হ্যায় রাখওয়ালে, দেশ হামারা, জান হামারা'; 'ইয়ে ওয়াক্ত কি আওয়াজ হ্যায় মিলকে চলো, ইয়ে জিন্দেগি কি রাগ হ্যায় মিলকে চলো'; 'জাগা হ্যায় ইনসান, জামানা বদল রহা'; 'চাটগাঁইয়া নওজোয়ান আঁরা হিন্দু মুসলমান, সিনাতে সিনা মিলাই ভাই

ঠেগাই ঝড় তুয়ান'; গানের পর গান অফুরন্ত ভাবে গেয়ে গেছেন শিল্পীরা, যাদের কেন্দ্রে হরি পাল।

হরি পালকে আমার মনে হতো মলয় ঘোষ দস্তিদারের তরুণ একটি প্রকাশ হিসেবে। বহু আগে থেকে মলয় ঘোষ দস্তিদারের গান শুনেছি। আজকের চট্টগ্রামের মুসলিম ইনস্টিটিউটের জায়গায় থাকা গম্বুজের মত দেখতে কালচারাল সেন্টারটিতেই বেশি শুনেছি। সেই উদাত্ত কণ্ঠ যেমন গণ সংগীতে, তেমনি চাটগেঁয়ে গানে। শেষেরগুলো বেশির ভাগ রমেশ শীলের অথবা তাঁর নিজের রচিত, অথবা প্রচলিত লোকগীতি থেকে সংগৃহীত। বিশেষ করে ওই চাটগেঁয়ে গানগুলোর জন্য ওই গম্বুজাকৃতি ঘরটি আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করতো :

'ছোড ছোড ঢেউ তুলি, ও ভাই ছোড ছোড ঢেউ তুলি;
লুসাই পাহারোত্তুন নামিয়েরে যার গুই খর্নফুলি'।

'দেবাইল্যা বানাইলোরে মোরে সাম্পানর মাঝি'।

'রইশ্যার বাপরে রইশ্যার বাপ, উফায় কি ভাই রইশ্যার বাপ,
বুদ্ধি দে'রে খোন প্রকারে এবার জান বাচাই'।

'সাম্পান যাবে উজানে, আমার, সাম্পান যাবে উজানে,
কে যাবিরে আয়রে তোরা আমার হাউশের সাম্পানে'।

ছোটবেলা থেকে মর্মমূলে স্পর্শ করতো বলেই, এগুলো এত ভাল লাগতো। বহু পরে শেফালী ঘোষ আর শ্যামসুন্দর বৈষ্ণব এসে তাঁর অভাব শুধু মেটাননি পুরো দেশে এরকম গানকে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। এখন তাঁরাও নেই।

প্রজাতন্ত্র দিবসে সুসজ্জিত একটি বাসে আমরা ক'জন ছিলাম—বাসের ছাদে ফিট করা ছিলো বিভিন্ন দিকে মুখ করা লাউড স্পীকার। বাসের পাশে সুচিত্রিত পোস্টারে লেখা ছিল—'পাকিস্তান ইসলামী প্রজাতন্ত্র মোবারক'। মাইক ব্যাটারিতে চল্‌লেও টেইপ রেকর্ডার চালাতে লাগছিলো সাপ্লাই থেকে কারেন্ট। তাই আমাদের বাস থামছিলো শহরের নানা জায়গায় সুবিধাজনক স্থানে, কোন সুবিধাজনক দোকানের সামনে। বাস থেকে লম্বা তার বের করে দোকান থেকে বিদ্যুৎ নেয়া হতো। এভাবে এক এক জায়গায় থেমে হয়তো আধ ঘণ্টা চলতো অনুষ্ঠান, তারপর কিছু দূর গিয়ে আবার অন্য জায়গায়। আমাদের দোকানের সামনেও যখন দাঁড়ানো হলো তখন ফুর্তি করে ভাইবোনরা সবাই ছুটে এলো। যেখানেই বাস দাঁড়িয়েছে খুবই উৎসাহ নিয়ে মানুষ ভীড় করে শুনতে এসেছে, দোকানগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে বিদ্যুৎ কে দেবে। আমার কাজ ছিল খুব সংক্ষিপ্ত—কখনো কখনো তার বের করে দেয়া, বা গুটিয়ে নিতে সাহায্য করা, এবং গর্বিত হওয়া।

স্কুল পালিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে

সেই ১৯৫৬ সালে সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় দেশীয় ও আন্তর্জাতিক কয়েকটি রাজনৈতিক ঘটনা বা ব্যক্তিত্বের এক রকম দূর থেকে সান্নিধ্যের সুযোগ হয়েছিল। এর মধ্যে একটি ছিলো নভেম্বর মাসে সুয়েজ সংকটের সময় এর প্রতিবাদে স্কুলের ক্লাস থেকে বের হয়ে গিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে যোগদান। মিশরের রাজা ফারুককে বিতাড়িত করে ফ্রি অফিসার্স নামক সামরিক অফিসাররা ক্ষমতা নেবার (১৯৫২) পর ১৯৫৪ সালে রাষ্ট্রের প্রধান পদে উঠে এসেছিলেন কর্নেল নাসের। আর দু'এক বছরের মধ্যে তিনি পরিণত হয়েছিলেন অসম্ভব জনপ্রিয় এবং সাহসী এক জাতীয়তাবাদী নেতায়; শুধু মিশরের নয়, পুরো আরব বিশ্বের। মিশরে বিদেশী কায়েমী স্বার্থের একটি অজুহাত হিসেবে কাজ করছিল ইঙ্গ-ফরাসী সুয়েজ খাল কোম্পানি। এই কোম্পানি ইউরোপ থেকে এশিয়ায় আসার জলপথের শর্টকাট মিশরের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত আন্তর্জাতিক ভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুয়েজ খালের নিয়ন্ত্রণ করতো। এর উপর মিশরের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৫৬ এর ২৬ জুলাই কর্নেল নাসের এই খালটিকে জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ কারণে অত্যন্ত ক্ষিপ্ত হয়ে বৃটেন ও ফ্রান্স মিশরকে ভীষণ ভাবে হুমকি দেয় এবং কৌশলে ইসরায়েলকে দিয়ে মিশর আক্রমণ করিয়ে সুয়েজ খালকে রক্ষা করার নামে সেখানে ইঙ্গ-ফরাসী যৌথবাহিনী অবতরণ করায় (২৯ অক্টোবর)। নভেম্বরের প্রথম দুই তিনদিনের মধ্যে এই যৌথবাহিনী বিদ্যুৎ গতিতে যুদ্ধ চালিয়ে তার সামরিক লক্ষ্যে পৌছে যায় এবং মিশরের সরকার পতনের মত অবস্থা সৃষ্টি করে। এভাবে নগ্ন সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের প্রতিবাদে সারা দুনিয়ার দেশে দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। বিশেষ করে উপনিবেশবাদের ভুক্তভোগী দেশগুলোতে ও আরব বিশ্বে মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ঢাকায় ও চট্টগ্রামে দারুণ ছাত্র বিক্ষোভ ঘটে ওই সময়।

আমার জন্য ঘটনাটি ঘটলো খুব আকস্মিক ভাবে। কলেজিয়েট স্কুলে ক্লাস চলছিলো, আমাদের ক্লাস নিচ্ছিলেন তরুণ শিক্ষক মুজাহিদ মিয়া। তিনি আমাদের সমসাময়িকদের দেয়া মজার নাম 'কোয়াইশ স্যার' হিসেবেই বেশি পরিচিত ছিলেন। শব্দটি চাটগেঁয়ে, সরাসরি আরবি থেকে আসা, যার কাছাকাছি মানে 'আরাম বোধ করা'—চাটগেঁয়েতে এর বিপরীত 'বেকোয়াইশ' শব্দটাই বরং বেশি ব্যবহৃত হয়। মুজাহিদ মিয়াকে এই নাম কেন দেয়া হয়েছিল জানিনা, তবে তিনি আমাদের প্রিয় শিক্ষক, ছাত্রদের সঙ্গে অকপটে মিশতেন, তাঁর রাজনৈতিক ধ্যান ধারণার কথাও অকপটে বলতেন। তাঁকে আমরা কম্যুনিস্ট ভাবাপন্ন বলেই জানতাম। ওই ক্লাসের সময় আমাদের স্কুলের পেছনের দিকের রাস্তায় একটি ছাত্র বিক্ষোভ মিছিল আমাদের দিকে এগিয়ে আসছিলো। শ্লোগান শুনতে পাচ্ছিলাম 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক'। স্পষ্টত ওরা আমাদেরকে মিছিলে যোগ দিতে আহ্বান করতে আসছিলো। মুজাহিদ স্যার যা পড়াচ্ছিলেন তা বাদ দিয়ে কর্নেল

নাসের আর সুয়েজ সংকটের বিষয়ে বলতে আরম্ভ করলেন, বেশ উত্তেজিত ভাবে। তিনি বললেন 'আজ সারা দুনিয়ার নির্যাতিত মানুষের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছেন বিপ্লবী নেতা কর্নেল নাসের। বাপের ব্যাটার মত একমাত্র তাঁরই সাহস আছে নিজের দেশের সম্পদ দেশের জন্য নিয়ে নেবার। তাই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাঁকে শেষ করে দেবার জন্য সৈন্য নামিয়েছে। কিন্তু তাঁর ভয় নেই, সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁর সঙ্গে আছে'। আমাদেরকে বের হতে ডাকাডাকি করছিলো মিছিলে থাকা কলেজ ও হাইস্কুলের ওই বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা। ওদের কোলাহল ছাপিয়ে শোনা যাবার জন্য স্যারের কণ্ঠ আরো জোরদার হলো। তিনি জানালার দিকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন আমরা যেন সেটি টপকে মিছিলে যাই।

ওদিকে মিলিটারি মেজাজের হেডমাস্টার কুদ্দুস ভূঁইয়া খুবই অস্থির ভাবে সামনের দিকের বারান্দায় পায়চারী করছেন, কখনো এই ক্লাসে ওই ক্লাসে ঢুকছেন। মুজাহিদ স্যারের উৎসাহ পেয়ে একজন দু'জন ছাত্র টুপ টাপ জানালা দিয়ে লাফিয়ে বের হয়ে পড়ছিলো। তাতে মিছিলের ছাত্রদের উৎসাহ আরো বাড়লো। আমি দ্রুত মনস্থির করে ফেললাম আমিও বেরুবো। এটি ছিল আমার জন্য একটি খুবই ব্যতিক্রমী ব্যাপার; তাছাড়া কাজটি সহজও ছিলনা। জানালাটি পাশের বাগানের ভূমি থেকে অনেক উঁচুতে, পতনটি মোটেই মসৃণ হলো না। তাছাড়া হেড মাস্টারের দৃষ্টি আকর্ষণের আগে বাগান আর রাস্তা পৃথক করা মাঝখানের কাঁটা তারের বেড়াটিও পার হতে হলো। দুটি তারকে হাতে টেনে ফাঁক করে মাঝখান দিয়ে যাবার চেষ্টায় জামাটিও ছিড়ে গেল অনেকখানি। এবার সব দিক থেকে রীতিমত বিক্ষুব্ধ ও সংগ্রামী ছাত্রে পরিণত হলাম, যার জন্য কিছুক্ষণ আগেও প্রস্তুত ছিলাম না। মিছিল এগিয়ে চললো, জীবনে এই প্রথম এরকম মিছিলে শ্লোগান ধরলাম : 'বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ, ধ্বংস হোক'; 'ইঙ্গ-ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, ধ্বংস হোক'; 'কর্নেল নাসের, জিন্দাবাদ'। আরো কয়েকটি স্কুলের সামনে গিয়ে আমরা মিছিলের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটালাম। শহরের বেশ খানিকটা এলাকা দিয়ে ঘুরে লালদিঘির পার হয়ে আন্দরকিল্লার দিকে যাওয়ার সময় বক্সীর হাটের মোড়ের কাছে এলে মিছিল ত্যাগ করে বাসায় চলে গেলাম। গর্ব ভরে সবাইকে পুরো ব্যাপারটি বুঝিয়ে বললাম ছেড়া সার্ট, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ার সময়ে লাগা কাদামাখা প্যান্ট ইত্যাদি খুলে ফেলার আগেই। তবে আব্বার সামনে পড়তে চাইলামনা।

পরের দিন পত্রিকায় দেখলাম ঢাকায় তুমুল ছাত্র বিক্ষোভ হয়ে গেছে, এবং বেশ সহিংস হয়েছে সেই বিক্ষোভ। বৃটিশ মালিকানাধীন কিছু কিছু স্থাপনা ভাঙচুর করা হয়েছে। তবে সব চেয়ে বড় ঘটনা ঘটেছে তোপখানা রোডে কাঠের কারুকার্যময় খুবই সুন্দর ক্লাসিক ইউরোপীয় ধাঁচের যে ভবনটিতে বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিস ছিল সেটিতে আগুন দিয়ে পুরো ছাই করে ফেলা হয়েছে। এ ভবনটি আমি দেখেছি—সুন্দর জায়গায় খুবই সুন্দর ভবন ছিল এটি। খুব দুঃখ

হলো; বিশেষ করে আমার প্রিয় লাইব্রেরির জন্য এ ধরনের ইনফরমেশন সার্ভিসের প্রতি আমি কৃতজ্ঞও ছিলাম। বিক্ষোভের জন্য খুশি হলেও বিক্ষোভকারীদের এই কাজটি আমি মনে মনে সমর্থন করতে পারিনি। বিশ্বব্যাপী আমাদের বিক্ষোভ সঙ্গে সঙ্গে কাজ দিয়েছিলো। তার চেয়েও বেশি কাজ দিয়েছিলো আমেরিকার তার বন্ধুরাষ্ট্র বৃটেন ও ফ্রান্সকে তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করার জন্য প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করাটি। হয়তো বিশ্বব্যাপী বিক্ষোভই সেই চাপ প্রয়োগে আমেরিকাকে বাধ্য করেছিলো। বৃটেন ৬ নভেম্বর যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করতে বাধ্য হয়, পরে ফ্রান্স এবং ইসরাইলও। ডিসেম্বরের মধ্যেই ইঙ্গ-ফরাসী সৈন্য মিশর থেকে প্রত্যাহার করতে হয়েছিলো। অপমানে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী স্যার এন্থনী ইডেন পদত্যাগ করেছিলেন (১০, জানুয়ারি ১৯৫৭)। অথচ এই এন্থনী ইডেন ছিলেন বৃটেনের বহু দিনের প্রথম সারির নেতা, এবং উইনস্টন চার্চিলের বহুল খ্যাত উত্তরসূরি।

সোহরাওয়ার্দী ও চৌ এন লাইকে দেখা

সুয়েজ সংকট যখন চলছিল সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী আর পূর্ব পাকিস্তানেও তখন আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ-প্রধান সরকার। চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মুসলিম লীগ, যুক্তফ্রন্ট, কংগ্রেস ভিত্তিক কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে সংবিধান দিয়েছিলো বটে, কিন্তু দীর্ঘ স্থিতিশীলতা দিতে পারেনি। তার প্রধান কারণ পশ্চিম পাকিস্তানে রিপাবলিকান পার্টির আরো উত্থান। তাঁর মন্ত্রীসভার পতন হলে আওয়ামী লীগ-রিপাবলিকান পার্টির সরকার গঠনের সুযোগ হয়ে গেল সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে (১২ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬)। প্রায় একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দলগুলোর সমর্থনের পুনর্বিন্যাসে যুক্তফ্রন্টের বদলে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। কেন্দ্রে সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মধ্যে নতুন আস্থার সৃষ্টি করেছিল—এবার বুঝি চুয়ান্নতে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচারের সময় যে সব আশা আকাঙ্খা এখানকার মানুষ প্রকাশ করেছিল সেগুলোর কিছু সুরাহা হবে। কাজেই এখানে আবহটি ছিল আনন্দের ও উঠতি আত্মবিশ্বাসের।

সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী হবার কিছুদিন পরই তিনি একটি ব্যতিক্রমী কাজ করেছিলেন পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে; তিনি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক আরো উন্নত করার জন্য চীন সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সফর বেশ ফলপ্রসূ হয়েছিল এবং চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের একটি বিশেষ সম্পর্কের সূচনা তখন থেকেই হয়েছে। মনে রাখতে হবে গণচীন তখন পশ্চিমা বিশ্বের কাছে একেবারেই অপাঙক্তেয় ছিল, সেখানকার অধিকাংশ দেশ চীন বলতে তাইওয়ানের চিয়াং কাইশেক সরকারকেই বুঝতো, তাকেই স্বীকৃতি দিত; এবং জাতিসংঘে, এমন কি এর নিরাপত্তা পরিষদে চীনের প্রতিনিধিত্ব করতো ওই সরকারই। অন্য দিকে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে এক সম্মেলনের উদ্যোক্তা হয়ে গণচীন জোটনিরপেক্ষ উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রশংসা ও

সম্মান লাভ করতে শুরু করেছিলো। সোহরাওয়ার্দীর চীন সফরের কয়েক মাসের মধ্যেই গণচীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই পাকিস্তান সফরে এসেছেন, ঢাকাতেও এসেছেন। এই সফরও পূর্ব পাকিস্তানে একটি বিরাট উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল। চৌ এন লাই ছিলেন চীনের কম্যুনিস্ট বিপ্লবের নায়ক মাও সেতুঙের ঘনিষ্ঠতম সহযোগী, চীনের বিপ্লবের একজন কিংবদন্তির মানুষ। তাঁকে ঢাকায় পেয়ে, প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দীর পাশে পেয়ে এখানকার মানুষ খুব আনন্দিত হয়েছিলেন।

ইউনূস ভাই ঢাকায় গেলেন চৌ এন লাইকে দেখতে, আমিও তাঁর সঙ্গ নিলাম। তাঁকে দেখতে পাওয়া, তাঁর বক্তৃতা সামনে থেকে শোনা, আমার জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা। যেদিন করাচি থেকে তিনি ঢাকা তেজগাঁও বিমান বন্দরে এসে নামলেন তখন ইউনূস ভাই ও আমি আগে থেকেই বিমান বন্দরে উপস্থিত ছিলাম। সারা পথে দেখেছিলাম অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর তোরণ—প্রত্যেকটি ভিন্ন কিন্তু অত্যন্ত নান্দনিক ডিজাইনে তৈরি করা হয়েছে। কোনটিই উপর লেখা আছে 'পাকিস্তানি-চীনা ভাই ভাই', কোনটির উপর 'পাক-চীন মৈত্রী অমর হোক' ইত্যাদি। রাস্তার বিভিন্ন স্থানে পাশাপাশি রাখা মাও সেতুং আর জিন্নাহর বিশাল ছবি রয়েছে দেখলাম, আর ছিল রাস্তার দুপাশে উভয় দেশের অসংখ্য পতাকা। বিমান বন্দরে খুবই ভীড় ছিল। ইউনূস ভাই একেবারে ভেতরে ঢুকতে চাইছিলেন দর্শক গ্যালারির মধ্যে। তাহলে বিমান থেকে নামার সময় চৌ এন লাই এবং সোহরাওয়ার্দীকে দেখতে পাবেন এবং চৌ এন লাইকে অভ্যর্থনা দেয়ার দৃশ্যটাও দেখবেন। ওই ভীড়ের মধ্য দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে তিনি সাহস করলেন না। আমাকে বিমান বন্দরের গেটের কাছে একটি জায়গায় দাঁড় করিয়ে নিজে গেলেন। আমি শুধু দেখলাম এক সময় পতাকাবাহী গাড়িগুলো সামনে দিয়ে গাড়ির বহরের সঙ্গে চলে গেল। পেছনে পেছনে এলো অনেক মানুষ। রাস্তার দুপাশেও চৌ এন লাইকে যেতে দেখবে বলে প্রচুর মানুষ দাঁড়িয়েছিলো।

পরের দিন ঢাকা স্টেডিয়ামে গণ-সংবর্ধনায় পেলাম। সে এক দৃশ্যই বটে—স্টেডিয়াম ভর্তি মানুষের সামনে চৌ এন লাই এবং সোহরাওয়ার্দী। প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান স্বাগত মানপত্র পড়লেন বাংলায়। চৌ এন লাই চীনা ভাষায় তাঁর বক্তৃতা দিলেন। কিছুক্ষণ পর পর বাংলা অনুবাদটি শোনালেন আতাউর রহমান খানই। পাকিস্তান-চীন বন্ধুত্ব নিয়ে, জোট নিরেপক্ষ আন্দোলন নিয়ে কথা ছিল তাঁর বক্তৃতায়। কিন্তু আমি বিশেষ ভাবে খুশি হলাম যখন তিনি মাত্র কয়েক দিন আগের সুয়েজ সংকটের কথা উল্লেখ করে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হবার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে অভিনন্দিত করলেন। এতে আমি বেশ কিছু আত্মতৃপ্তি অনুভব করলাম। পুরো আবহটিতে একটি অদ্ভুত আবেগ অনুভব করছিলাম, আমার সেই অল্প বয়সেও। গণচীনের বিপ্লবের অন্যতম নায়ক চৌ এন লাই এসেছেন আমাদের মধ্যে—চারদিকে আমাদের জনতা। তাঁর পাশে সোহরাওয়ার্দী—আমাদের নেতা,

যিনি আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। আমরা চৌ এন লাইকে সংবর্ধনা দিতে পারলাম বাংলায়। তাঁর বক্তৃতার অনুবাদ করা হলো সরাসরি বাংলায়। মনে হলো ঠিক এই সময়ে ওই আবহের মধ্যে উপস্থিত না থাকতে পারলে একটি ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হতাম।

সন্ধ্যার পর স্টেডিয়ামে চীনা সাংস্কৃতিক দলের পরিবেশনা দেখলাম। চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে একটি বড় সাংস্কৃতিক দল এসেছিলো। এত বড় মাপের একটি অনুষ্ঠানের কথা আগে কখনো কল্পনাও করিনি। শুরুতে একটি তথ্য চিত্র দেখানো হলো চীনা মুক্তি ফৌজের সংগ্রামের বিষয়ে। জাপানি আক্রমণ, চিয়াং কাইশেকের কুও মিন টাং বাহিনীর সঙ্গে লড়াই, লং মার্চ, বিজয়, তিয়ান আন মান স্কোয়ারে মাও সেতুঙের গণচীন প্রতিষ্ঠার ঘোষণা—সব কিছু দেখানো হলো। মাও সেতুঙের সাম্প্রতিক একটি বক্তৃতা পুরো দেখানো হলো—ইংরেজি সাব টাইটেল দেয়া। তারপর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হলো। অপূর্ব কিছু অ্যাক্রোবেটিকস দেখলাম, সবই খুবই নান্দনিক ভাবে মিউজিকের তালে তালে। নৃত্যনাট্যের মত কিছু কিছু স্কেচ দেখানো হলো—কোনটি জনতার সংগ্রামের, কোনটি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে, আবার কোনটি হাস্যরসের। খুবই বিশাল আয়োজনে, বহু শিল্পীর অংশ গ্রহণে অনুষ্ঠিত হলো নিখুঁত এসব নৃত্য-নাট্য। এর মধ্য একটি অদ্ভুত জিনিস দেখানো হলো যাতে তাদের শিল্প-সক্ষমতাটি দারুণ ভাবে ফুটে উঠেছে। নৌকায় সমুদ্র পাড়ি দিচ্ছে কিছু যাত্রী, মাঝিরা নৌকা চালাচ্ছে। হঠাৎ সমুদ্রে ঝড় উঠলো, ঝড়ের সঙ্গে লড়াই চল্‌লো নৌকার, মনে হচ্ছিল যে কোন মুহূর্তে তলিয়ে যাবে নৌকা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাদের জয় হলো, তারা বেঁচে রইলো। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো স্টেজে সমুদ্র, পানি, নৌকা, এমনকি এরকম পরিবেশের কোন পশ্চাদপটই নেই। আছে শুধু অনেক নৃত্যশিল্পী—তারাই অঙ্গভঙ্গিতে সমুদ্রে ঢেউ খেলালো, ঝড় তুললো, নৌকায় সংগ্রাম করে গেল, টিকে রইলো। যেমন নৌকার যাত্রীরা একদিকে যেভাবে ওপরে উঠলো আর অন্যদিকে যেভাবে নিচে নামলো তাতেই বোঝা যাচ্ছিল কী ভীষণভাবে নৌকাটি হাবুডুবু খাচ্ছে। কখনো এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয়নি বাস্তবে কিছু নেই, শুধু মানুষ আছে। একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান যে একটি বিপ্লবী জাতি সম্পর্কে কী রকম উচ্চ ধারণা সৃষ্টি করতে পারে চীনা সাংস্কৃতিক দলটি সেটি প্রমাণ করছিলো স্টেডিয়াম ভর্তি মানুষের কাছে।

মনে হয়েছে ঢাকায় চৌ এন লাইয়ের সফর শুধু পাকিস্তান-চীন বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে একটি শুভ সূচনা ছিলনা, সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রীত্ব এবং পূর্ব বাংলার আতাউর রহমান সরকারের জন্যও সেটি ছিল একটি উজ্জ্বল মুহূর্ত। প্রধানমন্ত্রী থাকা কালেই সোহরাওয়ার্দীকে আবার দেখেছি বেশ কয়েক মাস পর, সেবার খুবই কাছে থেকে। তিনি তখন একবার চট্টগ্রাম এসেছিলেন, খুব সম্ভব চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের ভিত্তি প্রস্তর দিতে। সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রী হবার পর থেকেই আমাদের বাসায় এবং অন্যত্র সবার কথাবার্তায় মনে হচ্ছিল যে এবার

আমাদের নিজেদের একজন মানুষ পাকিস্তানের কর্তৃত্ব পেল—সেটি শুধু আওয়ামী লীগ সমর্থকরা নয় বরং অন্য দলের সমর্থকরাও, বিশেষ করে যারা চুয়ান্নোর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের পক্ষে ছিলো। বড়দা সালাম ভাই দলের একেবারে জন্মলগ্ন থেকে আওয়ামী লীগের ও সোহরাওয়ার্দীর ভীষণ ভক্ত। তাঁর কথাবার্তায় মনে হতো এখন আমাদেরই সরকার—আমরাই ঠিক করবো পাকিস্তান কী করবে না করবে। সোহরাওয়ার্দী নিজেও কিন্তু পূর্ব বাংলায় এসে কর্মীদের সঙ্গে ছাত্রদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলে এমন ধারণা দিতে সাহায্য করেছেন। এর প্রমাণ পেলাম সেবার তাঁর চট্টগ্রাম ভ্রমণের সময় বড়দার সঙ্গে তাঁর একটি সভায় গিয়ে। ছোট জায়গায় কিছুটা ঘরোয়া পরিবেশে ছাত্র ও কর্মীদের একটি সভা, স্থানীয় নেতারাও ছিলেন। মানুষের সংখ্যা অনেক না হলেও জায়গার অভাবে ভীড়টি ছিল বেশি। গরমে ঘামে প্রধানমন্ত্রী একেবারে ভিজে গিয়েছিলেন, ফ্যানের বাতাসে না কুলানোতে ছাত্রদের কয়েকজন পেছনে দাঁড়িয়ে হাত পাখা দিয়ে তাঁকে বাতাস করছিলো। বাংলা উচ্চারণটি একটু উর্দু-ঘেঁষা, কিন্তু বেশ স্বচ্ছন্দ। লক্ষ্য করলাম ঘন ঘন একটি কথায় উর্দু ভাব থেকে যাচ্ছিল—'আমি বল্লাম যে' এই কথাকে তিনি বলছিলেন 'আমি বল্লাম কে'। একবার কী একটি বরাদ্দের কথা বলতে গিয়ে 'পঞ্চাশ টাকা' বলাতে কে একজন কানে কানে তাঁকে শুধরে দিলে তিনি হেসে বল্লেন 'আরে বাবা পঞ্চাশ লাখ, পঞ্চাশ লাখ!' আমি ছোট ছিলাম বলে অনায়াসে ভীড়ের মধ্য দিয়ে গলে গিয়ে একেবারে সামনে দাঁড়িয়েই এসব দেখতে পেয়েছিলাম। পুরো পরিবেশই বলে দিচ্ছিল ইনি অভিজাত কোন প্রধানমন্ত্রী নন্—গণমানুষের প্রধানমন্ত্রী। অনেক কিছু অর্জিতও হয়েছিল তখন পূর্ব বাংলার জন্য। এই প্রথম পূর্ব বাংলার মানুষ অন্তত কোন কোন ক্ষেত্রে তার নায্য হিস্যা পেতে আরম্ভ করেছিল। সংখ্যা-সাম্যের নীতির সমর্থক সোহরাওয়ার্দী যত বেশি ক্ষেত্রে সম্ভব সত্যি সত্যি এই সাম্য আনার ক্ষেত্রে চেষ্টার ত্রুটি করেননি।

সোহরাওয়ার্দী কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর নীতিকে পূর্ব বাংলার তরুণদের অনেকের কাছে জনপ্রিয় রাখতে পারেননি। 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ৯৫% আদায় হয়ে গেছে' তাঁর এমন কথা তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। তাঁর খুবই আমেরিকা-ঘেঁষা নীতিও একুশ দফার স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতির সঙ্গে মোটেই সঙ্গতি সম্পন্ন ছিলনা। শুনেছিলাম সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে সরাসরি গিয়ে প্রতিবাদী ছাত্রদেরকে তিনি বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে শূন্যের সঙ্গে শূন্য যোগ করলে শুধু শূন্যই থেকে যাব বলেই বড় পুঁজিবাদী দেশের সহায়তা নিতে হচ্ছে তাঁকে। তাঁর এই বিখ্যাত জিরো থিওরিও সবাইকে শান্ত করতে পারেনি—এমন কি মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে তাঁর দলেরই একটি বড় অংশকে। টাঙ্গাইলের কাগমারিতে আয়োজিত মাওলানার কাগমারি সাম্মলনে দলে বিভাজন স্পষ্ট হয়েছে, এবং আরো পরে ঢাকার রূপমহল সিনেমায় অনুষ্ঠিত সভায় বিভাজনটি সম্পূর্ণ হয়েছে মাওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে নতুন বামপন্থী দল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির (ন্যাপ) জন্মের

মাধ্যমে (২৫ জুলাই ১৯৫৭)। এখন অবধি যে ট্র্যাডিশন চলছে শুনেছি ওই রূপমহল সিনেমায়ও মূল দলের পক্ষ থেকে হামলা ও ভাঙ্গচুর হয়েছিল ওই দল-ভাঙ্গনের সভাকে ঠেকাতে। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রীসভা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তবে এর পতন ঠিক তাঁর নিজ দলের বিভাজনের কারণে ঘটেনি। প্রধানত পশ্চিম পাকিস্তানে তাঁর প্রধান শরিক দল রিপাবলিকান পার্টির এবং প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মির্জার অসন্তুষ্টি ঘটিয়েছিলেন বলেই প্রধানমন্ত্রীত্বের মাত্র এক বছরের মাথায় তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়েছিলো (১৭ অক্টোবর ১৯৫৭)। এই খবরে একটি বিষাদের ছায়া নেমে এসেছিলো আমাদের বাসারও সবার মধ্যে।

অন্য সবার দেখাদেখি সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীসভা নিয়ে আমিও বেশ পুলকিত ছিলাম, বিশেষ করে তাঁকে ওই দু'বার সামনা সামনি দেখার পর। তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় বেশ কয়েকজন বাঙালি মন্ত্রী ছিলেন, খুব সম্ভব মন্ত্রীসভার অর্ধেক। তাঁদের নিয়ে আমার তেমন কোন উৎসাহ ছিলনা; ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু একজন—তিনি শিল্পমন্ত্রী আবুল মনসুর আহমদ। কারণটি কিন্তু তাঁর মন্ত্রীত্ব নয়, বরং তাঁর লেখনী—রাজনৈতিক হাস্যরসের লেখনী। নিজে রাজনীতিবিদ হয়েও রাজনীতিবিদদের প্রতি নির্মম স্যাটায়ার করতে তাঁর জুড়ি ছিলনা। বাসায় অনেকদিন ধরে তাঁর 'ফুড কনফারেন্স' বইটি ছিল—আমি বার বার পড়েছি, কমিকের মজা পেতাম বলে; বিশেষ করে ওই বইতে থাকা কতগুলো কার্টুন আমার মাথায় একেবারে গেঁথে গিয়েছিলো। এতে 'ফুড কনফারেন্স' গল্পটির কথাই ধরা যাক—অবিভক্ত বাংলার নেতাদের নিয়ে সে গল্প। চল্লিশের মন্বন্তরের দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য সমস্যার সমাধানের জন্য সর্বদলীয় ফুড কনফারেন্স করছেন নেতারা কলকাতার অতি দামি রেস্টুরেন্ট ফার্পোতে। নামে নয় তাঁদের টাইটেলেই নেতাদের পরিচয় পাওয়া যায়। শেরেবাংলা (ফজলুল হক) টাইটেলটি কার তা তো জানাই আছে। পাঠককে বাকিদেরগুলো বুঝে নিতে হচ্ছে তাঁদের বক্তব্য, আচরণ ও ওই কার্টুনে দেখা ছবি থেকে—কারণ ছবিতে যার যার টাইটেল অনুযায়ী পশুর অবয়ব থাকলেও মুখের দিকে তাঁর মূল চেহারা বোঝা যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মহিষে বাংলা (নাজিম উদ্দীন) তাঁর ফুড স্কীম নিয়ে দীর্ঘ বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর শেরেবাংলা, সিংহ-ই-বাংলা (শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী—হিন্দু মহাসভার নেতা, অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী ফজলুল হকের কোয়ালিশন পার্টনার, হক-শ্যামা মন্ত্রীসভা খ্যাত), গাধা-ই-বাংলা (সোহরাওয়ার্দী), চুঁহা-ই-বাংলা (ইঁদুর চেহারার, কে বুঝতে পারিনি) সবাই ভরপেটে খেয়ে কনফারেন্সের মধ্যে ঘুমিয়ে নাক ডাকাচ্ছেন। ঘুমের ঘোরে তাঁদের মনে হচ্ছে বহু দূর থেকে ভেসে আসছে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠ—'আমার এই স্কীমে খাদ্য সমস্যার সমাধান হবেই হবে, হবেই হবে, হবেই হবে...।' সভার শেষে নেতারা যখন ফার্পো রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে এলেন কলকাতার রাস্তায়—দুর্ভিক্ষে বুভুক্ষু মানুষ তখন মরে সাফ্ হয়ে গেছে। শ্লোগান শোনা গেল 'মানুষে বাংলা মুর্দাবাদ'; গড়ের মাঠের ওধার থেকে তার প্রতিধ্বনি এলো 'জানোয়ারে বাংলা জিন্দাবাদ'।

কর্ণফুলির উজান বেয়ে কাগজকল ও জলবিদ্যুৎ

অষ্টম শ্রেণী শুরুর ওই শীতকালে (জানুয়ারি ১৯৫৭) একই সঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা দেখা এবং এর পুরো ভ্রমণটি অনেক আনন্দ ও অনেক ভাবনার সৃষ্টি করেছিলো। আব্বা ও চৌধুরী খালু ঠিক করেছিলেন লঞ্চে কর্ণফুলি ধরে চন্দ্রঘোনা আর কাপ্তাই যাবেন, আর আমাকে ও টুনুকে নিয়ে যাবেন। এর জন্য তাঁরা সব কিছুর বিস্তারিত পরিকল্পনা করে রেখেছিলেন—কোথায় কার আতিথ্য গ্রহণ করবেন, কী দেখবেন—সব কিছু। নেহাত বেড়াবার উদ্দেশ্যে এই পরিকল্পনা ছিলনা। চন্দ্রঘোনায় মাত্র বছর তিনেক আগে শুরু হয়েছিলো এশিয়ার বৃহত্তম কাগজের কল। আর কাপ্তাইতে জলবিদ্যুতের বিশাল কর্মযজ্ঞটি শিগ্‌গীর শুরু হতে যাচ্ছে, এ জন্য এখানে কর্ণফুলির উপর দেয়া হবে বিশাল এক বাঁধ—এর প্রস্তুতির কিছু কাজ এখনই চলছে। দুই জায়গাতেই আব্বার এমন বন্ধু রয়েছেন যাঁরা ভাল করে দেখাতে পারবেন। পরে বুঝেছি শুধু এগুলো দেখাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলনা। পেপার মিলের একেবারে শুরুর দিনগুলোতে চুয়ান্ন সনে এখানে বাঙালি-বিহারি দাঙ্গায় মিলের জেনারেল ম্যানেজার সহ যে অনেকগুলো করুণ মৃত্যু ঘটেছিল তাতে আব্বা খুব দুঃখ পেয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে সেই ঘটনার সম্পর্কেও ভাল করে জানতে চেয়েছিলেন তিনি।

তখন চট্টগ্রাম থেকে চন্দ্রঘোনা ও কাপ্তাই যাওয়ার সরাসরি উপায় ছিল কর্ণফুলি ধরে উজানে যাওয়া। কাপ্তাই রোড তখনো ছিলনা। ওই দিকে চট্টগ্রাম জেলার একটি বড় অঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল এই নদী পথে। আর এটিই ছিল আমাদের জন্য সুখবর। সেদিনের এমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরা নদী ভ্রমণ পরে আর কোনদিন নাও হতে পারতো, কারণ কিছুদিনের মধ্যে কাপ্তাই রোডের মতো সংক্ষিপ্ত পথ তৈরি হয়ে গিয়েছিলো। সে সময় দুটি কোম্পানির লঞ্চ কর্ণফুলি ধরে উজান-ভাটি করতো—একটি হলো দোভাষীর, অন্যটি মনসব আলীর। খুব ভোরে খাতুন গঞ্জ হয়ে চাক্তাইতে গিয়ে মনসব আলীর একটি লঞ্চে গিয়ে উঠলাম। কাঠের তৈরি ছোট লঞ্চ, বেশির ভাগ মানুষ নিচে জানালায় ঘেরা আবৃত জায়গাটিতে বসে। ওপরে রয়েছে একটি ছোট কেবিন, তার সামনে রেলিং দেয়া বারান্দা এবং একটুখানি ডেকের পাটাতন। আমাদের টিকেট কেবিনের—আব্বা আর খালু অধিকাংশ সময় ওখানে বসে অন্যান্য আর দু'তিন জন যাত্রীর সঙ্গে গল্প করলেন, চা খেলেন। আমি আর টুনু কখনো সেখানে বসে কথা শোনলাম, আর বাকি সময় বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটানা নদীর আর পাড়ের দৃশ্য দেখে গেলাম। শীতের ভোরে কুয়াশা ঢাকা নদীর আকর্ষণটিই আলাদা। কর্ণফুলি ব্রিজ ছাড়িয়ে ক্রমে ক্রমে চলে গেলাম চট্টগ্রাম জেলার অপেক্ষাকৃত দুর্গম জায়গাগুলোতে। এখানে নদীই যাতায়াতের ভরসা বলে ঘন ঘন নানা লঞ্চ ঘাট এলো, কোনটি নদীর এপারে, কোনটি ওপারে। তখন লঞ্চের ভট্ ভট্ ভট্ শব্দ বদলায়, ইঞ্জিন এবার উল্টো দিকে চলে ঘাটে গিয়ে থামার জন্য। দড়ি হাতে লাফ দিয়ে নেমে

একজন লঞ্চটি ঘাটে আটকায় এবং একটি তক্তা বের করে দেয় যাতে যাত্রীরা ওঠা নামা করতে পারে। এই অঞ্চলটি রাঙ্গুনিয়া থানায়। হয়তো যাতায়াত দুর্গম বলেই চাটগাঁয় একটি প্রবাদ আছে—কোন কিছু সরাসরি না করে ঘুর প্যাঁচে করাকে বলা হয় 'রৈন্যা দি শহরত্ য'ন' অর্থাৎ রাঙ্গুনিয়া দিয়ে শহরে যাওয়া।

সকাল গড়িয়ে দুপুর হবার কাছাকাছি সময়ে এক জায়গা থেকে কেমন যেন পঁচা বাঁশের গন্ধের মত এক রকম গন্ধ পেতে থাকলাম। ক্রমে গন্ধটি বাড়লো, সেই সঙ্গে সাদা সাদা সাবানের ফেনার মত জিনিস নদীর পানিতে ভাসতে দেখলাম—বিশেষ করে নদীর এক দিকে। গন্ধটি যদিও অসহ্য কিছু নয়, কিন্তু খুবই তীব্র ও বিশিষ্ট গন্ধ, সহজে ভোলার নয়। শুনলাম আমরা চন্দ্রঘোনায় চলে এসেছি। পেপার মিল থেকেই এই সব ফেনিল গন্ধযুক্ত বর্জ্য নদীতে আসছে।

আব্বার বন্ধু লঞ্চ ঘাটে এসেছিলেন, তাঁর সঙ্গে আরো দু'তিনজন যাঁরা মিলের কাজের সঙ্গে জড়িত। বাজারে গিয়ে সবাই খাওয়া দাওয়া করলাম, তারপর গেলাম মিল দেখতে। মিলের এক দিকে নদীর পাড়ে নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে আসা বাঁশের একটি রীতিমত পাহাড়। কাছেই পার্বত্য চট্টগ্রামের বনভূমি থেকে এই বাঁশ কেটে আনা হচ্ছে। প্রতিদিন কাগজ তৈরির জন্য অনেক বাঁশ দরকার হয়—বাঁশ তাই আসছেও সে রকম বিপুল সংখ্যায়; তাই বনের নতুন নতুন জায়গা থেকে কাটা হচ্ছে এই বাঁশ। ক্রেনে করে এই বাঁশের অনেকগুলোকে এক সঙ্গে তুলে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেয়া হচ্ছে কলের এক বিশাল মুখের ভেতর। সেখানেই নাকি ধুয়ে মুছে ভেতরে চলে যায় বাঁশ। ফেলার পর পরই বিকট শব্দ তৈরি হচ্ছে—বাঁশগুলো চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাওয়ার শব্দ। মিলের মধ্যে এক জায়গায় দেখলাম কনভেয়ার বেল্ট দিয়ে পেঁজা তুলার মত সাদা মণ্ড আসছে। ওই চূর্ণকৃত বাঁশের আঁশগুলো রাসায়নিক দ্রব্যের প্রভাবে আলাদা হয়ে গিয়েছে, তারপর ব্লিচিঙের মাধ্যমে ক্রমে একটু একটু করে সাদা হয়ে এই অবস্থা হয়েছে। আর এক জায়গায় দেখলাম পানির সঙ্গে থাকা মণ্ডের অতি পাতলা শীট চাপ দিয়ে ও গরম করে ক্রমে শুষ্ক ও আরো পাতলা কাগজের মত করে তোলা হয়েছে। একটানা বের হয়ে আসা সুন্দর সাদা কাগজ ক্রমাগত জড়িয়ে একটি বিশাল রোলে পরিণত হচ্ছে এবং গড়িয়ে প্যাকিং হবার জায়গায় চলে যাচ্ছে। সব কিছুতে কাজ করছে অনেক শ্রমিক, অনেক দক্ষ মানুষ, কাজ চলছে খুব সুন্দর ভাবে।

কিন্তু এখানে এসেছি অবধি আব্বার বন্ধু ও অন্যান্যদের কাছে শুনছি, আড়াই বছরের মত আগের আরেকটি দিনের কথা, যেদিন শ্রমিকদের পরিস্থিতি অন্য রকম হয়ে উঠেছিল—ঘটেছিল তাদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা। বাঙালি শ্রমিকদের সঙ্গে উর্দুভাষী শ্রমিকদের এই সংঘর্ষ হয়। উর্দুভাষী ম্যানেজার সুপারভাইজাররাও জড়িয়ে গিয়েছিল এই দাঙ্গার সঙ্গে। মোট তেরজনের মত মানুষ মারা গিয়েছিলো, আহত হয়েছিল অনেক বেশি। নিহতদের মধ্যে ছিলেন কর্ণফুলি পেপার মিল্সের ভারপ্রাপ্ত জেনারেল ম্যানেজার খোরশেদ। আব্বা, খালু ও তাঁদের প্রত্যক্ষদর্শী

বন্ধুরা দায়ী করছিলেন বাইরের উস্কানিতে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠা শ্রমিকদেরকে যারা খোরশেদের মত একজন দক্ষ বিশেষজ্ঞকে হত্যা করে কর্ণফুলির পানিতে ফেলে দিয়েছিল। তাদের হয়তো কোন কোন বিষয়ে বঞ্চনা ও ক্ষোভ ছিল, উস্কানি দাতারা নাকি সুকৌশলে এগুলোকে কাজে লাগিয়ে তাদেরকে খেপিয়ে তুলেছিল। নব প্রতিষ্ঠিত এই বিশাল কারখানাটির জন্য এই দাঙ্গা ও জেনারেল ম্যানেজারের হত্যা ছিল একটি বিরাট সঙ্কট। মনে হলো এই চিন্তা আব্বা কিছুতেই পুরো ভ্রমণে ভুলতে পারছিলেননা। মিল ভ্রমণ শেষে বিকেলের খানিক্ষণ আগে মনসব আলী লাইনের আরেকটি লঞ্চে কাপ্তাইয়ের উদ্দেশ্যে ওঠার সময় আমাদেরকে দেখিয়ে দেয়া হলো খোরশেদকে ঠিক কোন জায়গায় নদীতে ফেলে দেয়া হয়েছিলো। এর পর থেকে আমিও ওই চিন্তা আর ভুলতে পারছিলামনা।

চন্দ্রঘোনা থেকে কাপ্তাই—কর্ণফুলি নদীর এই অংশটি আমার কাছে অবিস্মরণীয় অপূর্ব এক দৃশ্য মনে হলো। সেই পড়ন্ত বিকেলে মনে হচ্ছিল গহীন বনের মধ্য দিয়ে নদীতে আমাদের লঞ্চ চলছে। দুপাশে অরণ্যে ঢাকা পাহাড়। ছোট লঞ্চের চাপা ভট ভট শব্দের সঙ্গে যোগ হচ্ছিল শুধু অসংখ্য পাখির কিচিরমিচির। দুই পাড়ের গাছপালার শামিয়ানা যেন নদীর উপরে এসে পরস্পর ছুই ছুই করছে এবং বিকেলকে আরো অন্ধকার করে ফেলছিল। মনে হচ্ছিল পাখিরা ছাড়াও গাছের ডালের মধ্যে আরো কেউ কেউ ছুটাছুটি করছিল মাঝে মাঝে—কাঠবিড়ালি হতে পারে, বানরও হতে পারে, কম আলোতে বোঝা যাচ্ছিল না। খুব কচিৎ নদীর পাড়ে গাছপালার পটভূমিতে দেখছিলাম দু'একজন পাহাড়ি নারী পুরুষ, কেউ ঝুড়ি মাথায়, কেউ হাতে দা নিয়ে কাজ করছে, পথ চলছে।

কাপ্তাই তখনো খুব ছোট একটি জায়গা, কারণ জলবিদ্যুতের জন্য মহাযজ্ঞটি তখনো ঠিক শুরু হয়নি। লঞ্চ এখানে ঘাটে থামলে আমরা নেমে আব্বার বন্ধুর বাসায় চলে গেলাম পাহাড়ি পথে কিছুটা হেঁটে। তিনি এখানে একজন ছোট কনট্রাক্টরের ম্যানেজার, প্রজেক্টের পূর্ব প্রস্তুতি হিসেবে রাস্তাঘাট ইত্যাদি তৈরিতে কাজ করছেন। কাজের সুবাদে কাপ্তাইতে বাসা নিয়ে থাকছেন, পরিবার পরিজন নেই। পাহাড়ের ঢালে সুন্দর বাসায় আমাদের চার জনের ভালো জায়গা হয়ে গেল। নদীর কাছে, পাহাড়ি পরিবেশে শীতের রাতে সে এক অন্য রকম আবহ আমাদের জন্য। রাতে খাওয়ার সময় আব্বার বন্ধু এই চাচার মুখে শোনলাম এখানে শিগ্‌গীর কী হতে যাচ্ছে। খুব উৎসাহী মানুষ, জল বিদ্যুৎ প্রকল্পের কারিগরি পরিকল্পনাগুলো সবই তাঁর ভাল জানা। এখন রাস্তা তৈরির সঙ্গে সঙ্গে কাজ চলছে দেশি-বিদেশী যে অনেক প্রকৌশলী ও কলাকুশলী শিগ্‌গীর এখানে আসবেন তাঁদের জন্য বাসা ইত্যাদি তৈরির কাজ। তিনি বল্‌লেন আমরা যদি আর মাত্র কিছুদিন পর আসতাম কাপ্তাইকে সম্পূর্ণ ভিন্ন অবস্থায় পেতাম। যে লঞ্চটি আমাদেরকে কাপ্তাইতে রেখে সামনের দিকে এগিয়ে গেল সেটি কিন্তু আর যেতে পারতোনা, কারণ এখানে নদীকে বেঁধে ফেলা হবে বিশাল এক মাটির বাঁধ দিয়ে,

মাটির হলেও এ যেই-সেই বাঁধ হবেনা। এর ফলে নদীর পানি জমে জমে অনেক উঁচু হয়ে, উজানের অনেক পাহাড়, বন, বাজার, লোকালয় ডুবিয়ে দিয়ে, যে বিশাল হ্রদ তৈরি হবে তার পানির পুরো চাপ একে সইতে হবে। পাশে একটি পানির পথ পাওয়ার হাউজের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ওই চাপের ফলে যে প্রচণ্ড স্রোত ওখানে পাওয়া যাবে তা দিয়ে জেনারেটর ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি হবে। এই পানি ছাড়াও প্রয়োজন মতো হ্রদের উচ্চতা ঠিক রাখার জন্য কিছু পানি বাঁধের ওপার থেকে ছেড়ে দেবার ব্যবস্থাও থাকবে। বাঁধের সঙ্গে একটি পথে থাকা বেশ কিছু গেইট আংশিক খুলে-বেঁধে এটি করা হবে—এই পথকে বলা হবে স্পীলওয়ে। পরদিন সকালে আমরা এ সবের জায়গাগুলো সরজমিনে দেখবো।

খুব ভোরে উঠে টুনু আর আমি প্রায় কুয়াশার মধ্যে বাড়ির সামনে বাগানে দাঁড়িয়ে উঁচুনিচু টিলাগুলোর সুন্দর দৃশ্য দেখছিলাম। চাচার কোরান তেলাওয়াত করার শব্দ কানে এলো। একটু কাছে গিয়ে শুনলাম এই তেলাওয়াত কিন্তু আরবিতে নয়, বাংলা অনুবাদে। বাংলা কোরান যে একই ভাবে সুর করে একই ভক্তির সঙ্গে পড়া যায় সেটি এই প্রথম দেখলাম, পরেও খুব বেশি দেখিনি। এটি আমার খুব ভাল লাগলো। সকালে তাঁদের প্রকল্পে কাজ করেন এমন কয়েকজন তরুণ প্রকৌশলী এলেন; সবাই মিলে আমরা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের পুরো এলাকা দেখতে বের হলাম। কাল সন্ধ্যায় যেটি বুঝতে পারিনি পুরো জায়গাটি কিন্তু ইতোমধ্যেই ভীষণ ব্যস্ত—চারদিকে অনেকগুলো বুলডোজার দেখলাম মাটি কাটছে, সমান করছে, বহন করছে। সঙ্গীরা বললেন 'এখন তো কিছুই না, বাঁধের কাজ শুরু হলে এ জায়গাটিকে আর চেনা যাবেনা, এই যে সরু নদীটা দেখছেন এটি এখানেই শেষ হয়ে যাবে—তারপর থেকে হবে অবারিত হ্রদ'। তাঁরা এমন ধারণা দিচ্ছিলেন যে অনেক পাহাড়, বন, লোকালয় ওই হ্রদের গর্ভে চলে যাবে, এমনকি মূল রাঙামাটি শহরও। তাছাড়া কাপ্তাই শহরটিও পরিণত হবে ইটপাথর লোহালক্কড়ের অন্য রকম এক শহর। আমেরিকার 'উতাহ কোম্পানিকে' নাকি ইতোমধ্যেই কাজ দেয়া হয়েছে। শিগ্‌গীর তাদের বিশাল জটিল সব যন্ত্রপাতিতে এ জায়গা ভরে যাবে। অনেক প্রকৌশলী, বিশেষজ্ঞ, দক্ষ মানুষ সেখান থেকেই আসবেন, দেশীরা তো বটেই। এভাবেই আগামী চার পাঁচ বছরে তৈরি হয়ে যাবে জলবিদ্যুৎ প্রকল্প; এখানকার বিদ্যুৎ যাবে অনেক দূরে দূরে। ভাবতে ভাল লাগলো যে এমন হবার আগে অন্তত একটি বার নিরবচ্ছিন্ন বয়ে যাওয়া কর্ণফুলিকে এবং কাপ্তাইকে তার আদি সৌন্দর্যে দেখতে পেলাম; এর পর হয়তো একে দেখবো সম্পূর্ণ ভিন্ন সাজে, ভিন্ন রূপে।

আমাদের ভ্রমণ কিন্তু কাপ্তাইতেই শেষ হলোনা। দুপুরের আগে চট্টগ্রামের দিকের লঞ্চে উঠে অল্প কিছুদূর যাওয়ার পরই আমরা চিৎমোরাং নামের একটি জায়গার ঘাটে নেমে গেলাম। এখানে আসার কারণ বড় চাচা খায়ের আহমদের হাতি দেখা। খায়ের আহমদ চাচা বেশ মজার মানুষ। সোনার দোকানের মূল

ব্যবসায় কিছুটা থাকলেও তিনি নানা রকম বেশ ইন্টেরেস্টিং সব ব্যবসার উদ্যোগ নিয়েছেন সময় সময়। হাতিটিও তাঁর এমনি একটি খেয়ালি ব্যবসা। দুটি হাতি তিনি কিনেছেন, কাঠ ব্যবসায়ীরা চিৎমোরাঙের কাছের জঙ্গল থেকে যে গাছগুলো কেটে কর্নফুলির ভাটিতে নানা করাত কলে নিয়ে যায় সেগুলোর পরিবহনের জন্য। এখানে নদী থেকে বেশ কিছু ভেতরের দিকে এই হাতির রক্ষণাবেক্ষণের জায়গা ও সঙ্গে একটি বাসা রয়েছে তাঁর। আমরা সেখানেই যাব। চিৎমোরাং তখন নদীর ধারে খুবই ছোট একটি বাজার মাত্র। কিছু দোকানপাট, চায়ের দোকান, ওই কাঠের আড়ৎ, এমনি কিছু কাজ কারবার নিয়ে এই বাজার। অল্প কয়েক জন বাঙালি থাকলেও বাজারের অধিকাংশই চাকমা অথবা মারমা। আমরা বাজারে না থেমে পাহাড়ি পথে ওই হাতির জায়গায় চলে গেলাম। ওখানে জঙ্গল পরিস্কার করা খানিকটা জায়গায় দু'একটি ঘর। হাতি দুটি এখানে থাকে—তাদের যত্ন আত্তি, খাওয়ানো ও দেখাশোনা করে দু'জন মাহুত। তা ছাড়া বাসায় তখন শুধু ম্যানেজার, কেয়ারটেকার এবং বাবুর্চি আছেন। সবার সঙ্গে পরিচয় হলো। এরপর হাতির কাজ দেখবো বলে সবাই এক সঙ্গে দুপুরের খাবার খেতে বসে গেলাম—মাহুত দু'জনও আমাদের সঙ্গেই খেলো। খেতে খেতে তাঁরা বোঝালেন হাতিকে কী খাওয়াতে হয় তাদের যত্ন আত্তি কেমন করে করা হয়। কেমন করে হাতি কাজ করে তা দেখলাম। বিরাট ভারী গাছের গুড়ির সঙ্গে চেইন বেঁধে সেই চেইন হাতীর গায়ে আটকিয়ে দেয়া হয়েছে। গুড়িগুলোর পুরাটাই মাটিতে স্পর্শ করে থাকে এবং এই অবস্থাতেই হাতি একে টেনে নিয়ে যায় নদীর দিকে। রাস্তাঘাটহীন পাহাড়ি এলাকার ওপর দিয়ে এরকম ভারি গুড়িকে টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য এটিই উত্তম ব্যবস্থা। এই গুড়িগুলোকে একটি চিহ্ন দিয়ে রেখে নদীতে ভাসিয়ে দেয়া হয়। নদীর স্রোতেই এগুলো ভেসে বিভিন্ন করাতকলে যায়। করাতকলগুলো এমন জায়গায় করা হয়েছে যেখান থেকে সড়ক পথে তক্তাগুলো শহরে-বাজারে সরবরাহ করা যায়। চিৎমোরাং ঘাট থেকে আবার লঞ্চ নিয়ে সন্ধ্যার মধ্যে বক্সীর হাটে বাসায় ফিরে এলাম।

আমার ল্যাবোরেটরি

করে দেখার অভ্যাস

অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় সত্যি সত্যি আমার নিজের একটি বিজ্ঞান ল্যাবোরেটরি গড়ে উঠেছিল বাসায়। এর কারণ তখন আমার জন্য একটি ল্যাবোরেটরি-আলমারি বানানো হয়েছিলো যাতে আমার তৈরি সব যন্ত্রপাতি যত্ন করে রাখতে পারতাম এবং এসবের কাজ করার জন্য সব টুকিটাকিও হাতের কাছে সাজিয়ে রাখতে পারতাম। তবে আসলে এরকম কাজ করছিলাম কয়েক বছর আগে থেকেই, যখন থেকে লাইব্রেরি থেকে ছোটদের বিজ্ঞানের বই পড়া আরম্ভ করেছি তখন থেকেই। এ ধরনের বই পড়ার সঙ্গে সঙ্গে যেখানে সম্ভব নিজে দেখা, নিজে করার একটি অভ্যাস গড়ে উঠেছিল; আর সেটি শুধু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়। যেমন কাগজ ভাঁজ করে নানা জিনিস তৈরির ছবিওয়ালা ছোটদের বই বহু আগে পড়েছিলাম বলেই সেই সব 'অরিগামি' চর্চা করেছি। মজার ব্যাপার হলো এমন এমন জিনিসও কিছুদিন কিছুটা চেষ্টা করেছি যেগুলো এর পরে আর কোন দিন করিনি। যেমন সে সময় ইউএসআইএস লাইব্রেরি ছোটদের বইতে খুব সহজ ভাবে গানের সুর পাশ্চাত্য নোটে কী ভাবে লিখে তা বোঝানো হয়েছিল এবং একটি পরিচিত গান ও সুরের উদাহরণ দেয়া হয়েছিল, তা পড়ে ও বোঝার চেষ্টা করে আমি বেশ কয়েক দিন বইটির মিউজিক নোট দেখে দেখে গাওয়ার চেষ্টা করেছি—'ইয়াংকি ডুডল, ইয়াংকি ডুডল, ইয়াংকি ডুডল ড্যান্ডি..'। শুধু তাই নয় ছোটদের বক্সিং শেখার একটি বই যখন পড়েছিলাম—তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বইয়ের ছবিগুলো দেখে দেখে নাকের সামনে এক হাতের প্রতিরক্ষা বজায় রেখে আক্রমণাত্মক লেফ্‌ট জ্যাব, রাইট জ্যাব, রাইট হুক্ ইত্যাদি ভঙ্গিগুলোতে হাত ছুঁড়েছি, নিখুঁত ভাবে তা হচ্ছে কিনা লক্ষ্য করেছি। এর কোনটিই কোনদিন কোন ভাবে কাজে লাগাইনি। আমার করে দেখাই আনন্দ। তবে বিজ্ঞানের ব্যাপার সমূহে এই করে দেখার মধ্যে দারুণ একটি ধারাবাহিকতা ছিল।

নেহাত মজা করার জন্য করে দেখার একটি উদাহরণ ছিল কৃত্রিম রঙধনু সৃষ্টি করা। বইয়ে পড়েছিলাম যে বৃষ্টির পর আকাশে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলবিন্দুগুলো থেকে যায় সূর্যের আলো তাতে বিক্ষিপ্ত হলে কিছুক্ষণের জন্য সেখানে সাত রঙের রঙধনু দেখা যায়। রোদের মধ্যে অনুরূপ জলবিন্দুর কোন সমাবেশ করতে পারলে কৃত্রিম ভাবেও এরকম রঙধনু সৃষ্টির কয়েকটি কায়দার কথা পড়েছিলাম। বাসার সেই দুই নম্বরে বর্ধিত অংশে পেছনের বারান্দায় একটি পানির কল ছিল যেখানে আমি সে সময় গোসল করতাম। বাইরে থেকে সুন্দর রোদ সরাসরি ওই কলের অঞ্চলে পড়তো। দেখতাম কল থেকে ছিটিয়ে পানি পড়লে, বা কলের মুখে হাত দিয়ে আরো ভাল করে ছিটালে সেখানে সুন্দর রঙধনু সৃষ্টি হতো। মুখে কুলকুচা করে আরো ছোট ছোট জলবিন্দু ছিটালে রঙধনু আরো ভাল ভাবে দেখা যায়। এভাবে নানা প্র্যাকটিস করে আমি একেবারে নিখুঁত রঙধনু সৃষ্টি করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতাম। আরো কতগুলো জিনিস নেহাত করতে করতেই হয়ে গেছে, অবশ্য বইয়ের অনুসরণে। স্কুলের বিজ্ঞান বইয়ে পড়েছি গাটাপার্চার চিরুনি চুলে বা পশমে ঘষলে নাকি স্থির বিদ্যুৎ তৈরি হয়। গাটাপার্চা জিনিসটি কী তা সেখানে ব্যাখ্যা করা হয়নি। কিন্তু যে প্লাষ্টিক চিরুনি আমি ব্যবহার করি, দেখলাম তাই চমৎকার কাজ করে। তা দিয়ে জোরে জোরে শুকনা চুল আঁচড়িয়ে বইয়ের কথা মতো খুব ছোট ছোট করে ছেড়া কাগজের টুকরার কাছে নিলাম—সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো লাফ মেরে চিরুনির গায়ে উঠে এলো। ঘষায় চিরুনির স্থির বিদ্যুতের প্রভাবে কাগজের কাছের তলে উল্টো বিদ্যুৎ চলে আসার ফলে এমনটি হলো। ওই কাগজের টুকরো দিয়ে বেশ খানিকটা মজা করে খেললাম। যেমন লক্ষ্য করলাম টুকরাগুলো তলের দিকে নয়—বরং খাড়া হয়ে কিনারার দিকটিই চিরুনিতে সংলগ্ন করতে চায়। বুঝতেই পারছিলাম যে বিদ্যুৎ জমার পরিমাণ কিনারাতেই বেশি হচ্ছে। এমনকি চিরুনিটি কাগজ থেকে একটু দূরে রাখলে কাগজের টুকরা উঠে আসতে না পারলেও কিনারার উপর খাড়া হয়ে স্থির দাঁড়িয়ে থাকে, চিরুনি সরালে পড়ে যায়। এ যেন পুতুল নাচিয়ে সুতা ছাড়াই পুতুল নাচাচ্ছে। এই দিকটি আমার পড়া বইয়ে লেখা ছিলনা, এর কারণ অনেক পরে বুঝেছি। এগুলো সবাইকে দেখিয়ে দারুণ মজা পেতাম। ভাল ভাবে দেখাবার জন্য অবশ্য কম আর্দ্র শুষ্ক মৌসুম প্রয়োজন হয়—নইলে চার্জ বাতাসের ভেতরে থাকা পানিতে হারিয়ে যায়। স্থায়ী চুম্বকে লোহার তৈরি কিছু সব সময় একই দিকে ঘষলে ওটিও চুম্বক হয়ে যায়। আমাদের বাসার সোনার কারিগর খগেন কাকার একটি বড় চুম্বক ছিল। আমি সেটাতে কয়েকটি সুঁচকে ঘষে ওগুলোকে চুম্বক বানিয়ে ফেলেছিলাম—সুঁচগুলোকে সুতা দিয়ে ঝুলালে উত্তর-দক্ষিণে মুখ করে থাকতো সব সময়। আমার স্কাউটিঙের একটি কম্পাস ছিল বটে, এখন আমি নিজেই বেশ কয়েকটি কম্পাস বানিয়ে ফেল্‌লাম।

নিজের প্রথম হাতঘড়ি পেয়েছিলাম আব্বা যখন তৃতীয় বার হজে গিয়েছিলেন তখন—অদ্ভুত সুন্দর সোনালী বডিতে সবুজ ডায়ালের ঘড়ি। এর আগে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত হাতঘড়ি তো নয়ই আমার পড়ার ঘরে অন্য কোন ঘড়িই ছিলনা—পাশের ঘরে গিয়ে ইউনূস ভাইদের টেবিল ঘড়িটি দেখে আসতে পারতাম। কিন্তু পড়ার সময় চেয়ার থেকে না উঠেই সময়ের দিকে নজর রাখার জন্য আমি কিছু বিকল্প ব্যবস্থা করে নিয়েছিলাম। সাতকানিয়া বস্ত্রালয়ের যে রেডিয়ো দেখতে পেতামনা, সারাক্ষণ বেশ সজোরে শুনতে পেতাম এবং সেখানকার বিভিন্ন সময়ের খবরগুলোর সময় জানতাম—রেডিয়ো পাকিস্তানের খবর, অল ইন্ডিয়া রেডিয়োর খবর; এগুলোর শুরু ও শেষের থেকে সময়ের ধারণা পেতাম। কিন্তু তার চেয়েও ভাল একটি বিকল্প আমি করে নিয়েছিলাম যাতে দিনের বেলায় নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সময় দেখতে পারতাম—তা হলো একটি ছায়া ঘড়ি। এই ছায়া-ঘড়িটি আমাকে তৈরি করতে হয়নি, আমি শুধু চিনে নিয়ে ব্যবহার করেছি মাত্র। দুপুরের পর থেকে আমাদের ঘরের ছাদের একটি অংশের ছায়া আমার জানালার নিচে সাতকানিয়া বস্ত্রালয়ের টিনের ছাদের উপর পড়তো, এবং সময় যত বিকেলের দিকে গড়াতো ছায়া তত দীর্ঘ হতো। ওই টিনের ছাদে কোন দাগ কাটা না থাকলেও ফ্রেমের সঙ্গে টিন সংলগ্ন রাখার জন্য যে রিভেটগুলো মারা হয় পর পর তার কয়েকটি দীর্ঘ সারি ছিল। ওগুলোর কোনটি পর্যন্ত বা কোনটির কত কাছে ছায়া গিয়ে পৌঁছলো তার থেকে সময়ের একটি ভাল ধারণা পেতাম। জানা পরিমাপ থেকে অজানা কোন পরিমাপের স্কেল ঠিক করে নেবার জন্য যে ক্যালিব্রেশন করা হয় তার নাম শুনেছি অনেকদিন পর। কিন্তু ছায়া ঘড়ি ব্যবহার করতে গিয়ে ঠিক এই কাজটিই করেছি। টেবিল ঘড়ি বার বার দেখে দেখে শুরুতে বুঝে নিয়েছি ছায়া কোথায় গেলে ঘড়িতে কতটা বাজে। তারপর থেকে ছায়াই সম্বল। পড়ার টেবিলে থেকেই নিজের নানা কাজে সময় নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম ওই ছায়া দেখেই। ওই ক্যালিব্রেশন অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হতো না। বছর যত এগোতো, শীত যত কাছে আসতো, সূর্য ততো দক্ষিণ দিকে হেলে গিয়ে ওই ছায়া তার আকৃতি বদলাতো, তার অগ্রসর হবার সময়ও বদলে যেত। তখন আমার ক্যালিব্রেশন একটু সংশোধন করে নিতে হতো। আমি এত সব করতে রাজি ছিলাম শুধু মাত্র সময়ের ধারণা পেতে। বলা যায় এও একটি খেলা ছিল।

কখনো কখনো এমনি দুটি খেলা এক সঙ্গে মিলিয়ে আরো মজার খেলার জন্ম হতো। যেমন কাগজের বিমান তৈরি যে আরো ছোট বেলার খেলা ছিল তা আগেই বলেছি। পরে যখন বিমানের নিয়ন্ত্রণ কেমন করে হয় সে সম্পর্কে ছোটদের বইতে পড়েছি, আমার কাগজের বিমানেও সেগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করেছি। যেমন লেজটিকে একটু উঁচু করে তুলে তাকে বিমানের 'রাডারের' (হাল) মত বামে বা ডানে বাঁকিয়ে দিয়ে তারপর উড়িয়ে দেখেছি কেমন করে বিমান সেদিকে গোত্তা খেয়ে বেঁকে যায়। লেজের কিনারাটি একটু উপরের দিকে ভাঁজ করে দিয়ে

দেখেছি 'ইলেভেটরের' মত—ভূমিসমান্তরাল ভাবে ছুঁড়ে দিলেও সেটি উঠে গেছে উপরের দিকে নাক উঁচু করে; আর নিচের দিকে ভাঁজ করে দিলে নাক নিচু করে নিচের দিকে চলে যায়। আবার বাম দিকের ডানার কিনারা একটু খানি কেটে উপরের দিকে আর ডান দিকের ডানায় তা নিচের দিকে ভাঁজ করলে (এইলরোন) বিমান বাম দিকে কাত হয়ে উড়তে থাকে। যা কিছু ছিল নেহাত বইয়ের কথা তা আমার কাগজের বিমানের মধ্যে পরীক্ষা করে ফেল্‌লাম।

ঐ খেলতে খেলতে বিজ্ঞানেরও কোন কোন বিষয়ে একটি ধারাবাহিকতা ছিল, ছোট বেলার ক্রমান্বয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে। যেমন খুব ছোটবেলায় কাজের ছেলে সেকান্দরের পরামর্শে আমরা ম্যাচ বক্সের দুটি ভেতরে অংশে সুতা সংযোগ করে ছাদের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে কথা বলার জন্য টেলিফোন বানিয়েছিলাম। এর বহুদিন পরে ইউএসআইএস লাইব্রেরিতে শিশুদের বিজ্ঞানের উপর অপূর্ব সব রঙিন ছবিতে ভর্তি ঝকঝকে কিছু বই পেয়েছিলাম। তখনো পড়ে ভাল না বুঝলেও ছবিই অনেক কথা বলে দিত। এর একটি বইয়ের নাম ছিল 'সাউন্ড', যার প্রচ্ছদে ছিল একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে কনডেন্সড মিল্কের টিনের সাইজের দুটি টিনের মধ্যে লোহার তার সংযুক্ত করে ওই আমাদের ম্যাচবক্সের টেলিফোনের মত টেলিফোনে আলাপ করছে। ব্যাস আমাকেও ঠিক ওরকম একটি তৈরি করতে হবে ম্যাচবক্স আর সুতার থেকে ভাল কিছু হয় কিনা দেখতে। ওই টেলিফোন তৈরির ঘটনার চেয়ে ওই বইয়ের কথাটিই আমার বেশি মনে গেঁথে গিয়েছিল ইংরেজি 'ক্যান' (টিন) কথাটি দিয়ে ক্যান টেলিফোনের কথা। জার্মানির বিখ্যাত বনেদি রেডিও সরঞ্জাম কোম্পানি Telefunken (টেলিফুনকেন) এর নাম যখন শুনেছি তখন অদ্ভুত ভাবে আমার মনে হয়েছে ওই ক্যান টেলিফোনের সঙ্গে নিশ্চয়ই ওই কোম্পানির নামের একটি সম্পর্ক রয়েছে—যা একেবারেই ভুল একটি ধারণা।

আধুনিক বৈদ্যুতিক টেলিফোনও অবশ্য আমি তৈরি করেছিলাম তা আরো পরে অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময়। তখন ব্যাটারি, তার, টর্চ বাতি ইত্যাদি নিয়ে স্বচ্ছন্দে কাজ করতে পারছি। টেলিফোনের একটি অংশ অর্থাৎ কথা বলার অংশটি বানিয়েছিলাম বই দেখে অতি সাধারণ সব জিনিস থেকে। কানে শোনার অংশের জন্য একটি হেডফোন ব্যবহার করেছি, যা বাসায় আগে থেকে ছিল। আমাদের দোকানে হাতের চুরি, বালা ইত্যাদি প্যাকেট করার জন্য 'হাজি এম নজু মিয়া সওদাগর' লেখা সুন্দর কার্ড বোর্ডের ছোট বাক্স ছিল—ঢাকনা খুলে বাক্সটি উল্টো করে টেবিলে রাখলে তা একটি ভাল সাউন্ড বক্স হয়ে দাঁড়ায়। এখন এর ওপর দুটি কার্বন দন্ড পাশাপাশি রেখে বাক্সের সঙ্গে আটকে নিয়েছি, আর ওই দুটি দণ্ডে রেত দিয়ে এক জায়গায় একটু ঘষে খাঁজ কেটে নিয়ে তার উপর পেন্সিলের একটি দুই ইঞ্চির মত লম্বা শীষ উভয় দন্ডের উপর আড়াআড়ি আলগোছে ফেলে রেখেছি। কার্বন দন্ডটি এসেছে পুরোনো ব্যাটারি ভেঙ্গে যার মাঝখানে একটি

কার্বন দন্ড থাকে। পেন্সিলের শীষটি পেন্সিলকে কেটে কেটে বের করে নিয়েছি সাবধানে। ওটি গ্রাফাইটে তৈরি, যাও এক রকম কার্বন। এখন ভাল একটি ব্যাটারির এক প্রান্ত থেকে তার দিয়ে বিদ্যুৎ ওই কার্বন দন্ড দুটির একটিতে, তারপর পেন্সিলের শীষ, তারপর অন্য কার্বন দন্ড হয়ে দূরে কানে শোনার যন্ত্র হয়ে আবার ওই ব্যাটারির অন্য প্রান্তে ফিরে এলে বর্তনি সম্পূর্ণ হয়। ওই বাক্সের উপর মুখ ঝুঁকিয়ে কথা বল্‌লে কার্বন দন্ড ও পেন্সিলের শীষের মধ্যের সংযোগের বৈদ্যুতিক বাধা কথার কাঁপুনি অনুসরণে পরিবর্তিত হয় বলে হেডফোনে শোনার যন্ত্রেও একই রকম পরিবর্তন হয়ে কথাগুলো শোনা যায়। আসল টেলিফোনও কিছুটা অন্য ভাবে এই একই কাজ করে। প্রথম যখন সত্যি সত্যি বাসার এক ঘর থেকে আর এক ঘরে এই টেলিফোনের মাধ্যমে স্পষ্ট কথা শোনলাম—আমার কী উল্লাস, যেন আমিই আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। সেই থেকে কয়েকদিন যাকেই পেরেছি ডেকে ওখানে কথা শুনিয়েছি।

এই টেলিফোন তৈরির কাহিনী থেকেই একটি কথা সুস্পষ্ট যে বিজ্ঞানের করে দেখার বা এটি-সেটি তৈরির কাজে যা কিছু প্রয়োজন হয়েছে তার সবই আমার হাতের কাছে যা আছে তা দিয়েই সারতে হয়েছে। এরকম কিছু কিছু জিনিস ব্যবহারের পরামর্শ বইয়েই দেয়া ছিল। কিন্তু বাকি জিনিস আমাকেই বুদ্ধি করে বের করতে হয়েছে—কারণ আমেরিকায় যেটি সহজলভ্য টুকিটাকি, বক্সীর হাট রোডের ছেলেটির কাছে তা সহজলভ্য ছিলনা, অনেক সময় চেনা জানাও ছিলনা। যেমন কাজ করতে গিয়ে প্রায়ই দুই রকমের টিউবের দরকার হয়েছে নানা কারণে—একটি হলো নানা আকৃতিতে বাঁকা কাচের নল, অন্যটি হলো রাবারের টিউব। প্রথমটির জন্য লজেন্স-চকলেটের দোকানে বিক্রি করা আমেরিকান ফ্ল্যাগওয়ালা চকলেট দানা ভরা টিউবগুলো বেশ কাজে এলো। খুব অল্প আগুনের আঁচে রেখে এই প্লাস্টিকের স্বচ্ছ নলগুলোকে ইচ্ছেমত বাঁকাতে পারতাম। এর ফলে সহজে বানাতে পেরেছি পানির থার্মোমিটার—বোতলের মধ্যে রঙিন পানি রেখে তার ছিপির কর্কের ভেতর দিয়ে সোজা একটি নল ঢুকিয়ে দেয়া। উত্তাপের সঙ্গে ওই রঙিন পানি প্রসারিত হতে দেখা যায়। U অক্ষরের আকৃতিতে বাঁকা টিউবে রঙিন পানি ভরে এক প্রান্ত ছিপি দেয়া খালি বোতলে ও অন্য প্রান্ত বাতাসে খোলা রেখে আমার বায়ুচাপ মাপার ব্যারোমিটারটি তৈরি করেছিলাম। U এর দুই বাহুর মধ্যে বাইরের বাতাসের দিকের অংশটিতে পানির উচ্চতা অন্য অংশের তুলনায় দ্রুত বেশি হতে থাকলে বুঝতাম যে চাপ কমছে—বৃষ্টি, ঝড় এ সবের আশঙ্কা আছে। রাবারের টিউবের সমাধানটি শেষ পর্যন্ত হয়েছে আমাদের বাসার কাছের হুক্কার দোকানে গিয়ে; ওদের কাছে হুক্কায় ব্যবহারের জন্য নানা রকম রাবারের নল পাওয়া গেল। এই নলের বহু ব্যবহার পরে করেছি—যেমন পাত্র থেকে স্বয়ংক্রিয় ভাবে পানি টেনে নেবার সাইফন, দুটি ফানেলের সঙ্গে লম্বা টিউব লাগিয়ে স্পীকিং টিউব—ঐ যে যুদ্ধ জাহাজ 'বাবরে' নেভীদের যা ব্যবহার করতে দেখেছি তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ।

একটি সমস্যা বহু রকম কাজের মধ্যে এসে যেত—যেখানেই কোন কিছু ঘর্ষণহীন ভাবে অবাধে ঘোরার প্রয়োজন হতো। যেমন বায়ু প্রবাহের দিক নির্ণয় করতে তীরের আকারে একটি কার্ডবোর্ড কেটে 'বাতপতাকা' সহজেই বানিয়েছিলাম। কিন্তু বাতাসের ধাক্কায় এটি যে অবাধে ঘুরবে সেই ব্যবস্থাটির উপায় কী? এই রকম প্রায় সব ক্ষেত্রের জন্য একটি সহজ উপায় পেয়ে গেলাম আমাদের দোকানের পাশেই ডাঃ রসিক লাল বণিকের চেম্বারে। আমার অতি পরিচিত কম্পাউন্ডার রঞ্জন কাকার একটি কাজ ছিল ইনজেকশান দেয়ার জন্য ডিষ্টিল্ড ওয়াটারের অ্যাম্পুল কাটা। কাচের সিল করা অ্যাম্পুলের মাথাটি তিনি নিপুণ হাতে ব্লেড দিয়ে একটু কেটে ভেঙ্গে ফেলতেন। এই কেটে নেয়া মাথাটিই আমার জন্য সুন্দর একটি মসৃণ বিয়ারিঙের কাজ করতো। একটি চোখা শিক, সুঁচ, বা পেরেক এর ভেতরে ঢোকালে এটি খুবই কম ঘর্ষণ করে তার চারদিকে বন বন করে ঘুরতে পারে। যাকেই ওভাবে ঘোরাতে চাইবো এই এম্পুলের মাথার সঙ্গে তাকে বেঁধে নিলেই হলো। এই ব্যবস্থা খুব কাজে এসে গেলো শুধু বাতপতাকার জন্য নয়, যখন স্টিম ইঞ্জিন বানালাম, কিংবা ইলেকট্রিক মোটর বানালাম তখনো। ফোলানো বেলুনের মুখটি হাতে চেপে রাখা অবস্থায় হঠাৎ হাত ছেড়ে দিলে বাতাস দ্রুত বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বেলুনটি যে উল্টো দিকে দ্রুত বেগে ছুটে যায় সেটি দেখে রকেট ইঞ্জিনের কাজ বুঝে গিয়েছিলাম। ওই স্টিম ইঞ্জিনে একটি বদ্ধ বার্লির টিনকে কাত করে রেখে এর ভেতরের পানিকে মোম বাতির আগুনে ফুটিয়ে বাষ্প তৈরির বয়লারে পরিণত করেছিলাম। পেছনের ছোট একটি ছিদ্র দিয়ে যখন সজোরে স্টিম বের হতো মোমবাতি ইত্যাদি সহ টিনটি উল্টো দিকে বন বন করে ঘুরতো, অবশ্য কায়দা করে সহজে ঘুরবার ব্যবস্থা করে দিতে হতো। ইলেকট্রিক মোটর তৈরির জন্য সব কিছু পাতলা ইনস্যুলেশনের (অন্তরক) আবরণযুক্ত একই দীর্ঘ তারকে দুটি খাড়া পেরেক ও একটি ঘুরন্ত পেরেকে পরতে পরতে জড়িয়েছি। তখন তারটির দুই প্রান্ত ব্যাটারির দুই প্রান্তের সঙ্গে যোগ করলে ঘুরন্ত পেরেকটি অ্যাম্পুলের মাথার ওই বিয়ারিং এর উপর বন বন করে ঘুরতে থাকে। অবশ্য আরো একটি বড় সমস্যার সমাধান করতে হয়েছে এর জন্য, ঘোরার সময় ঘুরন্ত ও স্থির তারের সংযোগ বজায় রাখার জন্য ওখানে তারটি ছিড়ে একটির উপর একটি ঘষে যাবার উপায় বের করতে হয়েছে।

স্টিম ইঞ্জিনে রবিনসন বার্লির টিন ব্যবহার করেছিলাম, কারণ বাসায় এটি পাওয়া যেত, অসুখ বিসুখে বার্লি খাওয়া হতো বলে। তার চেয়েও বেশি পাওয়া যেত কনডেন্সড মিল্কের টিন, আর ওভালটিনের টিন—সেগুলোও নানাভাবে কাজে লেগেছে আমার নানা এক্সপেরিমেন্ট। আমি একটি 'পিন হোল ক্যামেরা' তৈরি করেছিলাম সে সময়, সেটি একটি জুতার বাক্স ব্যবহার করে। এতে লেন্সের বদলে বাক্সের এক প্রান্তে ছিল আলপিন দিয়ে করা একটি ছোট্ট ছিদ্র। আর ফিল্মের বদলে অন্য প্রান্তে ছিল বাক্সে একটি আয়তাকার জানালা কেটে সেখানে

মোমঘষা কাগজের স্ক্রীন সেঁটে দেয়া। আলোকিত কোন দৃশ্যের দিকে বাক্সের ওই ছিদ্রের দিকটি তাক করলে ওই দৃশ্যের উল্টো ছবি ওই স্ক্রীনে দেখা যেত, ঠিক যে রকম ছোট হয়ে ফটোতে দেখা যায় অনেকটা সে রকম। অবশ্য এর জন্য বাক্সটি চাদরে ঢেকে স্ক্রীনটি অন্ধকারে রাখলে ব্যাপারটি আরো সুন্দর দেখায়। এই অভিজ্ঞতাটি পরে একবার বেশ কাজে লেগে গিয়েছিলো। বহু কাল পর খুব সম্ভব ১৯৭৭ সনের দিকে ঢাকায় যখন পূর্ণ সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল, তখন এরকম পিন হোল ক্যামেরার ব্যবস্থা করে অনেক মানুষকে নিরাপদে সূর্য গ্রহণ দেখার সুযোগ করে দিয়েছিলাম আমাদের 'অনুসন্ধানী বিজ্ঞান ক্লাবের' পক্ষ থেকে, যা আয়োজন করেছিলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের প্রাঙ্গনে। অষ্টম শ্রেণীতে থাকা কালে আমি একটি সরল মাইক্রোস্কোপও তৈরি করেছিলাম যাতে লেন্সের বদলে কাচের একটি খুব ছোট্ট গোলক হলেই যথেষ্ট। এর দেখার এলাকাটি কম হলেও পূর্ণ গোলক হওয়াতে বিবর্ধন করার ক্ষমতাটি নেহাত কম নয়। আমেরিকান ছেলেমেয়েরা নাকি অপটিক্সের দোকানে খুব ভাল ও স্বচ্ছ কাচের এরকম গোলক পায়। কিন্তু আমি পাব কোথায়? আমাকে দুধের পিপাসা ঘোলে মেটাতে হলো টুনুর নানা রকম পুঁতির মালার মধ্য থেকে একটি মোটামুটি স্বচ্ছ পুঁতির দানা খুঁজে নিয়ে। সচ্ছতার কমতির জন্য ওতে সবকিছু খুব স্পষ্ট ও ঝকঝকে ভাবে দেখা না গেলেও এই মাইক্রোস্কোপ দিয়ে আমি ছারপোকার পা, মাথা, শুঁড়ের মত ক্ষুদ্র জিনিসকেও বেশ বড় ও বিস্তারিত দেখতে পেলাম। এরকম নানা রকম ক্ষুদ্র পোকামাকড় ও অন্যান্য ক্ষুদ্র জিনিস এই মাইক্রোস্কোপে দেখে দেখে আমি সেই ছবি একটি খাতায় এঁকে রাখার চেষ্টা করতাম।

এসব নানা জিনিস তৈরি ও ব্যবহার করার কথা যে ভাবে তর তর করে বলে গেলাম আসলে ব্যাপারগুলো মোটেই সেভাবে হয়নি। এক একটিকে সত্যি সত্যি কাজ করার মত দাঁড় করাতে বহু দিন লেগে গিয়েছে, এক ভাবে না হলেও অন্য ভাবে চেষ্টা করতে হয়েছে। তারপরও প্রথম দিকে একটু কাজ করেছে তো পরে আবার অনেকবার কাজ করতে অস্বীকার করেছে। এভাবে চেষ্টা করতে করতে বোঝা গেছে সমস্যাটির উৎস কোথায়, সেভাবে সমাধানও করা হয়েছে। সব কিছু করতে হয়েছে নেহাত একা, খুব একটা পরামর্শ কারো কাছ থেকে পাওয়া যায়নি—তাই ভুল সারাতে বেশ দেরিও হয়েছে। যেমন ওই মাইক্রোস্কোপের ব্যাপারে তো আমি শুধু পুঁতির দানার কথা বলে খালাস। কিন্তু ওই পুঁতিটিকে একটি ছোট টিনের পাতের ছিদ্রের মধ্যে শক্ত করে স্থাপন করে, সুঁচের মাথায় দেখার জিনিসটি রেখে, ছোঁয়াছুয়ি না ঘটিয়ে উভয়কে যথাসম্ভব কাছে এনে, সঠিক দিক থেকে আলো ফেলে, চোখকে ঠিক জায়গায় রেখে, স্পষ্ট বিবর্ধিত ইমেজ সৃষ্টি করা বহু ধৈর্য ও পরিশ্রমের ব্যাপার ছিল—যা ধীরে ধীরে রপ্ত করতে হয়েছে। অন্যদিকে ওই ইলেকট্রিক মোটরের কথাই ধরা যাক। ঘুরন্ত পেরেকে জড়ানো তার আর স্থির দুটি পেরেকে জড়ানো তার, এই দুইয়ের মধ্যে মসৃণ ভাবে স্পর্শ করা

যোগাযোগ বজায় না রাখতে পারলে এই পেরেকগুলোর কোনটাই বিদ্যুৎ-চুম্বকে পরিণত হবেনা, তাই মোটরও কাজ করবেনা। ওই রকম টুকটাক জিনিস দিয়ে ওটি করা যে কত কঠিন তা শুধু করতে গেলেই বোঝা যায়। কিন্তু একবার গোলমালের উৎসটি বুঝে ফেলতে পারলে অবশ্য সমাধান হবেই, বিশেষ করে ওই সমস্যার পেছনে বিজ্ঞানটি কী তা যদি বুঝে ফেলা যায়। বইয়ের সহায়তায় তাও কিছুটা বোঝা সম্ভব হয়েছে। আর এভাবে সমস্যা সমাধানই হলো করতে করতে অথবা খেলতে খেলতে বিজ্ঞান করার সব চেয়ে শিক্ষণীয় বিষয়, আনন্দের বিষয়ও বটে।

আমার ল্যাবোরেটরি-আলমারি

ঐ অষ্টম শ্রেণীতে পড়া অবধি আমার নিজের কোন বুক-শেল্‌ফ ছিলনা। স্কুলের বইখাতার কিছু থাকতো আমার স্কুলে নিয়ে যাওয়া সেই ছোট কালো চামড়ার স্যুটকেসে, বাকিগুলো থাকতো টেবিলের উপর গোছানো অবস্থায়। লাইব্রেরি থেকে ধার করা বইগুলোও সেখানে থাকতো। আর আমার নিজের 'আউট বইয়ে'র সংখ্যা দিন দিন বাড়লেও তার অধিকাংশই থাকতো বড় ভাইদের শেল্‌ফে, তাঁদের বইয়ের সঙ্গে। তবে কিছু বই আমার এত আপন ও মূল্যবান মনে হতো যে এগুলোকে কাছ-ছাড়া করতামনা। এজন্য বড় একটি বেতের স্যুটকেস কিনেছিলাম; এই বিশেষ বইগুলোকে যখের ধনের মত এই বেতের স্যুটকেসে কাছে কাছে রাখতাম। এই সব দামি বইয়ের দুটির কথা মনে পড়ে—এর একটি হলো রবিনসন ক্রুসোর পুরো মূল বই যাতে ক্রুসো নির্জন দ্বীপ বাস থেকে উদ্ধার হবার পরও তার আরো কিছু অ্যাডভেঞ্চারের কথা ছিল। এই বইটি ছিল বেশ মোটা কিন্তু পেপারব্যাক। পুরো বইটি অসংখ্য অ্যাডভেঞ্চারের খুঁটিনাটিতে ভরপূর—ছবিটবির ব্যাপার ছিলনা। অন্য বইটি ছিল পুরো মূল গ্যালিভার্স ট্রাভেল্‌স—লিলিপুট (ছোট মানুষের দেশ) ব্রোবডিংনাগ (বিশাল দৈত্যাকার মানুষের দেশ), এবং লাপুটা (বৈজ্ঞানিক মানুষের দেশ)। এটি ছিল খুবই সুন্দর কমলা রঙের শক্ত মলাটের, ভেতরে মজার মজার ছবি। উভয়টির সব কিছু—গন্ধ, স্পর্শ সহ আমার খুব প্রিয় ছিল। বহু বছর ধরে বারবার চেখে চেখে পড়েছি—শুরুতে সব কিছু না বুঝলেও পরে বুঝেছি।

বই রাখার নির্দিষ্ট জায়গা যেমন ছিলনা, তেমনি এত দিন ধরে বিজ্ঞানের করে দেখার কাজের মধ্য দিয়ে যে মেলা শিশি, বোতল, তার, ব্যাটারি ইত্যাদি জমছিলো, কোন কোন ক্ষেত্রে রীতিমত শ্রদ্ধা উদ্রেক করার মত তৈরি করা যন্ত্রও—তা যত্র তত্র পড়ে থাকতো। কখনো বড়জোর জুতার বাক্স টাইপের কোন কিছুর মধ্যে ভরে রাখতাম। তাই আমার জন্য একটি পুরাদস্তুর বুক-শেল্‌ফ তৈরির অনুমোদন পাওয়া গেল, এতে অংশত আমার 'ল্যাবোরেটরি'র জিনিসপত্র রাখার জন্য একটি আলমারিও থাকবে। কিন্তু এর চূড়ান্ত নক্সা করার সময় ল্যাবোরেটরির

ভাগটিই বেশি হলো, বুক-শেল্‌ফের ভাগটি বরং কিছুটা গৌণই হলো, আমি সে ভাবেই চাইছিলাম। কারণ আমার চিন্তায় ছিল এতে শুধু ল্যাবোরেটরির কাজের জন্য দরকারি বইগুলো থাকবে। আর আলমারির উপরের অংশটির পাটাতনটি আমার বিজ্ঞানের কাজ করার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। অন্য বইগুলোর ভিন্ন ব্যবস্থা হবে।

জিনিসটির নক্সা করতে লেগে গেলাম। সবাই কিছু কিছু পরামর্শ দিলেন, বিশেষ করে ইউনূস ভাই খুব আগ্রহ নিলেন এতে। নিচের অর্ধেকটা দুই ডালার দরজা সহ একটি আলমারির মত হবে, আর উপরটা বুক-শেল্‌ফের মত। আলমারিতে কয়েকটি তাক আর ছোট ছোট খোপ থাকবে—এমন ভাবে যেন উঁচু যন্ত্রও রাখা যাবে, আবার ছোট খাট যন্ত্র, টুকিটাকি, বোতল, কেমিকাল ইত্যাদি রাখার জন্যও যথেষ্ট জায়গা থাকবে—প্রত্যেকটি আলাদা ভাবে। নক্সার বাকি খুঁটিনাটি ঠিক করে দিলেন ইউনূস মিস্ত্রি, আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠ কুশলী ছুতার—কাছেই নিজের দোকান আছে। তিনিও বুঝলেন আমার কাছে এই ল্যাবোরেটরি-আলমারির গুরুত্ব কত বেশি; যত্ন নিয়ে তৈরি করলেন সেগুন কাঠ দিয়ে। যতদিন না এটি তৈরি শেষ হলো আমি বার বার তাঁর দোকানে গিয়ে বসে বসে দেখলাম এর অগ্রগতি।

সেই থেকে আমার বিজ্ঞানের করে দেখার সব কাজ এই ল্যাবোরেটরি-আলমারিটাকে কেন্দ্র করে চলেছে বহু বছর। আর তার পরেও সাম্প্রতিক কাল অবধি অতীত আনন্দের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে এটি থেকে গেছে। এরকম 'ল্যাবোরেটরি' থাকাতে কাজগুলোও যেন একটু গোছালো ভাবে হলো। যেমন একটি গোটা আবহাওয়া কেন্দ্র খাড়া করার চেষ্টা করলাম—সম্ভাব্য সব জিনিস ব্যবহার করে। ইউনূস ভাই বিশ্ব জাম্বুরী উপলক্ষে ভ্রমণ থেকে যে আর্দ্রতা মাপক যন্ত্রটি এনেছিলেন তার থেকে বাতাসের আর্দ্রতাটি মোটামুটি বুঝতে পারতাম। তার সঙ্গে একটি থার্মোমিটারও ছিল। সেটির সঙ্গে তুলনা করে আমার রঙিন পানির থার্মোমিটারকে মোটামুটি দাগ কেটে নিতে পারলাম। আবহাওয়া কেন্দ্রের জন্য আরো ছিল আমার তৈরি ব্যারোমিটার—সূক্ষ্মভাবে না হলেও আবহাওয়া পরিস্কারের দিকে যাচ্ছে, না ঝড় বাদলের দিকে যাচ্ছে তাতে বোঝা যেত। আরো দু'একটি জিনিস বাকি ছিল—তাও বানিয়ে নিলাম। এর মধ্যে একটি খুব সহজ—ওভালটিনের একটি টিন ছাদে রেখে দিয়েছিলাম মুখ খুলে। বৃষ্টি হলে তাতে জমা পানির উচ্চতা রুলার দিয়ে মেপে বলা যেত কত ইঞ্চি বৃষ্টি হয়েছে। বাতাসের গতির দিক নির্ণয়ের জন্য তৈরি করা বাতপতাকা ছিল, কিন্তু বায়ু বেগ মাপার কিছু ছিলনা। তাও বানিয়ে নিলাম এক রকমের—সেটি দিয়ে অন্তত তুলনামূলকভাবে বোঝা যেত বেগ বেশি না কম, কত বেশি। দুটি পিং পং বল মাঝ খানে কেটে চারটি ছোট নারকেলের মালার মত জিনিস একই দিকে মুখ করে দুটি কাঠির দুই প্রান্ত লাগিয়ে নেয়া হয়েছে, কাঠি দুটি চলে গেছে একটি কর্ককে

এফোড় ওফোড় করে যাতে চারটি মালার প্রত্যেকটি পরেরটির সঙ্গে সমকোণে থাকে। এখন কর্কটি এদের নিয়ে অবাধে ঘুরতে পারলেই হলো। ওই মালাগুলোতে বাতাস ধরে সেগুলো কত জোরে ঘুরছে তাতেই বেগটি মোটামুটি বোঝা যায়।

এবার আমার রাসায়নিক ল্যাবোরেটরিটিও ভাল ভাবে গড়ে ওঠলো। রাসায়নিক ল্যাবোরেটরিতে যে সব টেস্ট টিউব, বীকার, জার, স্পিরিট ল্যাম্প এসব থাকে তার কোন কিছুই আমার ছিলনা। টেস্ট টিউবের ভূমিকায় আমি ব্যবহার করেছি পার্কার কালির খালি দোয়াত, বীকার হিসেবে কাচের গ্লাস, আর জার হিসেবে হরলিক্সের বোতল—ঢাকনি সহ। তবে রাসায়নিক দিক থেকে আমার একটি বিরাট শিক্ষা কেন্দ্র ছিল বাসার ভেতরেই; সেটি হলো স্বর্ণকার কারিগরদের দিনরাত কাজ। একেবারে শিশু অবস্থা থেকে প্রতিদিন এই কাজ দেখে এসেছি। দোকানের পেছনে একটি বড় ঘরে তাঁরা সবাই কাজ করতেন। এক পাশে খগেন কাকা ও তাঁর ভাই মনু কাকা। এঁরা সাধারণত সূক্ষ্ম সোনার তারের কাজ করেন, আর করেন অলঙ্কার পালিশের ও মিনার কাজ। ভারি ধাতব ব্লকের মধ্যে থাকা পরপর একটির থেকে সরু আরেকটি ক্ষুদ্র ছিদ্রের মধ্য দিয়ে জোর করে টেনে লম্বা করে তাঁরা সরু সোনার তার সৃষ্টি করতেন। মোটর দিয়ে পালিশের চাকা খুব সজোরে ঘুরিয়ে সোনার অলঙ্কারকে বিভিন্ন দিকে পালিশ দিতেন যার থেকে আলো চিক চিক করে ঠিকরে পড়তো। আর মিনার কাজটি তো অপূর্ব—রংবস্তু দিয়ে অলঙ্কারে ডিজাইন এঁকে তাকে ব্লো-পাইপের সাহায্যে আগুনে এত উত্তপ্ত করতেন যে রঙটা একেবারে বসে যেত।

ওই কারখানার অন্য দিকে বসে যামিনী কাকা ও শশী কাকা সোনা গলাতেন, ছাঁচে ঢেলে তাকে নানা আকৃতি দিতেন, তারপর এনভিলের উপর রেখে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে আরো সূক্ষ্ম আকৃতিতে আনতেন। গলাবার জন্য কড়াইয়ের মধ্যে কাঠকয়লা দিয়ে ফারনেস তৈরি হতো যার আগুনকে অনেক উচ্চ উত্তাপে নিতে পাম্প করে তাতে বাতাস দেয়া হতো—হাতে ঘোরানো ওই পাম্প। নানা সাইজের ও পুরুত্বের পাত্র যাদের মোশ (ক্রুসিবল) বলা হয় তার মধ্যে সোনা রেখে ওটি ওই কাঠ কয়লার তপ্ত আগুনে বসানো হতো। গলে টলটলে উঠলে বিশেষ চিমটা দিয়ে মোশ উঠিয়ে ছাঁচে যখন সোনা ফেলা হতো দারুণ লাগতো। কখনো কখনো যামিনী কাকারা সোনা পাকা করতেন। তাঁদের কাছে অ্যাসিড থাকতো—সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সব। আলাদা এসব অ্যাসিডে সোনার কিছু হতোনা কিন্তু খাদ গলে যেত, এবং ওভাবে তা দূর করা যেত। ওই অ্যাসিড যখন উত্তপ্ত করা হতো অত্যন্ত কটু গন্ধের গ্যাস ছড়িয়ে পড়তো। যামিনী কাকার পাশে বসতেন বেশি বয়সের প্রিয়নাথ কাকা—তিনি খুব ছোট ছোট বিভিন্ন সাইজের ও আকৃতির হাতুড়ি দিয়ে রুলি বা বালার উপর টোকাই কাজ করতেন—টুকটুক করে ঠুকে ঠুকে অপূর্ব সুন্দর ডিজাইন গড়ে

তুলতেন তার ওপর। তাঁদের কারখানার একটি বড় অংশ তাই ছিল রাসায়নিক কারখানা; এখানেই রসায়নের সঙ্গে, বিশেষ করে ধাতুবিদ্যার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। একেবারে ছোটবেলা থেকেই তাঁদের কাজ আমি অনেক্ষণ ধরে এক নাগাড়ে দেখতাম। এটি সেটি জিজ্ঞেস করতাম, তাঁরা বুঝিয়ে দিতেন। খগেন কাকা আমার ব্যাংকারও ছিলেন। আমার বৃত্তির টাকাগুলো তাঁর কাছে জমা থাকতো। তাঁরাই শিখিয়েছিলেন কেমন করে সাবধানে অ্যাসিড ব্যবহার করতে হয়, আমার কাজের জন্য যৎসামান্য অ্যাসিড তাঁরা দিতেন, নানা ভাবে সতর্ক করে। হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরির জন্য হরলিক্সের বোতলে টুকরা টুকরা দস্তা নিয়েছিলাম, যা পেতাম ওই ব্যাটারি ভাঙ্গা থেকে। ভাঙ্গলে ব্যাটারির মাঝখান থেকে যেমন কার্বন দন্ড পাওয়া যায়, তেমনি ব্যাটারির পাত্রটি দস্তার তৈরি বলে দস্তাও পাওয়া যায়। বোতলের ওই দস্তার ওপর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ঢেলে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করেছিলাম। বোতলের মুখে একটি জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি ধরে এবং ওই গ্যাসকে দপ্ করে জ্বলে উঠতে দেখিয়ে প্রমাণও করেছি যে ওটা হাইড্রোজেন গ্যাসই ছিল। তবে খুব স্পষ্ট বা বড় করে জ্বলতোনা এভাবে তৈরি গ্যাস, কারণ খুব বেশি গ্যাস জমতোনা, হারিয়ে যেতো অনেকখানি।

সব কিছুতে যে ধাতু গলিয়ে ফেলার মতো কড়া সব রাসায়নিক পদার্থ লাগতো তা নয়। ওই যে আমাদের দোকানের নিক্তিগুলোকে চকচকে সোনার বা রূপার গিল্টি করতে দেখেছিলাম, এখন নিজেই সন্ধান পেলাম এরকম গিল্টি করার একটি উপায়। একটি লোহার চাবির উপর তামার ইলেকট্রোপ্লেটিং করার চেষ্টা করলাম। এর জন্য দরকার তুঁতে (কপার সালফেট) যা বাসার কারিগর কাকাদের কাছে ছিলনা। কিন্তু এমনিতরো জিনিসের একটি দোকান আমাদের বক্সীর হাটেই ছিল; আমাদের দোকান থেকে খাতুনগঞ্জের দিকে একটু এগোলেই ছিল বিখ্যাত পীতাম্বর সাহার পসারির দোকান। বলা হতো টোটকা চিকিৎসায় বা সাধারণ ব্যবহৃত এমন কোন গাছ গাছড়া, রাসায়নিক দ্রব্য, এমনকি দুষ্প্রাপ্য জিনিস নেই যা পীতাম্বর সাহার দোকানে পাওয়া যায়না। এটি অবশ্য একেবারে ছোট বয়স থেকে আমি শুনে আসছি। বিশুদ্ধ ইসবগুলের ভূষি, পুরোনো ঘি, উলটকম্বল, ঘৃতকুমারি, চালমুগড়া, সোরা, তুঁতে ইত্যাদি কোথায় পাওয়া যাবে? কেন, পীতাম্বর সাহার দোকানে। তাছাড়া লামার বাজার স্কুলে যাবার সময় অনেক সময় এই পথ ধরে যেতাম ও পীতাম্বর সাহার দোকানে উঁকি দিতাম—ওতে থরে থরে সাজানো বিভিন্ন টিনে ও বয়ামে স্পষ্ট অক্ষরে যে লেবেলগুলো সাঁটা আছে সেগুলো দেখতাম। ওর মধ্যে বেশ নজর কাড়া অবস্থার একটি টিনের উপর দেখতাম লেখা আছে 'বাঘের দুধ'। এমন দোকানে তুঁতে পাওয়ার ব্যাপারতো একেবারে নস্যি। ছোট ছোট নীল তুঁতের স্ফটিকগুলো একটি হরলিক্সের বোতলে পানিতে গুলে নিয়েছিলাম। লোহার চাবিটিকে আগেই শিরিষ কাগজ দিয়ে ঘষে ভাল করে পরিস্কার ও মসৃণ করে নিয়েছিলাম যাতে উপরে তামার প্লেটিংটি ভাল করে লাগে।

চাবিটি বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে লাগানো ধাতব ক্লিপ দিয়ে আটকিয়ে ওই তুঁতে গোলা পানিতে ডুবিয়েছি, এই তার আবার যোগ করেছি ব্যাটারির নেগেটিভের সঙ্গে। ব্যাটারির পজিটিভ থেকে যাওয়া তারের সঙ্গে ওই তুঁতে পানিতে ডুবিয়েছি বেশ কিছু মোটা তামার তার দলা-মোচড়া করে গুটলি পাকিয়ে। এভাবে ওই পানির মধ্যে দিয়ে ব্যাটারি থেকে বিদ্যুৎ চলা আরম্ভ হলে ধীরে ধীরে চাবিটি তামার পাতলা আবরণে ঢেকে গেছে। তামার যোগান দিয়েছে ওই দলা-মোচড়া করে দেয়া তামার তার—ওটি ক্রমে একটু একটু ক্ষয়ে গেছে। অন্য যে কোন তামার জিনিস দিলেই হতো, কিন্তু সে রকম কিছু হাতের কাছে ছিলনা। তামার পয়সা অবশ্য ছিল, কিন্তু তা হলে ওটাও ক্ষয়ে যেতো। ব্যাটারির জোর কম বলে চাবিটি ভাল করে তামার পাতলা আবরণে ঢাকতে বেশ সময় লেগেছে। তাছাড়া তামার আবরণটি ভাল করে তাতে লাগেওনি ঘষা দিলে উঠে যেতে চায়। এর কারণ আমার চাবিটির গায়ের তলটিকে ঠিক মত প্রস্তুত করা হয়নি। তাই তামা তেমন মসৃণ ও চকচকে হয়ে পড়েনি চাবির সারা গায়ে—যেমনটি কারখানায় দিয়ে গিল্টি করা জিনিসে দেখি। এসব করতে হলে তুঁতে-পানির সঙ্গে আরো কিছু কিছু জিনিসের প্রয়োজন হয়, বিদ্যুৎ বেশি লাগে, আর প্রক্রিয়াও উন্নত হতে হয়। কিন্তু আমি লোহার চাবিকে তামার মত কিছুটা করতে পেরেছি এটিই আমার আনন্দ।

এ সবের চেয়ে ছোট ছোট অনেক মজার মজার কাজ আমি আমার রাসায়নিক ল্যাবোরেটরিতে করতে পারতাম। যেমন আয়োডিন দিয়ে চিনি বা শর্করা সনাক্ত করতে পেরেছি। ওই সময় বাসায় সব সময় টিংচার আয়োডিনের শিশি মজুদ থাকতো—এখন যে রকম স্যাভলন বা অন্য কোন রকম অ্যান্টিসেপটিক ওষুধ থাকে হাত পা কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে লাগানোর জন্য, সে সময় টিংচার আয়োডিনই এই কাজ করতো। এটি আরো সরল জিনিস, আয়োডিন একটি মৌলিক পদার্থ, আমরা পেতাম কালচে লাল ঘন একটি তরল হিসেবে। কাজেই বইয়ে পাওয়া নানা কাজের পরামর্শের মধ্যে আয়োডিন ব্যবহার করে করার কাজটি আমার জন্য সহজ ছিল। যে কোন শর্করা জাতীয় খাবারে এক ফোটা আয়োডিন দিলেই তা ঘন নীল রঙ ধারণ করতো—বিশেষ করে ভাত, আলু এগুলোতে চমৎকার হতো। আর একটি মজার কাজ ছিল লেবুর রস, সিরকা ইত্যাদিও যে অ্যাসিড সেটি প্রমাণ করার জন্য জবা ফুলের রস ব্যবহার করা। ফুলের রসটি কচলিয়ে বের করে ওর মধ্যে ওই লেবুর রস বা সিরকা দিলে ওটি আরো ভাল লাল হয়ে উঠতো, খগেন কাকাদের থেকে নেয়া কড়া অ্যাসিডগুলো দিলে তো বটেই। আবার খাওয়ার সোডা, ধোয়ার সোডা এসব দিলে কিন্তু রঙটি নীল হয়ে যেতো, কারণ ওদের গুণ অ্যাসিডের বিপরীত।

আমার ল্যাবোরেটরি-আলমারিটি যখন সবে তৈরি হয়েছে, তখনো নানা টুকিটাকিতে এতটা ভর্তি হয়ে উঠেনি, আর এ বুক-শেল্‌ফেও নিজস্ব বিজ্ঞানের বইয়ের সংখ্যা হাতেগোণা কয়েকটি মাত্র, তখন এক অদ্ভুত প্রাপ্তিযোগ হলো।

ইউনূস ভাইয়ের স্কুলের বন্ধু সেলিম ভাই (এম এ সেলিম, পরে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী) বহু দিন থেকেই ইলেকট্রিক্যাল ও ইলেকট্রনিক্স বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন; বিখ্যাত আমেরিকান ম্যাগাজিন 'পপুলার ইলেকট্রনিক্স', 'পপুলার মেকানিক্স' এসব তিনি নিয়মিত কিনতেন এবং তাতে থাকা নানা সার্কিট ও যন্ত্রপাতি তৈরি করতেন। ইউনূস ভাইয়ের কাছ থেকে তিনি শুনেছিলেন আমার আগ্রহের কথা, তাই আমার সঙ্গে কথা বলেছিলেন এসব নিয়ে। আমার মধ্যে তাঁর একজন উপযুক্ত সমজদার খুঁজে পেয়েছেন মনে করে তিনি আমাকে তাঁর সংগ্রহ থেকে অনেক জিনিস দিয়ে দিলেন—ওসব ম্যাগাজিনের এবং 'সায়েন্স ডাইজেস্ট' নামে অন্য একটি আরো চমকপ্রদ ম্যাগাজিনের অনেকগুলো সংখ্যা এবং ইলেকট্রিক্যাল কাজের দরকারি বেশ কিছু জিনিস। এর মধ্যে ছিল চমৎকার এনামেল অন্তরক আবরণে ঢাকা বেশ মোটা তামার তারের বিরাট ভাণ্ডার, যার দাম এত বেশি যে আমি কখনো কিনতে পারতামনা। এ সব তার আমার ইলেকট্রিক মোটর, এবং অন্যান্য অনেক তারের কুণ্ডলি সংক্রান্ত কাজে দারুণ সুবিধা করে দিয়েছিল। তাছাড়া ছিল বৈদ্যুতিক সংযোগ দেবার ক্রোকোডাইল ক্লিপ, নানা রকম কানেক্টর, তার কাটার যন্ত্র, রাবার ছাড়াবার যন্ত্র ইত্যাদি—যেগুলোর অভাবে কাজ খুবই কঠিন হতো। মজার ব্যাপার হলো বহুকাল পর তাঁর অবসর জীবনে সেলিম ভাইয়ের সঙ্গে আবার দেখা হলে জানতে পারলাম সেই সব ম্যাগাজিন কেনা ও পড়ার অভ্যাস তাঁর এখনো আছে। খুশি হলেন সেই অভ্যাস আমারো আছে জেনে। তিনি এরপর মাঝে মাঝে এখনো তাঁর ম্যাগাজিন কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেন—যেন এখনো তিনি আমাকে অর্ধ শতাব্দীর বেশি সময় আগের সেই বালকের মতই যোগ্য সমজদার মনে করেন।

উচ্চারণ, ছবি, নক্সা

প্রথম দিকে আমার ইংরেজি বই পড়া, বিশেষ করে বিজ্ঞানের বই বা ম্যাগাজিন পড়ার মধ্যে একটি অদ্ভুত অসম্পূর্ণতা ছিল, কারণ এর নানা শব্দ, বাক্য পড়েছি কিন্তু কখনো সে ভাবে কানে শুনিনি। কাজেই আমি শব্দের প্রাসঙ্গিকতা থেকে, ছবি দেখে, কখনো ডিকশনারি ব্যবহার করে বেশ কিছুটা বুঝতাম বটে কিন্তু অনেক শব্দের উচ্চারণ জানতামনা। কোন কোনটির একটি মনগড়া উচ্চারণ খাড়া করতাম, কিন্তু তার শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা জানার উপায় ছিলনা—কারণ বলার বা শোনার সুযোগ বেশি ছিলনা। কোন কোনটির উচ্চারণ করার চেষ্টাই করতামনা, এমনকি বিস্তারিত বানানের দিকেও খেয়াল করতামনা। যেমন নিজের মত করে উচ্চারণ খাড়া করেছিলাম এমন একটি শব্দ ছিল 'হামিডিটি' (humidity, বাতাসের আর্দ্রতা) এর উচ্চারণ যে 'হিউমিডিটি' তা টের পেয়েছি বহুদিন পর; অথচ সমানে নানা বইয়ে শব্দটি পড়েছি, এ নিয়ে কাজও করেছি। এ ধরনের মেলা উদাহরণ ছিল। একা একা নীরবে পড়লে, কাজ করলে, এমনটি না হয়ে উপায় ছিলনা।

তাতে অবশ্য আমার বোঝার বা আনন্দ লাভের কোন বিঘ্ন ঘটতোনা—ভাষার দিক থেকে পিছিয়ে ছিলাম, এই যা।

পরে ক্লাসে ইংরেজি শিক্ষা এগোলে এই সমস্যা আর থাকেনি, কিন্তু আমার পড়াশোনায় ছবি এবং নক্সার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা কখনো শেষ হয়নি। সপ্তম শ্রেণী থেকে শুরু করে আমাদের ভূগোল পাঠ্য বইয়ে একটি বিরাট পরিবর্তন আসে। নতুন পাঠ্য বইগুলো আমেরিকার সিলভার বার্ডেট কোম্পানির প্রকাশিত বই—বাংলাদেশের ছাত্র ছাত্রীর জন্য ভাষান্তর ও কিছুটা পরিবর্তন করে আমাদের উপযুক্ত করা হয়েছে। এ বইয়ের পুরো ভঙ্গিটি এবং বিশেষ করে এতে ছবির ব্যবহার ঠিক আমি যে ভাবে সব সময় চাইতাম অনেকটা সেভাবেই ছিল, পাঠ্য বইয়ে যা আগে কখনো পাইনি। এই বইয়ের পুরো সিরিজটি ছিল : ষষ্ঠ শ্রেণীর জন্য 'এশীয় প্রতিবেশী'—এশিয়ার বিভিন্ন দেশ নিয়ে; সপ্তম শ্রেণীর জন্য 'দক্ষিণ ভূভাগ—'আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া নিয়ে; এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্য—'ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা'। এতে কিছু কথার পরে পরেই ছিল ছবি—এমন ছবি যা ওই বিশেষ ব্যাপারটিকে জ্বলজ্যান্ত করে তোলে। সেই সঙ্গে থাকতো বিভিন্ন ম্যাপ; সাধারণ ম্যাপ নয়, এক একটি বিষয়কে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষ ভাবে নক্সা করা ম্যাপ। যেমন মনে পড়ে দক্ষিণ আমেরিকার পেরু দেশটিকে কী ভাবে পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়েছিল এই বইয়ে। ওখানে উচ্চ আন্দিজ পর্বতের ঢালেই অনেক মানুষের বসত, তাদের অধিকাংশ স্থানীয় আদিবাসী, পুরো জাতিটিরই শেকড় এই আদিবাসীদের মধ্যে। উচ্চ পার্বত্য আবহাওয়া তাদের চাষবাস জীবনযাত্রাকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে তা অনেকগুলো ছবিতে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে—তাদের খাবার, তাদের পোষাক, তাদের উৎসব, সব কিছু। এসব পড়ে ও দেখে তা আমাদের মানসিক চিত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছিল।

যেমন ধরা যাক ওখানকার আলু চাষিদের কথা, এই আলু তাদের প্রাণ। আমাদের মত এক রকমের আলু নয়, বিচিত্র রঙের বিচিত্র চেহারার অনেক রকমের আলু যা আবার পর্বতের ঢালে নানা রকম বিশেষ উপত্যাকার নিজস্ব জলবায়ুর বৈশিষ্ট ধারণ করছে; ওই পেরুই যে আলুর আদি উৎপত্তি স্থল। শুধু এই বইটিতে মনোযোগ দিলে আমি যেন চলে যাচ্ছি সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার সেই গ্রামে, যার সমস্ত পটভূমিতে উচ্চ পর্বত, সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে কয়েক হাজার ফুট উপরের জলবায়ুতে যেখানকার মানুষ অভ্যস্ত। আমাদের স্কুলের শিক্ষকরা কিন্তু এই বই পছন্দ করেননি—বিশেষ করে স্পষ্ট তথ্যের আকারে, নানা সংখ্যা বা তালিকার আকারে সরাসরি সব কথা বলে দেয়া নেই বলে তাঁরা অসুবিধা বোধ করতেন; ব্যঙ্গ করে বলতেন এ খালি 'ছবি দেখ, ছবি দেখ'। শিক্ষকদের অপছন্দের কারণে বইগুলো বেশি দিন চালু ছিলনা।

আমার নিজের লেখাপড়ায় কিন্তু নক্সার একটি বড় ভূমিকা থাকতো—এ জন্য একটি খাতা সব সময় সামনে খোলা থাকতো। অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল কোন কিছু

থেকেই এই নক্সার ব্যাপারটি বাদ যেতনা। জরুরি কথাগুলো এই নক্সার মধ্যেই থাকতো, নক্সাই তাদের মধ্যে সম্পর্কগুলো দেখিয়ে দিতো। এভাবে প্রধান তথ্যগুলো বুঝে নেবার জন্য ও মনে রাখার জন্য তাদেরকে বিন্যস্ত করে নিতাম নক্সার আকারে। এ সব হতো কখনো নানা রকম জ্যামিতিক খোপ খাপরূপে—কখনো গ্রাফ পেপারের মতো ছকে, কখনো বৃত্তের মধ্যে বৃত্ত অথবা উপবৃত্তে, কখনো লুডোর ছক্কার মতো কিউবে, এর একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্ক কেমন হবে, সেই অনুসারে। এই কারণেই এসব নক্সা এক টানে এঁকে ফেলতে আমি অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আর এক টানে এরকম ম্যাপ আঁকতেও অভ্যস্ত হয়েছিলাম; নিখুঁত ম্যাপ নয়, কিছু একটা বোঝাবার বা বোঝার সুবিধার্থে ম্যাপ। আমার নিত্যকার একটি নক্সা ছিল টেলিভিশনের আদলে, তখনো সত্যি সত্যি টেলিভিশন দেখতে ঢের বাকি। কিন্তু ইউএসআইএস লাইব্রেরির বইয়ে এর প্রচুর ছবি দেখেছি। এগুলো সেই আমলের টেলিভিশনের প্রতিকৃতি—ঢাউস বাক্সের সামনের তলে প্রায় গোলাকৃতি ছোট পর্দা। পর্দার নিচে ঘোরাবার মত বড় বড় সুইচ ইত্যাদি থাকতো। ছোটদের বিভিন্ন বইয়ে একটি ছবি বেশি দেখেছি তা হলো টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিদিনকার অনুষ্ঠানসূচি। সেই থেকে আমার অভ্যাস হয়েছে প্রতিদিন খাতায় একটি টেলিভিশন এঁকে তার স্ক্রীনের ভেতর টেলিভিশন অনুষ্ঠানসূচির ভঙ্গিতে আমার সারাদিনের পরিকল্পনা লিখতাম—কতক্ষণ কী পড়বো, লিখবো; তার মধ্যে অন্য বই পড়া, আমার ল্যাবোরেটরির কাজ করা, বিশ্রাম নেয়া এই সব কিছুর আইটেম থাকতো। যেহেতু টেলিভিশনের উপর দেখছি, তাই লেখাগুলো চেষ্টা করতাম ছাপার মত অক্ষরে সুন্দর হস্তাক্ষরে লিখতে। টেলিভিশনটাকেও এক এক দিন এক এক ভাবে আঁকতাম, কোন দিন সামনে থেকে সরাসরি, কখনো এক পাশ থেকে পুরো বাক্সটি দেখিয়ে। আসলে টেলিভিশনের দেশে ওইসময় টেলিভিশন অনুষ্ঠান নিয়ে যে আতিশয্য ছিল বই পড়ে সেই আকর্ষণ আমার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিলো। তাই ওইরকম সময়সূচি করা আমার সব কাজে একটি উৎসাহ জাগানিয়া হিসেবে কাজ করেছে।

স্পুটনিক ও 'দিন-ফানুস'

স্কুলে বা বাড়িতে বিজ্ঞানের আটপৌরে জিনিসগুলো নিয়েই ছিল বেশির ভাগ সময় আমার বিজ্ঞানের চিন্তা ভাবনা। কিন্তু সেটি সম্পূর্ণ বদলে গেল ১৯৫৭ সালের ৪ অক্টোবরে এসে। সেই দিন বিশ্বের অনেক সাধারণ মানুষের মত আমাদেরও নজর চলে গেল ওপরের দিকে, পৃথিবী ছাড়িয়ে। কারণ ওই দিন পৃথিবীর প্রথম কৃত্রিম চাঁদ 'স্পুটনিক' মহাশূন্যে উৎক্ষেপন করেছিল সোভিয়েত রাশিয়া। রাশিয়ান ভাষায় স্পুটনিক অর্থ হলো সহযাত্রী, অর্থাৎ এক্ষেত্রে পৃথিবীর সহযাত্রী, মানে তার উপগ্রহ। এরপর থেকে এটি আমাদের নিজেদের শব্দ ভাণ্ডারের অংশ হয়ে গেল। অবশ্য চাঁদের মত পৃথিবীর উপগ্রহ হওয়া ছাড়া চাঁদের সঙ্গে কোন মিল ছিলনা এই

স্পুটনিকের। এটি ছিল দুই ফুট ব্যাসের একটি গোলক মাত্র যার থেকে শুঁড়ের মত বের হয়ে ছিল চারটি অ্যান্টেনা, আর ভেতরে ছিল একটি রেডিয়ো ট্রান্সমিটার ও অল্প কিছু পরিমাপক যন্ত্র। হঠাৎ সেদিন পুরো পৃথিবীর মত অবাক হয়ে আমরাও পত্রিকায়, রেডিয়োতে এই বিরাট খবরটি পেলাম। পৃথিবীর মানুষ সাফল্যের সঙ্গে তাদের তৈরি একটি জিনিস মহাশূন্যে স্থাপন করেছে এবং তা নিয়মিত ঘণ্টা দেড়েকে একবার করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে যাচ্ছে। আরো বড় কথা হলো সব জায়গা থেকে শর্ট ওয়েভ রেডিয়োতে মানুষ এর থেকে সম্প্রচার করা বীপ বীপ শব্দ পাচ্ছিল যখনই তাদের মাথার ওপর দিয়ে স্পুটনিক যাচ্ছিল।

পত্রিকায় এমনও দাবি আসতে লাগলো যে অনেকে নাকি খালি চোখেও একে দেখেছে—মহাশূন্যে হলেও স্পুটনিক যে পৃথিবীর খুব বেশি উপর দিয়ে পরিক্রমণ করছিলোনা একথা মনে রাখতে হবে। স্পুটনিক উৎক্ষেপনের পর থেকে স্কুলে ও বাসায় এর কথাটিই নানা ভাবে আসছিল, শিক্ষকরা একই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজ্ঞানের অগ্রগামিতার কথাটিও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন। আমার মনে খালি উঁকিঝুকি দিচ্ছিল যে চেষ্টা করলে আমাদের ছাদ থেকে এই নতুন চাঁদটিকে দেখা গেলেও তো যেতে পারে।

যেই সময় এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটলো। টুনু আর আইয়ুব দু'জনেই খুব ছোট সাদা একটি জিনিস আকাশে আমাদের ছাদ থেকে কয়েক বার দেখতে পেলো। ওরা তার একটি নামও দিয়েছে 'দিন-ফানুস'। আমিও তাদের কথা মতো অনেক্ষণ ছাদে অপেক্ষা করে এমনি একটি খুব ছোট সাদা জিনিসকে আকাশে পশ্চিম দিক থেকে পূর্ব দিকে খুব ধীরে চলে যেতে দেখলাম। দিন-ফানুস নাম দেবার কারণটি স্পষ্ট। প্রবারণা পূর্ণিমার ও মাঘী পূর্ণিমার রাতে আমরা সব সময় ছাদে অনেক্ষণ কাটাতাম ফানুস দেখার জন্য। বৌদ্ধ ধর্মীয় অনেক মানুষের বাস চট্টগ্রামে; ওই ধর্মীয় উৎসবের রাতগুলোতে ফানুস ওড়ানোটি খুবই প্রচলিত। ফানুস জিনিসটি হলো এক ধরনের হট এয়ার বেলুন—বাঁশের কঞ্চির হালকা ফ্রেম ঘুড়ির মত কাগজ দিয়ে ছেয়ে উল্টো কলসীর আকৃতি করা হতো। নিচের দিকে এর খোলা সরু মুখের কাছে আগুন জ্বালিয়ে গরম হাওয়া ও ধোঁয়া দেয়া হয়। হালকা গরম বাতাস ফানুসকে ভরে ফেলার কারণে এটি আকাশে ওড়ে যায়—আর ওতে সব সময় একটি খোলা আগুনের বাতি থাকে যা গরম বাতাস দিয়ে একে উড্ডীয়মান রাখে। বাতির কারণে আকাশে বহু দূর যাওয়ার পরও একে দেখা যায়। ওই রাতগুলোতে আকাশ ফানুসে ফানুসে ভর্তি হয়ে দারুণ দৃশ্য সৃষ্টি হতো। দিনের বেলায় ফানুস উড়ানোও হতোনা, দেখা যাওয়ারও কথা নয়। তবুও এরকম সাদা জিনিস দেখে টুনুরা ওই নাম দিয়েছিলো—দিন-ফানুস। আমার কিন্তু প্রথম দর্শনে মনে হলো এটি স্পুটনিক না হয়ে যায়না—বিশেষ করে তখন খুবই আবছা দেখছিলাম, এই দেখা যায় তো এই দেখা যায়না। পরে পত্রিকায় দেখলাম খালি চোখে স্পুটনিক দেখা যাচ্ছে শুধু বিশেষ বিশেষ জায়গায়, তাও সূর্য ওঠার ঠিক পর

পর অথবা ডোবার ঠিক আগে আগে যখন সূর্য দিগন্তের খুব কাছে থেকে অনুচ্চ মহাশূন্যে স্পুটনিককে আলোকিত করতে পারে। তাছাড়া এটি যে খুবই অল্প সময়ে আমাদেরকে পার হয়ে চলে যাবার কথা তা মোটে হচ্ছিলনা। তারপরও আমরা দিন-ফানুস দেখতেই থাকলাম। পরে জানতে পারলাম আমরা যা দেখতে পাচ্ছিলাম তা চট্টগ্রাম থেকে ছাড়া আবহাওয়া বেলুন মাত্র—এটি উচ্চাকাশে গিয়ে সেখানকার আবহাওয়ার নানা পরিমাপ নেয়, আবহাওয়া কেন্দ্র নিজে শুধু ভূমির কাছের বাতাসের তথ্যগুলো মাপতে পারে। আবহাওয়ার পুরো খবর জানতে উর্ধ্বাকাশের তথ্যও প্রয়োজন।

স্পুটনিক ওই অক্টোবর মাসের শেষের দিকে গিয়ে নীরব হয়ে গেল, তার ব্যাটারি ফুরিয়ে যাওয়াতে তার থেকে বীপ বীপ রেডিয়ো সিগন্যাল আর পৃথিবীতে আসছিলোনা। স্পুটনিক নীরব হয়ে যাওয়াতে এ সম্পর্কে নতুন কোন খবর না এলেও, কয়েকদিন পর ৩ নভেম্বর এলো আরো জবর খবর। মহাশূন্যে গেল সোভিয়েতের আরো একটি কৃত্রিম উপগ্রহ স্পুটনিক-২। এটি বেশ বড়সড় ভারী উপগ্রহ, অনেক গবেষণা যন্ত্রপাতি নিয়েই গেল। সব চেয়ে বড় কথা হলো এর একটি জীবন্ত যাত্রীও ছিল—লাইকা নামের একটি কুকুর। প্রচণ্ড বেগে রকেট যখন মহাশূন্যে গেছে, পৃথিবীর চারদিকে যখন স্পুটনিক-২ পরিক্রমণ শুরু করেছে, তখনো লাইকা বেঁচে ছিল। এটি বোঝা যাচ্ছিল কারণ লাইকার শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রেডিয়ো সিগ্‌ন্যালের আকারে পাওয়া যাচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত লাইকা অবশ্য মারা গিয়েছিলো ভ্রমণের ধকলে নয়, বরং স্পুটনিকের ভেতরে উত্তাপ অনেক বেড়ে গিয়েছিলো বলে। মহাশূন্যে যাত্রী হিসেবে থাকায় লাইকা আমাদের কাছে ভীষণ জনপ্রিয়তা পেয়েছিলো। স্পুটনিক-১ যত না তোলপাড় সৃষ্টি করেছিলো, লাইকার কারণে এবার মনে হয় তা আরো বেড়ে গেল। তবে লাইকা মারা যাওয়াতে মনে কষ্ট পেয়েছিলাম। এটি ঠিক যে আগে পরে ওই মহাশূন্যে লাইকা মারা যেতই, কারণ তাকে স্পুটনিক-২ থেকে উদ্ধার করার কোন পরিকল্পনা ছিলনা।

স্পুটনিক নিয়ে পত্রিকায় লেখার আর আলোচনার কথায় যত কিছু এসেছে তার মধ্যে যতটা না এর বৈজ্ঞানিক ব্যাপার স্যাপার থাকতো তার চেয়ে বেশি থাকতো সোভিয়েত ইউনিয়ন যে আমেরিকাকে এর মাধ্যমে অনেকটা ছাড়িয়ে গেছে সেই বিষয়টা। স্পুটনিক-১ ও স্পুটনিক-২ এর পর আমেরিকা খুব পড়িমড়ি করে যে ভ্যানগার্ড উপগ্রহ উৎক্ষেপনের চেষ্টা করেছে তা সফল হয়নি। অবশ্য পরের বছর ১৯৫৮ এর শুরুতে প্রথম মার্কিন উপগ্রহ 'এক্সপ্লোরার-১' সফল ভাবে কক্ষে স্থাপিত হয়েছে বটে কিন্তু তাতে আগের স্পুটনিকের অতিরিক্ত তেমন কোন চমক ছিলনা। এরপর ওই বছরেই উভয় দেশ কয়েকটি উপগ্রহ পাঠালেও সাফল্যের পরিমাণের দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এগিয়ে ছিল। স্পুটনিক দিয়ে এই যে প্রারম্ভটি ঘটলো সেটি একদিকে যেমন মহাশূন্য যুগের সূচনা, তেমনি

সোভিয়েত ও আমেরিকার মধ্যে মহাশূন্য প্রতিযোগিতারও সূচনা, যা পরের কয়েক দশক আমাদের অনেক উচ্ছাস, অনেক আনন্দকে ঘিরে রেখেছিলো।

ঐ ১৯৫৮ সালেই খুব উপযুক্ত একজন মানুষ আমাকে স্পুটনিকের পেছনে যেই বিজ্ঞান তা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, সেই সঙ্গে আরো অনেক কিছু। তিনি হলেন এখলাস ভাই (এখলাস উদ্দিন আহমদ, পরে কালীনারায়ণ স্কলার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের খ্যাতনামা অধ্যপক)। অষ্টম শ্রেণীর পরীক্ষার পর ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে ঢাকায় গিয়েছিলাম। ইউনূস ভাই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসেবে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকেন। মোগল গার্ডেন্সের আদলে বাদশাহী সৌকর্যের যেই হল দেখে আগে অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থেকেছি, কী সৌভাগ্য এখন সেখানেই আমি কয়েক দিনের বাসিন্দা হতে পারছি। ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে একই বছরে এখলাস ভাইও ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে এই সলিমুল্লাহ হলেই থাকেন, তাঁর রুমের কাছেই রুম। এখলাস ভাই সব সময় বোর্ডে প্রথম হওয়া প্রদেশের সেরা ছাত্র, সম্প্রতি ইন্টারমিডিয়েটেও তিনিই প্রথম। ইউনূস ভাই আমাকে তাঁর হাতে সোপর্দ করে বল্‌লেন 'তোমার যা কিছু প্রশ্ন এখলাসকে করো'। মজার মানুষ এখলাস ভাই। বোর্ডে ফার্স্ট হওয়া বিশ্বজয়ী ভাল ছেলেরা সাধারণত যেমনটি হয় বলে ধারণা ছিল—দেমাগি, গম্ভীর প্রকৃতি—এখলাস ভাই দেখলাম তার ঠিক উল্টো। দারুণ উৎসাহী মানুষ, খুব দ্রুত কথা বলেন; আমি একটি কথা জিজ্ঞেস করলে আমাকে আরো দশটি কথা বুঝিয়ে ছাড়েন। তিনি বোঝাতে চেষ্টা করলেন রকেটে কত শক্তি থাকলে তা ওই স্পুটনিককে নিয়ে মহাশূন্যে যেতে পারে পৃথিবীর আকর্ষণ অতিক্রম করে। শুধু তাই নয় তাঁর কাছেই প্রথম শোনলাম তাঁদের যেখানে বিশ্ববিদ্যালয় সেই দারুণ সব স্থাপত্যময় কার্জন হলের লাল দালানগুলোর মধ্যে কী হয়। এখলাস ভাই সেখান থেকে সন্ধ্যা করে ফেরেন—কারণ অনেক এক্সপেরিমেন্ট করতে হয় পদার্থবিদ্যার ছাত্রদেরকে। সত্যেন বসুর কাহিনী শোনালেন—সেই মহাবিজ্ঞানী আইনস্টাইনের সঙ্গে যাঁর নাম জড়িয়ে আছে। এই কার্জন হল থেকেই সত্যেন বসু বিজ্ঞানের ইতিহাসে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন, ওইসময়ের তের বছর আগেও এখানে ছিলেন। এখনো তাঁর হাতে গড়া যন্ত্রপাতিতে পরিবেষ্টিত হয়ে আছেন এখলাস ভাইরা। বিজ্ঞান নিয়ে এখলাস ভাই খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে কথা বলছিলেন এবং তাঁর এই বালক শ্রোতাকেও তাঁর উচ্ছ্বাসের ভাগী করার চেষ্টা করছিলেন। অন্যদিকে শরীরের যত্ন না নিলে যে লেখাপড়াও ভাল হবে না সে কথা স্মরণ করাতেও ভুলেননি তিনি। হলের একজন কর্মী যাকে সবাই 'চাচা' ডাকতেন নানা জনকে দুধ সরবরাহ করতেন—এখলাস ভাইকেও। এখলাস ভাই চাচাকে বলে দিলেন এখন থেকে আমাকেও যেন এক গ্লাস দুধ দেয়া হয় রোজ।

এখলাস ভাইয়ের দ্রুত গতির কথাবার্তা শুধু তাঁর নিজস্ব বিষয় বা লেখাপড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতোনা, বরং অন্যদের সঙ্গে আলোচনায় তাঁকে প্রায়ই দেখতাম

দেশের ও বিশ্ববিদ্যালয়ের, এবং হল জীবনের নানা বিষয় নিয়ে খুবই সমালোচনা-মুখর হতে। ঠিক ওই সময় পুরো ঢাকা জুড়ে একটি হৈচৈ চলছে 'বাঘেরের পীরকে' নিয়ে। এখলাস ভাই বললেন 'দেখ আমরা বিজ্ঞান পড়ছি, বিজ্ঞান-মনস্ক হতে বলছি সবাইকে, কিন্তু দেশের আসল অবস্থাটি কী? বাইরে গেলে দেখবে হাজার হাজার মানুষ ছুটছে বোতল হাতে বাঘেরের পীরের থেকে পানি-পড়া আনতে'। আসলেও কথাটি আমি আগেই নানা জনের মুখে শুনছিলাম। ঢাকার কাছেই একটি জায়গা বাঘেরের এই পীরের মাজেজার কথা লোকমুখে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। নানা রকম অসুখ সারাতে ও মনোষ্কামনা পূরণ করতে সব ধরনের মানুষ বাসে, নৌকায়, লঞ্চে বাঘেরের দিকে যাচ্ছিল—সবার হাতে বোতল। সবার মুখে নাকি তাঁর এই মাহাত্ম্যের কথা। এতটা না দেখলেও আমি কয়েকবার লক্ষ্য করেছি রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাতে চালাতে ক্ষণে ক্ষণে 'বাঘের, বাঘের' বলে অকারণ চেঁচিয়ে উঠছিল। শুনেছি সে সময় শ্রমিকরা তালে তালে ধাক্কা দিয়ে ভারী জিনিস ওপরে ওঠাবার সময় বলতো 'বাঘেরের পীর হেঁইয়ো, আরো জোরে হেঁইয়ো' ইত্যাদি। ঢাকায় এই বাঘের হজুগ নাকি বেশ কিছুদিন স্থায়ী হয়েছিলো।

কমন রুমের ওই পারে

শক্তিতে দুর্বার

কলেজিয়েট স্কুলের সপ্তম শ্রেণীতে ভর্তি হবার পর থেকেই ভাবতাম সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণী শেষ করে কবে ওই কমন রুমটি পার হবো। স্কুলের ভবনটিই এমন ভাবে বিন্যস্ত ছিল যে মাঝখানে ওই বড় কমন রুমটির এপারে হলো জুনিয়র ক্লাসগুলো। তারপর কমনরুমের ওই পারে গেলেই শুরু হয়ে যায় সিনিয়র ক্লাসগুলো—নবম ও দশম শ্রেণী। স্কুলে ওখানকার ছাত্রদের মর্যাদাটাই অন্য রকম—দায়িত্বটিও অনেক বেশি। কমনরুম পার হবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন আচার আচরণ বদলে যায় ছেলেদের, অধিকাংশ ছেলের ক্ষেত্রে শরীরের গঠনও। হঠাৎ করে দেখি আমরা সবাই লম্বা হয়ে যাচ্ছি, গলার স্বর ভারী হচ্ছে, আমাদের মধ্যে ক্লাসে হাফ প্যান্ট পরা ছেলে আর দেখা যাচ্ছেনা বল্‌লেই চলে—অবশ্য স্কাউটিং পোষাক, পিটি ড্রেস ইত্যাদি ভিন্ন কথা। ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে পরে আসা আমার সখের আমেরিকান কাউবয় প্যান্টটিও মনে হচ্ছে আর বেশি দিন পরতে পারবোনা। নবম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকেই সব শিক্ষকরা বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন সেই মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাট্রিকুলেশন এক্সামিনেশনের কথা, কেউ কেউ রস করে বলতেন 'মাতৃকূলনাশক'। নবম শ্রেণীতে তাঁরা বলতেন 'ইউ আর ইন ম্যাট্রিক সেকেন্ড ক্লাস', আর দশম শ্রেণীতে 'ম্যাট্রিক ফার্স্ট ক্লাস'।

চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে এই পরিবর্তনটিকে আরো নাটকীয় করে তুলেছিল তার বাধ্যতামূলক জুনিয়র ক্যাডেট কোর—নবম ও দশম শ্রেণীর সব ছাত্রের জন্য। আমাদের জীবনে ওই দুই বছর কত ভাবে যে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রেখেছে তা প্রতিদিনকার ওই মিলিটারি ট্রেনিঙের খুঁটিনাটির মধ্যে না গেলে বোঝা যাবেনা। এখানে নবম ও দশম শ্রেণীর সব ছাত্রদের মধ্যে সব কিছু মিলে কী রকম একটি সাহসিকতার ভাব গড়ে উঠতো তার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় নিজে এখানে থাকার সময় বেলাল ভাইয়ের লেখা একটি গানে (বেলাল ভাই অর্থাৎ ইউনূস

ভাইয়ের বন্ধু বেলাল বেগ যে বরাবর স্বভাব-কবি ছিলেন সে কথাতো আগেই বলেছি)। ওই গান স্কুলে থাকতে তাঁরা গেয়েছেন, আমি শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছি :

ক্লাস টেন, ক্লাস টেন, ক্লাস টেন
শক্তিতে দুর্বার, নয় কভু হটবার,
পাকা স্টুডেন্ট;
ক্লাস টেন, ক্লাস টেন, ক্লাস টেন।
দ্বিতীয় বছর ক্যাডেট তারা, রাইফেল হাতে হয়ে খাড়া,
হাঁকে 'অ্যাটেনশন';
ক্লাস টেন, ক্লাস টেন, ক্লাস টেন।

আমরা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র এ যেমন আমাদের একটি পরিচয়, তেমনি আমরা পাকিস্তান জুনিয়র ক্যাডেট কোরের (জে সি সি) 'ইস্টার্ন কোম্পানি' এটিও আমাদের অন্য একটি পরিচয়; এমনি আর একটি 'কোম্পানি' পশ্চিম পাকিস্তানের একটি স্কুলে ছিল। আমাদের কোম্পানি শ'দেড়েক ছাত্রের একটি বাহিনী, যার মধ্যে রয়েছে কয়েকটি 'প্লাটুন'। প্রত্যেক প্লাটুন তিনটি 'সেকশনে' ভাগ করা, যার প্রত্যেকটিতে দশ বারজন ছাত্র। দশম শ্রেণীর যে ছাত্র আমাদের কোম্পানি কমান্ডার সে তো এখন ধরা ছোঁয়ার বাইরের ছেলে—ট্রেনিঙের সময় দেখা হলেই স্যালুট ঠুকতে হয়। তার আবার পদবি হয়েছে সার্জেন্ট মেজর, সেও দবদবা কম নয়। আমাদের নিজস্ব প্লাটুনে প্লাটুন কমান্ডার নির্বাচিত হয়েছিল শাহজাহান। ক্লাসের দু'জন শাহজাহানের মধ্যে ওর বাবা পুলিশে চাকরী করতেন বলে আমরা তাকে বলতাম 'পুলিশ শাহজাহান', পরে সে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে মেজর জেনারেল হয়েছিলো।

আমি একটি সেকশনের অধিনায়কত্ব পেয়েছিলাম মাত্র, কাজেই আমার র‍্যাঙ্ক ওই 'কর্পোরাল' বা দেশী ভাষায় 'নায়েকে' সীমাবদ্ধ ছিল। জে সি সি'র পোষাকে আমার হাতে একটির ওপর একটি 'ভি' চিহ্নের মত দুটি 'বিল্লা' (ননকমিশন্ড চিহ্ন) থাকতো। সেকশনে আমার নিচেও একজন অধিনায়ক ছিল ল্যান্স কর্পোরাল, তার শুধু এক বিল্লা। এই পদে ছিল রাজু (আলী রেজা খুরশিদ, পরে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়নের ত্যাগী নেতা, অকাল প্রয়াত)। এই বিল্লা প্রসঙ্গে মনে পড়লো সাহিত্যিক মাহবুবউল আলমের 'পল্টন জীবনের স্মৃতিতে' পড়েছিলাম প্রথম মহাযুদ্ধের সময় তাঁদের (নজরুলও তার মধ্যে একজন ছিলেন) ৪৯ বাঙালি পল্টনের একটি ছোটখাট কোর্ট মার্শালের কাহিনী। ওই ৪৯ নম্বরটি দিয়ে পুরো বাঙালি পল্টন পরিচিত ছিল। কোন এক নায়েককে তার অধীনস্থ সেপাই অপমান করায় সে কেঁদে ফেলেছিল—এই নিয়ে কোর্ট মার্শাল। কোর্ট মার্শাল সেপাইকে শাস্তি না দিয়ে কেঁদে ফেলার অপরাধে নায়েককেই শাস্তি দিল, শাস্তি তক্ষুনি কার্যকর করার রায় এলো : 'হাবিলদার মেজর, এর বিল্লা খুলে নাও'। দুই বছরের জেসিসি জীবনে আমি সামরিক শৃঙ্খলা ভঙ্গের মত অনেক অপরাধ করলেও

আমাকে অবশ্য কখনো বিল্লা হারাতে হয়নি। প্লাটুন কমান্ডার হওয়াতে শাহজাহানকে কোন বিল্লা পরতে হতোনা তার কাঁধে শোল্ডার ফ্ল্যাপে ছিল তারকা চিহ্ন। আর তার সহকারী সার্জেন্ট তসলিমের বিল্লাটি ছিল বেশ জবড়জং।

জেসিসি করা মানে হলো প্রতিদিন স্কুলের ক্লাসগুলো শেষ হলে আরো দুই পিরিয়ড সামরিক কাজ করা। এই দুটি পিরিয়ডের একটিতে সাধারণত হতো প্যারেড প্রশিক্ষণ, আর দ্বিতীয়টিতে সামরিক নানা বিষয়ে বিভিন্ন তাত্ত্বিক ক্লাস ও তার বাস্তব অনুশীলন। কখনো কখনো আবার পি টি ড্রেস পরে শরীর চর্চা, বক্সিং, ভলিবল ইত্যাদি খেলা। আমাদের বিশাল মাঠের আনাচে কানাচে এই সব চলতো। বেশির ভাগ হতো প্লাটুনের ভিত্তিতে—এক এক প্লাটুন মাঠের এক এক জায়গায়। তবে বড় প্যারেডের প্রশিক্ষণ নেবার জন্য পুরো কোম্পানিকে এক সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে কখনো কখনো। আবার অনুশীলনগুলো সেকশনের মধ্যেও হতো। প্রাথমিক কয়েক মাস যাবার পর আমাদেরকে প্যারেড করতে হতো রাইফেল নিয়ে। প্রশিক্ষণ প্যারেড আসলটির মত একই ওজন ও সাইজের ডামি রাইফেল নিয়ে করলেও আনুষ্ঠানিক প্যারেড এবং অনুশীলনের ফায়ারিং ইত্যাদি কাজ একেবারে রেগুলেশন সার্ভিস রাইফেল দিয়ে করতে হতো। আমাদের অধিকাংশের জন্য নিজের সাইজের তুলনায় এসবের সাইজ হতো বেশ বড়, ওজনটাও বেশ ভারি।

আমাদেরকে জে সি সি করাতেন তিন জন ওস্তাদজি। তাঁরা আর্মি থেকে প্রেষণে আমাদের স্কুলে কাজ করতেন, এখানেই থাকতেন। তাঁদের কাছেই আমরা তালিম নিতাম প্যারেডের এবং অন্যান্য কাজের। তাঁদের প্রধান হিসেবে পুরো জেসিসি'র দায়িত্বে ছিলেন আমাদের বড় ওস্তাদজি হাবিলদার মেজর নাজির, বাড়ি আজাদ কাশ্মীর। তিনি ছিলেন এক স্মরণীয় চরিত্র যাঁর কথা একটু পর বলছি। আর যে দু'জন ছিলেন একজন হাবিলদার, বাড়ি বিহার এবং অন্য জন্য নায়েক, বাড়ি এখানেই চাঁদপুর। আমাদের জেসিসির ওস্তাদ সৈনিকদের একজন কাশ্মীর আর একজন চাঁদপুর থেকে আসাটি আমাদেরকে নিয়মিত গাওয়া গানের দুটি ছত্র মনে করিয়ে দিত 'খাইবার দ্বারে তার পতাকাবাহী, মেঘনা-কূলের যত বীর সিপাহি'। খাইবার পাকিস্তান আফগান সীমান্তের গিরিপথ। বাড়ি নানা জায়গায় হলেও জেসিসি'র ক্ষেত্রে তাঁদের সবার এক ভাষা—তা হলো উর্দু। এমনকি সেই মেঘনা-কূলের নায়েক সাহেবও উর্দু ছাড়া অন্য কিছু বলতে চাইতেন না। রাষ্ট্র ভাষা বাংলার প্রশ্ন তুল্লে তিনি বলতেন উর্দু হচ্ছে ফৌজের জবান, এই শব্দটিও এসেছে ফৌজের পোষাক উর্দি থেকে। আর অন্য ওস্তাদজিরাতো উর্দু ভাষীই ছিলেন। ফলে প্যারেডের মাঠে আমাদের সবার মধ্যে ছিল ভাষার এক জগাখিচুড়ি। মার্চের সময় সারাক্ষণ কান ঝালাপালা থাকতো—'নজর সামনে', 'এড়ি পর' (গোড়ালির উপর), 'সিনা টাইট' ইত্যাদি নির্দেশ শুনতে শুনতে, যাতে ঢিলেমির কোন কারণ না ঘটে। এগুলো ওস্তাদজিরা বলে ভাল কথা, কিন্তু

তাঁদের নির্দেশে বন্ধু প্লাটুন লিডার (শাহজাহান) আর সার্জেন্টকেও (তসলিম) বলতে হতো সারাক্ষণ।

বড় ওস্তাদজি হাবিলদার মেজর আমাদেরকে বোঝাতেন বিশুদ্ধ 'ফৌজি আলফাজ' (সামরিক শব্দাবলী, একবচনে শব্দ হলো লফ্জ, বহুবচনে আলফাজ) সব সময় আমাদেরকে ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু সেই ফৌজি আলফাজের যে নমুনা দেখতাম তা রীতিমত হাসির উদ্রেককারী। লাইন সোজা করার জন্য এক জনের কাঁধে আরেকজন ডান হাত দিয়ে ও ডানে তাকিয়ে 'রাইট ড্রেস' করতে হতো। তারপর আগের অবস্থায় ফেরত আসার জন্য বলা হতে 'আইজোয়া'। বহু দিন পর বুঝেছি ওই শব্দটি এসেছে 'এজ ইউ ওয়্যার' কথাটির বিকৃতি থেকে। অনুশীলনে রাইফেল ফায়ার করানোর জন্য নির্দেশ দেয়া হতো 'লাইং লোডিং পজিশন'—তখন মাটিতে শুয়ে পড়ে রাইফেল লোড করার পজিশনে যেতে হতো। তারপর আদেশটি হতো 'আপনা মর্জি সে টাইম ফাইভ রাউন্ড অ্যাপ্লিকেশন ফায়ার'। এরকমই ছিল উর্দু-ইংরেজির এক অদ্ভুত জগাখিচুড়ি ওই ফৌজি আলফাজ।

আনুষ্ঠানিক প্যারেডের জন্য সার্ভিস রাইফেল নিয়ে অবলীলাক্রমে নিখুঁত মোশন নিতে পারা জরুরি ছিল। কিন্তু ওজনদার জিনিসকে ওভাবে চকিতে এক সঙ্গে কাঁধে তুলে নেয়া, আবার নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে চকিতে নামিয়ে এটেনশন হওয়া সোজা কাজ ছিলনা। একই ভাবে বড় কমান্ডারকে সামরিক সম্মান দেবার জন্য 'প্রেজেন্ট আর্ম' করতে পুরো রাইফেলকে সোজা সামনে দু'হাতে খাড়া করে নিখুঁত ভঙ্গিতে অনেক্ষণ একেবারে নিশ্চল হয়ে ধরে রাখা তাও কম কথা নয়, হাত একটুও কাঁপতে পারবেনা। কিন্তু বহুবার প্র্যাকটিসের ফলে এ-ও রপ্ত হয়ে গিয়েছিল। আমাদেরকে পোষাক দেয়া হয়েছিল—পাক্কা সামরিক পোষাক। খাকি শার্ট-প্যান্ট, সামরিক বেল্ট, পায়ে ভারি বুট—খানিকটা পায়ের ওপর ওঠে আসা। তার সঙ্গে প্যান্টের কিনারা মুড়ে লাগাতে হতো অ্যাঙ্কলেট। মাথায় খাঁকি ব্যারে টুপি। অবশ্য এ পোষাক পরতে হতো কালে ভদ্রে।

সামরিক কৌশলাদি যা শেখানো হতো বা অনুশীলন করা হতো—তা হলো পরিবেশের সঙ্গে মিলিয়ে 'কামোফ্ল্যাজ' করা অর্থাৎ জায়গা ভেদে গাছের পাতা, কাদামাটি ইত্যাদি গায়ে লাগিয়ে শত্রুর কাছে অদৃশ্য থাকা; মূল আক্রমণের আগে অজানা শত্রু এলাকায় গোপনে গিয়ে পথঘাট জেনে নিতে ও তাদের অবস্থান, শক্তি ইত্যাদির খবর নিতে 'রেকি' করা; ক্রলিং করে শত্রুর অদেখা থেকে একটি স্থান পার হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। এসব কৌশল শেখানো আর অনুশীলন করানোর থেকে বেশি হতো পাকিস্তান আর্মির নানা কীর্তি-কাহিনীর গল্প শোনানো। অনুশীলনের ক্ষেত্রে সব সময় অবধারিত ভাবে শত্রু পক্ষ স্পষ্ট ভাবেই ধরে নেয়া হতো ভারত। শত্রু পক্ষ না বলে সরাসরি বলা হতো 'হিন্দুস্তান'। যেমন বলা হতো : 'মনে কর এই খানে হিন্দুস্তানের সৈন্য অবস্থান করছে, তোমাদেরকে

গোপনে তাদের অবস্থান সম্পর্কে রেকি করতে হবে...' ইত্যাদি। বিভিন্ন সময়ে পাক-ভারত সীমান্তে যে সব ছোটখাট স্থানীয় সংঘর্ষ হতো তারও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ হতো। যেমন একবার বেশ কিছু দিন ধরে পূর্বপাকিস্তানের পূর্ব সীমান্তে মৌজা আসালং নামে জায়গার ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স (ইপিআর) ও ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে বেশ কিছু সংঘর্ষ হয়েছিল এবং কয়েকজন নিহত হয়েছিল, ভারতের একজন রক্ষী সীমান্তের পাকিস্তান অংশে ধরাও পড়েছিল। এ নিয়ে কয়েকদিন ধরে আমাদের জে সি সি'তে আলোচনা হয়েছে। এসব আলোচনায় সব সময় আমাদের আর্মি এবং ইপিআর এর কৃতিত্ব বড় করে দেখানো হতো, এবং গর্বে আমাদের বুক ফুলে যেত।

রোজকার জে সি সি করার আসল মজাটি ছিল এর একেবারে শেষ অংশে, যখন স্কুল শেষে এত বাড়তি কাজের পুরস্কার মিলতো চমৎকার খাবার রূপে। পরিশ্রান্ত ও ক্ষুধার্ত আমরা সারিবদ্ধ ভাবে বসে এ খাবারের উপর ঝাপিয়ে পড়তাম। জেসিসি'তে বেশ বড় সড় অ্যালুমিনিয়ামের বাটি ছিল আমাদের প্রত্যেকের জন্য। প্রতিদিন বাটি ভর্তি গরম গরম খাসির মাংস আসতো—ঘন চর্বিদার শুরুয়ার মধ্যে ডোবানো। আগে থেকেই সব বাটিতে বাটিতে পরিবেশন করা থাকতো। আর দেয়া হতো দুটি বড় সড় পরোটা। পরোটা দিয়ে ওই এত খানি খাসির মাংস শুরুয়া সমেত খেতে যে কী তৃপ্তি লাগতো তা বলে বোঝানো যাবেনা। সব সময় এই একই মেন্যু, কোনদিন কোন ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু তাই বলে কোনদিন এটি খেতে কারো বিন্দু মাত্র অনাগ্রহ হতে দেখিনি।

আমাদের কাছে জে সি সি'র একটি বড় আকর্ষণ ছিলেন আমাদের বড় ওস্তাদজি ব্যাটেলিয়ন হাবিলদার মেজর নাজির। দীর্ঘ সামরিক জীবনের শেষ ভাগে এসে তিনি বৃটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির এবং পরে পাকিস্তান আর্মির এই সর্বোচ্চ নন-কমিশন পদটিতে এসেছেন। সাধারণ সৈনিক থেকে যাঁরা শুরু করেছেন হাবিলদার মেজর হতে পারা তাঁদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের ব্যাপার। পুরো পোষাকে যখন তিনি থাকতেন সেটি বেশ দেখার মত হতো। তাঁর হাতের কব্জিতে হাবিলদার মেজরের ধাতব সোনালি ইনসিগনিয়া বাঁধা, পকেটের উপর অতীতের নানা ইউনিটে কাজ করারও সাফল্যের চিহ্ন রেজিমেন্টাল কালার্স সমূহ, সব মিলে তাঁর দীর্ঘ কিন্তু ছিমছাম দেহাবয়বকে একটি অদ্ভুত গরিমা দিতো। ওস্তাদজি ছিলেন আমাদের জন্য এক জীবন্ত কিংবদন্তি। ট্রেনিঙের সময় খুবই কড়া, অথচ তাঁর বালক-সেনাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল—এই মানুষটি নানা ভাবে আমাদের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন। সেই কবে কাশ্মীরে তাঁর গ্রাম ছেড়ে তিনি বৃটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে নাম লিখিয়েছিলেন সেই আবছা স্মৃতির কথা তিনি আমাদেরকে অনেকবার শুনিয়েছেন। আমাদের সামরিক কৌশলের যে সব ক্লাস তিনি মাঠে গাছের ছায়ায় বসিয়ে নিতেন তার অনেকটা জুড়ে থাকতো তাঁর নিজের সামরিক জীবনের নানা অভিজ্ঞতার কথা।

জীবনের বড় অংশটি কাটিয়েছেন বৃটিশ অফিসারদের অধীনে কাজ করে। তাঁর সব চেয়ে স্মরণীয় এবং ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে ১৯৪৩-৪৪ সালে বার্মা ফ্রন্টে। তখন তিনি চট্টগ্রামের খুব কাছেই জাপানি অধিকৃত আরাকানে বৃটিশ আক্রমণের অংশ ছিলেন। তাঁরা টেকনাফের খুব কাছের শহর মংডু দখল করে এগিয়ে গিয়েছিলেন প্রচণ্ড জাপানি বাধার সম্মুখীন হয়েও। মনে রাখতে হবে ওই সময়ে বার্মা ইতোমধ্যেই পুরোপুরি জাপানি দখলে ছিল। সেখান থেকে পুরো বার্মা-বৃটিশ আর্মিকে ভারতে প্রত্যাহার করতে হয়েছিল, এবং সেই সঙ্গে বার্মায় থাকা ভারতীয় অভিবাসীদেরকে জান হাতে নিয়ে পালিয়ে আসতে হয়েছিল। ওস্তাদজিদের ওই আক্রমণ ছিল অবস্থার পরিবর্তনের একটি চেষ্টা। কিন্তু তাঁরা বার্মার ভেতরে বেশিদূর যেতে পারেননি। বর্ষার কারণে এবং ইতোমধ্যে জাপানিরা মণিপুরের ইম্ফলে এবং কোহিমায় প্রচন্ড আক্রমণ করে ভারতে ঢোকার চেষ্টা শুরু করায় তাঁদের ব্যাটালিয়ানকে আরো উত্তরে ওই জায়গায় চলে যেতে হয়েছিল।

মণিপুরের ওই যুদ্ধে কখনো জাপানিরা আবার কখনো বৃটিশরা প্রাধান্য পাওয়াতে ওস্তাদজির ব্যাটেলিয়নকে যে মরণপণ যুদ্ধ করতে হয়েছিল তার কথা তিনি প্রায়ই আমাদেরকে বলতেন। এখানেই জাপানিদের সম্পর্কে ওস্তাদজির একটি অদ্ভুত সমীহ ও সম্মানবোধ জন্মেছিল, যা পরে তাঁর অনেক কথায় জাপানি সৈন্যদের কীর্তির উদাহরণ টেনে আনার মধ্য দিয়ে আমরা টের পেয়েছি। ইম্ফল আর কোহিমার যুদ্ধে বার বার ব্যর্থ হয়েও জাপানিরা আবার আক্রমণ করেছে; বার্মায় তাদের মূল কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে থাকার কারণে খাবার, রসদ ও চিকিৎসার অভাবে এবং অনাহারে ও ম্যালেরিয়া-আমাশায় তাদের মধ্যে প্রচুর মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু তবুও তাদের অনেক সাফল্যের মূলে ছিল সাহসিকতা ও শৃঙ্খলাবোধ। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জাপানিরা ভারতে ঢুকতে পারেনি—ওস্তাদজিরা তাদেরকে ইম্ফলে আর কোহিমায় ঠেকিয়ে দিয়েছিলেন। সেই বার্মা যুদ্ধের বেঁচে আসা গর্বিত সৈনিক ছিলেন আমাদের হাবিলদার মেজর ওস্তাদজি।

আমাদের কাছে যখন তিনি এসেছেন তখন তাঁর সৈনিক জীবন প্রায় শেষ প্রান্তে, অবসর গ্রহণের মাত্র কিছুদিন বাকি। তাঁর মন পড়ে থাকতো আজাদ কাশ্মীরে তাঁর গ্রাম ও পরিবারের কাছে। বিশেষ করে বলতেন সেখানে তাঁর মেয়ের কথা, যার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘদিন দেখা হয়নি। সারা জীবনেও মেয়েকে তিনি খুব বেশিদিন কাছে পাননি, মেয়ের সেই এক্কেবারে ছোট বেলা থেকে। সম্প্রতি নাতি হয়েছে খবর পেয়েছেন, কিন্তু তাকে এখনো দেখা হয়নি। এসব কথা যখন তিনি বলতেন তখন আমাদের কড়া ট্রেইনার ওস্তাদজির মুখ কাতর হয়ে পড়তো, চোখ ছলছল করতো। মাঝে মাঝে জে সি সি'তে গানের অনুষ্ঠান হতো। বিশেষ করে আমরা দু বছরে দু'বার যখন ক্যাম্পে গিয়েছি সেখানে এমনি আসর খুব জমজমাট হতো। ওস্তাদজি এ সবে আমাদের সঙ্গে ছেলে মানুষের মতো অংশ নিতেন। আমাদের সহপাঠী মুসাব্বির নিজে গান বানাতে পারতো, এবং নানা সুরে তা

গাইতো। মুসাব্বিরের একটি গানের প্রথম কলি ছিল 'ওস্তাদজির বাঁশি বাজেরে, আমার বাঁশি বাজেনা'—এটি সে সিলেটি লোকগীতির সুরে ও ভাষায় গাইতো। সেটি শুনে ওস্তাদজি কী খুশি!

ওস্তাদজির সঙ্গে আমার শুরুটা কিন্তু মোটেই ভাল হয়নি। জেসিসি'তে আমার চশমা আর তশমা (জুতার ফিতা) এই দুটি জিনিস তাঁর জন্য খুব বিরক্তিকর ছিল। চশমার কারণে আমি বক্সিঙে ঠিক মতো অংশ নিতে পারতামনা, কারণ চশমা খুলে ঠিক মত দেখতে না পেয়ে চোখ মিট মিট করতাম। আর প্যারেডের সময় আমার জুতার ফিতা কেন জানি প্রায় খুলে গিয়ে বিপত্তি ঘটাতো। তিনি ওসময় আমাকে সতর্কও করতেন 'এই চশমা ওয়ালে' বলে। কিন্তু ওই সামরিক কৌশলের গল্পের ক্লাসগুলোতে শিগ্‌গীর তিনি আবিস্কার করলেন যে আমি তাঁর মনোযোগী শ্রোতাই শুধু নই, বড় সমজদারও বটে। এরপর থেকে তিনি ক্রমে ক্রমে সামরিক কৌশলের অনেক কিছু ব্যাখ্যা করার ভার আমার উপর ছেড়ে দিতে লাগলেন—আমিও মনের মাধুরী মিশিয়ে সহপাঠীদেরকে ওগুলো বোঝাবার চেষ্টা করতাম ওস্তাদজির বর্ণিত নানা উদাহরণের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা করে। ওস্তাদজি আমাদের কোন কাজে খুশি হয়ে যখন আবেগপ্রবণভাবে দোয়া করতেন তখন বলতেন 'তুম সব বড়া আফসার (অফিসার) বন জায়োগে—জানরেল (জেনারেল), কারনাল (কর্নেল); গাঁওমে তোমারা মকান তক্ রাস্তা পহুঁছ জায়েগা'। আমাদের বহু যুদ্ধের অভিজ্ঞ কিন্তু মূলত অতি সাদাসিধা সরল গ্রামবাসী ওস্তাদজী এর চেয়ে বড় কোন সৌভাগ্য কারো জন্য কল্পনা করতে পারতেন না। সাধারণ সৈনিক হিসেবে কর্নেল, জেনারেল, এগুলো তাঁর জন্য ছিল ধরা ছোঁয়ার বাইরের অতি উচ্চ অর্জন—যে কারণে এসব অফিসারের গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা পৌঁছে যায়।

জেসিসি জীবনের তুঙ্গের অভিজ্ঞতা ছিল দু'বছরে আমাদের দুটি ক্যাম্প। দুটি ক্যাম্পই হয়েছিল একই জায়গায়, এবং প্রায় একই রকমের, তবে দ্বিতীয়টিতে আমরা কিছু অভিজ্ঞ ক্যাডেট ছিলাম বলে তার চ্যালেঞ্জগুলোও ছিল বেশি। আমাদের ক্যাম্প হতো চট্টগ্রাম-হাটহাজারি রাস্তার পাশে ফতেয়াবাদ হাই স্কুলের ক্যাম্পাসে ও মাঠে। সেখানে আমাদের থাকা-খাওয়া, সমাবেশ ও আরো কিছু অনুষ্ঠান হতো বটে, কিন্তু ক্যাম্পের আসল যে কাজগুলো সেই বাস্তব সামরিক অনুশীলনগুলো হতো নতুন পাড়া ক্যান্টনমেন্ট সংলগ্ন বিশাল পাহাড়-জঙ্গলের এলাকাটিতে। ফতেয়াবাদ স্কুল থেকে কিছুটা হেঁটেই ওই অঞ্চলে চলে যাওয়া যেত বলেই ক্যাম্পের এই স্থান নির্বাচন করা হয়েছে। সপ্তাহ দুয়েক ধরে চলা ক্যাম্পে তাই অনেক কিছু করার ব্যাপার ছিল, মোটামুটি অত্যন্ত কঠিন জীবন, সাধারণ জীবনযাত্রাকে একেবারে ভুলিয়ে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সব কিছুতে অতিরিক্ত শৃঙ্খলার বাড়াবাড়ি। এই শোয়ার জায়গার কথাই ধরা যাক। ফতেয়াবাদ স্কুলের হলঘরটিতে (স্কুল তখন বন্ধ ছিল) মেঝেতে দুই সারিতে আমাদের বিছানা—একেবারে সোজা সারি। সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথম কাজ হলো

গোটানো বিছানার বান্ডিলগুলোকে একেবারে সুতা ধরে সোজা লাইন করে রাখা, হলঘর জুড়ে। তার ঠিক সামনে বুট জোড়াগুলোও সোজা লাইনে—যেন এক কিনারা থেকে দেখলে শুধু একটি বিছানা ও তার সামনে শুধু একটি মাত্র বুট জোড়া দেখা যায়।

দিনের কর্মসূচিটি বেজায় দীর্ঘ, বেজায় কঠিন। সূর্য ওঠার আগে ঘুম থেকে উঠে এক সঙ্গে মসজিদে ফজরের নামাজ এরপর পি টি ড্রেস পরে চলে যেতে হতো পাহাড়ে, ফিজিক্যাল ট্রেনিং (পি টি) এর জন্য। ঘন্টা দুয়েক সে কাজ করে ফিরে এসে পাউরুটি, সেদ্ধ ডিম (ফৌজি আলফাজে 'ডাবল রুটি, আন্ডা') সহকারে টিনের মগে এক মগ চা খেয়ে মাঠে প্যারেড ও ক্লাস। দুপুরে খাওয়া ও বিশ্রামের পর আবার পাহাড়ে। এবার যুদ্ধ মহড়ার পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে রাইফেল ইত্যাদি সহ। কলেজিয়েট স্কুলের মাঠে যেই অনুশীলনগুলো সত্যিকার পরিবেশে করা সম্ভব হয়নি এবার অনুচ্চ পাহাড়, মাঝখানে বিস্তীর্ণ উপত্যকা, আবার জংলা পাহাড়—এ সবের মধ্যে সেই যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। দুই দলে বিভক্ত হয়ে কোন পাহাড়ের দখল নিয়ে দু'পক্ষের যুদ্ধ—যাতে একের গতিবিধি অন্যে টের না পায় সে জন্য নিজেদের কামোফ্ল্যাজ, রাইফেল হাতে উপুড় হয়ে শুয়ে হাতে পায়ে ক্রলিং করে পাহাড়ের ঢালে শম্বুক গতিতে চলা, রেকি করা, শত্রু অঞ্চলের ভেতর দিয়ে গোপনে বার্তা পাঠানো ইত্যাদি সব কিছু।

পাহাড়ের মধ্যে এক জায়গায় ক্যান্টনমেন্টের ফায়ারিং রেঞ্জ ছিল। কোন কোন দিন সকালে সেখানে গিয়ে ফায়ারিং প্র্যাকটিস করতে হতো। এর বেশির ভাগই আমাদের ওই বোল্ট অ্যাকশন সার্ভিস রাইফেল থেকে থ্রি নট্ থ্রি ক্যালিবারের সত্যিকার গুলি বর্ষণ। ওই লাইং লোডিং পজিশন করে আমাকে চশমা চোখে রেখে, বাম চোখ স্বাভাবিক ভাবে নিজে থেকে বন্ধ না করতে পারা সত্ত্বেও এই কাজ করতে হতো এবং লক্ষ্যভেদ না করতে পারলে বকাবকি, জবাবদিহিতার অন্ত থাকতোনা। নির্দেশগুলো বড় মজার—'ব্যাক সাইট কা ইউ কি আন্দর ফ্রন্ট সাইট কা নক রাখ কর গোলজারি কা ছে বাজে নিশান করো' অর্থাৎ পেছনের ইংরেজি ইউ আকৃতির অংশের ফাঁকার মধ্য দিয়ে একেবারে নলের সামনে থাকা আই আকৃতির জিনিসটিকে (নক্) রেখে লক্ষ্য ভেদের বৃত্তগুলোকে ঘড়ি মনে করে তার ছয়টা যেখানে বাজে সেখানে তাক করে গুলি ছোড়ো (কারণ গুলি কিছুটা লাফিয়ে উঠবে)। আমার অশক্ত হাত আর কাঁধের ওপর ওই সময় রাইফেলের যে পিছু-ধাক্কা এসে লাগতো সেটি সামাল দেয়া বেশ কঠিন হতো বৈকি। তবুও নিস্তার নেই। তবে মজা হলো যেদিন ক্যান্টনমেন্ট থেকে সত্যি সত্যি একজন অফিসার সাহেব এলেন। তরুণ একজন ক্যাপ্টেন এলেন আমাদেরকে ফায়ারিং রেঞ্জে লাইট মেশিন গান (এল এম জি) ফায়ার করানো শেখাতে ও তা ফায়ার করার অনুমতি দিতে। সামনে এর দুটি পায়ার উপর বসানো এল এম জি'তে কেমন করে যে প্রচুর গুলি অটোমেটিক বেরিয়ে গেল, কোথায় গেল তা

টেরই পেলামনা। অসুবিধার কথা হলো সবগুলো গুলির খোসা কুড়িয়ে নিয়ে আবার জমা দিতে হয়েছে। বিকেলে স্কুলের মাঠে ফুটবল ভলিবল ইত্যাদি খেলা, আর রাতের বেলা সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তবে কোন কোন দিন রাতে সেন্ট্রি ডিউটি পড়লে হতো বড় বিড়ম্বনা। আঁধার রাতে ক্যাম্পের বাইরে ঠাই দাঁড়িয়ে পাহারা দেয়া—পালা করে রাতের বিভিন্ন প্রহরে আমরা তাই দিতাম।

ক্যাম্পে আমাদের দিনগুলোকে যতই কষ্ট সহিষ্ণুতার টাইট দেয়া হোক না কেন, আমরা তার মধ্য থেকেই নানা আলগা বাঁধনের কাজ বের করে ফেলতাম। মূলত সেগুলোর জন্যই জেসিসি ক্যাম্পের কথা আজো স্মৃতিতে অক্ষয় হয়ে রয়েছে। সে সময় পাহাড়ি প্রকৃতির সঙ্গে যেভাবে মাখামাখি হয়ে থেকেছি তেমনটি একটানা এরকম আর কোন দিন হয়নি। তেমনি আমার একটি বিরাট লাভ হয়ে গিয়েছিলো—রাতে ডিউটির সময়, এবং সূর্য ওঠার অনেক আগে ঘুম থেকে ওঠার পর, আকাশ দেখার প্রচুর সুযোগ পেয়েছি। ইতোমধ্যে আকাশের তারামণ্ডলের সঙ্গে কিছুটা পরিচিতি হয়ে গিয়েছিলো—বিশেষ করে সেই আদমসূরত, সপ্তর্ষিমণ্ডল, ধ্রুবতারা, ক্যাসিওপিয়া, শুকতারা ইত্যাদি। আদমসূরত চট্ করে চিনতে পারি ওই তলোয়ার কোমরে নিয়ে মানুষটির আকারের জন্য। ক্যাসিওপিয়াও বেশ স্পষ্ট ইংরেজি 'এম' অক্ষরটির মত। রাতের বিভিন্ন সময়ে পর্যবেক্ষণের সুযোগে সপ্তর্ষি মণ্ডলের সুন্দর ঘড়ির মত প্রদক্ষিণটি লক্ষ্য করতে পেরেছি। একটি প্রশ্নবোধক চিহ্নের আকারে এটি বেশ দূরে ধ্রুব তারাকে কেন্দ্র করে ওলট পালট খেয়ে ঘুরছে। রাতের একটি প্রহরে এটি খাড়া প্রশ্নবোধক চিহ্নই থাকছে, আরেক প্রহরে বড় একটা চামচের আকৃতি নিচ্ছে কাৎ হয়ে, আরো পরে উল্টো প্রশ্ন বোধক, এবং তারপর উল্টো চামচ হচ্ছে। এসব দেখার সুযোগ পেয়েছি ওই বাইরে থাকার ফলে—যা পরে আর কখনো সম্ভব হয়নি। এগুলো দেখে ও বন্ধু সহপাঠীদের দেখিয়ে ভীষণ মজা পেতাম। তা ছাড়া এই একটি সময় কেটেছে যখন সহপাঠীদের সত্যি সত্যি কাছে এসেছি—এক সঙ্গে রাত্রি দিন যাপন করার ফলে, পরিশ্রান্ত হয়ে, বিশ্রাম নিয়ে, রাতের গভীরে গল্প করে। তাদের বহু অজানা কথারও বহু ভাবনা-চিন্তার ভাগী হতে পেরেছি। ক্যাম্পিঙে না আসলে এসবের কিছু হতোনা।

ক্যাম্পিঙের সর্বশেষ কসরত হতো এর রুট মার্চ। আমাদের রুট হলো ফতেয়াবাদ স্কুল থেকে হাটহাজারি থানা হেডকোয়ার্টার পর্যন্ত, এবং আবার সেখান থেকে ফতেয়াবাদ স্কুল। এই দুই জায়গার মধ্যে দূরত্ব এমন বেশি নয়—পাঁচ ছয় মাইলের মত। এইটুকু হাঁটা তেমন কোন ব্যাপার ছিল না। কিন্তু এ তো শুধু হাঁটা নয়, রাইফেল কাঁধে নিয়ে এক টানা মার্চ করে যাওয়া—লেফট রাইট লেফট রাইট করতে করতে, এবং পরে একই ভাবে ফেরত আসা। ধকলটি কম হতোনা তপ্ত রোদের নিচ দিয়ে এভাবে মার্চ করে যেতে। বুঝতে পারলাম পদাতিক বাহিনী কেমন করে এগিয়ে যায় স্থান থেকে স্থানান্তরে। শুধু মুশকিল হলো এই বিশেষ

পদাতিক বাহিনীর সৈন্যগুলো ছোট ছোট বালক হলেও রাইফেলগুলো কিন্তু মোটেই ছোট বা হালকা ছিলনা।

জেসিসি জীবনে আমাদের একটি বড় অনুষ্ঠান ছিল পূর্ব পাকিস্তানে থাকা একমাত্র আর্মি ডিভিশন ১৪তম ডিভিশনের প্রধান অর্থাৎ জেনারেল অফিসার কমান্ডিং (জিওসি) কে স্যালুট দেবার কোম্পানি মার্চপাস্ট। এর জন্য বহুদিন যাবত ছিল সাজ সাজ রব। প্যারেডকে নিখুঁত করার জন্য চল্‌লো অনুশীলনের পর অনুশীলন; সাজ পোষাক একেবারে টিপটপ। বুটজোড়া চকচকে পালিশ। রাইফেলগুলো বার বার মুছে চকচকে করে তোলা হয়েছে। মার্চপাস্টের ও এর প্রত্যেকটি অনুষঙ্গের যাবতীয় খুঁটিনাটি বার বার করে দেখা হলো যাতে কোথাও কারো বিন্দুমাত্র হেলে না যায়। জিওসি'র মার্চপাস্ট সামরিক বাহিনীর যে কোন ইউনিটের জন্য একটি স্মরণীয় ঘটনা। আর এই ক্ষেত্রে এটি স্কুলের ছেলেদের একটি কোম্পানি মাত্র। আমাদের কোম্পানি কমাণ্ডার প্যারেড কমাণ্ডারও বটে। সে মকশো করছে তার কম্যাণ্ড দেবার হাঁকটিকে। বেশ বিস্তারিত ব্যাপার এটি—'মার্চপাস্ট কলাম অফ রুট, ফার্স্ট প্লাটুন লীডিং, কোম্পানি—কুইক মার্চ'। আসল অনুষ্ঠানে সেই মুহূর্তে শুরু হয়ে যাবে, মিলিটারি ব্যান্ডসহ আমরা রাইফেল কাঁধে তালে তালে মার্চ করে যাব। জিওসি এলেন তাঁর মেজর জেনারেলের দুই তারা খচিত গাড়ি নিয়ে। সঙ্গে আরো ক'জন বড় বড় অফিসার। স্কুলের মাঠে তখন বহু মানুষ—স্কুলের ছাত্ররাতো সবাই রয়েছেই, তাছাড়া আমন্ত্রিত অনেক অভ্যাগত। এর মধ্যে আমরা মার্চ করলাম, জিওসির সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে স্যালুট জানালাম। এরপর থেকে বহু দিন ধরে চল্‌লো আলোচনা—কেমন হয়েছিলো মার্চপাস্ট, কোথায় কী খুঁত থেকে গেছে ইত্যাদি।

স্কুলে আমার একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী

নবম শ্রেণীতে ওঠার পর থেকেই সব শিক্ষকরাই বার বার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিলেন যে এখন আমরা ম্যাট্রিকের প্রথম ধাপে আছি, কাজেই লেখাপড়ায় কোন শৈথিল্য নয়। এই যে জেসিসি নিয়ে এত মাতামাতি এগুলো শিক্ষকরা মন থেকে খুব সমর্থন করতেন না, যদিও এতে তাঁদের করার কিছু ছিলনা। নবম ও দশম শ্রেণী মিলে যেন একটি একক জোড়শ্রেণী তৈরি হয়েছে যা পুরোটা ম্যাট্রিকের জন্য নিবেদিত। এর শুরুতেই কিছু সিদ্ধান্ত নিতে হয় ঐচ্ছিক বিষয় নির্বাচনের জন্য। যেমন একটি ক্ল্যাসিকাল ল্যাংগুয়েজ বেছে নিতে হবে, যে ক্ষেত্রে আমি আরবি নিয়েছিলাম—সংস্কৃত অথবা পালিও নিতে পারতাম, অথবা উর্দু, যদিও এই শেষেরটি ক্ল্যাসিকাল ল্যাংগুয়েজ নয়। অন্য দিকে বিজ্ঞান, অতিরিক্ত গণিত, অথবা ম্যাপ-রিডিং এই তিনটি থেকে একটি বেছে নিতে হবে। আসলে এই দলে বিকল্প বিষয় আরো থাকে, কিন্তু তা আবার সব স্কুলে সবগুলো থাকেনা। আমাদের কলেজিয়েট স্কুলে পরে ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল আর্টস বলে আরো একটি বিষয় যোগ হয়েছিল,

সেটি আমাদের সময়ে ছিলনা। ম্যাপ-রিডিং বিষয়টি অবশ্য শুধু আমাদের স্কুলেই ছিল, অন্য কোথাও ছিলনা। বাকি সব বিষয় বাংলা ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস ও ভূগোল সবাইকে একই ভাবে পড়তে হতো। আমার প্রিয় বিষয় বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে অতিরিক্ত গণিত বাছাই করাটি কেমন একটু লাগছিল। কিন্তু মনে করা হতো শেষ পর্যন্ত উচ্চতর পর্যায়ে বিজ্ঞানে ভাল করতে হলে অতিরিক্ত গণিতটাই বরং বেশি দরকার। এখানে যে উচ্চতর বীজগণিত এবং ত্রিকোণমিতি ইত্যাদি নতুন বিষয় রয়েছে যা কলেজে গিয়ে বিজ্ঞান পড়তে অপরিহার্য হবে। অতএব বিজ্ঞানকে এ পর্যায়ে এসে সম্পূর্ণ সখের বিষয়ের মধ্যেই রেখে দিতে হলো, স্কুলপাঠ্য বিষয়ের মধ্যে নয়। আর সখের বিষয় বলতে কী বোঝায় তা আমি স্কুলে রাষ্ট্র করে দিলাম নবম শ্রেণীতে ওঠার পরপরই—স্কুলে আমার একটি একক বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন করার মাধ্যমে।

বিজ্ঞানের নানা বই পড়ে করে দেখাবার মত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি অথবা কাজ যে সব বহুদিন ধরে খাড়া করেছিলাম তাদের সংখ্যা নেহাত কম ছিলনা। আমার সেই ল্যাবোরেটরি-আলমারি হবার পর থেকে এর অনেকগুলো তাৎক্ষণিক আনন্দ-আগ্রহ মেটাবার পর সযত্নে তুলে রাখতে পেরেছিলাম। এ সবের অস্তিত্বের কথা বাসার ভাইবোনদের বাইরে আমার অল্প কয়েকজন বন্ধু-বান্ধবই শুধু জানতো। তার মধ্যে একজন ছিল বাহাদুর (শামসুল হোসাইন); আমরা দু'জন খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম। বাহাদুরই বার বার বল্‌ছিল স্কুলে এসব নিয়ে আমার একটি প্রদর্শনী করা উচিত—যাতে সব ছেলেরা এটি দেখতে পায়। এ নিয়ে এতদিন আমার কোন উদ্যোগ না থাকার কারণ হলো নিজের আনন্দে এগুলো নানা সময়ে করে গেছি, সাক্ষী হিসেবে বাসার সবাইকে দেখিয়েছি। কোন প্রদর্শনীকে উদ্দেশ্য করে যেমন করা হয়নি, তেমনি পরেও এ নিয়ে প্রদর্শনী করার কথা মনে আসেনি। বাহাদুরের কথায় মনে হলো এগুলো স্কুলের সবাই দেখলে খুব মজা পাবে। হয়তো ওদেরো কারো কারো এরকম সখ থাকতে পারে যা আমি জানিনা। তেমনটি হলে এই নিয়ে হয়তো এক সঙ্গে কাজও করতে পারবো। বাহাদুর বললো প্রদর্শনী আয়োজনে সে সর্বোতভাবে সাহায্য করবে। স্কুলের বিজ্ঞান শিক্ষক জয়নুল আবেদীন সাহেবের কাছ থেকে অনুমতি নিলাম। তিনি অন্যদের সঙ্গে কথা বলে অনুমতি দিলেন। স্কুল ভবনের পেছনে যে ঘরে বাড়তি টেবিল রয়েছে সেখান থেকে কয়েকটি টেবিল আনলাম। কমনরুমে এই টেবিলগুলো একটার সঙ্গে একটি লাগিয়ে আমার প্রদর্শনী স্থল তৈরি হয়ে গেল। বাহাদুর আর আমি মিলে সব এক্‌জিবিটগুলো সাজিয়ে ফেল্লাম। যথেষ্ট জায়গার দরকার হলো সবগুলোর জন্য। এক একটিকে যদি ঠিক মতো করে দেখতে হয় তা হলে জিনিসটির আশেপাশে কিছু জায়গার দরকার হয় বৈকি। আমরা ওভাবেই সাজালাম, আর দু'জনে মিলে প্রত্যেকটি এক্‌জিবিটের প্ল্যাকার্ড লিখে দিলাম স্পষ্ট গোটা গোটা হস্তাক্ষরে।

কিছু কিছু জিনিস কমন রুমের বাইরে মাঠের উপরও সাজালাম। যেমন আমার আবহাওয়া কেন্দ্রের সব কিছুকে বাইরে নিয়ে গেলাম—বায়ুচাপ মাপক, বাতপতাকা, বায়ুবেগ মাপক, থার্মোমিটার ইত্যাদি সব কিছু। আমার সেই ব্যাটারি-ভাঙ্গা কার্বন রড আর পেন্সিলের শীষ দিয়ে তৈরি টেলিফোনের বলার ব্যবস্থাটি কমন রুমের ভেতরে রেখে শোনার ব্যবস্থাটি নিয়ে গেলাম বাইরে। প্রদর্শনীতে ছিল রবিন্সন বার্লির টিনের বয়লার বানিয়ে ভোঁ ভোঁ ঘোরার স্টিম ইঞ্জিন, তিন পেরেকে তার জড়িয়ে গড়া ইলেকট্রিক মোটর ইত্যাদি। তারের কুণ্ডলীর মাঝখানে আমার স্কাউট কম্পাসটি রেখে একটি গ্যালভানোমিটার তৈরি করেছিলাম। কুণ্ডলিটির সঙ্গে একটি ব্যাটারি সংযোগ করলে তাতে কম্পাসের কাঁটাটি ঘুরে যেত কারেন্টের প্রভাবে। কতখানি ঘুরলো সেটি দেখে বোঝা যেত ব্যাটারির কার্যকারিতা কতখানি আছে, আদৌ আছে কিনা। এতে দর্শকরা নিজেরাও ব্যাটারি টেস্ট করে নিতে পারতো। আরো ছোটখাট নানা জিনিস সাজিয়েছিলাম যেগুলো দর্শকরা নিজেরা নানা ভাবে করতে পারতো। এর মধ্যে ছিল বড় একটি চুম্বক থেকে নানা সুঁচকে চুম্বকায়িত করে তা সুতায় ঝুলিয়ে কম্পাস তৈরি, চিরুনি চুলে ঘষে কাগজের টুকরা তোলা, পুঁতির দানার মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ছোট্ট পোকা মাকড়ের পা মাথা এসব দেখা, সাইফন দিয়ে পানি টেনে নেয়া ইত্যাদি। আমার প্রদর্শনীটি কয়েক দিন সবাইকে জমিয়ে রাখলো। ক্লাস শুরুর আগে, টিফিন ছুটিতে এবং ছুটির পর আমি আর বাহাদুর দু'জনে এগুলো ব্যাখ্যা করতাম, দর্শকদের নিজেরা করে দেখতে সাহায্য করতাম। স্যারেরা সবাই এটি দেখতে এসেছেন, জেসিসি'র ওস্তাদজিরা এসেছেন, কেউ বাদ যান্‌নি। যেহেতু আমার এক্‌জিবিটগুলোর কোনটারই ফিনিশিং তেমন ভালো ছিলনা, সবই ছিল কিছুটা লটর পটর ধরনের—তাই আমাদের দু'জনকে সব সময় তৎপর থাকতে হতো কোনটা কোথায় ছুটে যায়, কোথায় কী মেরামত লাগে। করতে করতে বাহাদুরও বুঝে ফেলেছিলো কোথায় কী করতে হবে। তাছাড়া পুরো জিনিসটির আয়োজনে সে যে পারদর্শিতা দেখালো তার তুলনা হয়না। পরে এর চেয়ে অনেক বড় বড় কাজ আমরা এক সঙ্গে করেছি, এখনো করছি।

স্কুলে কিন্তু এই প্রদর্শনীটিকে ঘিরে তেমন কোন আনুষ্ঠানিকতা দেখানো হয়নি, নেহাত একটি ছাত্রের অদ্ভুত রকম খেয়াল হিসেবে সাদামাটা ভাবে একে নেয়া হয়েছে। তবে কারো মধ্যেই আগ্রহের কোন কমতি ছিলনা। অনেকেই বলাবলি করছিল বিজ্ঞানের বেশ বড় জিনিসকেও কেমন সাধারণ সব জিনিস দিয়ে অল্প আয়াসেই করে দেখানো যায়। এমনটি বলার একটি কারণও ছিল। আমাদের স্কুলে যে বিজ্ঞান ল্যাবোরেটরিটি ছিল সেটি অধিকাংশ সময় বন্ধই থাকতো। অন্তত আমি কোনদিন এটি ব্যবহৃত হতে দেখিনি। যে দু'একবার এতে উঁকিঝুঁকি দিতে পেরেছি দেখেছি ওখানে বেশ সুন্দর সুন্দর বিজ্ঞান এক্সপেরিমেন্টের যন্ত্রপাতি আছে, তবে সবই খুব যত্ন করে গুটিয়ে কাচের আলমারিতে সংরক্ষণ করা। যারা

বিজ্ঞান নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয় তাদেরকে ব্যবহারিক পরীক্ষার আগে কখনো কিছু দেখানো হয়, কিন্তু আমার বিজ্ঞান ছিলনা বলে সেই অভিজ্ঞতা আমার হয়নি, অন্যদেরকেও তেমন কিছু করতে দেখিনি।

ওই সময় আরো একটি দারুণ জিনিস তৈরি আমার সব মনোযোগ কেড়ে নিয়েছিলো, যদিও একাজে আমি একা ছিলামনা। এটি ছিল ক্রিষ্টাল রেডিয়ো তৈরি। এত কিছুর পরও আমাদের বাসায় কোন রেডিয়ো ছিলনা, তাই এর সম্পর্কে আমরা একটু দুর্বলতা ছিল বৈকি। এর মধ্যে চট্টগ্রামে একটি রেডিয়ো রিলে স্টেশন স্থাপিত হয়েছিলো যা ঢাকা স্টেশনের ব্রডকাষ্ট রীলে করতো। এর ট্রান্সমিটিং স্টেশন ছিল চান্দগাঁওয়ে—আমার নানা বাড়ির কাছে আরাকান রোড ঘেঁষে, শহরের থেকে মোটেই দূরে নয়। এই ক্রিষ্টাল রেডিয়োর খবরটি ইউনূস ভাইকে দিয়েছিলেন তাঁর স্কুলের বন্ধু এহসান ভাই, যাঁর সঙ্গে আমিও খুব ছোটবেলা থেকে ঘনিষ্ঠ ছিলাম। এহসান ভাইয়ের গ্রামের বাড়ি ছিল চান্দগাঁওয়ে ফরিদা পাড়ায় (ওখানেই থাকতেন); যেই অ্যান্টেনা থেকে রিলে স্টেশনের সম্প্রচার হতো, তার খুব কাছে। খুব সম্ভবত ওই অঞ্চলের কোন জাহাজির কাছ থেকে তিনি একটি ক্রিষ্টাল রেডিয়ো পেয়েছিলেন। জিনিসটা অবিশ্বাস্য রকমের সরল একটি ব্যাপার, তেমন কোন যন্ত্রপাতিই লাগেনা এতে, শুধু একটি হেডফোন অথবা একটি পুরোনো টেলিফোন রিসিভার হলেই চলে, শোনার দিকটির জন্য। এমনকি তাতে কোন ব্যাটারি বা বিদ্যুতের অন্য কোন উৎসও লাগেনা। শুধু দুটি শর্ত পূরণ করতে হয়—রেডিয়ো সম্প্রচার কেন্দ্রের কাছে থাকতে হয়, এবং খুব লম্বা করে একটি তার টানতে হয় দুটি খুঁটির মাঝখানে, রেডিয়োটির সঙ্গে অ্যান্টেনা হিসেবে সংযুক্ত করার জন্য। কাপড় শুকাতে দেবার তারের মত করে টেনে সস্তা লোহার তার দিয়ে এটি করা যায়। এহসান ভাই নাকি হেডফোন কানে লাগিয়ে চট্টগ্রাম রিলে স্টেশনের সব কিছু দিব্যি শুনতে পান। এই অদ্ভুত রেডিয়োটি দেখার জন্য এক বিকেলে ইউনূস ভাই ও আমি এহসান ভাইয়ের বাড়িতে গেলাম। বাস থেকে নেমে ধান খেতের মধ্য দিয়ে খানিকটা গ্রামের ভেতর ফরিদা পাড়া যেতে হলো। ক্রিষ্টাল রেডিয়োর সারল্য দেখে অবাক হয়ে গেলাম। একটি সিরামিকের নলের উপর এনামেলে ঢাকা তামার তার জড়ানো হয়েছে পুরো নল জুড়ে। এই তারের এক প্রান্ত এবড়ো খেবড়ো একটি ছাই রঙের ছোট্ট পাথরের (ক্রিষ্টাল) তলায় লাগানো। পাথরের ওপরে একটি সেফটি পিনের সুঁচালো আগা স্প্রিঙের চাপে গুতো দিয়ে রেখেছে। সেখান থেকে তার চলে গেছে হেডফোনে এবং হেডফোন থেকে ওই নলের উপর জড়ানো তামার তারের অন্য প্রান্তে। নলের উপর জড়ানো তামার তারের এক প্রান্ত থেকে অন্য একটি তার অবশ্য চলে গেছে সেই লম্বা লোহার তারের অ্যান্টেনায়, আর অন্য প্রান্ত থেকে একটি তারকে মাটিতে পুঁতে দেয়া হয়ে 'আর্থিং' সৃষ্টি করে। হেডফোনটি কানে দিয়ে দিব্যি রেডিয়ো শোনলাম—খুব জোরালো শব্দ না হলেও টেলিফোনের মতই স্পষ্ট ও আরামে শোনার মত।

এহসান ভাইকে অনুরোধ করে আমাদের জন্য ঠিক এরকম আর একটি ক্রিষ্টাল রেডিয়ো যোগাড়ের ব্যবস্থা হলো। বক্সীর হাট বাসার ছাদে যতটা সম্ভব লম্বা করে লোহার তারের অ্যান্টেনা দিলাম। ট্রান্সমিটিং স্টেশন থেকে অনেক দূরে চলে এসেছি বলে আমাদের অ্যান্টেনাটি ফরিদা পাড়াটির চেয়েও অনেক বেশি লম্বা হওয়া দরকার ছিল যা সম্ভব হয়নি। তাছাড়া বক্সীর হাটের ইট পাথরের মধ্যে আর্থিং করাটাও কঠিন হয়েছে। পানির পাইপের সঙ্গে লাগিয়ে সে কাজ সারলো, কারণ তা মাটির তলা দিয়েই এসেছে। ওই ছোট্ট পাথরটির উপর সেফটি পিনের চোখা পিনটি নানা জায়গায় লাগিয়ে চেষ্টা করে করে কোন কোন পজিশনে ঠিকই রেডিয়ো শোনা গেল হেডফোনে; কিন্তু এহসান ভাইয়ের বাড়িতে যত ভাল শোনা গিয়েছিল তেমন স্পষ্ট নয়। সৌভাগ্যক্রমে সেলিম ভাইয়ের দেয়া ম্যাগাজিন 'পপুলার ইলেকট্রনিক্সে' বিভিন্ন রকম ক্রিষ্টাল রেডিয়ো তৈরির বিষয়ে ছবি সহ লেখা পেয়ে গেলাম যা অনুসরণ করে আমাদের রেডিয়োটি উন্নত করার কাজ করলাম; ইউনূস ভাইও খুব উদ্যোগ নিলেন এই কাজে। ওই ম্যাগাজিন থেকেই জানলাম যে ক্রিষ্টাল রেডিয়ো ছিল রেডিয়োর একেবারে আদি রূপ। ওই যে ছোট্ট পাথরটি এটি একটি খুব সস্তা মামুলি ধরনের সেমিকন্ডাক্টর—যা আয়রন পাইরাইট, সিলিকন কার্বাইড বা ওরকম কিছু হতে পারে। ধাতব কোন চোখা প্রান্ত এর একটি সুবিধামত বিন্দুতে যদি দৃঢ় ভাবে চেপে ধরে তা হলেই একটি 'পয়েন্ট-কনট্যাক্ট ডায়োড' সৃষ্টি হয়।

ক্রিষ্টাল রেডিয়োর জন্য শুধু এই ডায়োডটিই দরকার যাতে রেডিয়ো স্টেশনের যে দুর্বল সিগন্যালটি সরাসরি আমাদের অ্যান্টেনায় এসে পড়ছে তাকে একমুখী করে হেডফোনে কাজ করানো যায়। এক্ষেত্রে ওই দুর্বল সিগন্যালকে এমপ্লিফায়ার দিয়ে সবল করার কোন ব্যবস্থা নেই, তাই রেডিয়ো স্টেশনের কাছে থাকতে হয়। এমপ্লিফায়ার নেই বলে কোন বিদ্যুৎ উৎসের প্রয়োজনও নেই। আমরা ম্যাগাজিনের পরামর্শ অনুযায়ী নানা ভাবে এর কাজকে উন্নত করার চেষ্টা করলাম। নলের উপর জড়ানো তারকে বড়-ছোট করলাম। ক্রিষ্টালের উপর সঠিক চাপ দেবার জন্য সেফটি পিনের বদলে একটুখানি মোচড় দেয়া দৃঢ় ষ্টিলের তার ব্যবহার করলাম, যা বাদ্যযন্ত্রের দোকান থেকে পেয়েছি, সেতারে ব্যবহৃত হয় বলে। পরে অ্যান্টেনার সঙ্গে একটি ক্যাপাসিটর লাগালাম—বিভিন্ন মাপের লাগিয়ে চেষ্টা করে গেলাম। এগুলো করে করে সব চেয়ে ভাল শোনা যাবার অবস্থায় আনলাম যাতে চট্টগ্রাম রিলে স্টেশনের ফ্রিকোয়েন্সির সঙ্গে আমাদের রেডিয়োর ফ্রিকোয়েন্সিটি আরো ভাল ভাবে টিউন হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের ক্রিষ্টাল রেডিয়োকে বেশ ভাল ভাবেই ব্যবহার করতে করেছিলাম। আরো পরে ইলেকট্রনিক দোকান থেকে লম্বাটে পুঁতির দানার মত ছোট্ট কাচের মধ্যে থাকা ফ্যাক্টরিতে তৈরি ডায়োড পেয়েছিলাম—যার ফলে খোলা ক্রিস্টাল পাথরের উপর সেতারের তার সরিয়ে সরিয়ে ভাল পজিশন খোঁজার ঝামেলা আর থাকেনি।

দশজনে যে রেডিয়ো শোনে তার বদলে এরকম নিজের তৈরি সরলতম বিদ্যুৎ উৎসবিহীন রেডিয়ো শোনার মজাটাই আলাদা। এই অদ্ভুত রেডিয়ো অনেককে দেখিয়ে ও শুনিয়ে খুব মজা পেলাম।

দেশে মার্শাল ল

১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দেশে একটি অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা হঠাৎ করে দেশে সামরিক শাসন জারি করলেন; শাসনতন্ত্র বাতিল বলে ঘোষণা করলেন; জাতীয় সংসদ, মন্ত্রীসভা, প্রাদেশিক আইন সভা ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা সবই ভেঙ্গে দিলেন। সকল রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত বলে ঘোষণা করা হলো। তিনি সেনাপ্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে চীফ মার্শাল ল অ্যাডমিনষ্ট্রেটর নিয়োগ করলেন। রেডিয়োতে খবরটি শোনার পর চকিতে সেটি বাসায় একটি হতবাক হয়ে যাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করলো। শুধু বড়দাকে অত্যন্ত হতাশ ভঙ্গিতে বলতে শোনলাম 'হায় সোহরাওয়ার্দী, হায় ইলেকশান!' এটি বলার কারণ হলো সে সময় কেন্দ্রে ও প্রদেশে রাজনীতি অত্যন্ত করুণ লেজে গোবরে অবস্থায় থাকলেও প্রধানমন্ত্রী স্যার ফিরোজ খান নুন কয়েক মাস পর পরের বছরের ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন। বড়দার মতো অনেকে বিশ্বাস করতেন যে নির্বাচনটি হলে পাকিস্তানের রাজনীতি অবশেষে সঠিক জায়গায় চলে আসবে। সেই পথে নেবার জন্য বড়দা সোহরাওয়ার্দীর উপর খুব ভরসা রাখতেন। এই জন্যই হঠাৎ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত মার্শাল ল'র ঘোষণা সবাইকে মুহূর্তে হতাশায় ডুবিয়ে দিয়েছিল। এমনিতে পাকিস্তানের রাজনীতিতে বহুদিন ধরে দুর্দিন চলছিল। মাত্র এক বছরের মত প্রধানমন্ত্রী থেকে সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের পর প্রেসিডেন্ট ইসকান্দর মির্জা আই আই চুন্দ্রিগড়কে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন। রিপাবলিকান পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামের ইসলামকে নিয়ে মন্ত্রীসভা গড়ে তিনি তাতে মুসলিম লীগকেও যোগ দিতে রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু যুক্ত নির্বাচন বাদ দিয়ে পৃথক নির্বাচন পুনরায় চালু করার চেষ্টার মুখে শরিক দলগুলোর বিবাদের কারণে তাঁর মন্ত্রীসভা দু'মাসও টেকেনি। এরপর প্রধানমন্ত্রী হলেন স্যার ফিরোজ খান নুন—রিপাবলিকান দলের নেতা। তিনি অদ্ভুত ভাবে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অনেক প্রধান দলকে তাঁর মন্ত্রীসভায় শামিল করাতে পারলেন—আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি, কৃষক শ্রমিক পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস, তফসিলী ফেডারেশন (সবই মূলত পূর্ব পাকিস্তানের দল) এবং রিপাবলিকান পার্টি (পশ্চিম পাকিস্তানের দল)। এক সঙ্গে কেন্দ্রে মন্ত্রীসভা গঠন করলেও পূর্ব পাকিস্তানের দলগুলোর মধ্যে বিরোধ চরমে পৌঁছেছিল, বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগপ্রধান মন্ত্রীসভা দারুণ চ্যালেঞ্জের মুখে থাকার কারণে। পশ্চিম পাকিস্তানে রিপাবলিকান পার্টির বিপরীতে কাইয়ুম খানের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ আবার জনপ্রিয়তা পাচ্ছিল, এক ইউনিটের বিরোধটি সেখানে দারুণ

ভাবে আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেছিল। সীমান্ত প্রদেশে খান আবদুল গাফফার খানও নতুন করে প্রভাব বিস্তার করছিলেন। সব দলই চেষ্টা করছিল আসন্ন নির্বাচনের আগে কেন্দ্রে ও প্রদেশে সুবিধাজনক অবস্থানে যেতে।

সবচেয়ে সাংঘাতিক অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদ ও এর মন্ত্রীসভাকে নিয়ে। ১৯৫৪এর নির্বাচনের পর ফজলুল হকের ক্ষণস্থায়ী যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করে ৯২-ক ধারার কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হয়েছিল। পরে অবশ্য ১৯৫৫ সালে এখানে সংসদীয় গণতন্ত্র ফিরে আসে, আওয়ামী লীগবিহীন যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীসভা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কিছু দলের সমর্থনে আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে গঠিত হয়। ১৯৫৬ সালে একটি অনাস্থা প্রস্তাবে এই মন্ত্রীসভা পরাজিত হলে আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগপ্রধান মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। কিন্তু ১৯৫৮ সালের প্রথম দিকে আবার এখানে দারুণ রাজনৈতিক সংকটের সূত্রপাত হয়। ইতোমধ্যে ফজলুল হক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন। পরিষদে আতাউর রহমান খান সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নেই এমন দাবি করে তিনি এ সরকারকে বরখাস্ত করে আবু হোসেন সরকারকে আবার মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন। ওদিকে কেন্দ্রে ফিরোজ খান নুন মন্ত্রীসভা আওয়ামী লীগের সমর্থনের উপর নির্ভর করছে। সোহরাওয়ার্দী এই সমর্থন প্রত্যাহার করার হুমকি দিলে কেন্দ্রীয় সরকার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফজলুল হককে গভর্নর হিসেবে বরখাস্ত করে নতুন গভর্নর নিয়োগ দেন। ফলে আবু হোসেন সরকারের একদিন-স্থায়ী মন্ত্রীসভার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অবসান ঘটে আর আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভা ফেরত আসে। এর কিছুদিনের মধ্যে আবার নতুন সংকটের সৃষ্টি হলো। ন্যাপ ওয়ান ইউনিট ও স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির প্রশ্ন তুলে আতাউর রহমান মন্ত্রীসভা থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করলে আস্থা ভোটে পরাজিত হয়ে এর পতন ঘটে, এবং আবার আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ফেরত আসেন। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে ন্যাপের সঙ্গে মিটমাট হয়ে যাওয়াতে আবার ওই সরকারের পতন হয় এবং আতাউর রহমান খান পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী হন। পূর্ব পাকিস্তানের সরকার নিয়ে এই 'মিউজিক্যাল চেয়ারের' খেলা সে সময় আমাদের কাছে একটি খেলার মতই উপভোগ্য হয়ে উঠেছিল।

দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের জন্য এটি ছিল খুব করুণ একটি অবস্থা। কোন দলই যখন স্পষ্ট সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে টেকসই মন্ত্রীসভা করতে পারছিলনা এমন অবস্থায় প্রাদেশিক পরিষদের স্পীকার নিয়ে অন্য রকম খেলা শুরু হয়ে গেল, কারণ স্পীকারের ভূমিকা তখন খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। পরিষদে কৃষক শ্রমিক পার্টির থেকে নির্বাচিত স্পীকার আবদুল হাকিমকে মানসিক ভাবে সুস্থ নন বলে অভিযোগ এনে প্রস্তাব পাশ করা হলো। তাঁকে স্পীকার হিসেবে বসতে বাধা দেয়া হলো, এবং পরিষদের পুলিশ সার্জেন্ট অ্যাট আর্মস তাঁকে পরিষদ কক্ষে ঢুকতেই দিলোনা। আওয়ামী লীগ সমর্থক ডেপুটি স্পীকার শাহেদ

আলী প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশন পরিচালনায় বসলেন বটে কিন্তু পরিষদ কক্ষে দুপক্ষের কিছু সদস্যদের মধ্যে তুমুল হাতাহাতি লেগে যায়, চেয়ার ছোঁড়া শুরু হয় এবং ডেপুটি স্পীকারও আক্রান্ত হন। গুরুতর আঘাত পেয়ে তিনি পরে হাসপাতালে মারা যান। এটি সেপ্টেম্বরের শেষের দিকের ঘটনা। এর কয়েকদিন পরেই এলো মার্শাল ল।

প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জা মার্শাল ল ঘোষণা করার সময় স্বাভাবিক ভাবেই কেন্দ্রে এবং প্রদেশে রাজনীতিবিদদের এই সাম্প্রতিক কাজ-কারবারগুলো তুলে ধরে তাদের হাত থেকে দেশকে বাঁচাবার অজুহাতটিই দিয়েছিলেন। তাছাড়া সে সময় রাজনীতিবিদদের এবং তার চেয়েও বেশি উচ্চ পদস্থ আমলাদের দুর্নীতি সম্পর্কে খুব নেতিবাচক ধারণা মানুষের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। মির্জা ও তাঁর সহায়ক শক্তি সেনাবাহিনী এই বিষয়টিকেও খুব বড় করে দেখিয়েছিলেন। মধ্যরাতে জারি করা মার্শাল ল'র ঘোষণা দিয়ে প্রেসিডেন্টের এই বক্তৃতা পরের দিন সবাই রেডিয়োতে শুনেছি, পত্রিকায় বিরাট বিরাট টাইপের শিরোনামে পড়েছি। মার্শাল ল'র কাজ প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হয়ে গেল—অন্তত দৃশ্যমানগুলো। কয়েক দিনের মধ্যে অনেক রাজনীতিবিদ গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন। রাস্তায় সামরিক বাহিনী দৃশ্যমান হলো। দু'এক সপ্তাহের মধ্যে জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করে সামরিক ও বেসামরিক কয়েকজন ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠন করা হলো। আসলে ক্ষমতার পালাবদলটি এলো দুই পর্বে। আইয়ুব খানের হাতেই ওভাবে মার্শাল ল' সরকার পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করা হলেও তিনি প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জাকে সন্দেহের চোখে দেখছিলেন। প্রধানমন্ত্রী হবার কয়েক দিন পরেই নবনিযুক্ত তিনজন সামরিক মন্ত্রী জেনারেল আজম খান, জেনারেল বার্কি এবং জেনারেল শেখ এক সঙ্গে সোজা প্রেসিডেন্টের কাছে গিয়ে তাঁকে তাৎক্ষণিক পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন এবং সে রাতেই প্রথমে কোয়েটায় নিয়ে পরে বিশেষ বিমানে লন্ডনে নির্বাসনে পাঠিয়ে দেন। আইয়ুব খান নিজেকে প্রেসিডেন্ট বলে ঘোষণা করলেন, নিজের মত করে সামরিক ও বেসামরিক নানা ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে প্রেসিডেন্টের মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। পরবর্তী দশ বছর নানা রকম কৌশলে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রেখে প্রায় নিজের খেয়ালখুশি মতই তিনি দেশ চালালেন।

কিন্তু মার্শাল ল ঘোষণার সময়ে নবম শ্রেণীর ছাত্র আমার চেখে যা ধরা পড়েছিল তা হলো সাধারণ মানুষের কাছে পরিবর্তনটিকে বেশ কাম্য বলেই মনে হয়েছে। সরকারী সব দফতরে আর্মিদের আনাগোনা হলো, দুর্নীতি উৎপাটনের কথা বলে অনেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো; খুব উচ্চ পদস্থ কয়েক শত কর্মচারীকে একেবারে ঘটা করে দুর্নীতির দায়ে বরখাস্ত করা হলো। অনেকের কড়া শাস্তি হলো—ছোট বড় পদে নিযুক্তদের মধ্য থেকে। শোনলাম যে একটু পড়ুয়া গোছের মেজর বা কর্নেল পদের কয়েক জনকে নানা স্কুলে কলেজে পাঠানো

হয়েছে শিক্ষা তদারকি করার জন্য। দুর্নীতি নিয়ে চোটপাটটি সাধারণ মানুষ খুব পছন্দ করলো। যদিও কয়েকদিন গুজব রটেছিলো যে লম্বা চুল দেখলে আর্মির লোকরা তা ছোট করতে বলছে বা করে দিচ্ছে—পরে সেই গুজবের বা এমনিতরো কাজের কোন সত্যতা পাওয়া যায়নি। তখন অনেকে মার্শাল ল'কে বলতো 'মার শালারে ল'। অর্থাৎ শক্তিশালী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি এর মার মার কাট কাট ভঙ্গি লোকের ভালই লাগছিলো। আমাদের স্কুলে একটি আর্মি আবহ তো আগে থেকেই ছিলো। সেখানে নতুন কিছু ঘটলোনা। তবে শিক্ষকদের মধ্যে মনে হলো এক ধরনের নীরবতা নেমে এসেছে, দেশের কথা, রাজনীতির কথা বড় একটা কেউ আর বলতে চাইছেন না। যাঁরা রাজনীতি সচেতন ছিলেন তাঁদেরকে খুব বিমর্ষ মনে হচ্ছিল, যদিও প্রকাশ্যে কেউ কিছু বলছেননা। দেশ বিভাগের পর প্রথম পুলিশের ইনস্পেক্টর জেনারেল চট্টগ্রামের জাকির হোসেনকে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত করা হলো। তিনি আমাদের স্কুলের ছাত্র ছিলেন, এখান থেকে ম্যাট্রিকে স্ট্যান্ড করেছিলেন, আগাগোড়া ভাল রেকর্ডের মেধাবী ছাত্র (আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) এবং পুরোনো বড় মাপের রাজকর্মচারী হিসেবে চট্টগ্রামে সুপরিচিত ছিলেন। এটিও স্থানীয় মানুষদেরকে খুব খুশি করলো।

প্রথম লেখা ছাপানো

আমাদের স্কুল জীবনে সব কিছু দ্রুত স্বাভাবিক হয়ে এলো; বরং একদিকে এতে লেখাপড়ার শৃঙ্খলা যেমন আরো ভাল হয়েছে, তেমনি পাঠ্য বহির্ভূত বিষয়গুলো—জেসিসি, স্কাউটিং ইত্যাদি আরো জমজমাট হলো। আমিও এগুলো নিয়ে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, আর তার চেয়েও বেশি আমার নিজের আনন্দের জন্য বই পড়া ইত্যাদিতে। স্পুটনিকের পর থেকে মহাশূন্য প্রতিযোগিতায় যেমন ঘনঘন নানা ঘটনা ঘটছিল—সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আমেরিকা উভয়ে ক্রমে আরো চমকপ্রদ উপগ্রহ ইত্যাদি মহাশূন্যে পাঠাচ্ছিল; তেমনি রকেট, উপগ্রহের উৎক্ষেপন, মহাশূন্যে কী আছে, ইত্যাদি নানা বিষয়ে আমাদের আগ্রহ ক্রমে বাড়ছিল। কিন্তু যখন ঘটনাগুলো ঘটছিল তখন পত্রিকায় একটু চাঞ্চল্যকর ভাবে দেয়া কিছু খবর দেখা ছাড়া এ সম্পর্কে পটভূমিগুলো জানার সুযোগ বেশি ছিলনা। রকেট উৎক্ষেপনের মাধ্যমে মহাশূন্যে পাড়ি দেয়া সম্ভব হওয়াতে একই প্রক্রিয়ায় চাঁদে যাওয়ার একটি সম্ভাবনার কথা পত্রিকায় উঁকিঝুঁকি দিতে দেখতাম। মহাশূন্য এবং মহাশূন্য ভ্রমণ সম্পর্কে নেহাত বৈজ্ঞানিক বর্ণনা বা সম্ভাবনার কথা নিয়েও কোন বই পাওয়া যায় কিনা তা স্কুলের কাছে বইয়ের দোকানগুলোতে দেখেছিলাম—তেমন কিছু পাইনি। তবে একটি পেপার ব্যাক সায়েন্স ফিকশন পেয়ে কিনেছিলাম—এইচ জি ওয়েল্সের 'দি ফার্স্ট ম্যান ইন দি মুন', এটি ১৯০১ সনে লেখা। তখন চাঁদ সম্পর্কে এবং মহাশূন্য সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রায় নির্ভুল ভাবেই অনেকটাই জানা ছিল। কিন্তু তারপরও এইচ জি ওয়েল্স বইটিতে

বৈজ্ঞানিক ভিত্তির বদলে কল্পকাহিনীকেই প্রধান করে তুলেছিলেন। তিনি এক অদ্ভুত বস্তুর কথা কল্পনা করেছেন যার মাধ্যমে তাঁর চন্দ্রযানটিকে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে আড়াল করে ফেলা যায়। ওভাবেই এটি চাঁদে যেতে পেরেছিল যাত্রীদের নিয়ে। সেখানে কীটপতঙ্গ সদৃশ চেহারার বাসিন্দা 'সেলেনাইটদের' বাস। তাদের সম্রাট 'গ্র্যান্ড লুনার' মানুষের চন্দ্রযানকে ফিরতে কীভাবে বাধা দিয়েছে এটি সেই কাহিনী। স্পষ্টত আমি যা জানতে চাইছিলাম তার ধারে কাছেও ছিলনা এই সায়েন্স ফিকশনটি।

আমার আগ্রহের কথা জেনে ওই সময় ইউনূস ভাই একটি সিনেমার কথা বলেছিলেন যেটি মর্নিং শোতে দেখানো হচ্ছে—নাম হলো 'অন দি থ্রেশোল্ড অফ স্পেস'। সিনেমার বিষয় হিসেবে ১৯৫৬ সালে তৈরি এই ছবিটি ছিল দুর্দান্ত। ১৯৫৪-৫৫ সালে মার্কিন এয়ার ফোর্সের সর্বাধুনিক বিমানগুলো কেমন করে ঊর্ধাকাশে স্ট্রাটোস্ফেয়ার (১০,০০০ মিটার উপরে বায়ুমণ্ডলের স্তর) পর্যন্ত গিয়ে সেখানে স্পেস স্যুট পরিহিত বৈমানিকদেরকে সজোরে তার সীটসহ বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে এবং তাঁরা সেই প্রায় মহাশূন্যের অবস্থাতে কিছুক্ষণ পড়তে থেকে পরে প্যারাসুট ব্যবহার করে নেমে এসেছেন এটি তার কাহিনী। এতে বৈজ্ঞানিক সক্ষমতা ও টেস্ট পাইলটদের সাহসিকতা অত্যন্ত শিহরিত হবার মত। এই টেস্টগুলো করাও হয়েছিল মার্কিন কিছু বৈমানিককে মহাশূন্য ভ্রমণের উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্য। কিন্তু আমার মনে চন্দ্রযাত্রার যে ছবি আঁকা সেই দিক থেকে এতেও তৃপ্ত হতে পারলামনা।

ভাবলাম সম্ভাব্য মহাশূন্য যাত্রা সম্পর্কে পত্র-পত্রিকা থেকে যা জেনেছি সে নিয়ে আমি নিজেই একটি লেখা লিখবো। চট্টগ্রামের সব চেয়ে কেজো বইয়ের দোকান নিউজফ্রন্ট থেকে একটি ভাল বই পেয়েছিলাম, ইংরেজিতে একটি বই—চাঁদ, মঙ্গল, শুক্র ইত্যাদির মাটি, বায়ুমণ্ডল, অভ্যন্তর সম্পর্কে সর্বশেষ যে পরিস্থিতি জানা আছে এ সব নিয়ে। আমি আমার লেখাটিতে চাঁদের পিঠের অবস্থার কথা জানাতে এই বই অনুসরণ করলাম। লেখাটির নাম দিলাম 'চাঁদ ঘুরে এলাম'। উদ্দেশ্য ছিল বৈজ্ঞানিক ভাবে সঠিক এরকম সম্ভাব্য একটি চন্দ্রযাত্রার বর্ণনা দেয়া। পাঠকদের কাছে একটু বেশি উপভোগ্য হবে মনে করে এটি একটি ভ্রমণ কাহিনীর ভঙ্গিতেই লিখলাম—অনেকটা আমার বয়সী ছাত্র ছাত্রীদের নিজেদের একটি ভ্রমণ কাহিনীর মতো। তাতে যে ধরনের রকেটে করে আজকাল উপগ্রহ উৎক্ষেপন করা হচ্ছে সে রকম আরো শক্তিশালী রকেটে করে চাঁদ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিলাম। চাঁদের কাছে যাওয়ার পর এর মাধ্যাকর্ষণে ও আমাদের চন্দ্রযানের অতিরিক্ত রকেট ব্যবহার করে ওখানে কিছুটা সমতল একটি জায়গায় অবতরণ করেছি আমরা। এরপর সবাই যার যার স্পেস স্যুট পরে বেরিয়ে এলাম—ঐ যে রকমের স্পেস স্যুট 'অন দি থ্রেশোল্ড অব স্পেস' সিনেমাটিতে দেখেছিলাম। এটি আগাগোড়া ঢাকা; ভেতরে সঠিক উত্তাপ, বায়ুচাপ ইত্যাদি রক্ষিত; অক্সিজেনের যোগান রয়েছে।

চন্দ্রযান থেকে নেমে শুরু হলো আমাদের আসল অভিযান—প্রধানত চাঁদের দর্শনীয় জায়গাগুলো দেখা। কোন জীবজন্তু, গাছ পালা, শহর-বন্দর তো নেই, দর্শনীয় বস্তু বলতে পাহাড়, খাদ, বিশাল নিচু জায়গা যাদের 'সাগর' বলা হয় (চাঁদ সম্পূর্ণ পানি-বিহীন হওয়া সত্ত্বেও)। চাঁদের পৃষ্ঠের অবস্থা সম্পর্কে এই তথ্যগুলো সম্প্রতি কেনা বইটিতে ভালই দেয়া ছিল; কাজেই তথ্যনিষ্ঠ ভাবে গল্প বানাতে অসুবিধা হলোনা। সব চেয়ে চমকপ্রদ যে দৃশ্যটি আমরা দেখলাম তা হলো তার পূর্ণ গরিমায় আমাদের পৃথিবীকে চাঁদ থেকে দেখা। পৃথিবী থেকে চাঁদকে যত বড় দেখা যায় তার থেকে বেশ কিছুটা বড় নীল একটি থালার মত। হেঁটে যতখানি দেখা যায় শেষ করে আমরা আবার একই ভাবে রকেটে করে পৃথিবীতে ফেরত এসেছিলাম। 'চাঁদ ঘুরে এলাম' লেখাটি যাদের দেখালাম সবাই পছন্দ করেছিলো। ইউনূস ভাই বল্‌লেন এটি ছাপাতে দৈনিক ইত্তেফাকে কচি কাঁচার আসরে পাঠিয়ে দিতে। তখন এটি ছোটদের জন্য লেখার জমজমাট আসর। ভয়ে ভয়ে পাঠিয়ে দিলাম। যেমনটি লেখা থাকতো দাদা ভাইয়ের নির্দেশনায়—'স্পষ্ট হস্তাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে পাঠাবে'—সে ভাবেই লিখলাম। শিগ্‌গীর এটি ছাপা হলো। এটিই আমার প্রথম ছাপার অক্ষরে লেখা, আর তা বিজ্ঞানের বিষয়েই। লেখাটি ছাপা হওয়াতে অনেকের অভিনন্দন পেলাম—শিক্ষকদের ও বন্ধুদের কারো কারো, এবং আরো বেশি ইউনূস ভাইয়ের বন্ধুদের যাদের কারো কারো আমি খুব ঘনিষ্ঠ ছিলাম।

ইউনূস ভাই সে সময় ঢাকায় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকেন। সেখান থেকে তিনি আমাদেরকে প্রায়ই চিঠি লিখতেন, আমরাও লিখতাম। আমার স্কুল, বিজ্ঞানের কাজ এ সব নিয়ে চিঠিতে কথা হতো। তবে চট্টগ্রামে আমরা বিশেষ ভাবে মুখিয়ে থাকতাম তাঁর সেই বিশেষ বাক্যের জন্য 'আগামী কাল সবুজ তীরে আসছি'। অনেক সময় একটি পোস্ট কার্ডের উপর সংক্ষেপে লেখা থাকতো বাক্যটি। ইউনূস ভাই সবুজ তীর লিখতেন 'গ্রিন এ্যারো' ট্রেনকে—প্রথম দ্রুতগামী দিনের বেলার ট্রেন এটি দুই শহরের মধ্যে। রাতের যে ঢাকা মেইলের সঙ্গে আমরা পরিচিত ছিলাম এটি তার চেয়ে অনেক কম সময়ে আসা যাওয়া করে। তাছাড়া সকালের দিকে রওয়ানা হয়ে রাত শুরুতেই পৌছিয়ে দেয়, পুরো পথ দৃশ্য দেখতে দেখতে চলা যায়—গল্প করে, বা কখনো দীর্ঘ সময় ধরে খাওয়ার সুন্দর কামরাটি 'ব্যুফে কারে' বসে চা খেতে খেতে। 'গ্রিন এ্যারো' ট্রেনটি দেখতেও ভারী সুন্দর—সবুজ তীরই বটে। মজার ব্যাপার হলো ইউনূস ভাইয়ের সেই চিঠি এবং পোস্ট কার্ড পোস্ট করা হতো ফুলবাড়িয়াতে ঢাকা রেলওয়ে স্টেশন থেকে যেখানে আছে 'আরএমএস' অর্থাৎ 'রেলওয়ে মেইল সার্ভিস'। চট্টগ্রামগামী ঢাকা মেইলটি রাতে ছাড়ার একটু আগেও যদি সেখানে পোস্ট করা যায় তা হলে পরদিন সকালে চিঠি গন্তব্যে পৌঁছে ডেলিভারি হয়ে যেত। সলিমুল্লাহ হল থেকে হেঁটে গিয়ে ফুলবাড়িয়া পোস্ট করতে তাঁর কোন কার্পণ্য ছিলনা—কারণ হাঁটতে

তাঁর খুব আনন্দ। আরএমএসে গিয়ে চিঠি পোস্ট করার মাহাত্ম্য যেমন তিনি আমাকে শিখিয়েছিলেন তেমনি হাঁটার আনন্দটিও শিখিয়েছিলেন। ওইসময় একবার ঢাকায় গিয়ে তিনি ও তাঁর দুই বন্ধুর সঙ্গে সলিমুল্লাহ হল থেকে হেঁটে নারায়ণগঞ্জ গিয়েছিলাম—পাগলা, পোস্তাগোলা ইত্যাদি নামের জায়গাগুলোর মধ্য দিয়ে হাঁটা, শীতলক্ষ্যা নদী দেখা, নারায়ণগঞ্জ গিয়ে চায়ের দোকানে আয়েস করে চা নাস্তা করা, আর নদী বন্দরে স্টিমার দেখা—এই সব কথা খুব মনে পড়ে।

বলছিলাম ইউনূস ভাইয়ের আসার সময় হলে ২০ বক্সীরহাট রোডে আমরা সবাই নেচে উঠতাম। এর কারণ ঢাকা নিয়ে তাঁর অনেক জমা গল্প শোনা, আর আমাদের এদিককার সব খবর দেয়া। অনেক কথা, অনেক পরামর্শ করার বিষয় জমা থাকতো আমাদের সবার। প্রায়শ কোন কিছু একটি অজুহাত তুলে যদি সুযোগ পেতাম ইউনূস ভাই ফেরার সময় তাঁর সঙ্গী হয়ে জুটে যেতাম। দশম শ্রেণীতে ওঠার পর পর এমনি এক অজুহাত এনে দিলো ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট টিমের পাকিস্তান সফরে ঢাকা টেস্ট (মার্চ ১৯৫৯)। ইউনূস ভাই এবং সলিমুল্লাহ হলে তাঁর দুই একজন বন্ধুর সঙ্গে মিলে সিজন টিকেট কেটে টেস্ট ম্যাচ দেখলাম বেশ আড়ম্বর করে। বিশেষ লক্ষ্য ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজের কিংবদন্তি হয়ে ওঠা ফাস্ট বোলার হলকে দেখা। তাঁর কথা শুনে আসছিলাম অনেক দিন ধরে। বেয়াড়া রকম দীর্ঘাঙ্গী এই দৈত্যের মত মানুষটি যখন দীর্ঘপথ দৌড়ে এসে দুর্দান্ত বেগে বল ছুঁড়ে দেন তখন তাঁর সামনে দাঁড়ায় কার সাধ্য। ইনজুরির কারণে পাকিস্তানের যাদুর ব্যাটধারী ওপেনার হানিফ মোহাম্মদ খেলতে পারেননি ঢাকা টেস্টে। প্রথম ইনিংসে হলই যাদু দেখালো—একের পর এক প্রথম চার জনকে আউট করে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাকি বোলারদের মধ্যেও ছিলেন সোবার্স, গিবস, আর রামাধীনের মতো ইতিহাস সৃষ্টিকারী ক্রিকেটরেরা। সোবার্স কোন উইকেট না পেলেও অন্যরা দু'একটি করে পেলো। তবে হলের ব্যাপারটিই আলাদা। মনে হলো আমার মত সারা স্টেডিয়ামের মানুষ শুধু হলকেই দেখছে।

মজাটি ঘটলো পাকিস্তানের দ্বিতীয় ইনিংস খেলার সময়। ইউনূস ভাই আর আমি খেলার এক ফাঁকে ভাবলাম সালিমাবাদ রেস্টুরেন্টে দুপুরে ভাত খেয়ে আসি। স্টেডিয়াম অঞ্চলে যাওয়ার একটি বাড়তি আকর্ষণই ছিল এই সালিমাবাদ রেস্টুরেন্টে খাওয়া। অতি সাধারণ মানের রেস্টুরেন্ট, কিন্তু খুব সুস্বাদু খাবার। এত জনপ্রিয় যে যখনই যাই অত্যন্ত ব্যস্ত, বসার জায়গা থাকতোনা, বেশ খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর জায়গা পাওয়া যেত। খাবার পরিবেশন ও খাওয়া তাই হতো চটপট। এই সালিমাবাদ অবশ্য তারপরও দীর্ঘকাল পর্যন্ত একই ভাবে গুলিস্তান সিনেমার পেছনে—একটু উত্তরে, একই জনপ্রিয়তা ধরে রেখেছিল। শেষ পর্যন্ত নর্থ-সাউথ রোড করতে গিয়ে এটি উচ্ছেদ হয়েছে। এখন অবশ্য গুলিস্তানও আর নেই, যা কিনা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকার প্রথম ও সব চাইতে বিখ্যাত ল্যান্ডমার্ক। দ্রুতগতিতে খাওয়া শেষ করার আগে ওখানেই খবর পেয়ে গেলাম

ইনিংস শেষ—কারণ শেষ চারজন খেলোয়াড়ের কেউই হলের ঝড়ের সামনে দু'তিন মিনিটের বেশি টিকতে পারেনি। তারপরও অবশ্য পাকিস্তান এই ম্যাচটি জিতেছিল। এই টেস্ট ম্যাচটির কথা আমার বিশেষভাবে মনে আছে হলের বোলিং এর কারণে। সেবার আমরা যখন তাঁকে দেখি তখনো তিনি অল্প কিছু মাত্র টেস্ট ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। পরে অনেকদিন খেলেছেন। খেলা থেকে ষাটের দশকে অবসর নিয়ে তিনি নিজ দেশের সংসদ সদস্য এবং মন্ত্রীও হয়েছিলেন।

টেস্ট ম্যাচের একটি আকর্ষণই দেখলাম নানা রকম অভিনব জিনিস হকাররা যে মাঠে বিক্রির জন্য নিয়ে এসেছিলো তা। এদের অনেকগুলো কোন না কোন ভাবে ক্রিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত। এর মধ্যে একটি জিনিস আমার কাছে দারুণ আইডিয়া মনে হলো—খুবই সাধারণ, অথচ বৈজ্ঞানিক দিক থেকে খুবই তাৎপর্য বহনকারী। এ ছিলো ম্যাচ বাক্সের চেয়ে সামান্য বড় সাইজের দুটি ছোট্ট নোটবুক—এর মলাটটিও অন্য পাতাগুলোর মত নরম। রাইটিং প্যাডের মত এর উপরের দিকটাই বাইন্ডিং করা আছে। নিচের কিনারাটি আঙ্গুলে ধরে দ্রুত গতিতে পাতা উল্টাতে দিলে একটিতে দেখা যায় চলচ্চিত্রের মত হানিফ মোহাম্মদ ব্যাট চালিয়ে একটি স্ট্রোক খেলছেন, আর অন্যটিতে ফজল মাহমুদ দৌড়ে এসে বল করছেন। সিনেমার রিলের পর পর ফ্রেমগুলোর স্থির ফটো নোটবুকের পর পর পাতায় ছাপানো রয়েছে বলে দ্রুত গতিতে এগুলো চোখের সামনে দিয়ে একের পর এক চলে গেলে ওই চলচ্চিত্রের এফেক্টটি সৃষ্টি হয়; যেভাবে পর্যায়ক্রমে ফ্রেমগুলো একের পর এক পর্দার উপর প্রক্ষিপ্ত হয়ে সিনেমাতে ঘটে। চোখের সামনে থেকে সরে যাওয়ার পরও খুব স্বল্প একটি সময় একটি ছবি মস্তিষ্কে থেকে যায় বলে পরের ছবির থেকে আগের ছবি পৃথক করা যায়না—সবগুলো মিলে চলচ্চিত্রের অনুভূতি হয়। সামান্য একটি নোট বইয়ে এই অনুভূতিটি সৃষ্টি করে ওই খেলনাটি তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। দেখলাম অনেকেই এটি কিনে হানিফের ব্যাটিং আর ফজলের বোলিং দেখছে বার বার। আমার কেনার কারণ ছিল অবশ্য আরো গূঢ়—সিনেমার বিজ্ঞানটি সহজে বোঝা ও অন্যকে বোঝাতে পারা।

চার হাজার স্কাউটের মেহমানদারি

ঐ যে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় মার্চে ওয়েস্ট ইন্ডিজের সঙ্গে টেস্ট ম্যাচ দেখতে ঢাকা যাওয়া, তার আগে আগে কিন্তু চট্টগ্রামেই ঘটে গেল আমরা সব স্কাউটদের জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৫৮ সালের ২৭ ডিসেম্বর থেকে পরের বছরের ৪ জানুয়ারি পর্যন্ত আমরা কাটালাম দারুণ আনন্দ-উত্তেজনার মধ্যে; এই দিন কটিতে আমাদের চট্টগ্রামেই অনুষ্ঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় পাকিস্তান জাতীয় স্কাউট জাম্বুরী। সারা পাকিস্তান থেকে এবং বেশ কয়েকটি অন্য দেশ থেকে প্রায় চার হাজার স্কাউট এসেছিলো; তাঁবু গেড়েছিলো চট্টগ্রাম শহরের এক কিনারায় আগ্রাবাদের মাঠে—তখন থেকে আজ অবধি সেটি 'জাম্বুরীর মাঠ' বলে পরিচিত। আমরাও

ছিলাম ওই চার হাজারের অর্ন্তভুক্ত, কিন্তু পার্থক্য হলো অন্যরা ছিল মেহমান, কিন্তু আমরা চট্টগ্রামের স্কাউটরা ছিলাম মেজবান—আমাদের দায়িত্ব ছিল বেশি।

নবম শ্রেণীর বার্ষিক পরীক্ষাটি শেষ করেই জোরেশোরে লেগে গিয়েছিলাম ওই মেজবান হিসেবে প্রস্তুতি পর্বে। ১৯৫২ সনে ওই যে ইউনূস ভাইরা রেল গাড়িতে চড়ে ভারতের উপর দিয়ে করাচিতে প্রথম জাতীয় জাম্বুরীতে গিয়েছিলেন, তার এত গল্প শুনেছি যে বুঝতে পারছিলাম কী মহাযজ্ঞ হতে যাচ্ছে এই দ্বিতীয় জাম্বুরীতেও। আমাদের প্রস্তুতির বড় অংশটি ছিলো চট্টগ্রাম স্কাউটসের সবার এক সঙ্গে সমন্বিত ভাবে প্রশিক্ষণ নেয়া, যেন দেশবিদেশের হাজারো স্কাউটের মেলায় আমাদের বৈশিষ্টগুলো তুলে ধরতে পারি। চট্টগ্রাম স্কাউটসের প্রধান দুটি দল ও প্রতিদ্বন্দ্বী হলো কলেজিয়েট স্কুল ট্রুপ আর সেন্ট প্লাসিডস স্কুল ট্রুপ। হয়তো সে জন্যই আমাদের প্রশিক্ষণের স্থান ঠিক হলো এই দুইয়ের কোথাও নয়—বরং গভর্নমেন্ট মুসলিম হাইস্কুলে। এর আগে ওখানে কোন দিন যাওয়া হয়নি। লালদিঘির মাঠের অদূরে একটি পাহাড়ের ওপর এক পর্তুগীজ দুর্গে এই স্কুল। ওই যে ১৫০০ শতকে পর্তুগীজরা চট্টগ্রামে বসত গড়ে নানা জায়গায় কয়েকটি দুর্গ বা ফ্যাক্টরি স্থাপন করেছিল এটি তারই একটি। কর্ণফুলির মোহনায় তাদের প্রিয় বন্দর পোর্টো গ্র্যান্ডের (বৃহৎ বন্দর) উপর পাহারাদারির জন্য পাহাড়ের উপর এই দুর্গটি বেশ সুবিধাজনক ছিল বলেই মনে হয়। দুর্গই বটে, এর নানা অলিন্দে দরাজ আকারের সব কক্ষের কোন কোনটিতে এবং সামনের প্রশস্ত উঠানে চল্‌লো আমাদের প্রশিক্ষণ। বিভিন্ন প্রধান স্কুলের স্কাউট শিক্ষকরা সে সব প্রশিক্ষণ দিলেন। আমাদের নিজেদের স্কাউট ট্রুপের বাইরে এসে চট্টগ্রাম স্কাউটস হিসেবে অন্যান্য অনেকের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ হলো এখানে। জাম্বুরীর মাঠে আমরা যে কাজ করবো, মার্চ করবো, কসরত দেখাবো, আর সব চেয়ে বড় কথা এর বিভিন্ন ক্যাম্প ফায়ারে খোলা আগুনের চারদিকে বসে নানা স্থানের নানা স্কাউটদের আসরে কী কী গাইবো, কী আনন্দ ধ্বনি (ইয়েল) দেবো—ইত্যাদির অনুশীলন চললো।

আমার কাছে সব চেয়ে চমকপ্রদ মনে হলো দেশ বিদেশের নতুন নতুন গান শেখা। আন্তর্জাতিক একটি আন্দোলন হিসেবে নানা দেশের বেশ কিছু গান দেশে দেশে স্কাউটদের মধ্যে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা পেয়েছে। এর কোন কোনটি আমরা অনুশীলন করলাম এক সঙ্গে গাইবার জন্য—বেশির ভাগই আসলে মজার গান, অনেকগুলো তেমন কোন অর্থবিহীন। যেমন একটি পাঞ্জাবি গান দক্ষিণ আফ্রিকায় এত জনপ্রিয়তা পেয়েছে যে একে সেখানকার গানই মনে করা হয়—

'সেররর—গ্যায়া বাবা লাসি কা কোটারা
লাসি কা কোটারা বাবা লাসি কা কোটারা'

অর্থাৎ—লাস্‌সির (ঘোলের মিষ্টি পানীয়) বাটি থেকে সব ছিটিয়ে গেছে...

অথবা ভারতের উত্তর প্রদেশের গানে এক কৃষকের অভিযোগ :

'মেরি ভৈস কো ডান্ডা কেঁউ মারা–'

অর্থাৎ—আমার মোষকে কেন ডাণ্ডা পেটা করেছ?
অথবা আরো অর্থহীন ভাষাহীন আন্তর্জাতিক গান

'গিং গাং গোলি গোলি গোলি গোলি ওয়াটসা,
গিং গাং গুয়ো, গিং গাং গুয়ো'

এই গানটি নাকি স্কাউট আন্দোলনের জনক স্বয়ং ব্যাডেন পাওয়েল রচনা করেছিলেন ১৯২০ সালে প্রথম স্কাউট বিশ্ব জাম্বুরীর জন্য, যাতে নানা দেশের নানাভাষী ছেলেরা গাইতে পারে। আর এর সুর নাকি নেয়া হয়েছে বালক বয়সে মোৎসার্টের রচিত তাঁর প্রথম সিম্ফোনি অবলম্বনে।

আর একটি গান মনে পড়ে যেটি কানাডার কুইবেকে ফরাসী ভাষী শিশুদের গান; সারা দুনিয়ায় গাওয়া হয় :

'আ-লুয়েত্তে জেঁতি আলুয়েত্তে
আ-লুয়েত্তে জেঁতে প্লুমের‍্যাই
জেঁতে প্লুমেরাইলাতে
আলুয়েত, আ-লুয়েত্তে..."

যদিও এর একটি শাব্দিক অর্থ আছে, আসলে সেই অর্থের তেমন কোন গুরুত্ব নেই; ওই সেরর গ্যায়া বাবা লাসি কা কোটারার মতই। এক সঙ্গে মজা করে গাওয়ার সুরটিই আসল।

অবশ্য আন্তর্জাতিক ভাবে স্কাউট-প্রিয় সব গানই যে অর্থহীন তা নয়। যেমন সেবা ধর্ম নিয়ে এই ভারতীয় গানটি আমরা দরদ দিয়ে গাইতে শিখেছি তখন :

'সাম্ভাল কে চল্ না হো-গা, ভাইয়ো সেবা ধরো।
সেবা করনা ধরম হামারা, চাহে দুশমন চাহে পেয়ারা...'

যাঁরা গান শেখাতেন তাঁদের মধ্যে মুসলিম হাই স্কুলের স্কুলের স্কাউট শিক্ষক মোহাম্মদ আলী স্যার ছিলেন প্রধান, খুবই পরিশ্রম করে নানা স্কুলের এতগুলো ছেলেকে তিনি গানগুলো শিখিয়েছিলেন। নিজেদের পারফরমেন্সের মান বাড়ানো, নিজেদেরকে বৃহত্তর আন্তর্জাতিক স্কাউট আন্দোলনের আরো ভাল সদস্য করা ছাড়াও প্রশিক্ষণের আরো বিষয় ছিল। জাম্বুরীর ভৌগোলিক গঠনটি কী হবে, এর কোথায় কী পাওয়া যাবে ইত্যাদিও আমাদের ভাল করে জানা প্রয়োজন ছিল। কারণ চট্টগ্রামের স্কাউট হিসেবে বাকিদেরকে এসব বিষয়ে সহায়তা দেয়াটি ছিল আমাদের কর্তব্য। তাছাড়া জাম্বুরীতে হাজার হাজার দর্শকেরও সমাগম হবে। তাঁদেরকেও সহায়তা দিতে হবে। আমাদের উপরেই নির্ভর করছে এত বড় আয়োজনে চট্টগ্রামের সম্মান।

কলেজিয়েট স্কুলের স্কাউট ডেনে আমাদের স্কুলের নিজস্ব অনুশীলনও চল্‌লো। আমরা নিজেদের ট্রুপকে নতুন করে সাজালাম—ক্যাম্পে কারা কী করবো, কী দেখাবো ঠিক করলাম। সিদ্ধান্ত হলো ক্যাম্প ফায়ারে আমাদের একটি অনুষ্ঠান হবে চট্টগ্রামকে উপস্থাপন করা। এর জন্য সমবেত কণ্ঠে চাটগেঁয়ে গানের একটি গীতিমালা তৈরি করলাম ধারাবর্ণনা সহ। গানের নেতৃত্ব বরাবরের মত বোরহানের উপর। এর ধারাবর্ণনাতে শুরুটা এভাবে "চট্টগ্রাম, স্বপ্নীল ভূমি চট্টলা। পাহাড় ঘেরা, সাগর ধোয়া নদী-মেখলা প্রাচ্যের সৌন্দর্য রাণী এই চাটগাঁ..."। প্রথম গানটিই হলো সমুদ্রে ঝড়ের মুখে পড়া দাঁড় বাওয়া মাঝিদের আকুল গান :

"হেই বদর বদর বদর বদর হেঁইয়া,
হেই বদর বদর বদর বদর হেইয়া
বে-বাম দরিয়ার মাঝে হায়রে কূল কিনারা নাই।

এমনি ভাবে চট্টগ্রামের জনপ্রিয় লোকগীতিগুলোকে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলাম—আর এর জন্য দিনের পর দিন প্রচুর অনুশীলন করে গিয়েছি।

অবশেষে জাম্বুরী উদ্বোধনের আগের দিন আগ্রাবাদের জাম্বুরী মাঠে নক্সা করা বিন্যাস অনুযায়ী শত শত তাঁবু পড়ে গেল। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের তাঁবুগুলো পড়লো আমাদের তৈরি চটের একটি গেইটের সঙ্গে দড়ি দিয়ে ঘেরা জায়গার মধ্যে—কয়েকটি বড় বড় তাঁবু, প্রত্যেকটিতে সারিবদ্ধ ভাবে বেশ কয়েক জনের শোয়ার ব্যবস্থা। সুন্দর করে সাজালাম আমাদের ঘেরা এই জায়গাটি। তাঁবুগুলোর পেছনে রান্না করার জন্য একটি অঞ্চল তৈরি করে নিলাম। সামনের দিকটা অভ্যাগত দর্শকদের জন্য নানা ভাবে সুসজ্জিত করলাম। দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় করার জন্য আমাদের স্কাউট ডেনের সংগৃহীত জিনিসপত্র যথেষ্ট নয় মনে করে আমাদের কাব টিচার মোখলেস সাহেব আর স্কাউট টিচার ভূপতি বড়ুয়া বাবু প্রস্তাব করলেন আমার একক বিজ্ঞান প্রদর্শনীটিও এখানে থাকুক—বিশেষ করে স্কাউট জীবনে যে সব যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হতে পারে সে সবের। এ প্রস্তাবে সব চেয়ে বেশি খুশি হলো বাহাদুর—এর আগে স্কুলে আমার বিজ্ঞান প্রদর্শনীটি যার সহায়তা না পেলে সম্ভব হতোনা। এবারো আমরা দু'জন পরিকল্পনা করে বাঁশের উপর চাটাইয়ের একটি টেবিল তৈরি করলাম তাঁবুর সামনে—সেখানেই সাজিয়ে ফেল্‌লাম বিজ্ঞান প্রদর্শনী, অনেকটা ওই স্কুলে করাটির মতোই। স্কাউট হিসেবেও বাহাদুর অত্যন্ত উৎসাহী ছিল—কাজেই উভয় রকম উৎসাহের যোগে আমরা প্রদর্শনীকে জাম্বুরীর উপযুক্ত করে তুলতে পারলাম।

জাম্বুরীর ক্যাম্পগুলো বিন্যাস ঠিক হয়েছিল পাকিস্তানের বিভিন্ন এলাকার স্কাউদেরকে কাছাকাছি আনার জন্য। তাই নানা এলাকার স্কাউটদেরকে অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ক্যাম্প করার ব্যবস্থা হয়েছিল। চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের পাশেই ছিল সিন্ধুর হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের ক্যাম্প। ক্যাম্প তৈরি করতে করতে

তাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় হলো, আমরা তাদেরকে সহায়তা দেবার চেষ্টা করলাম। জাম্বুরী মাঠের এই অংশের সবাই ছিলাম 'খাইবার' সাব-ক্যাম্পের অন্তর্ভুক্ত—দেশের নানা অঞ্চলের অনেকেই এর মধ্যে ছিলাম। এটি পশ্চিম পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমে আফগান সীমান্তে খাইবার গিরিপথের নামে, যে সরু গিরিপথ দিয়ে গ্রিকবীর আলেকজান্ডার থেকে শুরু করে নানা বিদেশী আক্রমণকারীরা ভারতে প্রবেশ করেছে। আরো দুটি সাব-ক্যাম্প ছিল—'কর্ণফুলি' এবং 'সুন্দরবন'। আমাদের অনেক কাজই হতো সাব-ক্যাম্পের ভিত্তিতে; যেমন নিজস্ব প্রোগ্রাম, রসদ সরবরাহ, এবং প্রতি রাতে নিজস্ব ক্যাম্প ফায়ার—মাঝখানে আগুন জ্বালিয়ে নাচ, গান আর ইয়েল। প্রত্যেক সাব-ক্যাম্পে ঢোকার মুখে সুন্দর গেইট ছিল, আবার প্রত্যেক আলাদা আলাদা ট্রুপেরও নিজস্ব প্রবেশদ্বার ও সাইনবোর্ড ছিল।

উদ্বোধনী মার্চে গিয়েই টের পেলাম আমাদের এই জাম্বুরী মাঠে সমাগত স্কাউটদের বিপুল বৈচিত্র। বিভিন্ন বয়সের স্কাউটরা এসেছে—কম বয়সের থেকে শুরু করে অনেক কৈশোর উত্তীর্ণ তরুণ স্কাউটও। বিদেশী কন্টিনজেন্টগুলোর সঙ্গে দেখা হলো। বিদেশের সব চেয়ে বড় দলটি হলো ইরানের—তাদের সবারই যথেষ্ট বয়স, হয়তো রোভার স্কাউট অথবা স্কাউট মাস্টার এমনি কেউ হবে। তাদের মার্চটিও দেখলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম; অনেকটা মিলিটারি মেজাজের মার্চ। বিদেশীদের মধ্যে আরো ছিল জাপান, সোমালিয়া, আফগানিস্তান, এবং একটি ছোট ভারতীয় দল। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমাদের সম্মিলিত মার্চের সালাম নিলেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও চীফ স্কাউট জেনারেল আইয়ুব খান—তিনি এর উদ্বোধনী ভাষণও দিলেন। ওই উদ্বোধনের পর পরই কিন্তু জাম্বুরী মাঠ পরিণত হয়েছিল সাধারণ দর্শকদের একটি জনারণ্য। অন্য ক্যাম্পের স্কাউটরা আসছিলো দলে দলে আমাদের ক্যাম্প দেখতে, আবার সাধারণ দর্শকরাও আসছিলো। অন্য স্কাউটদের সঙ্গে পরিচিত হচ্ছিলাম, ঠিকানা বিনিময় করছিলাম, আর সাধারণ দর্শকদেরও কৌতূহল মেটাচ্ছিলাম যথাসাধ্য। এর মধ্যে আমাদের নিজেদের কৌতূহলও কম নয়—সুযোগ মত চলে যাচ্ছিলাম অন্যদের ক্যাম্পে।

জাম্বুরীর শুরুতে বেশ কিছুটা অব্যবস্থা দেখা দিয়েছিল। এত বড় মাঠের এতগুলো ক্যাম্পের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রেখে শৃঙ্খলামত সব কিছু করা সম্ভব হচ্ছিলোনা। মেজবান হিসেবে দায়িত্বটি ছিল পূর্ব পাকিস্তান স্কাউটস কর্তৃপক্ষের। কিন্তু তাদের যে নিয়মিত লোকবল ছিল তা মোটেই এ কাজে দক্ষতা দেখাতে পারছিলো না। তখন এক পর্যায়ে দেখলাম তাঁরা ইউনূস ভাই ও তাঁর কয়েকজন স্কুল জীবনের বন্ধু প্রাক্তন স্কাউটের শরণাপন্ন হয়েছেন। পুরো ব্যাপারটি শিগ্‌গীর চলে এলো তাঁদের নিয়ন্ত্রণে। সারা মাঠ থেকে শোনা যায় এমন শক্তিশালী মাইকের ব্যবস্থা হলো দ্রুত—তাতে কিছুক্ষণ পরে পরেই ইউনূস ভাই ও

তাঁর বন্ধু মাহবুব ভাইয়ের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম—বাংলা, ইংরেজি ও উর্দুতে। সমস্যাগুলো ছিল রসদ সরবরাহ, পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, প্রাথমিক চিকিৎসা এবং বিভিন্ন প্রোগ্রাম সম্পর্কে সবাইকে সময়মত অবহিত করার ব্যাপার। এটি এখন নিয়মিত স্পষ্টভাবে মাইকে জানানোতে সবাই বেশ আশ্বস্ত হলো। আর একটি সমস্যা ছিল এত বড় জাম্বুরীতে কারা কোথায় আছে তা চিহ্নিত করে যারা সেখানে যেতে চায় দ্রুত তাদেরকে পৌছানো। এই কাজে ইউনূস ভাইকে দেখলাম সম্পূর্ণ অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতি অবলম্বন করতে। তিনি নিজেই উদ্যোগী হয়ে এক গাদা পোস্টার পেপারের উপর সমানে মোটা কলম দিয়ে বড় বড় অক্ষরে লিখে গেলেন তাতে তীর এঁকে দিলেন—কোন সাব-ক্যাম্প, কোন ট্রুপ কোন দিকে গেলে পাওয়া যাবে; ঘোষণা কেন্দ্র, কেন্দ্রীয় রসদ, চিকিৎসা কেন্দ্র ইত্যাদিও বা কোথা থেকে সহজে কোন দিকে গেলে পাওয়া যাবে। ওই যে কলেজ নির্বাচনের সময় দ্রুত শত শত পোস্টার লিখে অভ্যাস ছিল তাঁর, সেটিই এখন কাজে লাগালেন। আমরা অনেকে ভলান্টিয়ার হয়ে এসব পোস্টার জাম্বুরী মাঠের পুরো জায়গায় নানা ক্যাম্পের মাঝখানে 'অলিগলিগুলো' ও 'সদর রাস্তায়' যথাস্থানে সেঁটে দিলাম। ব্যস এর পর থেকে জাম্বুরীতে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা একেবারেই কমে গেল।

সাব-ক্যাম্পে আমাদের প্রতি রাতের ক্যাম্প ফায়ারগুলো জমে উঠলো। আমাদের 'খাইবার' সাব-ক্যাম্পের চীফ ছিলেন পাঞ্জাবের একজন বেশ সম্মানীয় স্কাউটার (সিনিয়র স্কাউট মাস্টার)। চেহারায় এই মজার মানুষটিকে বাঙালি বলেও চালিয়ে দেয়া যায়। প্রতি রাতে ক্যাম্প ফায়ারে তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে ইংরেজিতে সংক্ষিপ্ত মজার মজার বক্তব্য রাখতেন শুরুতে দুই হাত মাথার উপর তুলে হ্যান্ডশেকের মত উভয় হাত জড়ো করে বলতেন 'খোশ আমদেদ স্কাউটস'! আমরা গভীর রাত পর্যন্ত চালাতাম আমাদের পারফরমেন্স। আমাদেরকে উৎসাহ দেবার জন্য সাব-ক্যাম্প চীফ মাঝে মাঝে তাঁর প্রিয় ইয়েলটি দিতেন—'সাবাহ সাবাহ' আর আমরাও চেঁচিয়ে উঠতাম 'সাবাহ'। ওই যে গানগুলো শিখেছিলাম—আসর জমিয়ে ওগুলো গেয়ে যেতাম একে একে। এর মধ্যে মাঝে মাঝে নাচ—কোদাল নৃত্য, ঝুমুর সৃত্য, ধান কাটার নৃত্য, এমনি নানা কিছু। চট্টগ্রামের উপর আমাদের সেই গানের স্কেচটিও পরিবেশন করলাম—বাংলা-ইংরেজি ধারাবর্ণনা সহ : 'হেই বদর বদর বদর বদর হেইয়া'। আমাদের সাব-ক্যাম্পে পূর্ব পাকিস্তানের আরো নানা স্থানের স্কাউটরা তাদের নিজস্ব এলাকার গানের, সুরের পরিবেশন করলো, যেমন ময়মনসিংহ গীতিকার গান। সবাই ভীষণ উৎসাহী আমুদে মুডে থাকতো—তাই সবই প্রশংসিত হতো। ফাঁকে ফাঁকে চলতো বাংলা, উর্দু, পাঞ্জাবি, ইংরেজি, পশতু, সিন্ধি নানা রকম স্কাউট ইয়েল বা জয়ধ্বনি। একবার কেউ দিলেই হলো আমরা সঙ্গে সঙ্গে শিখে ফেলতাম।

লাহোরের ছেলেদের একটি পাঞ্জাবি গান খুব ভাল লাগলো—'হেই জমা-লো'। এটি আসলে পাঞ্জাবের একটি বিখ্যাত লোকগীতির ঢঙ্গে যার উপর নানা

ভাবে গান খাড়া করা যায়, অনেকটা আমাদের জারি গানের মতো। কয়েকজন সমস্বরে পাঞ্জাবিতে একটি নতুন ছত্র গাইতো আর এর পরেই আমরা সবাই ধুয়া তুলতাম—'হেই জমা-লো'। সিন্ধুর হায়দ্রাবাদের ছেলেরা একটি সুন্দর নাচ দেখালো—মরুভূমির উপজাতীয়দের নাচ বিশেষ রকমের পোষাক পরে। কিছুক্ষণ পর তারা হো-হো, হো-হো, হো-হো-হো-হো করে—তালে তালে নাচতে এগিয়ে আসতো, এবং তাদের একজন সুন্দর উর্দুতে ঘোষণা দিতো 'হাম পাঞ্জাব সে দোস্তি কি পয়গাম লে কর আয়ে হোঁ' (আমরা পাঞ্জাব থেকে বন্ধুত্বের বাণী নিয়ে এসেছি), এর পরের জন হয়তো বলছে 'হাম বাঙ্গাল সে আখোয়াত (ভ্রাতৃত্ব) কি পয়গাম লে কর আয়ে হো'—এমনি ভাবে চলতো নানা অঞ্চলের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেবার পালা। দেশীয় রাজ্য সোয়াতের স্কাউটরা দেখালো পাঠানদের খাটাক নাচ। নাচতে নাচতে তারা দরবেশি পাক খেতে থাকে আবার বড় বৃত্তাকারে ঘুরতেও থাকে। প্রতি রাতে আমাদের ক্যাম্প ফায়ার থেকে কিছু ভাল অনুষ্ঠান নির্বাচন করা হতো শেষ রাতে পুরো জাম্বুরী মিলে যে গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ার হবে তাতে পরিবেশনের জন্য।

জাম্বুরীতে সব চেয়ে বেশি চাহিদা ছিল বিদেশী স্কাউটদের। তাদের সংখ্যা খুব কম অথচ তাদের সঙ্গে কথা বলতে চায় অন্য সবাই—অন্য স্কাউটরা যেমন তেমন সব দর্শকরাও। দর্শকের চাপ প্রতিদিন বাড়ছিলো, অনেকে সপরিবারে স্ত্রী-পুত্র-কন্যা সবাই মিলে। আসবেইনা বা কেন এত কাছে দেশ বিদেশের এত স্কাউটদের এই মিলন মেলা দেখার সুযোগ ছাড়ে কে? আসলে জাম্বুরী মাঠ নিজেই হয়ে পড়েছিল যেন একটি অস্থায়ী জাম্বুরী শহর—যে শহর উপচে পড়েছিল তার আশপাশে আগ্রাবাদে, চট্টগ্রাম শহরে এই একাংশে। বিদেশীদের মধ্যে ইরানী স্কাউটদের সংখ্যাই বেশি, বয়স্ক এই স্কাউটরা সারাদিন জাম্বুরী মাঠে খুব ঘুরতোও বেশি, কয়েকজন করে দল বেঁধে। তাই তাদেরকেই পাওয়া যেত জাম্বুরী মাঠের যত্রতত্র। দীর্ঘাঙ্গ সুঠাম দেহ এবং গৌর বর্ণের কারণে দূর থেকেও তাদের চিনতে কোন অসুবিধা হতো না। তাদের শরীর দেখে মনে হতো ইরানিয়ান মিলিটারির কোন একটি প্লাটুনকেই বুঝি পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে এখানে। তাদের সবার সঙ্গেই থাকতো বাড়তি কিছু স্কার্ফ, ও অন্যান্য ইরানি টুকিটাকি। এগুলো ওরা আমাদের নানা স্কাউটদের টুপি, স্কার্ফ, ও নানা স্কাউট সামগ্রীর সঙ্গে বিনিময় করছিলো। এখানকার স্কাউটরা খুব আগ্রহী থাকতো এরকম বিনিময়ে। আসলে সব জাম্বুরীতে এটি একটি নিয়মিত ব্যাপার—দেখা হলেই অনেক সময় একে অপরকে বলে 'এনিথিং টু এক্সচেঞ্জ?' অথবা প্রশ্নের মতো করে শুধু 'এক্সচেঞ্জ?'। এদিক থেকেও ইরানিদের বাজার দর ছিল বেশি—কারণ তাদের এক্সচেঞ্জ করার মতো অনেক কিছু ছিল। তবে আমাদের দেয়া জিনিস যদি তাদের পছন্দ না হতো তা হলে তারা 'না' না বলে ভদ্রভাবে বলতো 'আফটার জাম্বুরী'। এই যে ইরানিদের

'এক্সচেঞ্জ?' এর উত্তরে 'আফটার জাম্বুরী' বলা এটি সারা জাম্বুরীময় একটি প্রচলিত হাসির কথায় পরিণত হয়েছিল।

জাপানি স্কাউটদের দেখে খুব মজা পেলাম। তাদের মধ্যে আমার বয়সীরাই বেশি, দু'একজন একটু বড়। তাদের ক্যাম্পে গিয়ে দেখার ও আলাপের একটু সুযোগ পেয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে কথা বলার ভাষার অভাবে বেশির ভাগ মিষ্টি মিষ্টি হেসেই সারতে হলো। তবে তাদের নেতা স্কাউট মাস্টারটি ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি বলতে পারেন, মজার মানুষ—কিছুক্ষণ পরে পরেই তাঁর ছেলেদেরকে তাড়া দিচ্ছিলেন জাপানি ভাষায় কী বলে-বলে। তাঁর নাম জানলাম মিজনো সান (জনাব মিজনো)। ভাগ্যের এক যোগসূত্রে এই মিজনো সানের কথা পরে আরো অনেক বলতে হবে।

বাসা থেকে সবাই—আব্বা, খালু, চাচারা জাম্বুরী ঘুরে গেছেন। টুনু, আইয়ুব আজম, জাহাঙ্গীর সবাই প্রায়ই আসতো জাম্বুরী দেখতে আমাদের ক্যাম্পে এসে বিশ্রাম নিতো, গল্প করতো। দু'একবার সঙ্গে ছোট মইনুও থাকতো। ওরা একবার জাপানিদের ক্যাম্পে গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছিলো। একজন জাপানি ছেলেকে নাম জিজ্ঞেস করাতে সে নাম বল্‌লো 'মকসুসু'। ভাইয়েরা ওটি বলার চেষ্টা করলো 'মকসুসু।' কিন্তু ছেলেটি শুদ্ধ করে দিয়ে খুব সুন্দর মৃদু গলায় প্রত্যেকবার বলে 'নো, নো, নো, নো, মকসুসু'। আইয়ুবরা কিছুতেই বুঝতে পারছিলোনা যে ওরা ভুলটা কী বলছে। সেবার মইনুও ছিল তাদের সঙ্গে। পরে বাসায় আইয়ুবরা এ কথা বার বার বলে যখন হাসাহাসি করতো—মইনুও তার শিশু বুলিতে বলতো 'নো নো নো নো মকসুসু'। সবাই যে ভাবে ওই শেষের 'সুসু'র উচ্চারণটিকে জাপানি উচ্চারণের মতো করার চেষ্টা করতো, মইনুও তাই করতো।

জাম্বুরীর ওই সপ্তাহটি যখন শেষ হয়ে এলো আমাদের মনটি ভীষণ খারাপ হতে থাকলো—ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত একটি ঘোরের মধ্যে কাটানোর অবসান হতে হবে বলে। আসলে এতদিন সাধারণ জীবনযাত্রার কথা ভুলেই গিয়েছিলাম। নিজের ক্যাম্প সামাল দেয়া, অতিথি স্কাউটদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা, দর্শকদের দেখানো, অন্য ক্যাম্পে ঘুরে আসা, হেড কোয়ার্টারে গিয়ে ইউনূস ভাইদের কোন কাজে লাগা, আর রাতে ক্যাম্প ফায়ারে আগুনের চারদিকে গোল হয়ে বসে আনন্দে আত্মহারা হওয়া—গান, নাচ, ইয়েল সব কিছুতে। এই ঘোরটি এমনই ছিলো যে যখন তাঁবুগুলো গুটিয়ে ফেলছিলাম সে সময় কিছু একটার জন্য আমাদের কয়েকজনকে জাম্বুরীর বাইরে যেতে হয়েছিল বেশ খানিকটা দূরে। বাহাদুর, বোরহান, শায়েস্তা আর আমি এটি যে জাম্বুরী মাঠ নয় বরং আগ্রাবাদ রোড—সদর রাস্তার মাঝখান, চারদিকে অচেনা পথচারী, সে কথা একেবারে ভুলে গিয়ে পরস্পরের বাহুতে বাহু ঢুকিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে সমস্বরে গান গেয়ে গেয়ে পথ চলছিলাম, আমাদের জাম্বুরী সংগীত—

'জাম্বো জাম্বো জাম্বুরী
এই আমাদের জাম্বুরী
আমাদের জাম্বুরী
জা-ম্বু-রী।
এলো হেথা দেশীয়
এলো হেথা এশীয়
এলো যে পরদেশীয়
করে গেল মনচুরি।'

জাম্বুরী সংগীতের দ্বিতীয় অংশটি ছিল উর্দুতে।

জাম্বুরী শেষ হয়ে গেলেও এর কিছু পাদটীকা ছিল। আমরা বাসায় ফিরে এসেও ইউনূস ভাই কিন্তু বাসায়ও ফিরলেন না, ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়েও ফিরে গেলেন না। পশ্চিম পাকিস্তানের স্কাউটদেরকে বিভিন্ন দলে ভাগ করে পূর্ব পাকিস্তান দেখানোর একটি পরিকল্পনা ছিল। কোন দলকে নিয়ে যাওয়া হলো রাঙ্গামাটি, কোন দলকে সিলেট, আর একটি দলকে সুন্দরবন। ইউনূস ভাই সহ কয়েক জনের উপর দায়িত্ব পড়েছিল সুন্দরবনের দলটির সঙ্গে থাকার। কয়েকটি লঞ্চে ওরা সুন্দরবনের ভেতরে নদীতে চলছিলো। লঞ্চ থেকে একটি পাঞ্জাবি ছেলে দুর্ঘটনাক্রমে নদীতে পড়ে গিয়েছিলো। সে সাঁতার জানতোনা, উদ্ধার করতে পারার আগেই নদীর কুমীর তাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো। ইউনূস ভাই অন্য লঞ্চে ছিলেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই এই ভয়াবহ ঘটনার কথা জানলেন। তাঁদেরকে বাকিদের শান্ত রাখা, সুন্দরবনের থানায় রিপোর্ট করা, সবাইকে জানানো ইত্যাদি অনেক বেদনাদায়ক কাজ করতে হলো। যখন জানতে পারলাম আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গেল, এত আনন্দের পর।

অন্য পাদটীকাটি কিন্তু বেশ মজার। জাম্বুরীতে একটি পাঞ্জাবি ছেলের সঙ্গে আমার বেশ ভাব হয়েছিল, তার নাম মোশতাক। ক্লাস সেভেনে পড়া এই ছেলেটির বাড়ি লাহোরের কাছে শেখুপুরা জেলার মুরিদকে নামের একটি ছোট শহরে। জাম্বুরী থেকে ফিরে যাওয়ার সময় খুব মন খারাপ করে সে ঠিকানা ইত্যাদি নিয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পরেই তার চিঠি পেলাম, উর্দুতে লেখা কারণ চিঠি লেখার মত ইংরেজি সে এখনো শেখেনি। আমাকে অবশ্য ইংরেজিতেই জবাব দিতে হলো। এভাবে অনেকবার চিঠি বিনিময় হলো—মোশতাক তার স্কুল, তার শহর, তার জীবন সম্পর্কে অনেক কিছু যে শুধু লেখে তাই নয়, তার লেখাপড়া সম্পর্কে আমার পরামর্শও নিতো, আমার বেশ ভক্ত হয়ে পড়লো সে। মজার ব্যাপার হলো চিঠি প্রায়ই খালি আসতোনা—টুকিটাকি নানা জিনিস সে চিঠির সঙ্গে পাঠাতো—মাঝে মাঝে আলাদা বড় প্যাকেটও পাঠাতো। যেমন ঈদের আগে সেমাই শুধু পাঠালোনা, পাছে আমরা এটি রাঁধতে না জানি এর রেসিপিও সঙ্গে দিয়েছিল। তার সব চাইতে সুন্দর উপহার ছিল মুরিদকের বিখ্যাত চিত্রিত কভারের ছুরি—ফলকাটা ইত্যাদি কাজের জন্য, খোলা যায় আবার গুটিয়ে রাখা

যায়। উপরে সুন্দর নানা রঙের চকমকে পাথরের কাজ করা কভার যার উপর আমার নাম খোদাই করা—বোঝাই যায় সে বিশেষ ভাবে অর্ডার দিয়ে তৈরি করিয়েছে। মোশতাক আমাদের বাসায় একটি পরিচিত চরিত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আমার ছোট ভাইয়েরাও তাকে নানা কথা লিখে পাঠাতো, আমরাও মাঝে মাঝে তাকে এটা সেটা উপহার পাঠাতাম। তার পরিবারের সবাইও আমাদের পরিচিত হয়ে উঠেছিল। বেশ কিছু দিন এভাবে চিঠি বিনিময়ের মাধ্যমে মোশতাক যদিও পরিবারের একজনের মতই হয়ে উঠেছিল, ওর সঙ্গে আমার আর কোন দিন দেখা হয়নি।

নতুন ঠাঁইয়ে প্রথম আবাদকারী

দশম শ্রেণীর ওই বছরটিতে (১৯৫৯) এপ্রিল মাসের দিকে আমাকে ঠাঁই বদল করতে হলো। ২০ বক্সীরহাট রোডের বাসা থেকে আমি চলে গেলাম আমাদের নতুন বাসা 'নিরিবিলিতে'। সেটি ইতোমধ্যে আংশিক সম্পূর্ণ হলেও তখনো নির্মানাধীন। এই নতুন বাসা নিয়ে আমাদের এত উৎসাহ ছিল যে আগে থেকেই বড়রা সহ আমরা এর নামকরণ নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্ক শুরু করেছিলাম। শেষ পর্যন্ত 'নিরিবিলি' নামটিই গৃহীত হয়েছিল। আব্বার নিজের দু'একটি প্রস্তাব তাঁর বন্ধুদের বাড়ির নামের অনুকরণে থাকলেও আমাদের মতটাতেই তিনি শেষ পর্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছিলেন। প্রথমে শুধু আমিই গেলাম। পরিবারের বাকি সবাই আপাতত বক্সীরহাটেই রয়ে গেল। আমার যাওয়ার কারণ ছিল প্রধানত একান্তে লেখাপড়া করার সুবিধার জন্য। কিন্তু এটি করতে গিয়ে আমাকে এক বিরান জায়গাকে আবাদ করতে হলো। আমাদের নতুন বাড়িটি তৈরি করা হয়েছিল একটি আবাসিক এলাকার জন্য পরিকল্পিত, কিন্তু এখনো বিরান, এমন একটি জায়গায়। এখন সেটি পাঁচলাইশ রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া বলে পরিচিত—চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের কাছেই অসংখ্য ভবনে ভর্তি অত্যন্ত সরগরম একটি এলাকা। সে সময় মেডিক্যাল কলেজটি সবে তার ভিত্তি নিয়েছে, পাহাড়ের পাদদেশে প্রথম দু'তিনটি ভবন গড়ে উঠেছে। এ ছাড়া এলাকাটি ছিল একেবারে শূন্য—প্রধানত দিনে মাছির ও রাতে মশার সম্পূর্ণ দখলে। এর কারণ জায়গাটি তখন ছিল একেবারে অগম্য এঁদো জমিতে ভর্তি। আবাসিক এলাকার ম্যাপে সুন্দর প্লটগুলো দেখেছিলাম যার মাঝে মাঝে প্রশস্ত রাস্তা। আমাদের বাসাটি একটি কোনার বাসা—সামনেই বড় একটি পার্ক। কিন্তু এ সব তখনো ছিল ভবিষ্যৎ, নেহাতেই স্বপ্ন। আপাতত ত্রিসীমানায় কিছু নেই। আমাকে এখান থেকে স্কুলে যেতে প্রধান সড়কে পৌঁছতে হতো যথেষ্ট কসরত করে একটি একটি কাঁচা রাস্তা দিয়ে।

আমাদের বাসার নিচের তলাটি তখন কোন রকমে বসবাসের যোগ্য হয়েছে, অন্তত এক ধরনের ক্যাম্পিং করার জন্য। তখনো রানিং পানি ছিলনা, না ব্যবহারযোগ্য ছিল অভ্যন্তরীণ টয়লেট। একটি নলকূপ ছিল যা নির্মাণ কাজের

জন্য ব্যবহৃত হতো—সেখান থেকেই পানি খেতে হতো। সেই পানি অবশ্য খুবই লৌহ সমৃদ্ধ—খাওয়া ও গোসলে ব্যবহার করলে দাঁত, চুল এসবেও লৌহ সমৃদ্ধি দেখা যেত। তাই দৈনন্দিন গোসলের ব্যবস্থা হলো একটু খানি হেঁটে গিয়ে একটি পুকুরে। স্থানীয় খুব অল্প কিছু মানুষ প্রায় গ্রামের আবহে থাকা পুকুরটি ব্যবহার করতো খেজুর গাছে তৈরি একটি ঘাটের সাহায্যে। তাই পুকুরটি বেশ সুন্দর ও পরিস্কার ছিল।

২০ বক্সীর হাটের অভ্যস্ত জমজমাট পরিবেশ ছেড়ে আমি যে চলে এলাম এমন এক প্রতিকূল আবহে সেখানে আমার সঙ্গী হয়েছিলেন তরুণ আবদুস সালাম, যিনি নির্মীয়মান বাড়ির কিছুটা তদারকি করেন, নিজের লেখাপড়াও করেন। আবদুস সালাম আমার ঘনিষ্ঠ মানুষ, আমার দাদা এবং পরে আব্বার একজন পুরোনো কর্মী বাছা মিয়ার ছেলে। বাছা মিয়া নিজেও এখানে থাকেন বাবুর্চি ও কেয়ারটেকার হিসেবে। লেখাপড়ার জন্য মোহমুক্ত হয়ে বানপ্রস্থ নেয়া ছাড়া আমাকে এখানে পাঠানোর আর একটি কারণ বোধ হয় ছিল পাইওনিয়ারের কাজ করা; কারণ কথা ছিল অল্প কিছু দিনের মধ্যে অন্যরাও এখানে চলে আসবে। আপাতত আমার পূর্ণ একাকীত্ব। বইপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে, পুরোনো টেস্ট পেপার নিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতির একটি পর্ব নিয়ে সময় কাটাচ্ছি। ভাল প্রস্তুতি নিয়ে কিছু রেওয়াজও ছিল। যেমন আমার প্রিয় বিষয় ইতিহাসের ক্ষেত্রে রেওয়াজ হলো বড় বড় ইতিহাসবিদের প্রাসঙ্গিক কোটেশন দিতে হবে (সবই ইংরেজিতে) যেমন স্ট্যানলি লেইন পুল, কিংবা আর সি মজুমদার, কিংবা অন্য কারো। কাজেই আমার ইতিহাস বই ছাড়াও এসব কোটেশন নির্বাচন করার জন্য ওই সব উদ্বৃতি দেয়া বিএ ক্লাসের মূল বই ঘাঁটতে হচ্ছে। একটি রেওয়াজ আমি নিজের জন্য নিজে করেছিলাম তা হলো ভূগোলে এবং ইতিহাসেও যেখানে সম্ভব এক টানে ম্যাপ এঁকে দেখানো, যা বোঝাতে চাচ্ছি তা। এরও অনুশীলন দরকার। কাজেই জানার জন্য বোঝার জন্য পড়া এক জিনিস, আবার ম্যাট্রিক পরীক্ষার খাতায় তা পরীক্ষক-পসন্দ্ করে সেটি তুলে ধরার কায়দা কানুন শেখাটি ভিন্ন ব্যাপার। এ ছাড়া অঙ্কের সব জবরদস্ত অনুশীলন তো রয়েছে। আমার ক্ষেত্রে একটি বিরল বৈশিষ্ট্য ছিল যে সহপাঠীদের অনেকের মত আমি এ সব ব্যাপারে শিক্ষকদের কাছে পড়তে গিয়ে আত্মসমর্পণ করিনি। সবই চলছিল আমার নিজস্ব পরিকল্পনায়, অনেক ক্ষেত্রে বেশ উদ্ভাবনশীল প্রক্রিয়ায়। নির্জনতার একটি ফল হতো রাতে এ সব করতে করতে চেয়ারের ওপরেই ঘুমিয়ে পড়তাম। অনেক দিন দেখতাম রাতে সালাম বাইরে জানালা দিয়ে ডাকাডাকি করছেন, ঠিক ভাবে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ার জন্য।

এভাবে পরীক্ষা নিয়ে আগাম ভাবনা-চিন্তার অন্যরকম একটি কারণও ছিল—সেটি অবশ্য বেশ খুশির খবর। ইতোমধ্যে আসন্ন দশম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে যোগ দেবার জন্য পাকিস্তানের স্কাউট দল গঠনের খবর পেয়ে আমি

একটি দরখাস্ত করেছিলাম। সেটি করেছিলাম পূর্ব পাকিস্তান স্কাউটস হেড-কোয়ার্টার্সের কাছে। স্কাউটিং এ আমার অভিজ্ঞতা, সক্ষমতা, স্কাউট শিক্ষকদের মতামত ইত্যাদি সব দিয়ে দরখাস্ত করতে হয়েছে—সঙ্গে স্কাউট পোষাকে একটি ছবি। এ নিয়ে পরে খুব বেশি ভাবিনি। কিন্তু ইউনূস ভাই ঢাকায় স্কাউট অফিস থেকে খোঁজ নিয়ে জানালেন আমি নির্বাচিত হয়েছি—খুশিতে আমার ঘুম ছুটে গেল। আরো অভাবনীয় ভাবে সিনিয়র স্কাউট হিসেবে ইউনূস ভাইও নির্বাচিত হয়েছেন; তিনি ঢাকা থেকে দরখাস্ত করেছিলেন। সব কিছু ঠিক ঠাক হলে কয়েক মাস পর জুলাইতে (১৯৫৯) আমাদেরকে রওয়ানা হতে হবে। জাম্বুরী হবে ফিলিপাইন্সের লস বানোসে। শুধু এটিই নয়, ঠিক হয়েছে এই একই স্কাউট দল এরপর জাপানে দ্বিতীয় নিপ্পন (জাপান) জাতীয় জাম্বুরীতেও যোগ দেবে অতিথি হিসেবে। কী সৌভাগ্য এভাবে জাপানও দেখা হবে, এবং সেই সঙ্গে দূর প্রাচ্যের আরো বেশ ক'টি দেশ।

খুশিতে আটখানা হয়ে প্রতিদিন খালি এসব নিয়েই ভাবছিলাম। এর মধ্যে পোষাকের মাপ পাঠানো হয়েছে, কাগজের উপর পা রেখে, তার চারদিকে পেন্সিল ঘুরিয়ে আঁকা উভয় পায়ের কিনারার নক্সাও পাঠানো হয়েছে জুতার জন্য—সবই সোজা করাচিতে। পোষাক আষাক সব কিছু ওখান থেকেই আসবে। আর ডাক-যোগে নানা রকম প্রস্তুতির নির্দেশাবলীও আসছিল করাচি থেকে। একটু হাসিও পেলো এই ভেবে যে পাকিস্তানের সব অঞ্চল থেকে আসা সবার যাত্রাটি আসলে শুরু হবে চট্টগ্রাম থেকে, তবুও এসব আনতে হচ্ছে সুদূর করাচি থেকে। এর মধ্যে একটু খানি শুধু 'কিন্তু' ছিল—ম্যাট্রিক পরীক্ষার বছরে পাক্কা দুটি মাসের মত সময়ে আমার জীবন থেকে লেখাপড়া উধাও হয়ে যাবে। আর এই সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে স্কুলের টেস্ট পরীক্ষা—যাকে কিনা মনে করা হয় পরীক্ষার একটি ড্রেস রিহার্সেল। স্কুলের শিক্ষকদের কাছে এই সংবাদ একটি মিশ্র বার্তা বহন করে আনলো। স্বাভাবতই আমি জাম্বুরীর জন্য নির্বাচিত হওয়াতে তাঁরা খুব খুশি। স্কুলের জন্যও এটি একটি বিরল সম্মান। অন্য দিকে এভাবে পরীক্ষার সাধনা থেকে এক রকম ইস্তাফা দিয়ে দেয়াটি আমার শুভাকাঙ্খী কোন কোন শিক্ষকের পছন্দ হলো না। আমার নিজের মধ্যে বা পরিবারের মধ্যে অবশ্য এ নিয়ে কখনো কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না।

এ বাড়িতে আমি বেশিদিন একাকী ছিলামনা। মাসখানেকের মধ্যে বড়দা আর ছোট তিন ভাই নিরিবিলিতে চলে এসেছিলো। মা রাজি নয় বলে আব্বা, মা, টুনু ও মইনু বক্সীর হাটে রয়ে গেলেন আরো বেশ কিছু দিন। বাড়িতে যে কারিগরদের কাজ চলছিল তাদের কাজ দেখেও কিছুটা সময় আমার কাটতো। ওই সময় দু'জন খুউব উচ্চমানের কারিগরের সংস্পর্শে যেতে পেরেছি। নেহাত কারিগর বল্লে ভুল হবে, মনে হয়েছে তাঁরা ছিলেন শিল্পী, হাতে শিল্পীর যাদুর ছোঁয়া নিয়ে তাঁরা নিজ প্রযুক্তির চর্চা করছিলেন। তার চেয়েও বেশি আমাদেরকে

মুগ্ধ করেছে তাঁদের ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। তাঁদের একজন হলেন আতর আলী মিস্ত্রি। তিনি কাঠের পালিশের মিস্ত্রি। তিনি আমার দাদার পরিচিত ছিলেন, আর আব্বা ছিলেন তাঁর খুব গুণমুগ্ধ। আব্বা বলতেন আতর আলী মিস্ত্রি হলেন শুধু চাটগাঁর সেরা নয়, বরং রেঙ্গুনের সেরা মিস্ত্রি। আমাদের চট্টগ্রামের কাঠের বনেদি গুণাগুণ, আর তার আসবাবের নির্মাণ সৌকর্য এবং পালিশ ফিনিশিং বার্মার কাজগুলোর তুলনায় যে একেবারে নস্যি—এমনটিই তখন মনে করা হতো। আর আতর আলী মিস্ত্রি তাঁর পালিশের হাতের জন্য রেঙ্গুন জয় করা মিস্ত্রি; সেখানেই তাঁর শেখা, সেখানেই কেটেছে তাঁর পেশায় স্বর্ণ যুগ। এখন তিনি অনেকটা অবসরে। বৃদ্ধ বয়স, কৃশ দেহ, সাদা চুল-দাড়ি; মাথায় সাদা কাপড়ের টুপি, গেঞ্জি গায়ে, তার উপর লুঙ্গি পরে বসে থাকতেন। তাঁর সাগরেদরা তাঁর তত্ত্বাবধানে স্পিরিট, গালা, রঙ ইত্যাদির নিখুঁত মিশ্রণটি তৈরি করতো। যাকে বলে ফাউণ্ডেশন পলিশ তা ওরাই দিতো—এক্ষেত্রে আমাদের কারুকার্যময় করে তৈরি বার্মা টিকের (বার্মিজ সেগুন কাঠ) দরজা, চৌকাঠ ইত্যাদির ওপর। ফাইনাল পলিশটা তিনিই টানতেন।

গম্ভীর প্রকৃতির স্বল্পভাষী মানুষ আতর আলী মিস্ত্রি। কিন্তু তবুও আমি তাঁর সঙ্গ পছন্দ করতাম হাতের তুলার মৃদু স্পর্শে তিনি কীভাবে কাঠের তলকে এত সুন্দর করে তুলতেন তা দেখতে। বিশেষ করে যেখানে তিনি আসলে কৃত্রিমভাবে ওই তলের উপর কিছু আরোপ করছেননা, বরং কাঠের যে স্বাভাবিক আঁশগুলো, একের ভেতর এক এর বৃত্ত-রেখাগুলো যা নিজেই কাঠকে এমন শৈল্পিক সুষমা দিয়েছে, সেটিকেই যেমন করে তিনি অনেক গুণে ফুটিয়ে তুলছেন। আমার অন্য আগ্রহ ছিল তাঁর কাছে রেঙ্গুনের কথা শোনা—সেখানে তাঁর জীবনের কথা। শৈশব থেকে অনেক মানুষের সংস্পর্শে এসেছি যাঁদের জীবনের অধিকাংশ কথা রেঙ্গুনের। তাঁর কথা থেকে যা বুঝলাম—আসলে তাঁর কাজের সমজদাররাই ছিল সব রেঙ্গুনে—সত্যিকারের বড় লোক, বড় মনের লোক, চট্টগ্রামে তাদের দেখা পাওয়া ভার। পরে বুঝেছি কেন তিনি এ কথা বলেছেন। রেঙ্গুনে আমাদের দেশের যে ধনী ব্যবসায়ীরা ছিলেন তাঁরা অত্যন্ত ধনী। বিশেষ করে ওখানকার বড় বড় নির্মাণ কাজের অধিকাংশ কনট্রাক্টররা ছিলেন চট্টগ্রামের—খুবই বিলাসী জীবন ওখানে তাদের। আর বার্মায় ধনীদের বড় বাড়ি বড় বৈভবের প্রকাশ কিন্তু ইট পাথরের চেয়েও বেশি ঘটতো কাঠের কাজের সৌকর্যে, ভবনের সামনে কাঠের কাজ, ভেতরে দেয়ালে পালিশ করা কাঠের আবরণ, আগাগোড়া মেঝে সুন্দর মসৃণ পালিশের কাজ। আর সেখানে কাঠের আসবাবগুলো তার সঙ্গেই মানানসই করে বনেদি। এমন পরিবেশে আতর আলী মিস্ত্রির কদর হবেনা তো কোথায় হবে?

অন্য যে কুশলীর সংস্পর্শে সে সময় এসেছিলাম তিনি হলেন মোজাইকের কারিগর নাসের মিস্ত্রি। বাসা বাড়িতে মোজাইক জিনিসটি সেই সময় এমন পরিচিত ছিলনা, নতুন কিছু ভবনেই শুধু এটি সদ্য দেখা যাচ্ছিল। ঘরের

মেঝেতে বা সামনের বারান্দার দর্শনীয় পিলার ইত্যাদিতে দৃষ্টিনন্দন ও মসৃণ কিছু করতে চাইলে তখন বড় জোর রঙিন বিশুদ্ধ সিমেন্ট ব্যবহার করা হতো—বিভিন্ন রঙের সিমেন্টে নানা প্যাটার্নও গড়া হতো। যেমন মেঝেতে সাদা কালো বরফি প্যাটার্ন বেশ জনপ্রিয় ছিল। আব্বা মোজাইকের কাজে মুগ্ধ হয়েছেন চট্টগ্রামের প্রথম আধুনিক আবাসিক এলাকা 'হাউজিং সোসাইটিতে' কিছু বাড়ি দেখে। তারই একটি আব্বাকে এত মুগ্ধ করেছিল যে তিনি চেষ্টা করেছেন নিরিবিলিকে সেই আদলে তৈরি করাতে। মোজাইকটিও এর অন্তর্ভুক্ত ছিল। আসল সূত্র থেকে তখনকার বিরল কুশলী মোজাইক মিস্ত্রিদের একজন এই নাসের মিস্ত্রিকেও এভাবেই আবিষ্কার করা গিয়েছিল। মাঝবয়সী এই মানুষটির ব্যক্তিত্ব কিন্তু আতর আলী মিস্ত্রির ঠিক বিপরীত। তিনি সারাক্ষণ কথা বলেন, আর কথা বলেন বিশুদ্ধ নদীয়া-শান্তিপুরি ভাষায়, শ্রুতিমধুর যে ভাষা চলতি বাংলার প্রমিত রূপ; রবীন্দ্র-সাহিত্যের কারণে সর্বত্র আদৃত রূপ। এটি তিনি ব্যবহার করেন রবীন্দ্র সাহিত্যের অনুরাগী হিসেবে নয়, বরং ওই নদীয়া অঞ্চলে তাঁর আদি বাড়ি বলে। আর গল্প করতেও তিনি খুব পছন্দ করেন, বিশেষ করে অতীতে কোন কোন রাজা-রাজড়ার প্রাসাদে তিনি মোজাইকের কাজ করেছেন সেই গল্প।

মনে করতাম তিনি হয়তো অতীতে নানা জমিদার বাড়িতে কাজ করছেন তাদেরকেই রাজা-রাজড়া বলছেন। তবে প্রায়ই বলতেন তিনি 'রুমের' বাদশার ওখানেও কাজ করেছেন। এই 'রুম' যে কোথায় তা কখনো খোলাসা করেননি। স্বাভাবিক ভাবে ধরে নিয়েছি বিখ্যাত সুফি সাধক জালালুদ্দীন রুমীর জন্ম স্থান যে রুম তার কথাই বলছেন। তুরস্কের অটোমান সামাজ্য প্রতিষ্ঠিত হবার আগে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্তমান তুরস্কের পূর্বাংশে তুর্কী-পারসিক এই রুম সুলতানাতের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল। এই উভয় সংস্কৃতির প্রভাবে ওখানে মধ্য-এশীয় এবং পারসিক স্থাপত্য বিকশিত হয়েছিল যাতে পাথরের কাজের প্রচুর উৎকর্ষ দেখা যায়—যা ইস্পাহান বা সমরখন্দের স্থাপত্যের সমতুল্য। এ নিয়ে তাঁকে বেশি প্রশ্ন করতামনা, কারণ পাছে তিনি মনে করেন যে তাঁর কথায় অবিশ্বাস করছি। এসব গল্প তিনি আমাদের একত্র সমাবেশেই বেশি করতেন। নাসের মিস্ত্রির গল্পে অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু তাঁর কাজে সস্তা বা মামুলি কিছু ছিলনা—অত্যন্ত কুশলী ও পারফেকশনিষ্ট মানুষ ছিলেন তিনি। অনেকে যাঁরা অদূর ভবিষ্যতে ভবন তৈরির কথা চিন্তা করতেন, তাঁরা তাঁর কাজ দেখতে আসতেন। মোজাইকের কাজের প্রত্যেকটি পর্ব তাঁর তত্ত্বাবধানে ও তাঁর নিজের হাতের ছোঁয়ায় হতো; যদিও তাঁর নিজস্ব তিন চারজন বেশ দক্ষ সহকারী ছিলো। মোজেকের প্রত্যেক রকম দানার পূর্ব ইতিহাস তাঁর জানা—কোন্‌টি ইতালি দেশের কোন্ অঞ্চল থেকে এসেছে সে কথা তিনি খুব গর্ব করে বলতেন। একমাত্র ইতালিতেই পাওয়া সম্ভব এমন সুন্দর দ্যোতনাময় পাথরকুচি।

দেশ-বিদেশের কথা বল্‌লেও তিনি কিন্তু খুব সাদাসিধে মানুষ ছিলেন—লুঙ্গির উপর একটি কুর্তা পরতেন। কঠিন কাজগুলো করার সময় কুর্তাটি খুলে ঝুলিয়ে রাখতেন, গায়ে শুধু গেঞ্জি থাকতো। সঠিক রঙের সিমেন্টের সঙ্গে মিশিয়ে তিনি মোজাইক মিক্সচার তৈরি করতেন অত্যন্ত সন্তর্পণে, তারপর সেগুলো মেঝেতে ঢালাই করতেন অথবা পিলার, রেলিং, দেয়ালের অংশ ইত্যাদির আস্তরের উপর লাগাতেন। ওভাবে দীর্ঘদিন রেখে সযত্নে 'কিউর' করার পরে যখন মোজাইক কাটা আরম্ভ হতো সেটি আর এক দেখার মত জিনিস। বিভিন্ন নম্বরের বিশেষ পাথর দিয়ে একের পর এক ঘষে চলতো মোজাইক কেটে মসৃণ করা—প্রথমে বেশি খসখসে পাথর, তারপর আরো মসৃণ, আরো মসৃণ—যতক্ষণ না মোজাইকটাই হয়ে পড়ে অতি মসৃণ, তেলতেলে সুন্দর একটি তল। সব শেষে মোম পালিশ; সে এক অনবদ্য ব্যাপার, এর স্পর্শে মোজাইক লাভ করতো তার চূড়ান্ত চকচকে রূপ। ঘষার পালিশের কাজগুলো অন্যরা করতো তাঁর তত্ত্বাবধানে। নাসের মিস্ত্রির সেই সৃষ্টি বহু দশক পর্যন্ত একটুও মলিন না হয়ে তার রূপ বজায় রেখেছে নিরিবিলিতে। এসব দেখা, তাঁর গল্প শোনা, এবং বিশেষ করে ওই রকম ভাষায় তা শোনা—এর সবই আমাদের জন্য ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয় ব্যাপার। সাধারণ কথা, সহকারীদেরকে নির্দেশ দেবার, এমন কি বকা দেবার কথাও, তাঁর ভাষার কারণে মোলায়েম ও মধুর হয়ে উঠতো। যেমন তিনি তাঁর সহকারীর কাছে থেকে মোজাইক মশলার একটি কড়াই চাইতে বলবেন—'ওগো মনোয়ার, কড়াইটি এদিকে দেবে গো'।

ছোটদের কাছে নাসের মিস্ত্রির আর একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কিছু দিন পর পরই তিনি বলতেন—"আজ একটু 'বালক সেবা' করা দরকার"। তাঁর এই 'বালক সেবা' ছিল বাসার ছোটদেরকে কিছু খেতে দেয়া; এমন কিছু নয়—কলা, বিস্কুট, কখনো মিষ্টি ইত্যাদি। সবাইকে ভাগ করে দিতেন, কলরব করে সবাই যে খেতো, এটিই তাঁর খুব ভাল লাগতো; এভাবেই তিনি বালকদের 'সেবা' করতেন। তিনি বলতেন ছোটরা হলো আল্লাহর দূত, ওদেরকে সব সময় প্রফুল্ল রাখা সওয়াবের কাজ। আমার মজা লাগতো ওই 'বালক সেবা' শব্দটি। হয়তো হিন্দুস্তানি ভাবধারার প্রভাবেই তিনি শব্দটি পেয়েছিলেন। এক সময় নাসের মিস্ত্রি বল্‌লেন এমনি মোজাইক করে চলবেনা, এখানে টালি বসাতে হবে। টালি জিনিসটির সঙ্গে তখন পরিচয় ছিলনা, তাঁর কাছেই শিখলাম। তিনি বোঝালেন ঢালাই করলে সব রকম ডিজাইন করা যায়না; অন্যদিকে নানা টালির মিশ্রণে, এমনকি একই টালিতে নানা ডিজাইনের অংশ রেখে তা করা যায়। তা ছাড়া টালিতে একটি নষ্ট হলে ওটা তুলে ফেলা যায়। নিরিবিলিতে ইতোমধ্যে একটি সংযুক্ত দোতালা ঘর করা হয়েছিলো—নিচের তলা গ্যারেজ, উপরের তলায় ড্রাইভার ও অন্যদের থাকার ঘর। ওই গ্যারেজেই বসানো হলো টালি বানাবার কল—অর্থাৎ একটি বল-প্রেস মেশিন। সুন্দর ডিজাইন অনুযায়ী একটি টালির

চাঁছের মধ্যে নানা খোপে নানা মোজাইক মশলা দেয়া হয়, তারপর হাতে বড় স্ক্রুর উপর ঘুরিয়ে ভারি লোহার বলের চাপ দেয়া হতো তার উপর, যার ফলে এটি আঁট-সাট টালিতে পরিণত হতো, ছাঁচ থেকে খুলে নিলেও আর ভাঙতোনা। পরে চৌবাচ্চায় ভিজিয়ে রাখলে এই টালি জোড় নিয়ে প্রায় ইটের মতই শক্ত হয়ে যেতো, ও তারপর যথাস্থানে বসানো যেত। এই মোজাইক টালি তৈরি ও বসানোর কাজে কুশলতার জন্যও নাসের মিস্ত্রির নাম ছড়িয়ে পড়েছিল।

এর মধ্যে আমাদের বিশ্ব জাম্বুরীতে রওয়ানা হবার সময়ও এসে গেল। পুরো পাকিস্তান স্কাউট দলটিই এজন্য চট্টগ্রাম চলে এসেছে, কারণ এখান থেকেই বিশ্ব জাম্বুরীর উদ্দেশ্যে দল রওয়ানা হবে। পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গা থেকে মোট এগার জন সদস্য। ইউনূস ভাই চলে এসেছেন ঢাকা থেকে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে মোট নির্বাচিত হয়েছিল তিন জন, কিন্তু এর মধ্যে স্কাউটার সদরুদ্দীন শেষ পর্যন্ত যেতে পারছেন না বলে আমরা দু'জনেই রয়ে গেলাম। দলের নেতা খান তারিক ইসমাইল খান বেশ ডাকসাইটে একজন অফিসার, এক সময় লাহোরের ডিভিশন্যাল কমিশনার ছিলেন, তবে একজন নিবেদিত স্কাউট কর্মকর্তাও বটেন। আমার কাছাকাছি বয়সের রয়েছে আরো তিন জন—একজন করাচি, একজন লাহোর এবং একজন মন্টোগোমারি (বর্তমান নাম শাহীওয়াল) থেকে এসেছে। বাকিরা বিভিন্ন বয়সের স্কাউটার অর্থাৎ স্কাউট মাস্টার অথবা রোভার স্কাউট। তাঁদের দু'জন এসেছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের নর্থ ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে থেকে—যার একটি স্কাউটিং ঐতিহ্য রয়েছে। যাত্রার আগে তাঁদের সবার সঙ্গে দেখা হলো, তবে এত অল্প সময়ে ঠিক পরিচিত হয়ে উঠা হলোনা। সে কাজ বাকি রইলো যাত্রার পরের সময়ের জন্য। চট্টগ্রামে কলেজিয়েট স্কুলের হোস্টেলেই ছিলেন দলের অধিকাংশ সদস্য। আমাদের মখলেস স্যার সার্বক্ষণিক ভাবে তাঁদের দেখাশোনা করছিলেন। দেখলাম ইতোমধ্যেই তিনি তাঁদের কাছে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছেন। পুরো দল একত্র হয়ে কিছু গানের অনুশীলন করলাম যেন এক সঙ্গে জাম্বুরীতে গাইতে পারি।

এছাড়া এমনি আর কিছু প্রস্তুতির উদ্যোগ ইউনূস ভাই নিজে নিয়েছিলেন তা হলো নানা রকম বাংলা গানের উপর ভিত্তি করে একটি গীতি-নক্সা তৈরি করে টেইপ রেকর্ডারের রেকর্ড করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এজন্য তাঁর বন্ধু গায়কদের ও কৃষ্টি কেন্দ্রের কিছু গায়কদের সম্মিলনে দেশাত্মবোধক গান, পল্লীগীতি, লোকগীতিগুলোকে পূর্ব বাংলার প্রকৃতি, মানুষ, জীবন-সংগ্রাম নিয়ে ইংরেজিতে কথকতার ফাঁকে ফাঁকে রেখে এই গীতিনক্সাটি রেকর্ড করা হয়েছিলো। ওই কথকতায় কণ্ঠ দিয়েছিলেন ইউনূস ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধু কায়সার ভাই (আতাউর রহমান খান কায়সার, পরে আওয়ামী লীগের নেতা, রাষ্ট্রদূত ও প্রেসিডিয়াম সদস্য)। এই গীতিনক্সাটি করার উদ্দেশ্য ছিল আমরা যে সব পাকিস্তান দূতাবাসে যাব সেখানে এই টেইপের কপি দেয়া, দূতাবাসে ব্যবহৃত হবে এই আশায়।

বিশেষ করে দুটি দূতাবাস আমাদের লক্ষ্যে ছিল। জাপানে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন মোহাম্মদ আলী বগুড়া—যিনি কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। বগুড়ার নবাব বাড়ির মানুষ হিসেবে তিনি বাঙালিত্ব দাবি করেন, যদিও তিনি বাংলাভাষী ছিলেননা। আর ফিলিপাইনে রাষ্ট্রদূত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় তথ্যমন্ত্রী পীর আলী মোহাম্মদ রাশেদী। তিনি নিজে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধুর রাজনীতিবিদ ছিলেন, কিন্তু তাঁর স্ত্রী ছিলেন বয়সে তরুণী বাঙালি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ পরিচিত প্রাক্তন ছাত্রী মমতাজ লিলি খান। আমাদের দলনেতাও একটি টেইপ রেকর্ডিং সঙ্গে করে এনেছিলেন সেটি হলো জাম্বুরী উপলক্ষে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের একটি রেকর্ডকৃত বাণী—ইংরেজি ও উর্দুতে। এর একটি বাংলা অনুবাদ করা হলো এবং তাও টেইপে রেকর্ড করা হলো, চট্টগ্রামে এসে। খুব সম্ভব এই রেকর্ডিঙেরও উদ্দেশ্য ছিল দূতাবাসগুলোতে দেয়া।

আমাদের তখনো নির্মানাধীন 'নিরিবিলিতে' আমরা একটি স্মরণীয় অনুষ্ঠান করলাম। বিশ্ব জাম্বুরীতে যোগদানকারী পাকিস্তান স্কাউট দলটিকে এখানে দাওয়াত করলাম। দলনেতা খান তারেক ইসমাইল খান সবাইকে নিয়ে এলেন; সবার পরণে পূর্ণ জাতীয় স্কাউট পোষাক, ইউনূস ভাই এবং আমারও। এই উপলক্ষে আব্বা আমাদের দু'জনের সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদেরকেও দাওয়াত করলেন; কাজী সাহেব, মখলেস সাহেব, এঁরাতো এলেনই, চট্টগ্রাম স্কাউটসের বিশিষ্ট কর্মকর্তারাও যোগ দিলেন। আমাদের সব ভাই বোনেরা যোগ দিল এই আসরে। সবার ছোট মইনু এখন চার বছরের শিশু, সেও যোগ দিল সেজেগুজে। আমাদের সবার জন্য সেটি ছিল খুবই মজার ও খুশির একটি অনুষ্ঠান। বেশ রাত পর্যন্ত গল্প হলো। আমাদের এই শিক্ষকদের যাদেরকে আব্বা খুব শ্রদ্ধা করতেন, এই উপলক্ষে তাঁদের সঙ্গে মন খুলে গল্প করতে পারলেন তিনি, দলের সব স্কাউটদের সঙ্গেও অনেক কথা বল্‌লেন। বিশেষ করে দলনেতা খান তারেক ইসমাইল খান আব্বাকে খুব মুগ্ধ করলেন। তাঁর দুই ছেলে এই দলে স্থান পেয়েছে—এটি ছিল আব্বার জন্য খুব খুশির দিন।

প্রাচী

রঙ্গুম রঙিলা

এই অধ্যায়ের নামটি ধার করেছি বুলবুল চৌধুরীর লেখা 'প্রাচী' উপন্যাসটি থেকে। ত্রিশ থেকে পঞ্চাশের দশকে দেশব্যাপী অনেক খ্যাতি লাভ করে যৌবনে প্রয়াত নৃত্যশিল্পী বুলবুল চৌধুরী ('বুলবুল ললিত কলা একাডেমি' যাঁর নামে) এই একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর জন্ম চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার চুনতি গ্রামে; এই অঞ্চলের অসংখ্য মানুষ ১৯৪২-৪৩ সালে জাপানি বোমাবর্ষণ ও দখলদারিত্বের সময় কী ভাবে বার্মা থেকে পালিয়ে হেঁটে জীবন বাজি রেখে দেশে ফিরেছিল সেই মর্মান্তিক কাহিনীর পটভূমিতে এই উপন্যাস, যা স্কুলজীবনেই পড়েছিলাম। বিশ্ব-জাম্বুরী উপলক্ষে আমাদের যাত্রারও প্রথম ধাপ বার্মায়, কিন্তু সেটি বিপরীত অভিমুখে এবং তা দুঃখের যাত্রা নয়, অত্যন্ত আনন্দের। বাল্যকালের এই প্রাচ্য-ভ্রমণ আমার স্মৃতিতে সব সময়ের জন্য জ্বলজ্বল করে থাকা একটি অভিজ্ঞতা।

চট্টগ্রাম থেকে রেঙ্গুন—পিআইএ'র ডাকোটা বিমান ফ্লাইটটি ছিল আমার জীবনের প্রথম বিমান ভ্রমণ; বিমান সম্পর্কে এতদিনকার সব বাইরে থেকে জানা কথা এখন একটু মিলিয়ে নেবার সুযোগ পেলাম। ডাকোটা বিমানটি বেশ ছোটখাট—দাঁড়িয়ে থাকার সময় এর সামনের দিকটি কেমন উপরের দিকে নাক উঁচু করে থাকে, যা পরে অন্য বিমানে দেখিনি। বিমানের মধ্যেই দলে আমার সমবয়সী স্কাউট তিন জনের ভাব-সাবের একটি পরিচয় পেলাম। ওরা তরুণ বাঙালি ফ্লাইট স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে কিছু একটি চাওয়ার জন্য তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল আঙ্গুলের তুড়ি বাজিয়ে। এটি স্টুয়ার্ডের মোটেই পছন্দ হয়নি। তিনি সুন্দর ইংরেজিতে ওদেরকে বেশ কিছু উপদেশ দিয়ে দিলেন—দেশের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য যেখানে যাচ্ছে সেখানে যেন এই ধরনের আচরণ না করে। এরা বকাটি হজম করে গেল কথা না বাড়িয়ে। বুঝছিলাম এই তিন জনের সঙ্গেই আমাকে ঘনিষ্ঠভাবে আগামী দিনগুলো পাড়ি দিতে হবে—কাজেই তাদের আচার

আচরণ খেয়াল করতে হচ্ছে বৈকি। তাদের মধ্যে বয়সে একটু ছোট তানভীর ছিল বেশ সপ্রতিভ, করাচি থেকে এসেছে, বিমান বাহিনীর এক উইং কমাণ্ডারের ছেলে। বাকি দু'জন অতটা চালাক চতুর নয়, দু'জনের নামই এনাম, তাই একজনকে আমরা ডাকতে শুরু করেছিলাম মোটা এনাম (সে বেশ কিছুটা মোটা ছিল বলে)—সংক্ষেপে 'মোটে'। ওরা সবাই পাঞ্জাবিভাষী—করাচি থেকে এলেও তানভীরও তাই। ক্রমেই টের পাচ্ছিলাম এদের সঙ্গে দিন কাটাতে হলে তাদের পাঞ্জাবি কথাগুলোই আমাকে বুঝতে হবে; সেটি অবশ্য খুব কঠিন হলোনা।

রেঙ্গুন বিমান বন্দরে পৌঁছেই অদ্ভুত একটি অনুভূতি হলো আমার। জীবনে প্রথম বিদেশের মাটিতে পা রাখছি। আর এই বিদেশ যে কোন বিদেশ নয়, যেই রঙ্গুমের (রেঙ্গুনের চাটগেঁয়ে নাম) কথা শিশুকাল থেকে অজস্রবার শুনে আসছি সেই রঙ্গুম, সেই বর্মা। আমার দাদার ভাই জুনু মিয়া সওদাগরের স্ত্রী বর্মি দাদী, তাঁর বর্মি মা অর্থাৎ দাদার শাশুড়ী, এঁরা আমার একান্ত আপন জন। আমাদের গুরুজনদের মধ্যে বার্মার গল্প নেই এমন বোধ হয় কেউই ছিলেননা। বার্মার সব গল্প ছাপিয়ে যে চিত্রটি শিশু কাল থেকে মনে আঁকা ছিল সেটি হলো 'রঙ্গুম রঙিলা'—অর্থাৎ চমৎকারিত্বে ঝলমলে রঙিন এই রেঙ্গুন। রেঙ্গুনের প্রসঙ্গ উঠলেই শোনা যেত এই রঙ্গুম রঙিলার কথা। এর আকর্ষণ দুর্বার, এতটাই টান যে ছোট্ট মেয়েটি পর্যন্ত এর মায়াডোরে সাড়া না দিয়ে পারে না, সমস্ত কিছু পেছনে ফেলে ছুটে যায় সেখানে—যেটি লক্ষ্য করি চাটগাঁয় বহুল প্রচলিত ছড়াতে :

'ইক্কিনি মনার গুরগুরি ঠ্যাং
ক্যানে সেই মনা রঙ্গুম গ্যাল্
হাতর খাড়ু ফেলাই গ্যাল্
মা বাফরে খাঁদাই গ্যাল্'

একটুকু ময়নার ছোট ছোট পা, কেমন করে সেই ময়না রেঙ্গুনে গেল। হাতের চুড়ি ফেলে গেল, মা-বাপকে কাঁদিয়ে গেল।

আসলে অনেক মানুষ রেঙ্গুনে যেত নিজেদের ভাগ্যান্বেষণে। অনেকে ভাল ব্যবসা বাণিজ্য করতো সেখানে—তারা আবার অনেককে চাকরি দিতে পারতো। ছোটখাট দোকান থেকে শুরু করে ছোট বড় ম্যানেজারগিরি, ঠিকাদারি, বড় ব্যবসা—এর সব ক্ষেত্রেই বাঙালিদের বিশেষ করে চট্টগ্রামের মানুষদের জোরালো উপস্থিতি ছিল সে সময়। চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে যুদ্ধের কারণে তাতে কিছুটা ভাটা পড়লেও, তার বেশ কিছুটা পরে পুনরুদ্ধার হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে আমরা যখন গিয়েছি, স্বাধীন বার্মাতেও তার রেশ তখনো সেখানে ছিল। বার্মার জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতা ইত্যাদির ফলে নীতি পরিবর্তন হলেও বাস্তব কারণে আমাদের দেশের মানুষের কিছু কিছু ক্ষেত্রে অগ্রগণ্যতা তখনো কিছুটা ছিল। এটি একেবারে শেষ হয়ে গিয়েছিল আরো কিছু পরে ষাটের দশকে নে উইনের সামরিক শাসন প্রবর্তিত হবার পর।

আমরা ফিলিপাইনে জাম্বুরীতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে রেঙ্গুনে সেবার বেশ কয়েকটি দিন কাটিয়েছিলাম। এ সময় আমরা আতিথ্য গ্রহণ করেছিলাম সামরিক বাহিনী এবং আগাখানী সম্প্রদায়ের স্কাউট সংগঠনের কাছে। সামরিক বাহিনীর ওপর এ দায়িত্ব থাকার একটি কারণ ছিল। ১৯৫৮ থেকে ১৯৬০ এই দুই বছর সামরিক বাহিনীর প্রধান নে উইনকে একটি কেয়ারটেকার সরকার চালাবার দায়িত্ব দিয়েছিলেন এর আগের দীর্ঘকালীন প্রধানমন্ত্রী উ নু। ১৯৪৮ এ স্বাধীনতার পর থেকে অধিকাংশ সময় উ নুই গণতান্ত্রিক ভাবে দেশ চালাচ্ছিলেন—সেই উ নু যার নামে মিউনিসিপ্যাল স্কুলে গরম মাস্টার আমাকে ডাকতেন। ওই সময়টি অবশ্য নানা অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিদ্রোহ ও গৃহযুদ্ধে আকীর্ণ ছিল দেশটি। কিন্তু ১৯৫৮ তে এসে উ নু'র দল কম্যুনিস্টপন্থী ও কম্যুনিস্ট বিরোধী এই দুই ভাগে এমন ভয়াবহ ভাবে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল যে তাঁর পক্ষে সরকার চালানো বা নতুন নির্বাচন দেয়া কঠিন হয়ে পড়েছিল। তাই তিনি জেনারেল নে উইনকে কিছুদিনের জন্য একটি কেয়ার টেকার সরকার গঠন করে নির্বাচনের আয়োজন করার আহ্বান জানিয়ে সরে গিয়েছিলেন। ১৯৬০ সালে ওই সরকার নির্বাচনের ব্যবস্থা করলে উ নু আবার বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি কম্যুনিস্টপন্থীদের আগেই দল থেকে বের করে দিয়েছিলেন। আমরা ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে যখন রেঙ্গুনে যাই তখন জেনারেল নে উইনের কেয়ার টেকার সরকার চলছিল—এবং ওই কারণেই সামরিক বাহিনী আমাদেরকে দেখাশোনা করছিলো। আর আগা খান স্কাউটসরা আমাদেরকে সঙ্গ দিচ্ছিল, নানা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছিল, তার কারণ খুব সম্ভব পাকিস্তানে আগাখান সম্প্রদায়ের একটি বড় অবস্থান রয়েছে। ইউনূস ভাই এবং আমার জন্য অবশ্য তৃতীয় আর একটি আতিথ্য অপেক্ষা করছিল। আব্বার বন্ধুস্থানীয় আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয় এজাহার সাহেব রেঙ্গুনের প্রতিষ্ঠিত কনট্রাক্টর। তাঁর বাসায় গিয়ে এবং দু'একদিন থেকে রেঙ্গুনের অন্য চিত্রটাও পেয়েছি—আমাদের দেশীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা সে চিত্র।

রেঙ্গুন এয়ার পোর্টের কাছে একটি সামরিক স্থাপনায় আমাদেরকে থাকতে দেয়া হয়েছিল। সেখানে দুপুরের খাবারের সঙ্গে দেয়া একটি সংবর্ধনায় আমাদের প্রধান অভ্যর্থনাকারী কর্নেল টুন একটি দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে কথা প্রসঙ্গে বার্মার সাম্প্রতিক অভ্যন্তরীণ সশস্ত্র বিদ্রোহের একটি চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরলেন। তিনি খুব নাটকীয় ভাবে বলছিলেন—'এই যে তোমরা যেখানটিতে থাকছো, এই জায়গাটিও একটি সময় বিদ্রোহীদের হাতে চলে গিয়েছিল'। রাজধানীর মধ্যেই এয়ারপোর্টের কাছে এই জায়গাগুলোতে রেঙ্গুন সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিলনা বেশ কিছুদিন। এই ঘটনাগুলো ঘাটছিল ১৯৪৯-৫০ এর দিকে। কিন্তু ওই ভাবে পুরা দস্তুর গৃহযুদ্ধের আকারে না হলেও সংঘাতগুলো বজায় ছিল এই কেয়ারটেকার সরকার আসার আগে অবধি। কর্নেল টুন এগুলোই তুলে ধরছিলেন।

ঐ সংঘাতে মোটের উপর তিনটি পক্ষ ছিল—সরকার, সশস্ত্র কম্যুনিস্ট বিপ্লবীরা, এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতিসত্তাগুলোর সশস্ত্র বাহিনীগুলো (কারেন, শান, মন ইত্যাদি, যার মধ্যে রোহিঙ্গা মুজাহিদীনও ছিল)। ওই সশস্ত্র জাতি-সত্তাগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রবল ছিল কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন। এদের সব পক্ষের উপস্থিতি ছিল বার্মা সামরিক বাহিনীর মধ্যেই, যে কারণে সংঘাতটি গৃহযুদ্ধের রূপ নিয়েছিল। এই কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়নপন্থী সামরিক গোষ্ঠীগুলোই রেঙ্গুন শহরের একটি অংশকে দখল করে নিয়েছিল। আমাদের এই ভ্রমণের মাত্র কয়েক বছর পরেই বার্মায় উ নু সরকারকে উৎখাত করে শেষ পর্যন্ত নে উইনের নেতৃত্বে স্থায়ী ভাবে সামরিক শাসন জেঁকে বসেছিল, যা এখনো পরোক্ষভাবে চলছে। ওই সংঘাতগুলোই তার পেছনে একটি অজুহাত হিসেবে কাজ করেছে। একটি ব্যাপার শুনে খুব মজা পেলাম। জাপানিরা যখন বৃটিশদের হারিয়ে বার্মা দখল করেছিল তখন আউঙ সানের নেতৃত্বে গঠিত বার্মা জাতীয় বাহিনী জাপানিদেরকে সমর্থন সহায়তা করেছিল। সে সময় জাপানিরা ওই গেরিলা বাহিনীর ৩০ জন তরুণ সদস্যকে উন্নত মানের সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিল—যাদের মধ্যে ছিলেন আউঙ সান এবং নে উইন। শুধু তাই নয় পরের গৃহযুদ্ধে বিভিন্ন পক্ষের অন্তত ৭-৮ জন ছিলেন ওই 'ত্রিশ তরুণের' অন্তর্ভুক্ত—সরকার পক্ষে, কম্যুনিস্ট পক্ষে, এবং কারেন ন্যাশনাল ইউনিয়নের পক্ষেও। বার্মার পরের ইতিহাসের অনেকটাই পরিচালিত করেছেন ওই 'ত্রিশ তরুণের' নানা জন।

এজাহার সাহেব এসে ইউনূস ভাই ও আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর বাসায়। সে এক অদ্ভুত সুন্দর বাসা; বিশেষ করে কাঠের সুন্দর ব্যবহারে চমৎকৃত হলাম—দেয়াল, মেঝে, ছাদ সবই সুন্দর কাঠের প্যানেলে ঢাকা। এটিই নাকি বার্মার ঐতিহ্যবাহী রীতি। এজাহার সাহেবের সামাজিক মেলামেশা রেঙ্গুনের চাটগেঁয়ে অভিজাতদের সঙ্গে। এক এক বেলা নানা মোগলাই আর সুলতানী খাবার খাওয়াতে তিনি যে সব জায়গায় নিয়ে গেলেন তার সঙ্গে মূল বার্মার কোন সম্পর্ক নেই। মনে হলো বার্মিজ খাবারকে তাঁরা খাবার বলেই গ্রাহ্য করেন না। এজাহার সাহেবের ঠিকাদারিতে রেঙ্গুনের নানা জায়গায় বিভিন্ন নির্মাণ কাজ চলছিল। তিনি তারই একটিতে আমাদেরকে নিয়ে গেলেন দেখাবার জন্য। দেখলাম সকল শ্রমিক সেখানে বর্মি—খুবই দরিদ্র, গোবেচারা চেহারার মনে হলো তাদেরকে। কাজের তদারকিতে যে কয়েকজন আছে তারা সবাই চাটগেঁয়ে—এজাহার সাহেবের নিজস্ব মানুষ। বর্মি ভাষাতেই ডাক চিৎকার করে তাঁরা শ্রমিকদেরকে তাড়া দিচ্ছিলেন। আমাদেরকে দেখতে পেয়ে খুব আনন্দিত হয়ে এসে আলাপ করলেন। বল্‌লেন 'বর্মিরা খুবই অলস প্রকৃতির, সারাক্ষণ গালাগালি না করলে কাজ করতে চায়না'। গুটি কতক অভিবাসী মানুষের দিক থেকে এরকম একটি জাতিগত বা বর্ণগত বৈষম্য চালাবার ব্যাপারটি যে স্বাধীন

বার্মায় আর বেশিদিন চলতে পারেনা তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। আবার অন্য একটি রেঙ্গুন দেখলাম এই শহরের '৫৫তম ষ্ট্রিট' নামে পরিচিত অঞ্চলে। এখানে অসংখ্য দরজির দোকান—কোনটি আহামরি কিসিমের নয়। প্রায় সবগুলোর মালিক এবং দরজি কারিগররা চট্টগ্রামের ও নোয়াখালীর। এই পর্যায়ের কারিগর, ব্যবসায়ীরাও একালের রেঙ্গুনেও দিব্যি ভাল করছেন দেখতে পেলাম।

রেঙ্গুন শহরের একটি বিরাট বাজার আউঙ সান মার্কেট—স্বাধীনতা সংগ্রামের নায়কের নামে, আততায়ীর গুলিতে নিহত না হলে স্বাধীনতা পরবর্তী নেতৃত্ব যার হাতেই থাকতো বলে ধারণা করা হয়। বিশাল সনাতন মার্কেট। এত বড় জায়গা থেকে খুব ছোট একটি জিনিস খুব কদর দিয়ে কিনলাম। আজ আমরা যে স্পঞ্জের স্যান্ডেল অহরহ ব্যবহার করছি—ঠিক সেই দুই ফিতার স্যান্ডেল, তবে স্পঞ্জের নয় সুন্দর চামড়ার। এই প্রথম এরকম স্যান্ডেল দেখলাম। আসলে এটি সারা বার্মার জাতীয় পাদুকা; যেমন তাদের সবারই অন্য একটি পরিধেয় হলো লুঙ্গি—স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে (যদিও উভয়ে একটু ভিন্ন ধরনের)। এর উপর পুরুষদের থাকে কলার ছাড়া বেঁটে শার্ট আর মেয়েদের ব্লাউজ। চট্টগ্রামের সে সময় আমাদের গ্রামে অনেক পুরুষ বার্মিজদের মতো লুঙ্গি পরতো, শার্ট লুঙ্গির মধ্যে গুঁজে দিয়ে। আর মহিলারা লুঙ্গির মত কিন্তু ফুলেল কাপড় 'থামি' পরতো এবং গায়ে ফুলহাতা ব্লাউজ। অবশ্য তারা বাড়তি একটি ওড়নার মত কাপড়ও গায়ের উপর প্যাঁচিয়ে নিতো—যাকে বলা হতো 'গ'র খ'র' অর্থাৎ গায়ের কাপড়। চট্টগ্রামের 'গুলবাহার' ব্র্যান্ডের থামি তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল; এটি জাপান থেকে আসতো।

আগাখান স্কাউট দলের সঙ্গে রেঙ্গুন থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণের শহর পেগু গেলাম। রেঙ্গুনের শহরতলী ও গ্রামাঞ্চল পেরিয়ে এই প্রাচীন শহরটিতে বার্মাকে কিছুটা তার সনাতন ঐতিহ্যে খুঁজে পেলাম। শান্ত ছোট মফস্বল শহর, যদিও এক কালে স্থানীয় 'মন' রাজাদের রাজধানী ছিল, বন্দর হিসেবে পরে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের কাছেও কদর পেয়েছে। এখানে দেখতে পেলাম দুনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বুদ্ধ মূর্তি—'শ্বেতালিআউং বুদ্ধ'। এটি শায়িত বুদ্ধ মূর্তি—প্রায় দু'শ ফুট লম্বা আর সে রকমই উঁচু। ইতোমধ্যেই বুঝে ফেলেছিলাম বৌদ্ধ ধর্মের স্থান বার্মায় কতখানি, এখানকার সংস্কৃতিতে বৌদ্ধ ধর্ম ওতোপ্রোতোভাবে মিশে আছে। তাই সর্বত্র প্যাগোডা, কেয়াং, মন্দিরের প্রাচুর্য রয়েছে, আর সেই সঙ্গে দৃশ্যমান হয় নানা বয়সের শ্রমণ—মুণ্ডিত মস্তক ও একটি পিঙ্গল বস্ত্র পরিহিত। ইতোমধ্যে রেঙ্গুনে দেখেছি নগরীর সনাতন প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে তার স্বর্ণ-পাতে মোড়ানো বিশাল শোয়েডাগন প্যাগোডা। মূল প্যাগোডার চারদিকে বহু দূর ছড়ানো সোপান, শাখা-প্রশাখা, বাজার, ভক্ত শ্রমণ সবকিছু মিলে ব্রহ্মদেশের নাড়ীটি বোঝা যায় সেখানে গেলে। আমাদেরকে যাঁরা আতিথ্য দিচ্ছিলেন আগাখানী মুসলিম সম্প্রদায়ের এই সদস্যরাও বৌদ্ধ ধর্মীয় আচার আচরণ সম্পর্কে যথেষ্ট খবর রাখেন দেখলাম। তাছাড়া তাঁরা নানা ভাবে নিজেদের বর্মি রূপটি তুলে ধরতে খুব উৎসাহী যেমন

তাঁদের মুসলিম নাম ছাড়াও একটি বার্মিজ নাম রয়েছে, এবং সেই নামেই তাঁরা পরিচিত হতে ভালবাসেন।

পেগুতে ঘোরাফেরার পর এখানকার একটি সাধারণ চায়ের দোকানে বসে চা খেলাম, গল্প করলাম। চায়ের সঙ্গে সমুচা ইত্যাদি যেমন এলো, এলো কিছু বার্মিজ আচার, সালাদ ইত্যাদি। দু'টি জিনিস নাকি বিশেষ ভাবে যে কোন ধরনের বর্মি খাবারের সঙ্গে যুক্ত। এই চায়ের দোকানেও দেখলাম তা পরিবেশিত হচ্ছে। একটি হলো 'নাপ্পি'—এর সম্পর্কে দেশেই নানা গল্প শুনেছি। এটি হলো মাছকে অনেকটা সিদোল শুটকির মতো গাঁজিয়ে তার প্যাস্ট তৈরি করা। এই নাপ্পি—স্যুপ, চাটনি, রান্না খাবারের উপাদান ইত্যাদিতে নানা ভাবে ব্যবহার করা হয়। অন্য সাধারণ খাবারটি হলো 'লাফেট' যা কিনা জারানো চা পাতা। এটি সাধারণত সালাদের সঙ্গে খাওয়া হয়। এখন মনে হলো আমরা যে বক্সীর হাটের বাসায় চা পাতার ভর্তা খাচ্ছিলাম তা হয়তো এই বর্মি সনাতন রসনা ঐতিহ্য থেকে ধার করা।

ওখানে কয়েকটি দিন কাটাবার সময় ভেবেছি রেঙ্গুনকে রঙিলা বলার, বা তাকে নিয়ে এমন স্মৃতিতাড়িত হবার কী কারণ আমাদের অঞ্চলের মানুষদের ছিল। স্পষ্টত ওদের জন্য এখানে কাজের, উন্নততর জীবনমানের, সুযোগ বেশি ছিল যেটি তাদেরকে আকর্ষণ করতো। হয়তো বা আমাদের কালচারের তুলনায় এখানকার কালচার এতই ভিন্ন ছিল যে এটিও অনেকের কাছে একটি আকর্ষণ হিসেবে কাজ করেছে। বিশেষ করে এখানকার নারী পুরুষ সবার একত্র কাজ করার, হাটে বাজারে সব কাজকর্মে নারী পুরুষের আনন্দমুখর উপস্থিতি এবং তাদের সাধারণ সারল্য—এগুলো আমাদের অতিরিক্ত রক্ষণশীল ও কর্তৃত্বপরায়ণ সমাজে ক্লান্ত অনেকের জন্য একটু নতুনত্ব হয়তো এনে দিতো। অন্তত সেকালে তাদের যাওয়ার এই একটি জায়গা ছিল যেখানে তারা অনাকাঙ্খিত ছিলনা, অথবা নিজেরা হীনমন্যতায় ভোগার কোন কারণ যেখানে ছিলনা।

পাকিস্তান কন্টিনজেন্ট

রেঙ্গুন ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আমরা এগারজন ধীরে ধীরে সত্যিকারের 'পাকিস্তান কন্টিনজেন্ট' হয়ে উঠলাম—অর্থাৎ বিশ্ব জাম্বুরী ও নিপ্পন জাম্বুরীতে পাকিস্তানের স্কাউট দল। নিজেদের ব্যক্তিগত লাগেজ ছাড়াও কন্টিনজেন্ট হিসেবে আমরা বহন করছি বেশ কিছু জিনিস—যেমন জাতীয় পতাকা, দেশ ও দেশের স্কাউটদের প্রতিনিধিত্বকারী কিছু প্রকাশনা, ছবি, টেইপ ইত্যাদি। সঙ্গে আরো ছিল বিশেষ ভাবে তৈরি করা ছয়টি ছোট ছোট তাঁবু, কমলা রঙের সিনথেটিক কাপড়ে তৈরি—হালকা এলুমুনিয়ামের ফ্রেমের সাহায্যে দ্রুত এই তাঁবুকে খাড়া করা যায়; বহন করার সময় এই ফ্রেমকে সুন্দর ভাবে গুটিয়ে রাখা যায়। আমাদের এগারোজনের মধ্যে মোটের উপর তিনটি তিন রকম বয়সের মানুষের

গ্রুপ—কন্টিনজেন্ট লিডার খান সাহেব, কন্টিনজেন্ট ম্যানেজার এবং আরো দু'একজন বয়স্ক সিনিয়র মানুষ, এঁরা সবাই সরকারী গুরুত্বপুর্ণ সব পদে নিয়োজিত আছেন। দ্বিতীয় গ্রুপে ইউনূস ভাইসহ চার জনের মত রোভার স্কাউট তরুণ বয়সী, আর তৃতীয়টিতে আমরা চারজন বয়সে ছোট বয়স্কাউট—সবাই স্কুলের ছাত্র। প্রথম দিকে বিমান ভ্রমণ, রেঙ্গুনে ঘোরাফেরা এসব নিয়েই সবাই ব্যস্ত ছিলাম—ঠিক দল হিসেবে নানা দায়িত্ব পালন এবং এর মাধ্যমে পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মেলামেশা ইত্যাদির সুযোগ ঘটেছে কম। কিন্তু ফিলিপাইনে জাম্বুরীর মাঠে অল্প দু'একদিনের মধ্যেই তার আমূল পরিবর্তন ঘটলো। জাম্বুরী এমন জায়গা যেখানে কারো আলাদা হয়ে থাকার উপায় নেই—বয়সে বড় ছোট নির্বিশেষে। আনুষ্ঠানিকতায় দলগত ভাবে একযোগে দেশের প্রতিনিধিত্ব করার ক্ষেত্রে ক্ষণে ক্ষণে অন্যদের সঙ্গে নিজকে খাপ খাইয়ে নিতে হচ্ছে। তার চেয়েও বড় কথা হলো আনুষ্ঠানিকতার বাইরে দিনের পর দিন যে তাঁবু জীবন যাপন, সেখানে পরস্পরের এত কাছে এসে এত কাজ করতে হচ্ছে যা বাসায় ভাইবোন বা ঘনিষ্ঠদের সঙ্গে কাজের সমতুল্য। সেই কমলা রঙের ছোট তাঁবুর মধ্যে মাটির উপর রাত্রিবাস (সে মাটি ওখানে বেশ স্থায়ীভাবে কাদায় পরিণত হয়েছিল) প্রত্যেক তাঁবুতে দু'জন করে; রসদ এনে রান্নাবান্না, খাওয়া; প্রবল বৃষ্টি, কাদায় একাকার পরিবেশে ন্যূনতম দৈনন্দিন একটু ভদ্র গোছের জীবন যাপন করার চেষ্টা, এভাবেই চলছিলো। আবার এর মধ্যে নিজেদেরকে ও ক্যাম্পকে ছিমছাম রেখে রোজ হাজার হাজার অতিথিদের সামনে দেশকে তুলে ধরা এসব সহজ কাজ ছিল না, না কনিষ্ঠতম স্কুলছাত্রের জন্য, না বিলাসী জীবন যাপনে অভ্যস্ত কট্টর সিভিল সার্ভিস অফিসার দলপতি খান তারেক ইসমাইল খানের জন্য।

খান সাহেব বেশ চোখে পড়ার মত একজন মানুষ। পাঞ্জাবি হলেও দেখতে পাঠানের মত, বলতে গেলে ইংরেজ সাহেবের মত; অত্যন্ত ফরসা প্রায় লালচে গায়ের রঙ, কালো ঘন গোঁফ, আর কোঁকড়ানো চুল। কন্টিনজেন্টে অন্য যে পাঞ্জাবিরা ছিলেন তাঁরা এদিক থেকে মোটেই তাঁর মত ছিলেননা। খান সাহেবের এরকম ইংরেজসুলভ চেহারায় সব চেয়ে বেশি মুগ্ধ ছিলেন বোধ হয় খান সাহেব নিজে। জাম্বুরীতে কড়া রোদে ও আর্দ্রতায় গেঞ্জি-হাফ প্যান্ট পরা অবস্থায় তার স্কিন বার্ন দেখা দিয়ে গায়ের কোন কোন জায়গায় ঘায়ের মত হয়ে গিয়েছিলো। এটি বেশি ফরসা মানুষের ক্ষেত্রেই হয়। খান সাহেব তাঁর স্কিন বার্ন নিয়ে মনে হয় বেশ গর্ববোধ করতেন, আমাদেরকে বলতেন আর দেখাতেন তো বটেই, অভ্যাগতদেরকেও দেখাতেন। যদিও তিনি আমাদের সবার সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশতেন, কিন্তু পাঞ্জাবি অভিজাতদের যে একটা গুমর থাকে সেটি তাঁর মধ্যে বেশ স্পষ্ট ছিল—কথাবার্তায় সেটি প্রকাশ পেত। ইউনূস ভাই আর আমার সঙ্গে তাঁর একটি অদ্ভুত সম্পর্ক ছিল। পুরো কন্টিজেন্টটি চলতো পাঞ্জাবি ভাষা, পাঞ্জাবি জোক্, ঠাট্টা, আড্ডা এ সবের মধ্যে; শুধু আমরা দু'জন ছাড়া। আমরাই ছিলাম

ব্যতিক্রম; নিজেরা যখন কথা বলতাম তখন তারা ভাবতো এ বুঝি কোন এক ভিনদেশী ভাষা—অথচ এটিও রাষ্ট্রভাষা, তাই বেশি কিছু বলতে পারতোনা। অন্যরা এ নিয়ে বেশি মাথা না ঘামালেও খান সাহেব ঘামাতেন। নিজের ওই জবরদস্ত ম্যানেজার থাকলেও ইউনূস ভাইয়ের ওপরই তিনি অনেক কাজের জন্য নির্ভর করতেন—ইউনূস ভাইয়ের ব্যবস্থাপনা দক্ষতার কারণে; কিন্তু তারপরও খান সাহেবের সব সময় আক্ষেপ—'আল্লাহ এই কাদের সঙ্গে আমাদেরকে মিলিয়ে দিলো!' এটি তিনি কিছুটা হাসির ছলে বলতেন বটে কিন্তু ব্যাপারটি তাঁর মনে সব সময় খচখচ করতো। এটি আরো বাড়িয়ে দিয়েছিলাম আমি। আমার উর্দু বলা মোটেই স্বচ্ছন্দ ছিলনা, খুব শুদ্ধও ছিলনা। তা ছাড়া একটি গোঁ-ও ছিল যে ইংরেজিতেই যথাসম্ভব বড়দের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবো; এটি খান সাহেবের পছন্দ ছিলনা।

আমাদেরকে খান সাহেব মাঝে মাঝে ডাকতেন 'বাংলো' বলে। এও তাঁর অদ্ভুত, কিছুটা স্থূল রসিকতার একটি অংশ ছিল—তাঁর বাংলো বাড়ির কথাটিকে মনে করিয়ে দিয়ে। এত বড় জাঁদরেল আই সি এস অফিসার, কিন্তু যে সব কৌতুক বা রসিকতা করার চেষ্টা তিনি প্রায়শ করতেন তা কিন্তু বেশির ভাগ সময় খুব জমতোনা, বরং প্রায়ই মাঠে মারা যেত। দোষটি অবশ্য তাঁর; আমার মনে হতো স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞানটি তাঁর কিছুটা কম ছিল। ওই যে বললাম তার স্কিন বার্ন দেখিয়ে গর্ব অনুভব করা, ফিলপিনো স্ত্রী-পুরুষ অভ্যাগতদের কাছে সেটি করে মোটেই তিনি কল্কে পাননি। আর একবারের কথা মনে আছে। জাপানে পথে দল বেঁধে আমরা হাঁটার সময় একজন বৃদ্ধ সাদাসিধে গোছের জাপানি তাঁর দিকে আসছিলেন। ওই ভদ্রলোকের প্যান্টের সামনের জিপারটি খোলা ছিল। খান সাহেব বেশ একটু রসিকতা করেই ব্যাপারটি তাঁকে দেখিয়ে দিলেন। জাপানি ভদ্রলোক এতে মোটেই প্রীত হননি, বরং আমাদের সামনেই খুবই রাগান্বিত হয়ে জাপানি ভাষায় গজর গজর করলেন। জাপানে অধিকাংশ সময় আমাদেরকে সঙ্গ দিয়েছিলেন স্কাউট মাস্টার মিজনো সান। যেহেতু তিনি ভাল ইংরেজি বলতে পারতেন না, খান সাহেব তাঁর সঙ্গেও প্রায়ই এমন ভাবে মশকরা করে কথা বলতেন যা জাপানি ভব্যতায় আঘাত দিতো। নিজেদের মধ্যে তাঁকে মিজানো সান না বলে বলতেন 'মজনু' বা পাগল বলে। আমাকে মাঝে মাঝে কঠিন কঠিন কিছু কাজের দায়িত্ব দিয়ে খান সাহেব বেশ তৃপ্তি পেতেন—মনে হতো আমি পেরে না ওঠলে তিনি এক হাত নেবেন এই আশায়। এক হাত না-নিতে পারলে পাঞ্জাবিতে যে ভাবে বলতেন 'বাঁচ্ গেয়া পুত্তুর' (বেঁচে গেলে বাছাধন)—তাতেই মনে হতো ওটিই উদ্দেশ্য ছিল। একবার সবাই মিলে গল্প করার সময় খান সাহেব বল্লেন ইব্রাহীমকে আমাদের উর্দু শেখানো উচিত। ইউনূস ভাই সঙ্গে সঙ্গে বল্লেন হ্যাঁ খুব ভাল হবে, এবং সবাইকে বাংলাও শেখানো উচিত'—এ কথা শুনে খান সাহেব একটু দমে গেলেন।

একটি জিনিস তাঁর খুব ভাল ছিল যে তিনি অন্যদের থেকে কোন ভাবে আলাদা চলার চেষ্টা করতেননা; সবার সঙ্গে মিশতেন, গল্প করতেন, ভাল লাগুক মন্দ লাগুক মন খুলে বলতেন, বড় অফিসার বলে নিজের মধ্যে কথা লুকিয়ে রাখতেন না। সবার সঙ্গে ওই গেঞ্জি পরে তাঁবুর সামনে কাজ করতেন, রান্না বান্না, গোছগাছ সব কিছুর তদারক করতেন। ওই দিক থেকে তিনি পাক্কা স্কাউট, মোটেও গা বাঁচিয়ে-চলা অফিসার নন। বিভিন্ন দূতাবাস ইত্যাদিতে গেলে রথী মহারথীদের সঙ্গে চলে যেতেন না, বরং আমাদের সঙ্গে থেকেই তাঁদের সঙ্গে কথা বলতেন। অনেক ধৈর্যশীল ছিলেন। বিশেষ করে জাপানে নানা জায়গায় বেড়াবার সময় আমাদের মধ্যে কারো ইচ্ছে হলো একটি পুতুল কিনবে, বা ক্যামেরা কিনবে। ধৈর্য ধরে তিনিও সবার সঙ্গে অপেক্ষা করতেন, কিনতে সাহায্যও করতেন।

জাম্বুরী থেকে দেশে ফেরার বেশ কয়েক বছর পর ১৯৬৬ সালের দিকে খান সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিলো। আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রত্বের একেবারে শেষের দিকে। গাজীপুরের মৌচাকে এক স্কাউট সমাবেশে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন, সেখানেই দেখা হলো। অনেক আলাপ হলো। দেখলাম—'আল্লাহ কাদের সঙ্গে মিলিয়ে দিলো' এই ভাবটি তাঁর সম্পূর্ণ বদলে গেছে। আইয়ুব খানের শাসনের একেবারে প্রথম দিকের এক আত্মম্ভরী পাঞ্জাবি আমলা হিসেবে তাঁর যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এখন সেটি অনেক নরম হয়ে এসেছে বাস্ত বতার পরশে। মনে হলো এখন পূর্ব পাকিস্তানে কী হচ্ছে সেদিকে তিনি আগ্রহ ভরে তাকিয়ে আছেন, মনে করছেন পাকিস্তানকে এসপার ওস্পার করতে এরা যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে, এদেরকে সমীহ করতে হবে।

আমাদের পাকিস্তান কন্টিনজেন্টে আমার অধিকাংশ সাহচর্য কিন্তু খান তারেক ইসমাইল খানের সঙ্গে ছিলনা; ছিল তানভীরে, এনামে আর মোটের সঙ্গে—অর্থাৎ তানভীর, এনাম আর মোটা এনামের সঙ্গে, যাদের নিয়ে আমাদের ছোটদের চারজনের দল। ওই নামের শেষে 'এ' যোগ করাটি হলো পাঞ্জাবিতে তুচ্ছার্থে ডাকা—পুরোনো বন্ধুরা বন্ধুকে যেভাবে ডাকে, আমরা যেমন ডাকি এনাইম্যা। তাদের কাছে আমার নামও 'এ' যুক্ত। দ্রুত আমরা বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম, প্রধানত পরিস্থিতির চাপে। কখনো কখনো অবশ্য ঠেকায় পড়লে মধুর স্বরে অন্যকে ডাকতো 'ও পাইইই' অর্থাৎ 'হে ভাই-'; অথবা একই অর্থে 'ও প্রা'; বিশেষ করে 'মোটে' এটি করতো বেশি কারণ সে খুব নার্ভাস প্রকৃতির ছেলে। তাদের কথা শুনতে শুনতে আমি পাঞ্জাবি অন্তত বোঝার মতো বেশ রপ্ত করে ফেলেছিলাম, সব মান-অভিমান, ঝগড়া ইত্যাদিতে অংশও নিতে পারছিলাম। এদের সবার ভয়, আনন্দ, সবলতা, দুর্বলতাগুলোও বেশ জানা হয়ে গিয়েছিল। আমরা পাকিস্তান কন্টিনজেন্টের দিনগুলো মসৃণভাবে চলতে এর প্রয়োজন ছিল।

যেখানে যাচ্ছি কন্টিনজেন্ট হিসেবে আমাদের কিছু করতে হচ্ছে অন্তত সমবেত ভাবে একটি গান গেয়ে শোনাতে হচ্ছে। এ সব দিক থেকে তেমন কোন

প্রস্তুতি নেবার সময় আমরা পাইনি। কাজেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে জাতীয় সংগীত 'পার্ক-সরজমিন শাদবাদ' গাইতাম। অবশ্য আরো দুটি গান আমরা সবাই মিলে গাওয়ার অভ্যাস করেছিলাম। এর একটি হলো 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ, আজাদী পায়েন্দাবাদ। পাকিস্তান আজাদ রহেগা, ইয়ে গুলশান আবাদ রহেগা'। আর অন্যটি হলো 'পূরব বাংলার শ্যামলিমায়' নামক বাংলা গান, যেটি 'পাক-সরজমিন' গৃহীত হবার আগে পর্যন্ত আমরা জাতীয় সংগীত হিসেবে গাইতাম :

পূরব বাংলার শ্যামলিমায়
পঞ্চ নদীর তীরে অরুণিমায়
ধূসর সিন্ধু, মরু সাহারায়
ঝাণ্ডা জাগে যে আজাদ।...

কন্টিনজেন্টের সবাই পুরোপুরি কখনো এটি রপ্ত করতে পারেনি। আমরা দু'জনেই গলা ফাটিয়ে গাইতাম, বাকিরা সাধ্যমত গলা মেলাবার চেষ্টা করতো।

রেঙ্গুন থেকে বিমানে ব্যাংকক গিয়ে পৌছলাম গভীর রাতে। সেই রাতের বেলায় থাই স্কাউটদের একটি দল আমাদের জন্য বিমান বন্দরে অপেক্ষা করছিলো। তাদের সঙ্গে ওখানেই কিছুক্ষণ কাটিয়ে আবার আমরা অন্য একটি বিমানে রওয়ানা হয়ে গেলাম ফিলিপাইনে ম্যানিলার উদ্দেশ্যে। এই যাত্রায় সেকালের সত্যিকারের দূরপাল্লার আন্তর্জাতিক বিমান ভ্রমণ কাকে বলে তার সঙ্গে পরিচিত হলাম। ওরকম দূরপাল্লার বিমান যাত্রা চালু হয়েছে তা তখন বেশি দিনের কথা নয়। বিমান ভ্রমণের কৌলীন্য তখন তুঙ্গে ছিল। বিমান যাত্রী হিসেবে খাতির পেতে বিজনেস ক্লাস বা ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী হতে হতোনা। কী বিমান বন্দরে, কী বিমানের মধ্যে, যত্ন আত্তির কোন সীমা ছিল না। আমরা ছিলাম এয়ার ফ্রান্সের যাত্রী। আগাগোড়া পথে আমার খুব মজা লাগলো ফরাসী ভাষায় ঘোষণাগুলো শুনতে। যদিও বোঝার জন্য পরবর্তী ইংরেজি ঘোষণার অপেক্ষা করতে হয়েছে, কিন্তু সেই-ই আমার প্রথম দীর্ঘক্ষণ ফরাসী শোনা—হোস্টেসের এই আনুনাসিক ফরাসী ঘোষণাকে খুবই মিউজিক্যাল মনে হলো। ব্যাংকক থেকে ম্যানিলা যাওয়ার পথে হঠাৎ একটি ব্যতিক্রমী ঘোষণা এলো—বিমানে কিছু যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দেয়াতে আমরা আপাতত ম্যানিলার দিকে যাত্রা অব্যাহত রাখতে পারছিনা, ত্রুটি সারাবার জন্য আমাদেরকে অনির্ধারিত ভাবে ভিয়েতনামের সায়গনে অবতরণ করতে হবে। আজকালকার দিনে এমন হলে এরকম ঘোষণায় হকচকিয়ে যেতাম, ভয় পেতাম। কিন্তু সেই বাল্যকালের ফুর্তির সফরে ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে মন নেচে ওঠলো। আর একটি জায়গা দেখা হবে, ওখানে বিমান সারাতে একটু বেশি সময় লাগলে তো ভাল করেই দেখা হবে। আর এই দেখা যেই সেই জায়গায় নয়, 'ভিয়েতনাম' ও 'সায়গন' ইতোমধ্যেই বেশ আলোচিত স্থান, যদিও আমেরিকা তখনো সরাসরি ওই ভিয়েতনাম যুদ্ধে জড়িত হয়নি।

পত্রিকার কারণে ভিয়েতনামের ঘটনাবলীর সঙ্গে মোটামুটি পরিচিত ছিলাম। তাছাড়া এ সময় বড়দা মাঝে মাঝে বাসায় 'টাইম' অথবা 'নিউজ উইকের' কোন কোন কপি নিয়ে আসতেন। তাতে বোঝা যেত আমেরিকা ওইসময়েই ক্রমে ভিয়েতনামে জড়িয়ে পড়ছে। ১৯৫৪ সালে উত্তর ভিয়েতনামের দিয়েন বিয়েন ফু'তে ফরাসী ঔপনিবেশিক সামরিক বাহিনী হো চি মিনের নেতৃত্বাধীন মুক্তি বাহিনীর দ্বারা কার্যত ঘেরাও হয়ে চরম পরাজয় বরণ করেছিলো। এর ফলে পরে জেনেভা আলোচনার মাধ্যমে ভিয়েতনাম হো চি মিনের নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনাম, এবং নগো দিন দিয়েমের নেতৃত্বে কার্যত আমেরিকার তাঁবেদার রাষ্ট্র দক্ষিণ ভিয়েতনামে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তা হলে কী হয়, জাতীয় নেতা হিসেবে হো চি মিনের, এবং ভিয়েতনাম জাতির যুদ্ধ বিজয়ী দল হিসেব কম্যুনিস্ট পার্টির (যা ভিয়েৎমিন বলে পরিচিত) প্রভাব দক্ষিণেও যথেষ্ট থেকে গিয়েছিল।

কাজেই সেই ১৯৫৯ সালেও দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাজধানী সায়গনে ক্ষমতায় না থাকলেও সাধারণ মানুষের চিন্তায় ও কথাবার্তায় হো চি মিন খুবই উপস্থিত ছিলেন। দিয়েমের শাসনের ওই পঞ্চম বছরেই বেশ বোঝা যাচ্ছিল তিনি গণতন্ত্রের ধার ধারেন না। তিনি একেবারেই স্বেচ্ছাচারী ছিলেন; এবং তা হতে পেরেছিলেন বিপুল পরিমাণের মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক সাহায্যের অপব্যবহারের সুযোগেই। দক্ষিণ ভিয়েতনামের কম্যুনিস্টরা—যারা ভিয়েতকং বলে পরিচিত—ইতোমধ্যেই উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে একীভূত হবার জন্য সীমিত আকারের গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছিল; মার্কিন সামরিক 'অ্যাডভাইজারদের' পরামর্শ মত দক্ষিণ ভিয়েতনাম সেনাবাহিনী তার দমনের চেষ্টা করছিল। কিন্তু জনগণের স্পষ্ট সমর্থন ভিয়েতকংদের দিকে থাকাতে বিপুল সংখ্যক তথাকথিত অ্যাডভাইজারদের প্রত্যক্ষ সহায়তা সত্ত্বেও এগুলো মোটেই সফল হচ্ছিলনা। এজন্যই পরের বছরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রকে ক্রমে ক্রমে নিজে সৈন্য পাঠিয়ে পুরা দস্তুর যুদ্ধ পরিচালনার দিকে চলে যেতে হয়েছিল। ১৯৫৯ সাল থেকে ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত সময়টি ছিল ভিয়েতনাম যুদ্ধের গতি প্রকৃতি সম্পূর্ণ বদলে যাবার সেই ক্রান্তিকাল।

১৯৫৯ সালের জুলাইতে যে সায়গনে যাত্রা বিরতি করতে বাধ্য হলাম সেখানে আমরা আপাত শান্ত একটি সুন্দর শহর দেখতে পেলাম, একটি পুরো দিন সেখানে কাটিয়ে। সায়গন সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারছি তার কারণ সেই আমলে বিমান যাত্রীদেরকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেয়া হতো; ওই যাত্রা বিরতির সময়টুকু যেন তাদেরকে আনন্দে ব্যস্ত রাখা যায় সেদিকেও বিমান কোম্পানির লক্ষ্য থাকতো—এখনকার মত বিমান বন্দরে বা বড় জোর একটি হোটেলে ফেলে রাখতোনা। ওই সারাটি দিন আমাদেরকে একটি গাড়িতে করে সায়গন শহরের দর্শনীয় নানা জায়গা দেখানো হয়েছে; ভিয়েতনামের কালচার আর দৈনন্দিন জীবনের একটি ধারণা যেন আমরা পেতে পারি সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হয়েছে। রেঙ্গুনের রাস্তায় নারী-পুরুষের যে ধরনের পোষাক দেখেছিলাম—

সায়গনে তা বেশ বদলে গেল; যদিও পুরুষ ও নারীর মিলিত ব্যস্ততা, সমান অংশগ্রহণের কালচারটি কিন্তু এখানেও খুবই বিদ্যমান। উভয়ের লম্বা গলাবন্ধ পাঞ্জাবির মত পোষাক এদের—দুপাশে নিচে থেকে বেশ খানিকটা জায়গা কাটা; নিম্নাঙ্গের পোশাক পাজামার মত। মেয়েদের ক্ষেত্রে দুপাশে কাটা পাঞ্জাবির মত কুর্তাগুলো বেশ ফুলেল। গ্রাম থেকে আসা মহিলাদের আলাদা করে চেনা যায় তাদের মাথায় কোণাকৃতি বাঁশবেতের তৈরি টুপি দেখে। ওদের অনেকে কাঁধের ভারাতে নানা সওদা নিয়ে এসেছে। ওদিকে সায়গনের কেন্দ্রস্থলটি কিন্তু বেশ আধুনিক—ইউরোপীয় ধাঁচের নানা ভবনে। নদীর ধারটি বন্দরের মতো বেশ সরগরম। বইয়ের দোকানে হো চি মিনের ছবি দিয়ে প্রচ্ছদ করা বই দেখলাম—মনে হলো দেশ বিভাগের পর এখনো জোর করে হো চি মিনকে মুছে দেবার কোন চেষ্টা করা হচ্ছে না। কথা বলে মনে হলো জাতীয় নেতা হিসেবে হো চি মিনের প্রভাব এখনো মানুষের মধ্যে প্রবল। বাইরে বেশ উচ্ছল শান্তির শহর হিসেবে দেখলেও ভেতরে ভেতরে কিন্তু তখনিই অশনি সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল। আমরা ওখানে যাওয়ার মাত্র কয়েকদিন আগে সায়গন থেকে মাত্র ২০ মাইল উত্তরের একটি শহর বীন-হোয়াতে মাত্র ছয় জন ভিয়েতকং গেরিলা আমেরিকান মিলিটারি অ্যাডভাইজারদের একটি কম্পাউন্ডের ওপর চোরা-গোপ্তা হামলা চালিয়েছিল। এতে দু'জন আমেরিকান সৈন্য ও তিনজন ভিয়েতনামিজ নিহত হয়। ওসময় এরকম ছোট ছোট হামলা আরো হয়েছিলো বলে সারা দক্ষিণ ভিয়েতনামে তখন মার্কিন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের মধ্যে ব্যাপক আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে ও তাদের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

বাজারে সুভেনির্যর হিসেবে একটি হস্তশিল্প কিনতে গিয়ে দাম জিজ্ঞেস করলে দাম বল্‌লো 'মত্ দং' অর্থাৎ এক দং। কেন জানি এই কথাটি মনে গেঁথে ছিল। দং হলো ভিয়েতনামের টাকার নাম। মজার ব্যাপার হলো ২০০৭ সালে আবার সায়গন গেলে এক হাজার দং এর নিচে কোন নোটই দেখিনি। আর ওই মত্ দং দিয়ে যে জিনিস কিনবো কিনা ভাবছিলাম অনুরূপ দাম এখন অন্তত দশ হাজার দং। ভিয়েতনামের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে কত পানি গড়িয়ে গেছে এই সময়ে তা এর থেকে বোঝা যায়—কী মারাত্মক রকমের মুদ্রাস্ফীতি মাঝখানে ঘটে গেছে! খাওয়া দাওয়ার পর আমাদেরকে সায়গন চিড়িয়াখানায় নিয়ে যাওয়া হলো। এটি নাকি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সব চেয়ে সমৃদ্ধ একটি চিড়িয়াখানা। এই আমার জীবনের প্রথম একটি চিড়িয়াখানা দেখা, তাই দেখার সময় কিছু কিছু জিনিস বেশ উৎসাহ নিয়েই দেখেছি। কিন্তু তবুও মনে হলো এত অল্প সময়ের জন্য ভিয়েতনামে এসে দেশটিই আরো বেশি দেখতে পারলে ভাল হতো, চিড়িয়াখানা নয়।

সায়গন থেকে উড়ে ম্যানিলা বিমান বন্দরে এসে বিমানের সিড়ি দিয়ে নামার সময় হকচকিয়ে গেলাম। সে সময় বোধ হয় নানা দেশ থেকে স্কাউটরা আসছিলো

এখানে তাই বেশ জবরদস্তভাবে অভ্যর্থনা জানাবার একটি ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু জাম্বুরী কর্তৃপক্ষের অভ্যর্থনার চেয়েও বেশি তৎপরতা দেখা গেল কোকা কোলা কোম্পানির। ওই সিড়ির উপরেই তারা হাতে ধরিয়ে দিল সদ্য খোলা অবস্থায় ষ্ট্র সহ একটি কোকা কোলা বোতল। আর একই সঙ্গে চলছিল চোখ ধাঁধাঁনো ছবি তোলার ফ্ল্যাশ। পেপসি কোলার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পড়ে কোকা কোলা কোম্পানি বোধ হয় এভাবেই প্রচার অভিযানে নামছিলো। আর আমার এই প্রথম কোকা কোলার স্বাদ গ্রহণ—যদিও বহু কাল ধরে এই পানীয়ের কথা শুনে আসছি। বিমান বন্দরে আমাদের জন্য বড় বড় করে লেখা ছিল 'মাবুহায়'—এই কথাটি। এর পর থেকে এই মাবুহায় কথাটি বার বার শুনেছি। তাগালোগ অর্থাৎ ফিলপিনো ভাষায় এটি একটি জয়ধ্বনি—'জিন্দাবাদের' মতো, বা 'হুররার' মত; আবার এটি অন্যকে সম্ভাষণের জন্য ব্যবহৃত হয়, স্বাগতম জানাতেও ব্যবহৃত হয়। দশম বিশ্ব জাম্বুরীর সকল সম্ভাষণে, এর জাম্বুরী সংগীতেও ছিল সবাইকে মাবুহায় জানাবার ব্যাপারটি। বিমান বন্দরে যারা অভ্যর্থনা জানালো তারাও সমস্বরে বললো—'মাবুহায়'।

জাম্বুরীতে যোগ দেবার জন্য দলে দলে যে সব স্কাউট আসছিলো ম্যানিলায় তাদের নানা দলকে নানা ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ঘরোয়া মেহমান হিসেবে থাকতে দেয়া হচ্ছিল দু'একদিনের জন্য। আমাদের পাকিস্তান কন্টিনজেন্টের ঠাঁই হলো ফিলিপাইনের খুব বড় একজন ধনকুবেরের আতিথ্যে। এর ফলে খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি খুব ভাল হলো বটে, কিন্তু ম্যানিলা দেখা বা ম্যানিলার মানুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বড় একটা ঘটলোনা। কারণ বিশাল বৈভব, প্রাসাদ, বাগানবাড়ি ইত্যাদি দেখতেই অনেক সময় কেটে গেল। একটি জায়গায় অনেক্ষণ ছিলাম তাঁর খেলনা রেলওয়ে সিষ্টেমের ঘরের মধ্যে। বড় কামরাটির অনেকটা স্থান জুড়ে তাঁর ছোট ছোট খেলনা ট্রেন, রেল রাস্তা, আর নানা স্টেশন নিয়ে তাঁর এই ক্ষুদে রেলওয়ে সিষ্টেম। একটি প্যানেল থেকে নানা সুইচ টিপে ট্রেনগুলো চালানো যায়; কলিশন এড়িয়ে তাদের গতিপথ নিয়ন্ত্রণ করা যায়; জংশনে রাস্তা বদল করা যায়; সিগন্যাল ডাউন করে, সবুজ বাতি জ্বালিয়ে, হুইসেল দিয়ে স্টেশনে প্রবেশ করা যায়। এক রকম পারদর্শিতার এই গেইমসে মেতে এতে সময় কাটানো বেশ উৎসাহ উদ্দীপক—কিন্তু তাতে ফিলিপাইনকে দেখা হয়না। সেই ক্ষতি অবশ্য কড়ায় গণ্ডায় পুষিয়ে গেল যখন ম্যানিলা ছেড়ে চলে গেলাম লস বানোসে যেখানে বসছে বিশ্ব স্কাউটের মিলন মেলা।

কাদায় মাটিতে বিশ্ব পরিচয়

মাকিলিং পর্বতের ঢালের উপরেই আমাদের দশম বিশ্ব জাম্বুরী বসেছিল জুলাইয়ের ১৭ থেকে ২৬ তারিখ (১৯৫৯) দশটি দিন। ফিলিপাইন দেশটি অনেকগুলো দ্বীপ দিয়ে গঠিত, তার সবচেয়ে বড়টি হলো লুজোন। দক্ষিণ লুজোনের ল্যাগুনা জেলার

লস বানোসে এই মাকিলিং পর্বত। আসলে এটি প্রাকৃতিক ভাবে সংরক্ষিত একটি ন্যাশনাল পার্ক। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হাজার খানেক ফুট উপরে পর্বতের ঢালে এই অংশটি কিছুটা সমতল, খোলা জায়গা। এতে বসেছিল ৪৪টি দেশ থেকে আসা ১২ হাজার স্কাউটের এই মিলন মেলা—যথেষ্ট বিশাল একটি এলাকা জুড়ে। এটি দশাসই একটি আয়োজনের ব্যাপার। নরদার্ন লুজোন নামের সাব-ক্যাম্পের এক জায়গায় আমাদের পাকিস্তান কন্টিনজেন্টের তাঁবু খাড়া করার জায়গা পেয়েছি। এরা বলে সুব্-ক্যাম্প—কারণ ওদের ইংরেজিটা আমেরিকান ইংরেজি, আর ইংরেজিতে কথা বলতে ফিলপিনোরা বেশ পারদর্শী। ওই বারো হাজারের একটি বড় অংশ স্বাভাবিক ভাবেই ফিলপিনো ছেলে—সবাই প্রায় বালক বয়সী, দশ বারো থেকে তের চৌদ্দ বছরের। কিন্তু ওরা ছাড়াও সেই প্রথম দিন ভোর সাতটা থেকে শুরু করে সবক'টি দিন হাজার হাজার ফিলপিনো নারীপুরুষ জাম্বুরী দেখতে এসেছে। সারাদিন তাদের দ্বারা প্রায় পরিবেষ্টিত হয়ে থাকতাম। সব চেয়ে বেশি আসতো ফিল্পিনো কিশোর-কিশোরী এবং উঠতি তরুণ তরুণী। মেয়েদের সংখ্যা ছেলেদের চেয়ে বেশি বই কম হবে না।

এর আগে তাঁবু জীবনে কাটাবার অভিজ্ঞতা আমার ছিল, নানা রকম ক্যাম্পিঙেরও, কিন্তু মাকিলিং পর্বতের ঢালে যা করতে হলো সেটিকে নানা দিক থেকে রীতিমত একটি সংগ্রাম বলা যায়—প্রধানত প্রকৃতির বিরুদ্ধে। উঁচুনিচু জায়গাকে কোদাল দিয়ে যথাসম্ভব সমতল করে নিতে হলো যার ওপর তাঁবু খাটিয়ে তাতে শোয়া যায়। সেই কমলা রঙের ছয়টি ছোট ছোট তাঁবুকে অর্ধ চন্দ্রাকারে সাজিয়ে খাড়া করে ফেললাম; কেন্দ্রস্থলে খাড়া করলাম পতাকা দন্ড জাতীয় পতাকা উত্তোলনের ব্যবস্থা। উঁচুনিচু মাটিতে শুতে যেন বেশি কষ্ট না হয় তার জন্য একটু খড় বিছিয়ে তার উপর প্লাষ্টিকের শীট পাতলাম। ওভাবে থাকলে অসুবিধা হতোনা, কিন্তু শিগ্গীর শুরু হলো প্রবল বর্ষণ—এমন বর্ষণ যে পাহাড়ের ঢালে প্রায় ভূমিধস নামার যোগাড়। এরপর থেকে মাঝে মাঝেই ঘটেছে এমন বর্ষণ। আমরা যেখানে মাটি কুপিয়েছি তা একেবারে কাদা হয়ে একাকার, বাইরে পাহাড় থেকেও কাদা পানি নেমে এসেছে। রাতে শোয়ার জন্য তাঁবুর নিচটি শুকনা রাখাও কঠিন হয়ে পড়লো। এই কাদামাটির উপরেই করতে হলো আমাদের সব কাজকর্ম—সকালে পতাকা উত্তোলন, জাতীয় সংগীত, ব্রেকফাস্ট তৈরি, অন্যান্য রান্না-বান্না, অতিথিদের সঙ্গে কথা বলা, ক্যাম্প দেখানো, সব। বিভিন্ন ক্যাম্পফায়ার, অনুষ্ঠান, অন্য ক্যাম্প ভিজিট এগুলোর জন্য ছাড়াও রোজ পালা করে আমাদেরকে যেতে হতো সাব-ক্যাম্প সাপ্লাই অফিসে রসদ আনতে। চড়াই উৎরাই সে পথও যথেষ্ট কাদাময় ছিল—যাতে স্কাউট জুতা প্রায়ই ডেবে যাবার উপক্রম হতো। এতে কিন্তু হাজার হাজার স্কাউট আর দর্শকদের সারাক্ষণ হৈচৈ করে ঘোরাফেরার কিছুটা কমতি ঘটেনি, নানা দেশের স্কাউটদের বিভিন্ন দলীয় ডিসপ্লে দেখাবার কাজেও উৎসাহের কোন অভাব হয়নি। কাদা যেহেতু আমাদের

পিছু ছাড়ছিলোনা আমাদের দলের স্কাউটার শরীফ সাহেব তাই এ জাম্বুরীর নাম দিয়েছিলেন মাডুরী ('মাড' বা কাদা থেকে)। সেই থেকে ওই নামটিই আমাদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে পড়েছিল। আমার বন্ধু ওই তানভীরে, এনামে আর মোটে কাদামাটিতে অভ্যস্ত না হওয়াতে একেবারেই কাহিল হয়ে পড়লো; আমাকেই ভরসা দিয়ে রাখতে হতো তাদেরকে।

একেবারে প্রথম দিকে সাধারণ কিছু ব্যবস্থাপনা দেখে কিছুটা ভড়কে গিয়েছিলাম। যেমন গোসল করার যে ব্যবস্থা দেখলাম একটি বিশাল ঘেরা জায়গায় পর পর লাইন করা একই পাইপের সঙ্গে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে শত শত শাওয়ার। দেখলাম নানা দেশের সব ছেলেরা একেবারে নগ্ন হয়ে তাতে হৈচৈ করে শাওয়ার করছে। আমাদের কন্টিনজেন্টের সবাই এতে ভীষণ কুণ্ঠা বোধ করলো, আবার এর মধ্যে নিজেদের কাপড় পরে গোসলও ভাল দেখায়না। কাজেই অন্যপথ বেছে নিলাম—অতিরিক্ত পানি বহন করে এনে ক্যাম্পের পাশে একটু জঙ্গলের আড়ালে গোসল করে নেয়া। দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল আরো মারাত্মক। টয়লেটের ব্যবস্থাটিও দেখলাম সেভাবেই বারোয়ারি—লম্বা লাইন করে একটির থেকে আরেকটু একটু তফাতে দিয়ে দেয়া হয়েছে অনেকগুলো সীট ছাড়া কমোড। এগুলোর মাঝখানে কোন রকম কোন দেয়াল বা আবরু নেই। দেখেই বোঝা গেল ওখানে পোষাবেনা। ভাগ্যিস ক্যাম্পের পেছনেই ছিল বিস্তীর্ণ জঙ্গল। এক্ষেত্রেও জঙ্গলই ভরসা।

সাধারণত রসদ আনার দায়িত্ব থাকতো আমাদের জুনিয়র চার জনের। এটি আমি খুব উপভোগ করেছি, কারণ এই উপলক্ষে জাম্বুরীর নানা এলাকার উপর দিয়ে নরদার্ন লুজোন সাব-ক্যাম্পের সাপ্লাই অফিসে যেতে হতো। ওখানে নানা মানুষের সঙ্গে দেখা হতো, কারো কারো সঙ্গে ছবির পোজ দিতে হতো, আলাপ হতো। রসদ আনার আর একটি সুবিধা হলো পছন্দসই খাবার ও ড্রিংক্স ইত্যাদি বেছে বেছে বেশি নিয়ে আসা। যেমন সেই যথেষ্ট গরমের দিনগুলোতে আমাদের জন্য দেদার উপাদেয় ঠাণ্ডা পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল আমার অতি প্রিয়, এর নাম 'চকো-ভিম'। এটি একটি চকলেট ড্রিংক—অত্যন্ত উপাদেয়। ইচ্ছেমত সংখ্যায় প্লাষ্টিকের বোতলে আনা যেত; কত বোতল যে এর গলঃধকরণ করেছি তার ইয়ত্তা নেই। শুধু রসদ আনা নয়, তানভীর আর আমাকে আরো একটি কাজ দেয়া হয়েছিল যেটি বেশ সম্মানজনক—প্যারেডে কালার গার্ড বা পতাকাবাহী হিসেবে। হয়তো গায়ে গতরে আমরাই সবার ছোট বলে এই ব্যবস্থা। তা ছাড়া দলের পক্ষ থেকে নানা জায়গায় গিয়ে আমাকে বা তানভিরকেই তিন আঙুলের স্কাউট স্যালুট ঠুকে বলতে হতো—'প্রেজেন্টিং পাকিস্তান কন্টিনজেন্ট...;, ইত্যাদি।

আমাদের ক্যাম্পের আশেপাশে ফিলিপাইন স্কাউটস যারা ছিল তারা দেশের সবচেয়ে বড় দ্বীপ লুজোনের উত্তর দিকের প্রদেশগুলো থেকেই আসা। এর মধ্যে

দলগত ভাবে আমার খুব খাতির হয়ে গিয়েছিল 'আব্রা' প্রদেশের কিছু স্কাউটের সঙ্গে। কাছেই ওদের ক্যাম্পে গিয়ে প্রায়ই গল্প করতাম। ওরা আমাকে নিজেদের অঞ্চলের কথা অনেক বুঝিয়েছে, বলেছে তাদের স্কুলের কথা, ভবিষ্যতে কী হতে চায় সে কথা। একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম—এখানকার সব ছেলেদের উপর খুব বেশি মার্কিন প্রভাব। তাদের সবার চুলের ছাট ছিল মার্কিন জিআই'দের (জেনারেল ইশ্যু অর্থাৎ সামরিক বাহিনীর সাধারণ সদস্য) মতো, পেছনে ও পাশে একেবারে চুল না রেখে সামনে ও উপরে শুধু একটু রাখা। ওদের কথাবার্তায় ইয়াংকি টানের আমেরিকান উচ্চারণের ইংরেজি। সব চেয়ে মজার ব্যাপার হলো ভবিষ্যতে এদের অনেকেই মার্কিন সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে চায়। এটি খুবই সম্ভব ছিলো, কারণ ওইসময় ফিলিপাইনে শুধু যে অনেক মার্কিন সামরিক ঘাঁটি ছিল তাই নয়, সেই সেনাবাহিনীতে ফিলিপিনোরা যোগও দিতে পারতো। এ যেন অনেকটা নেপালের গুর্খাদের মতো; নেপাল স্বাধীন হবার পরও গুর্খা পরিবারদের দেখা গেছে এক ভাই বৃটিশ সেনাবাহিনীতে গুর্খা রেজিমেন্টে, এক ভাই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে, আর এক ভাই নেপালি সেনাবাহিনীতে যোগ দেবে এমন পরিকল্পনা নিয়েই এগোতো। নেপালের মতো ফিলিপাইনের ক্ষেত্রেও এটি সম্ভব হয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্কের কারণে।

১৫ শতক থেকে শুরু করে ১৮ শতকের একেবারে শেষের দিক পর্যন্ত পুরো ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জটি স্পেনের উপনিবেশ হিসেবে প্রথমে মেক্সিকো থেকে এবং পরে সরাসরি স্পেন থেকে শাসিত হতো। সেজন্য এদের সনাতন কালচারে স্প্যানিশ প্রভাবটি প্রচুর—উত্তরাঞ্চলের প্রায় সবাই ক্যাথলিক খৃস্টান; তাদের নাম, জায়গার নাম, সবই মূলত স্প্যানিশ ভাষার। দক্ষিণের মিন্দানাও, সুলু, কোতাবাত ইত্যাদি দ্বীপগুলোতে অবশ্য ইতোপূর্বের সুলতানদের শাসনের প্রভাব রয়ে গিয়েছিল—সেখানে অধিকাংশ মানুষ মুসলিম; ইসলামি কালচার ও জীবনধারা এখনো প্রায় পুরাপুরি অনুসৃত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে ফিলপিনোরা বিদ্রোহ করে। কিন্তু ওসময় কিউবা ও পুর্তোরিকোতে স্প্যানিশ-আমেরিকান যুদ্ধে (১৮৯৮) স্পেনকে পরাজিত করার সুযোগ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপাইনকে তাদের শাসনাধীনে নিয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদীদের বিদ্রোহ দেখা দিলেও বিংশ শতাব্দীর শুরুর আগেই তা দমন করা হয়, এবং তখন থেকেই এখানে মার্কিন প্রভাবের শুরু হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে আগে এক ধরনের স্বায়ত্বশাসন ফিলিপাইনকে দেয়া হয় বটে, কিন্তু যুদ্ধের সময় দেশটি জাপানিদের হাতে চলে যায়। জাপান-আমেরিকা যুদ্ধের সব চেয়ে ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী কিছু সংঘর্ষ ঘটেছিলো এই ফিলিপাইনে। সে সময় ও পরে জাপানি দখলে এখানকার মানুষ অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করে। এভাবে স্বাধীনতা বিলম্বিত হয় ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত। কিন্তু তারপরও মার্কিন প্রভাব যথেষ্ট থেকে গিয়েছিল, আমরা যে সময় ফিলিপাইনে তখনো।

আব্রার স্কাউটরা ছাড়াও আর একটি ফিলপিনো ছেলের সঙ্গে আমার খুবই বন্ধুত্ব হয়ে গিয়েছিল। সে প্রায় প্রতিদিনই আমাদের ক্যাম্পে আসতো, গল্প করতো, এটি সেটি সুভেন্যির নিয়ে আসতো, দু'একটি জিনিস বিনিময়ও করেছি তার সঙ্গে। ওর নাম ম্যানুয়েল, আর তার বাড়ি উত্তর লুজোনেরই ইসাবেলা প্রদেশে; জায়গাটির নাম সে এমন ভাবে উচ্চারণ করতো শুনতে মনে হতো 'সাবেলা'। ম্যানুয়েল আমাকে তার স্কাউটিং এর ব্লেজার কোটটি দিয়ে দিয়েছিলো—তার আর আমার গায়ের মাপটি প্রায় একই হওয়াতে কোটটি আমার গায়ে সুন্দর ফিট করেছিলো। সুন্দর সবুজ রঙের কোট—অনেকটা মাও সেতুং কোটের মত ছোট কলারের, সামনের পকেটের উপর ইসাবেলা প্রাদেশিক স্কাউটসের মনোগ্রাম সহ একটি সুন্দর এপলিক লাগানো। এই কোটটি দেশে ফিরে শীতকালে আমি অনেক ব্যবহার করতাম। পরে আমি সাইজে একটু বড় হয়ে যাবার পর হুবহু একই সবুজ কাপড়ে, একই ফ্যাশনে একই রকম আর একটি কোট বানিয়ে নিয়েছিলাম কলেজে পড়ার সময়। শুধু স্কাউট মনোগ্রামের বদলে আমি এতে ম্যাগাজিন থেকে এটমের (পরমাণুর) একটি সুন্দর রঙিন ছবি এম্ব্রয়ডারি করে তৈরি করিয়ে নিয়েছিলাম। কেমন করে জানিনা বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে আমার ছাত্র রাজনীতির কালে এটি আমার একটি ট্রেডমার্কে পরিণত হয়েছিল; এবং ছাত্র ইউনিয়নের আমার বন্ধু নানা নেতার গায়েও এটি মাঝে মাঝে শোভা পেত—সে কথা যথা স্থানে হবে। ম্যানুয়াল সম্পর্কে আর যা মনে পড়ে তা হলো সে নাকেমুখে কথা বলতো খুব দ্রুত, আর আমাকে তাগালোগের দু'একটি করে কথা শেখাত। আমিও আমার কানে কোন কোন শব্দ বেশি এলে তার মানে ওর কাছে জেনে নিতাম। যে দুটি কথা শিখতেই হয়নি—একেবারে শুরু থেকেই সমানে সবার সঙ্গে ব্যবহার করছিলাম, তা হলো 'মাবুহায়' (স্বাগতম অথবা দীর্ঘজীবি হও) এবং 'সালামত' (ধন্যবাদ)। তাছাড়া 'মাগানডাং উমাগা' (শুভ সকাল), 'মাগানডাং হাপোন' (শুভ বিকেল) আর 'মাগানডাং গাবি'র (শুভ সন্ধ্যা) সঙ্গে সে শিখিয়ে দিয়েছিল 'মাগানডাং ডালাগা' (সুন্দরী)।

এ সব তাগালোগ কথা খুব কাজে আসতো যখন দলে দলে যে তরুণ তরুণী দর্শকরা আমাদের ক্যাম্পে সারাক্ষণ এসে আমাদের সব কাজ দেখতো, নানা কথা বলতো। এদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ হচ্ছে মেয়েরা। বিশেষ করে রান্নার ডিউটি যখন পড়তো তখন আমরা সারাক্ষণ এই কৌতূহলী মেয়েদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকতাম, তারা রান্নায় সাহায্য করার চেষ্টা করতো—নানা কথা জিজ্ঞেস করতো। আমরা যে রকম তাদেরকে কথা দিয়ে খুশি করার চেষ্টা করতাম, তারাও তেমনি বলতো পাকিস্তানি ছেলেরা বেশ 'গুয়াপো'। ম্যানুয়েল বুঝিয়ে দিয়েছিলো এর অর্থ 'হ্যান্ডসাম'।

ফিলপিনো স্কাউটরা ছাড়া আমাদের প্রতিবেশী ক্যাম্প ছিল মালয়, সারাওয়াক, ব্রুনেই, এবং ইন্দোনেশিয়ার স্কাউটরা। এর মধ্যে ইন্দোনেশিয়া ছাড়া

অন্যগুলো ছিল বৃটিশ উপনিবেশ। সে সময় (১৯৫৯) বোর্নিও দ্বীপের উত্তর ভাগে তিনটি পৃথক উপনিবেশ—সাবাহ, সারাওয়াক আর ব্রুনেই, প্রত্যেকটি স্থানীয় সুলতানদের নামে মাত্র শাসনে বৃটিশ উপনিবেশ ছিল। তার মধ্যে সাবাহ ও সারাওয়াক পরে মালয় ফেডারেশনের সঙ্গে একীভূত হয়ে ১৯৬৩ সনে মালয়েশিয়ায় পরিণত হয়েছে। জাম্বুরীর ওই সময়ে মালয় তখনো বৃটিশ উপনিবেশ। ফিলিপাইনের কাছাকাছি দেশ হওয়াতে ওই সবগুলো দেশের অনেক স্কাউট এসেছিলো জাম্বুরীতে। ওদের ক্যাম্পের সঙ্গে আমাদের বেশ যাওয়া আসা ছিল। একটি জিনিস বেশ অবাক লাগতো একদিকে ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যদিকে মালয়, সারাওয়াক ইত্যাদির স্কাউটদের চালচলনে বড় একটি পার্থক্য দেখে। আমার জানা ছিল যে এরা সবাই মোটামুটি একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত মানুষ, সবার ধর্ম ইসলাম, ভাষাও প্রায় এক। কিন্তু দেখলাম মালয়, সারওয়াক, ব্রুনেই এর স্কাউটরা খুব চটপটে, সমানে ইংরেজি বলছে, খুব কেতাদুরস্ত স্কাউটিং করছে। অন্যদিকে ইন্দোনেশিয়ানরা কিছুটা নিস্প্রভ, ভাষা সমস্যাতো আছেই—তারা তো আর বৃটিশ কলোনি নয়। মনে হলো ইন্দোনেশিয়ার ছেলেরা আরবি ভাল জানতো। আমাদেরকে কোন কিছু বোঝাতে না পারলে আরবিতে বোঝাবার চেষ্টা করতো। অনেক পরে টের পেলাম যে মালয়, সারাওয়াক, ব্রুনেইর যে স্কাউটদের আমরা দেখছিলাম তাদের অধিকাংশই আসলে চীনা বংশোদ্ভূত, সংখ্যালঘু হলেও বৃটিশ আমলে ওরাই স্কুলে-কলেজে লেখাপড়ায় ও স্কাউটিঙে অগ্রণী বলে এখানে অধিকাংশ ওরাই এসেছে; স্কাউট-নেতৃত্বে ওরাই রয়েছে। ওই আমাদের কিস্তি টুপির মত মালয়ী টুপি সমেত স্কাউট ইউনিফর্মের মধ্যে কে চীনা কে মালয়ী চট করে তা বুঝতে পারিনি। এর মাত্র কয়েক বছর পর মালয়েশিয়ার স্বাধীনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠের রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার পর দু'এক দশকের মধ্যে ব্যাপারটি সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছিলো, এরপর থেকে এখানকার চীনা বংশোদ্ভূতদের বিরুদ্ধেই বরং বৈষম্য করা হয়েছে।

ফিলিপাইন ও কাছাকাছি দেশগুলোর স্কাউট ছাড়া ক্যাম্পের প্রতিবেশী হিসেবে যাদের সঙ্গে পাকিস্তান কন্টিনজেন্টের ভাল লেনদেন ছিল তারা হলো আমেরিকান স্কাউটস। এখানকার স্কাউট আর স্কাউট শিক্ষক সব আমেরিকান যে খোদ আমেরিকা থেকে জাম্বুরীতে এসেছে তা নয়। এদের অনেকে ফিলিপাইনেই থাকে—এখানকার বিভিন্ন মার্কিন ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে যে আমেরিকান স্কুলগুলো রয়েছে সেখান থেকে ওরা এসেছে। এখানে আমেরিকান স্কাউট ট্রুপগুলোর সঙ্গে স্থানীয় মার্কিন সেনাবাহিনীর একটি সম্পর্ক আছে। এই একই রকম সম্পর্ক আরো বেশি দেখেছি কয়েক দিন পর জাপান জাম্বুরীতে। একটি জিনিস লক্ষ্য করলাম ফিলিপাইনের ছেলেদের রাজনীতির প্রতি আগ্রহ অনেকটা আমাদের দেশের মত—অনেক কথাই শেষ পর্যন্ত রাজনীতিতে গিয়ে গড়ায়। দেখলাম যদিও মার্কিনপ্রীতি যথেষ্ট, মার্কিন সেনাঘাঁটিগুলোকে অনেকে পছন্দ করছেনা। তখনকার

ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট গার্সিয়া সেগুলোর মেয়াদ ৯৯ বছরের বদলে ২৫ বছর পর পর নবায়নযোগ্য করেছেন, এতে তারা প্রেসিডেন্টের ওপর খুশি। কিন্তু আবার ম্যানুয়েল দেখলাম গার্সিয়াকে একেবারে পছন্দ করেনা—তার মতে গার্সিয়া ও তাঁর ন্যাশনালিষ্ট পার্টি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। তার পছন্দ ভাইস প্রেসিডেন্ট ম্যাকাপাগলকে যিনি বিরোধী লিবারাল পার্টির। ওদেশে প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট আলাদাভাবে নির্বাচিত হয় বলে সেবার বিরোধী দল থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে সব কাজে প্রেসিডেন্টের বিরোধিতা করছিলেন। ম্যানুয়েল বলছিলো 'দেখবে পরের নির্বাচনে জনপ্রিয় ম্যাকাপাগল গার্সিয়াকে পরাজিত করবে'। দু'বছর পর ১৯৬১ সালে তাই হয়েছিল।

ফিলিপাইনে বিশ্ব জাম্বুরীতে জাপান একটি বড় স্কাউট দল পাঠিয়েছিল। ফিলিপিনোদের মুখে শুনেছি এটি একটি ব্যতিক্রমী ব্যাপার। এই প্রথম চোখে পড়ার মত করে জাপান থেকে রকমের কোন প্রতিনিধি দল মহাযুদ্ধের পর ফিলিপাইনে এসেছে। ১৯৪২-৪৫ সালের জাপানি যুদ্ধের ও জাপানি দখলদারিত্বের দুঃস্বপ্নের স্মৃতিগুলো সারা ফিলিপাইনের মানুষ গ্রামে-গঞ্জে পর্যন্ত কোথাও এখনো ভুলে যেতে পারেনি। যুদ্ধটা ছিল আমেরিকানদের সঙ্গে, কিন্তু জাপানি বাহিনীর চরম নিষ্ঠুরতার শিকার হয়েছিল ফিলিপাইনের মানুষরা। তাদের অনেকের সঙ্গে জাপানিরা প্রায় মানবেতর প্রাণির মত ব্যবহার করেছে। শোনলাম এটি এমন দুঃসহ স্মৃতি ছিল যে এর বহুদিন পরেও জাপানি পতাকা, জাপানি জাতীয় সংগীত ইত্যাদিও তাদের জন্য এক রকম আতঙ্কের অনুভূতি এনে দিত। জাপানিরা কিছুদিন ধরেই চেষ্টা করছে এখানে এই মনোভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে। জাম্বুরীতে ছেলেদের বড় দল পাঠিয়ে জাপান ফিলিপিনোদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার চেষ্টা করছিলো। ফিলিপিনোরা এতদিনে মনে হয় এই জাম্বুরীর পাহাড়ে ও উপত্যাকায় আবার জাপানি মানুষ ও জাপানি পতাকা দেখতে রাজি হয়েছে।

ইউনূস ভাই সহ আমরা কয়েকজন জাম্বুরীতে ঘুরে ভারতীয় ক্যাম্পটি বের করেছিলাম। বড় দেশ হলেও তাদের কন্টিনজেন্ট দেখলাম আমাদেরটির সমানই হবে। তাদের পোষাকটির মধ্যে পাগড়িটি বেশ চোখে পড়ার মত, এর তল থেকে খাঁটি বাংলায় কথা বলে উঠলো এক বঙ্গ সন্তান—হিমাংশু বসু। পশ্চিম বঙ্গের কারো সঙ্গে আমার এই প্রথম দেখা। হিমাংশুর দিক থেকে আমরাও বোধ হয় তাই। অনেক কথা হলো পাকিস্তান আর ভারতকে নিয়ে। বোম্বাই থেকে আসা প্রীতম ফাতনানী দেখলাম খুবই উচ্ছল ছেলে, সবাইকে নিয়ে বেশ কয়েকটি গান গেয়ে শোনালো। কয়েক দিন পরে ভারতীয় কন্টিনজেন্টের একটি বড় অংশই আমাদের ক্যাম্পে এসে হাজির হলো। দুই দল মিলে অনেক গান গাওয়া হলো। ওদের দলে দু'তিন জন পাঞ্জাবি ছিল। দেখলাম ওরা আমাদের পাঞ্জাবিদের সঙ্গে নিজেদের ভাষায় গান ধরলো—

জাম্বুরীমে দিল বেকারার হো গেয়া
লালা সাচমুচি;
সাড্ডে মানডে ভি এথে, এতোয়ার হো গেয়ে
লালা সাচমুচি;

অর্থাৎ—জাম্বুরীতে মন উচাটন হয়ে গেছে; এখানে সব সোমবারগুলো রোববার হয়ে গেছে। এলেবেলে এক গান, সোমবারকে ইংরেজিতে 'মানডে' বলছে, আবার রোববারকে খাঁটি উর্দু বা পাঞ্জাবিতে বলছে 'এতোয়ার'। এই পাঞ্জাবি একতার উত্তরে হিমাংশুকে বল্লাম চল আমরাও বাংলাতে কিছু গাই। এক সঙ্গে গাওয়ার মত ওরকম চটুল কোন গান চট করে খুঁজে পেলামনা। তাই আমরা গান ধরলাম 'ধন ধান্য, পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা...'

আমাদের ক্যাম্পের কাছাকাছি একমাত্র ইউরোপীয় প্রতিবেশী ছিলো ফ্রান্সের স্কাউটরা। তাদের সঙ্গেও দেখাদেখি হতো, আসা যাওয়া ছিল, কিন্তু ভাষার কারণে কথা বেশি এগোতোনা। কিন্তু সারাক্ষণ ক্যাম্পে ওদেরকে গান গাইতে দেখতাম—ফরাসী ভাষার আনুনাসিক উচ্চারণে সে গান শুনতে খুব ভাল লাগতো। আমরা শুধু একটি গানে গলা মিলাতে পেরেছিলাম কুইবেকের সেই বিশ্ব বিখ্যাত লোকগীতি :

'আ-লুয়েত্তে জেঁতি আলুয়েত্তে : আ-লুয়েত্তে জেঁতে প্লুমেরাই...'।

বর্ষণ, কাদা মাখামাখি, চলাচল বিভ্রাট সব কিছুর মধ্যেও বিশ্ব জাম্বুরীর মহা আয়োজনে ও আনুষ্ঠানিকতায় কোন ঘাটতি ছিলনা। ফিলিপাইনের প্রেসিডেন্ট গার্সিয়া এতে উদ্বোধনী বক্তৃতা দিয়েছিলেন—আমরা দলে দলে মার্চ করে গ্র্যাণ্ড এরিনাতে গিয়ে সে উদ্বোধনীতে যোগ দিয়েছি। বিশ্ব চীফ স্কাউট লর্ড রাওলিনও আমাদেরকে স্বাগত জানিয়েছেন সেখানে। এর আগে আমরা ইংরেজি অক্ষরের ক্রমানুযায়ী বিন্যস্ত হয়ে নিজেদের স্থান নিয়েছিলাম এরিনাতে, যেখান থেকে ফিলিপাইন মিলিটারি ব্যান্ডের তালে তালে প্রথমে এ-তে অস্ট্রেলিয়া, তারপর বি-তে বার্মা এমনি করে নিজ নিজ জাতীয় পতাকা সামনে রেখে মার্চপাস্ট করে প্রেসিডেন্ট ও চীফ স্কাউটকে সালাম জানিয়ে গিয়েছি। এর মধ্যে আমাদের সাব-ক্যাম্পের সব দল রাতে রাতে আগুন জ্বালিয়ে ক্যাম্প ফায়ার করেছি—দুনিয়ার দেশ দেশ থেকে আসা স্কাউটদের নাচ-গান-নানা অনুষ্ঠান দেখেছি, নিজেরাও অংশ নিয়েছি।

কিন্তু এসব আনুষ্ঠানিক ঘটনার থেকে আমার মনে বেশি দাগ কাটতো অনানুষ্ঠানিকভাবে যা কিছু জাম্বুরীতে ঘটে চলছিল তা। জাম্বুরীর একটি এলাকায় সুন্দর একটি বাজার বসার মতো জায়গা ছিল। আমার কাছে একে মনে হতো গ্রামের একটি হাটখোলার মতো। বেশ চওড়া একটি রাস্তার দুপাশে চায়ের দোকান, ফান্টা-পেপসি কোলার দোকান (এই গরমের দিনে সবার খুব প্রিয়), স্কাউট টুকিটাকির ও সুভেনিয়েরের দোকান, জাম্বুরীর কিছু কিছু অফিস ইত্যাদি

ছিল—সবই অস্থায়ী স্থাপনার। রাস্তাটি যথারীতি কাদায় ভরপুর—এদিক থেকেও গ্রামের হাটখোলার মতই। আমরা যখনই সম্ভব এখানে হাঁটতে হাঁটতে চলে যেতাম—অন্যান্য ক্যাম্পের ছেলেরাও আসতো, বাইরে থেকে আসা দর্শকরা তো বটেই। ওখানে সব সময় কিছু না কিছু ঘটনা ঘটেই চলেছিল। সব চেয়ে দারুণ দৃশ্য দেখেছিলাম জাপানি স্কাউটদের শিন্টো মন্দিরের প্রতিকৃতি কাঁধে নিয়ে মুখে অদ্ভুত ধরনের হৈ হৈ শব্দ করতে করতে দৌড়ে দৌড়ে মিছিল। পরনে কিমনোর মত সনাতন জাপানি পোষাক, মাথায় সাদার উপর লাল জাপানি অক্ষর লেখা গামছার মত একটি কাপড় বাঁধা। ব্যাপারটি ঠিক যেন মহরমে আমাদের তাজিয়া মিছিলের মতো—যেভাবে লম্বা বাঁশের সাহায্যে অনেকে একসঙ্গে তাজিয়া কাঁধে নেয়—ঠিক সেভাবে। শিন্টো মন্দিরটি প্রতিকৃতিও ঠিক যেন তাজিয়ার মত। আরেক দিন দেখলাম কুয়েতের স্কাউটরা লম্বা সাদা ঝোলানো আরবি পোষাকে মাথায় সুপরিচিত আরবি মস্তকাবরণ 'কেফিয়ে' লাগিয়ে, হাতে খাড়া খোলা তলোয়ার দোলাতে দোলাতে বিখ্যাত আরবি তরবারি-নৃত্য করে চলছিল, আরবি সুরের গান গাইতে গাইতে। আবার কতগুলো জিনিস দেখতাম খুব সাধারণ—কিন্তু তাও বেশ ভাল লাগতো। যেমন একদিন অল্প বয়সের অনেক ফিলপিনো স্কাউটদের দেখলাম অদ্ভুত ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে মার্চ করছে আর তালে তালে গাইছে :

'ওয়ান-টু-থ্রি-ফোর, ওয়ান-টু, ওয়ান-টু...'।

আবার দেখলাম আর একদল গান গেয়ে গেয়ে চলছে যেন পল্লীগীতির মত সুরে :

'রাসা সাইয়াম রে, রাসা সাইয়াম সাইয়াম রে...'।

ফিলপিনোদের মধ্যে যে কত কিসিমের মানুষ আছে সেটি ওই জায়গায় গেলে ভাল বোঝা যাচ্ছিল। দক্ষিণের মিন্দানাও, সুলু, কোতাবাৎ এ সব দ্বীপের অধিকাংশ অধিবাসী মুসলিম, তাদের ভাবসাব অনেকটা ইন্দোনেশিয়ানদের মত। একটু যারা বড় তাদের অনেকের মুখে গুচ্ছ দাড়ি। পাকিস্তানি পরিচয় পেলে লম্বা করে সালাম দিয়ে কথাবার্তায় নিজেদের মুসলিম সত্তাটিকে তুলে ধরতে খুব ভালবাসে। আবার হঠাৎ হঠাৎ এমন সব মানুষকে ওখানে দেখলাম যারা খুব সম্ভব ফিলিপাইনের ছোট ছোট উপজাতীয় গোষ্ঠীগুলোর কেউ হবে। এদের চুল-দাড়ি-গোঁফ এমন অবাধ্য, পোষাক আশাক এমন অবিন্যস্ত, মনে হয় ওরা দূরান্তের কোথাও নির্বাসিত অথবা কোন গেরিলা আর্মির সৈন্য, হঠাৎ করে বের হয়ে এসেছে। গেরিলাদের কথা বিনা কারণে ভাবিনি—যুদ্ধের সময় জাপানিদের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হওয়া ফিলিপাইনের কম্যুনিস্ট গেরিলা হুক-বালাহাপ গোষ্ঠী পরে ফিলিপাইন সরকারের বিরুদ্ধে চোরা-গোপ্তা হামলা চালিয়ে পঞ্চাশের দশকেও বেশ সক্রিয় ছিল; দেশে থাকতেও তাদের কথা শোনতাম।

ঐ জায়গাটি যেন ছিল নানা দেশের স্কাউটদের একটি মিলন-বাজার, যখন যার যেমন খুশি তেমন করার জন্য। নানান দেশের ছেলে মেয়েদের ও বড়দের একত্র হয়ে আলাপের, গল্পের, গানের এক অদ্ভুত জায়গা হয়ে উঠেছিল ও-টি। পাকিস্তানের পেশোয়ার শহরে যে কিস্‌সা খানি বাজার আছে প্রাচীন কালেও নাকি সেটি ছিল। খাইবার গিরিপথ দিয়ে এশিয়া ইউরোপ থেকে যত দেশের পর্যটক, ব্যবসায়ী এখানে আসতো তাদের সকলে ওখানকার সরাইখানায় থেকে নানা দেশের গল্প করতো—সে জন্যই এই নাম। আমাদের জাম্বুরীর ওই জায়গাটিকেও আমার কাছে সারা দুনিয়া থেকে আসা দু'দিনের মেহমানদের এমনি একটি কিস্‌সা খানি বাজার বলে মনে হচ্ছিল।

শুরুতে 'মাডুরি' ইত্যাদির জন্য দুর্ভোগ পোহাতে হলেও এই দশ দিনে মাকিলিং পর্বতের ঢালে এই জঙ্গলে ঘেরা, অলিগলির জায়গাটিতে দিব্যি কায়েম মোকাম হয়ে গিয়েছিলাম। যত শেষের দিন ঘনিয়ে আসছিলো তত আতঙ্কিত হয়ে পড়ছিলাম আমাদের এই জমজমাট বিশ্ব-আড্ডা, এই কিস্‌সা খানি বাজার কি সত্যিই তা হলে ভেঙ্গে যাবে! সমাপ্তি অনুষ্ঠানটিও হলো সেই রকম একটি বুক ভাঙ্গা কান্নার মত। এবার আর ওরকম সুন্দর করে মার্চ করে গ্র্যান্ড এরিনাতে যাওয়া নয়; এ, বি, সি, ডি—ওভাবে নিজেদেরকে আলাদা আলাদা সাজিয়ে নেয়া নয়; বরং সবাই সবার মধ্যে মিশে গিয়ে এলোমেলো ভীড় করে সমবেত হলাম গ্র্যাণ্ড এরিনায়। বক্তব্য, ভাষণ, আবার দেখা হওয়ার আশা প্রকাশ, ইত্যাদি শেষ হলে সন্ধ্যার নিভু নিভু আলোতে আমরা দুই হাতে পাশের যে কোন দু'জনকে আবদ্ধ করে দুলতে দুলতে গেয়ে চলেছিলাম শেষ বারের মত দশম বিশ্ব জাম্বুরী সংগীত। গানটির করুণ সুরটি এবারই যথাযথ মনে হলো :

'মা-বু-হায় টু অল্
স্কাউট্‌স হু আর হেয়ার...
আই এম ইউর ব্রাদার অ্যান্ড ফ্রেন্ড
সো—টেইক মাই হ্যান্ড...'।

তলপিতল্পা গুটিয়ে লস বানোস থেকে আবার ম্যানিলা চলে এলাম—এই বার নগরীটি ভাল করে দেখা হলো। বড়, ঘন বসতি পূর্ণ ব্যস্ত নগরীর অভিজ্ঞতাও এই প্রথম। চোখে পড়ার জিনিস হলো সুন্দর নানা রঙে নানা ডিজাইনে চিত্রিত যানবাহন 'জিপনি'। লক্ষ্য করে দেখলাম যে নতুন উপরিকাঠামো ও চিত্র-বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে যেই মূল গাড়িটি সেটি আমার বেশ পরিচিত—ঐ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে নিলামে বেচে দেয়া সেই সামরিক জীপগাড়ি! যুদ্ধকালীন খোলা ওই জীপ গাড়িগুলো তখন চট্টগ্রামে বেশ দেখা যেত। আমার এম ই স্কুলের সহপাঠী ও বক্সীর হাটে প্রতিবেশী মির্জা আবু মনসুরদের ওরকম একটি জীপ গাড়ি ছিল বলে ওতে চড়ার সৌভাগ্যও মাঝে মাঝে হয়েছে। শুনেছি চট্টগ্রামের নাজির হাট অঞ্চলে ওই জীপ গাড়িকে সুকৌশলে সারা গায়ে এমন কি ড্রাইভারের সামনে

ইঞ্জিনের উপরও অনেক আরোহী নেবার উপযোগী করে 'চাঁদের গাড়ি' নামে ভাড়ায় খাটানো হয়েছে—আমাদের বাল্যকালের দীর্ঘ দিন পরেও। ওই জীপ গাড়িই ম্যানিলায় এসে 'জিপনি' নামে ভোল পাল্টিয়েছে।

ম্যানিলায় পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের বাসায় আমাদের ডিনারের দাওয়াত ছিল। রাষ্ট্রদূত পীর আলী মোহাম্মদ রাশেদীর নাম আমার কাছে পরিচিত—কারণ তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ আলীর মন্ত্রীসভায় তথ্যমন্ত্রী ছিলেন। রাশেদী সাহেব ছিলেন সিন্ধুর রাজনীতিবিদ। সেখানে প্রাদেশিক রাজনীতিতে পাকিস্তান আন্দোলনের সময় থেকেই বিশিষ্ট ছিলেন। তবে পেশাগত জীবনে তিনি সিন্ধুর কয়েকটি পত্রিকায় বেশ কিছুদিন সাংবাদিক হিসেবে কাজ করেছেন, নিজে পত্রিকা বেরও করেছেন। সিন্ধু প্রদেশে এবং পরে কেন্দ্রে তথ্যমন্ত্রী হবার কারণও হয়তো এটিই। তাছাড়া সিন্ধি, উর্দু এবং ইংরেজি ভাষায় সাহিত্য চর্চার জন্যও তাঁর খ্যাতি ছিল। মার্শাল ল'র পর আইয়ুব খান তাঁকে ফিলিপাইনে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করেছিলেন। রাষ্ট্রদূতের বাসায় ইউনূস ভাই আর আমি আলাদা একটু খাতির পেলাম, কারণ আমরা বেগম সাহেবার 'দেশের' লোক। তাঁর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী মমতাজ লিলি খান তুলনামূলক ভাবে অনেক কম বয়সী বাঙালি তরুণী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী। স্বামী-স্ত্রী দু'জনকেই বেশ বিদগ্ধ ও সদালাপী মনে হলো। লিলি খান তো আমাদের পেয়ে যেন হাতে চাঁদ পেলেন—কতকাল তাঁর এ ভাবে মন খুলে বাংলায় কথা বলা হয়না। ম্যানিলাতে তাঁর দিনকাল নিয়েই অনেক গল্প হলো। দেশের খবর অর্থাৎ বাংলাদেশের খবরের জন্যও মনে হয় তিনি বেশ উদগ্রীব হয়ে ছিলেন। অত্যন্ত খুশি হলেন যখন আমরা আমাদের আনা বাংলা সংগীতের টেইপগুলো দিলাম—এর কিছুটা শুনে তিনি অত্যন্ত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন। হবার কথাও বটে; কায়সার ভাইয়ের (আতাউর রহমান খান কায়সার) ইংরেজি কমেন্ট্রি সহ গানগুলো আসলেও অনবদ্য ছিল—বিশেষ করে যেভাবে ইউনূস ভাই বিভিন্ন রকমের গান নির্বাচন করেছেন। লিলি খানের উৎসাহ দেখে তাঁদের প্রচেষ্টাগুলো সার্থক মনে হলো। পুরো টেইপ কপি করে নেবার জন্য চমৎকার ব্যবস্থা বাড়িতে ছিল। আমি মনে করেছিলাম যে কপি করার জন্য বুঝি কয়েক ঘণ্টা ধরে পুরো টেইপ চালাতে হবে। না, এমন প্রযুক্তি ছিল যে দ্রুতবেগে নিমেষে পুরো টেইপ কপি হয়ে গেল।

লিলি খান এখানে তাঁর দু'তিন বছরের মেয়েকে নিয়ে খুব ব্যস্ত, আমাদের সঙ্গেই খেলছিলো মেয়েটি। বল্‌লেন তাঁর খুব ইচ্ছে মেয়েকে বাংলা শেখাবেন, কিন্তু তা করবেন কি মেয়ে নাকি তাগালোগ ছাড়া কিছুই বলতে চায়না—আয়ার কাছ থেকে শুধু সেটিই শিখছে। খুব মজা লাগলো যখন রাশেদী সাহেবের প্রথম পক্ষের বড় ছেলে মাঝে মাঝে 'মাম্মি মাম্মি' বলে লিলি খানের কাছে এটা-সেটার জন্য আসছিলেন; তাঁর বয়স লিলি খানের চেয়ে বেশি বই কম বলে মনে হলো না।

নিপ্পন এবং নিহন

কথাটি যদি স্বয়ং একজন জাপানির কাছে না শোনতাম তা হলে বিশ্বাস হতোনা। তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম সব সময় জেনে এসেছি যে নিজেদের দেশের নাম জাপানিদের কাছে 'নিপ্পন'—অর্থাৎ উদীয়মান সূর্যের দেশ। যে জাম্বুরীতে যোগ দিতে আমাদের এখানে আসা তাকে বলা হচ্ছে 'দ্বিতীয় নিপ্পন জাম্বুরী'। কিন্তু আজকাল জানছি জাপানি ভাষায় নিজের দেশ হলো 'নিহন', জাপানি মানুষ হলো 'নিহনজিন' এবং ভাষা হলো 'নিহন-গ'। এর উত্তরে তিনি বললেন "দুটি কথাই ঠিক—'নিপ্পন' ও 'নিহন' দুটিই শুদ্ধ। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হেরে যাবার আগে পর্যন্ত আমরা নিপ্পনই বেশি বলতাম—ঐ কথাটির মধ্যে একটি জোর আছে, একটি গরিমা আছে। এরপর থেকে নরম শব্দটিই বেশি ব্যবহার করছি কারণ এখন ওই রকম জোর দিয়ে কথা বলাটি যথাসম্ভব পরিহার করছি"। তাই আগে অসম্ভব জাতীয়তাবাদী অহমিকা ও আগ্রাসনের ভাব নিয়ে যাকে বলা হতো 'দাই নিপ্পন' (মহান জাপান) সেটি পরবর্তী শান্তিবাদী জাপানে আটপৌরে 'নিহনে' পরিণত হয়েছে। ওই ছেলেবেলায় জাপানে এক মাসের ওপরে থেকে আমার কাছে বরং মনে হয়েছে জোর দেয়া আর জোর না দেয়া এই দুটি রূপই জাপানিদের মধ্যে একেবারে পাশাপাশি রয়েছে। যুদ্ধের কথা তুললে তখনকার তাদের কীর্তিকলাপের যে কোন আলোচনায় তাদের একেবারে ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি অবস্থা—মনে হয় এসব ভুলে যেতে পারলে বাঁচে। তাছাড়া তাদের অন্তত বাইরের দিকটি একেবারেই নম্র, অতি ভদ্র, আমাদের শেখার অনেক কিছু রয়েছে। কিন্তু দেশটি ঘুরে দেখলেই বোঝা যায় সব গ্লানি সব ধ্বংস মুছে দিয়ে কী দ্রুত সকল মানুষকে নিয়ে কেমন চমৎকার উন্নত একটি জাতি কয়েক বছরে আবার খাড়া হয়ে গেছে, বিশেষ করে প্রযুক্তি ও ব্যবসায়ে যা করেছে তার মধ্যে কমজোর কিছু নেই।

প্রযুক্তির ব্যাপারটি জাপানে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গেই টের পেলাম। রাতের টোকিও বিমান বন্দরে বিমানের একেবারে সিঁড়ি পর্যন্ত এসেছিলো আমাদেরকে অভ্যর্থনাকারী স্কাউটদল, আর তাদের সঙ্গে প্রচুর ফটোগ্রাফার—এমন সব ক্যামেরা এমন সব ফ্ল্যাশের উদ্গীরণ করতে পারে এমনটি কখনো চিন্তার মধ্যেও আসেনি। ক্যামেরার কথা বলতে গেলে পরে দেখেছি জাপানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের হাতেও জবরদস্ত সব ক্যামেরা। নিকন, ক্যানন এসব দামি দামি ক্যামেরার কথা শ্রদ্ধাভরে এতদিন শুনেছি, কিন্তু এখানে এসে দেখলাম এগুলো সকলের হাতে হাতে। এই প্রথম দেখছিলাম একটি উন্নত দেশের চেহারা কী হতে পারে—রাস্তায়, দোকানে, ভবনে, আলোর বন্যা। ট্রেনের পুরো বগির সমান এক একটি বাস, নিয়ন বাতিতে গড়া দশাসই সব বিজ্ঞাপন, কোথাও কোথাও ছোট ছোট বাতির বিন্যাসে একটানা চলচ্চিত্র, ওভাবেই তাৎক্ষণিক খবরের প্রদর্শন—সবই চোখে পড়লো বিমানবন্দর থেকে আমাদের আপাত বাসস্থান ওয়াই এমসিএতে যাওয়ার পথেই। তবে এই সব জমকালো আলোক-বক্তব্যের কোথাও

ইংরেজির উপস্থিতি নেই বল্‌লেই চলে—বরং জাপানি লেখার নানা রূপের নান্দনিক সৌকর্য দেখেই আমাদেরকে খুশি হতে হলো, তার অর্থ বুঝে নয়। তেমনি শিগ্‌গীর দেখলাম কথাবার্তার দিক থেকেও আমরা একেবারে নাচার—এখানে কেউ ইংরেজি বলে না। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা গেছে এই ব্যবধানটি আমরা কোন না কোন ভাবে অতিক্রম করেছি। আমাদের একেবারে সঙ্গে যখন যাঁরা ছিলেন তাঁরা এক রকম ইংরেজি বলতে পারতেন—সে ট্যুরিষ্ট কোম্পানির গাইড, আমাদের হোস্ট স্কাউট দলের মাস্টার, বা এমনিতরো কেউ। পরে স্কাউটদের মধ্যে কাউকে কাউকে পেয়েছি কিছু ইংরেজি বলার মতো।

তবে জাপানে ভ্রমণকারীর সব কাজে যে জাপানি জানা প্রয়োজন হয় তা কিন্তু নয়। যেমন জাপানি জানতে হয়না টিউব ট্রেনে ভ্রমণ করতে; পরের দিনই পরিচয় ঘটলো সেই টিউব ট্রেনের সঙ্গে যা দুনিয়ার বড় বড় উন্নত নগরগুলোর প্রসঙ্গে শুনে আসছিলাম। ওয়াই এম সি এ থেকে অল্প পথ হেঁটে গেলেই এর একটি স্টেশন 'আওয়াজি চো'। একেবারে ভাষা না জেনেই একটি টিকেট হাতে থাকলে সেখানে পাতালে ডুব দিয়ে বিশাল টোকিও নগরের যে কোন স্থানে চলে যেতে পারছিলাম। এর কারণ প্রত্যেক স্টেশনের নাম ইংরেজিতেও লেখা ছিল আর এর রাস্তার নানা রুটের যে ম্যাপ তাতেও ইংরেজি ছিল। তাই কয়েক জনে মিলে আওয়াজি চোতে ডুব দিয়ে গিন্‌জা স্ট্রিটে গিয়ে ওপরে ওঠে আসতে পারলাম। গিন্‌জা টোকিওর প্রাণকেন্দ্র—সবচেয়ে আলো ঝলমল উজ্জ্বল এলাকা; শপিং, বিনোদন ও ভ্রমণের জন্য যেখানে আসতেই হয়। শুনেছিলাম এখানে এলে লন্ডনের পিকাডেলি সার্কাস বা নিউয়র্কের টাইম স্কোয়ার না দেখার আফসোস আর থাকে না। আমাদের জন্য অবশ্য যত শিগ্‌গীর সম্ভব গিন্‌জায় ছুটে যাবার একটি বিশেষ কারণ ছিল, আর সেটি প্রযুক্তি সংক্রান্ত। দেশে থাকতে পত্রিকায়, ম্যাগাজিনে দেখছিলাম যে সম্প্রতি ট্রানজিস্টর বলে একটি ইলেকট্রনিক জিনিস আবিষ্কার হয়েছে যার ফলে এতদিনকার বিশাল বপু রেডিয়োকে ছোট বই খাতার সাইজে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছে। শুধু তাই নয়—আগের রেডিয়োকে যেখানে সেটির ওজন, বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং দীর্ঘ তারের অ্যান্টেনার কারণে স্থির এক জায়গায় বসে থাকতে হতো, এই রেডিয়োকে একটি বই বা একটি খাতার মতই যত্রতত্র নিয়ে চলতে চলতেও শোনা যাবে; কারণ তার অ্যান্টেনা বড় জোর একটি পেন্সিলের মত বা তার চেয়ে খানিকটা লম্বা; সাধারণ কয়েকটি টর্চ ব্যাটারি দিয়ে সেটি চলে; আর বই খাতার মতই এটি আটোসাটো, ঠাণ্ডা (আগের রেডিয়ো বাজার সময় গরম থাকতো) এবং অভঙ্গুর! রেডিয়োসহ এই সব ট্রানজিস্টরের গড়া যন্ত্রপাতি জাপানিদের হাতে পড়েই ম্যাজিকের মত সুন্দর ও তুলনামূলক ভাবে সস্তা হয়ে ওঠেছে। সোনি, তোশিবা আর ন্যাশনালের মত জাপানি কোম্পানিদের নাম ইতোমধ্যেই আমাদের কাছে পৌঁছে গিয়েছিল।

মজার ব্যাপার হলো ওই বছরই মাত্র কয়েক মাস আগে দেশে পত্রিকার প্রথম পাতায় ছবি দেখেছিলাম সোনি কোম্পানির সদ্য বাজারজাতকৃত পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম রেডিয়োটির। এটি মোটামুটি হাতের তালুর সাইজের; একটি ধাতব হাতল আছে সেটিতে ঠেস দিয়ে টেবিলে রাখা যায়, একে হাতে ধরে বহন করা যায়, সেটিই আবার অ্যান্টেনা। মজার ব্যাপার হলো 'এগুলো বেশ সস্তা—সর্বসাধারণের জন্যই তৈরি হয়েছে।' এগুলোই ছিল গিন্‌জা স্ট্রিটে ছুটে যাওয়ার কারণ—সোনি, তোশিবা, ন্যাশনাল সবার বড় বিক্রয়-কেন্দ্রগুলোতে ওখানেই। যেহেতু টার্গেট ঠিক করা আছে, তাতে খুঁজে পেতে বেগ পেতে হলোনা—সেই বই-খাতার মত রেডিয়ো, আর হাতের তালুর সাইজের ক্ষুদ্রতম রেডিয়ো, ঠিক যেমনটি ছবিতে দেখেছিলাম। এগুলোকে সপ্তাশ্চর্যের মতো জিনিস মনে হয়েছে, কিনে মনে হয়েছে যখের ধন পেয়েছি। ন্যাশনালের সেই খাতার সাইজের রেডিয়োটি সুন্দর চামড়ার আবরণের মধ্যে যাকে বাস কন্ডাক্টরদের পয়সার ব্যাগের মত করে কাঁধে বা গলায় ঝুলিয়ে অথবা পড়ার টেবিলে রেখে এর পর আমার অনেক ক'টি বছর কেটেছে; জীবনের একটি উচ্ছল সময়ে তার সাহচর্য ভোলার নয়। সোনির তালু সাইজের রেডিয়োটি চমক হিসেবে ছিল আরো দুর্দান্ত, তবে ওই ন্যাশনালের মতো এটি দীর্ঘজীবী হয়নি। মনে রাখতে হবে চট্টগ্রামে বা ঢাকায় এগুলো এসে পৌঁছতে বা চোখে পড়তে তখনো ঢের বাকি।

সেদিন গিন্‌জায় এগুলো ছাড়াও বিশেষ করে ইউনূস ভাইয়ের কাছে আর একটি আকর্ষণ ছিল সেখানকার ক্যামেরার বন্যা—জাঁদরেল নিকন, ক্যানন থেকে শুরু করে কত রকম হতে পারে তার প্রদর্শনী। তিনি খুব ছোট বেলা থেকে ক্যামেরার সমজদার। এই ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্রায়তনকেই আমরা গুরুত্ব দিলাম। মিনোলটা কোম্পানির একটি ছোট্ট ক্যামেরা কিনলাম যেটি বলতে গেলে একটি মুঠো ক্যামেরার মত—একমাত্র জাপানি বুদ্ধিতেই বোধ হয় সম্ভব এমন একটি ক্যামেরা। একটি সিগারেট কেইসের মত জিনিস—কেইসটি খোলা বাঁধার মত করলেই পরের ছবির জন্য লোড হয়ে যায়।

অন্য একটি নতুন প্রযুক্তিকেও এ সময় সামনাসামনি পেলাম, যা পরে সাধারণ পণ্যে পরিণত হয়েছিলো; তা হলো সিনথেটিক কাপড়। আমাদের জগতে এ সময় পর্যন্ত চলছিলো কিং কটনের রাজত্ব। কাপড়ের যা কিছু ফ্যাশন তার সবই প্রাকৃতিক—প্রধানত কটন, বড় জোর সিল্ক। ওই কটনের ওপরই নানা কায়দা করে কখনো তার বের করা আঁশ ছেঁটে দিয়ে পশমী ভাব এনে 'ভেলভেট' অর্থাৎ মখমল, কখনো বিশেষ ধরনের বুনোটে চিক চিক করা 'সাটিন' যাতে একরকম সিল্কের ভাব দেয়া যায়; সব বাহাদুরি খাটানো ওই কটনের ওপরেই। আধুনিক কেমিক্যাল শিল্প নাইনলের মতো সিনথেটিক আঁশ এবং কাপড় আরো আগে উদ্ভাবন করেছিলো বটে কিন্তু তা সাধারণ মানুষের আওতায় বাজারে আসতে আসতে উৎপাদনকারী দেশগুলোতে ১৯৫৪-৫৫ সাল এসে গিয়েছিলো। জাপান

বরাবরই কাপড় তৈরিতে সামনের কাতারে ছিল, যদিও সে সময় জনপ্রিয় সস্তা মার্কেট ধরাটাই তার লক্ষ্য ছিল বেশি। সেই শিশুকাল থেকে 'গুলবাহার' ছাপের জাপানি 'থামি' ও শাড়ির কথা আমাদের গ্রামেই শুনে আসছি। এখন ইলেকট্রনিক্স ইত্যাদিতে এগিয়ে গেলেও জাপান বস্ত্র ছাড়েনি। গিন্‌জা স্ট্রিটের দোকানে 'নাইলন' এবং আরো সাম্প্রতিক 'পলিয়েস্টারের' শার্ট প্যান্ট ইত্যাদি দেখে চমৎকৃত হয়ে গেলাম। দেশে তখনো এগুলো গিয়ে পৌঁছেনি; শুধু মার্কিন মুলুকে 'ওয়াশ অ্যান্ড ওয়্যার' এই শ্লোগানে (অর্থাৎ ইস্তিরির প্রয়োজন নেই ধুয়েই পরে ফেলো) এগুলো কটনের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে এমন কথা পত্র-পত্রিকায় পড়েছিলাম। জাপানের তখনকার গণমুখী মার্কেটিঙের মধ্যে দাম এমন কিছু মনে হলোনা; তাই ঝটপট নিজেদের জন্য এবং বাড়ির ছোটদের জন্য কয়েকটি কিনে ফেল্‌লাম।

টোকিওতে ও জাপানের অন্যত্র দোকানপাটে একটি বিষয় লক্ষ্য করলাম এমন ইলেকট্রনিক্সের দেশেও দাম দস্তুর হিসেবে করে বের করার জন্য কয়েক সারি গুটি দিয়ে তৈরি ছোট 'সোরোবান' নামক সেকেলে গণনা যন্ত্র ব্যবহার করছে। আঙুল দিয়ে গুটি সরিয়ে সরিয়ে যোগ-বিয়োগ-গুণের কাজ চলছে। তখনো ইলেকট্রনিক ক্যালকুলেটর চালু হয়নি, তাই বলে এরকম গুটির গণনা যন্ত্র দেখতে পাবো এমনটি আশা করিনি।

আমরা জাপান পৌঁছে গিয়েছিলাম ৬ আগস্ট নিপ্পন জাম্বুরী শুরু হবার সপ্তাহ খানেক আগে। এই সময়ে টোকিও এবং জাপান দেখার জন্য সুন্দর আয়োজন আগে থেকে করে রাখা হয়েছিল। আবার জাম্বুরীর পরও বেশ কিছু দিন জাপান ভ্রমণ করেছি। শুরুতে টোকিয়োতে ভ্রমণ চল্‌লো বিশেষ এক ট্যুরিস্ট বাসে। যে জাপানি তরুণীটি আমাদের গাইডের কাজ করছিলেন তিনি তাঁর সীমাবদ্ধ ইংরেজি দিয়ে চেষ্টা করছিলেন আমাদেরকে সব কিছু বোঝাতে। ভাষায় যা তাঁর সীমাবদ্ধতা তা কাটিয়ে উঠছিলেন অসম্ভব মিষ্টি আচরণের মাধ্যমে—তাঁর হাসি, তাঁর কথা, এবং একই সঙ্গে বাসের কন্ডাক্টর হিসেবে তাঁর ড্রাইভারকে সহায়তা দেয়ার ভঙ্গি সবই ছিল মনে থেকে যাবার মত। কিছুক্ষণ পর পর দর্শনীয় কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর জন্য বলছেন 'প্রিজ শো রাইট' কিংবা 'প্রিজ শো লেফ্‌ট'। ইংরেজি শব্দ প্রয়োগ ও গ্রামারের সীমাবদ্ধতাটি বড় কথা নয়; দেখলাম কোন জাপানিই 'ল' অক্ষরটি উচ্চারণ করতে পারতে পারেনা। 'ল' কে সব সময় তারা 'র' তে পরিণত করে; যার ফলে তাদের কাছে 'প্লিজ' হয়ে যায় 'প্রিজ' 'লন্ডন' হয়ে যায় 'রন্ডন'। পরে ছোট ছোট কয়েকজন জাপানি ছেলের সঙ্গে একত্রে আমরা ভ্রমণ করছিলাম, আর তাদের কেউ কেউ আমাদের অনেক কিছুতে 'ল' উচ্চারণ করতে পারছিলোনা, তখন আমি তাদেরকে একটি মুখের কসরত করতে দিয়েছিলাম বার বার বলতে 'আল্লা বিল্লা তোবা তিল্লা'। ওরা চেষ্টার ত্রুটি করেনি এই কসরত করতে, কিন্তু ফলাফল শূন্য, সবগুলো ল'ই র' হয়ে গেছে, ল' থাকেনি।

কোন গন্তব্যে যখনই পৌঁছছিলাম আমাদের তরুণী গাইড বাস থেকে নেমে গিয়ে ওটি পার্ক করতে ড্রাইভারকে সাহায্য করছিলেন—ব্যাক করার সময় 'অরাই, অরাই, অরাই...' এমনি ভাবে ডেকে ডেকে। ঠিক স্কুলে যাবার আমাদের টাউন এরিয়ার বাসে কন্ডাক্টর যেমন চাটগেঁয়ে ভাষায় ডাকে 'আইয়োক, আইয়োক, আইয়োক...' সেভাবে। ভেবেছিলাম গাইড বোধ হয় জাপানি ভাষাতে আসুক, আসুক বলছেন। পরে বুঝেছি তিনি বলছিলেন 'অল্ রাইট', অল্ রাইট...' এর জাপানি উচ্চারণ! জাপানি কথ্য ভাষায় এরকম অনেক ইংরেজি শব্দকে ব্যবহারের অভ্যাস আছে, কিন্তু অনভ্যস্ত কানে বোঝা যাবেনা যে ওটি ইংরেজি শব্দ। বেশ গরমের দিন ছিলো—রাস্তায় ফল বিক্রেতারা দোকানে সুন্দর তরমুজ বিক্রি করছিল। ওতে আমাদের আগ্রহ দেখে গাইড কয়েকটি তরমুজ ফালি ফালি করে নিয়ে এলেন ছুটে গিয়ে। সবাইকে এমন ভাবে পরিবেশন করলেন যেন আমাদেরকে নিয়ে ফ্যামিলি পিকনিকে বের হয়েছেন।

সেই যাত্রায় তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন ফুজি টাওয়ার—তখন পৃথিবীর সব চেয়ে উঁচু টাওয়ার, টেলিভিশন ব্রডকাস্টের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে; ইম্পেরিয়াল প্যালেস; বিশ্ব অলিম্পিক হতে যাওয়া ন্যাশনাল স্টেডিয়াম ইত্যাদি দর্শনীয় স্থান; আর অবশ্য অবশ্যই অনেকগুলো শিন্টো মন্দির। প্রত্যেকটি মন্দিরের প্রায় একই রকম পরিবেশ—সামনে দুটি বিশাল গোল স্তম্ভের উপর আড়াআড়ি একটি সোজা বীম এবং আরেকটি উপরের দিকে বাঁকানো বীম এই নিয়ে সুপরিচিত মন্দিরের গেইট যাকে বলা হয় 'টোরি', যার সব কিছু লাল রঙের; ধাপে ধাপে বাঁকানো ছাদের মূল মন্দির, তাতে অনেকগুলো 'চোচিন' বা কাগজের লণ্ঠন, সুন্দর চৌবাচ্চায় পবিত্র পানি, লম্বা হ্যান্ডেলের বড় ডাবর চামচে নিয়ে সে পানি খাওয়া ইত্যাদি। শুধু টোকিও নয় ট্রাভেল এজেন্সির তত্ত্বাবধানে সারা হনসু দ্বীপ অর্থাৎ জাপানের বড় অংশটি যখন প্রায় এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে সমানে ঘুরে বেড়িয়েছি প্রত্যেক জায়গার কোথাও আমাদেরকে বিভিন্ন শিন্টো মন্দিরে নিয়ে যেতে ভুল হয়নি। জাপানিদের কাছে এর প্রত্যেকটির যে আলাদা তাৎপর্য, আলাদা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস রয়েছে সেটি বেশ স্পষ্ট। কিন্তু আমাদের কাছে এদের একটির থেকে আরেকটিকে তেমন আলাদা কিছু মনে হয়নি।

সাধারণভাবে জাপানিরা দেখলাম বেশ লাজুক প্রকৃতির, সেটি খানিকটা হয়তো আমাদের মধ্যে ভাষা সমস্যার কারণে। কিন্তু এই লাজুকতা মোটেই দেখা যায়না দোকানদারির ক্ষেত্রে। সেটি সুভেনিয়রের ছোটখাট দোকানই হোক আর গিন্‌জা স্ট্রিটের সোনির কেন্দ্রীয় শো-রুম দোকানই হোক, বিক্রেতারা সমানে কথা বলেন, তাদের সওদা সম্পর্কে আদ্যোপান্ত বর্ণনা দিতেই থাকেন যতক্ষণ পর্যন্ত না কাস্টমার সন্তুষ্ট হচ্ছেন—এবং তা করেন সুন্দর, নম্রভাবে। যাঁরা কিছুটা ইংরেজি জানেন তাঁরা ইংরেজিতে চেষ্টা করেন, অন্যরা আমাদের সঙ্গী জাপানি যে আছেন তাঁর মাধ্যমে এটি করেন নিজের ভাষাতেই। ব্যবসার ক্ষেত্রে সব পর্যায়েই তারা যে

খুবই এক মনে লক্ষ্যনিষ্ঠ তা খেয়াল করলাম টোকিওতে একটি ঘটনায়। আমাদের কন্টিনজেন্টের নাজির সাহেব একটি জাপানি পুতুল কেনার চেষ্টা করছিলেন বেশ জমকালো কেতাদুরস্ত একটি পুতুলের দোকান থেকে। এগুলো সনাতন কিমোনো পোষাকে ও সৌন্দর্য বিন্যাসে জাপানি মহিলার প্রতিকৃতির ঐতিহ্যবাহী পুতুল, যথেষ্ট দামিও বটে। হঠাৎ পুতুল কেনা নিয়ে নাজির সাহেবের সঙ্গে দোকানদারের একটি মতবিরোধ দেখা দিল। নাজির সাহেব দাবি করছিলেন যে তিনি টাকা দিয়ে দিয়েছেন, দোকানদার বলছিলেন তিনি টাকা পান্‌নি। এ নিয়ে মেলা তর্কাতর্কি, আমাদের দলের অনেকে জড়িয়ে পড়ল তর্কে—কিন্তু দোকানের লোকজন নির্বিকার, তারাও সমানে তর্ক চালিয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত দোকানের সব কাজ বন্ধ করে ক্যাশের সব টাকা গোণা হলো, তাদের রেকর্ডে থাকা কী কী তথ্যের সঙ্গে জানি তা মেলানো হলো, পরে রায় দেয়া হলো যে হ্যাঁ টাকা তারা পেয়েছে বটে। খুবই আনুষ্ঠানিক ভাবে আমাদের কাছে ক্ষমা চাইলেন দোকানের কর্তৃপক্ষ এই ভুলের জন্য; জাপানির ক্ষমা প্রার্থনা—সেও এক দেখার মত ব্যাপার।

'চাচা জিন্দাবাদ'

জাপানে আমাদের দিনগুলো কেটেছে সব চেয়ে বেশি একজন মানুষের সাহচর্যে, তিনি হলেন মিজনো সান ('সান' কথাটি সম্মান সূচক, যে কোন পূর্ণ বয়স্ক স্ত্রী-পুরুষের নামের পাশে, বা আত্মীয়তা সম্পর্কের পাশে লাগাতে হয়)। মিজনো সান একজন স্কাউট মাস্টার যাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল চট্টগ্রামে দ্বিতীয় পাকিস্তান জাম্বুরীতে। সেখানে তিনি ছোট জাপানি স্কাউট দলটির দলনেতা ছিলেন। সেই কারণেই খুব সম্ভব জাপানে থাকাকালে তাঁকেই সার্বক্ষণিক ভাবে পাকিস্তান কন্টিনজেন্টের দেখাশোনা করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল। ক্রমেই দেখলাম অত্যন্ত মজার মানুষ এই মিজনো সান। তাঁর সীমাবদ্ধ ইংরেজির কারণে তাঁকে আরো বেশি মজার মানুষ মনে হতো। তাঁর সঙ্গে এত অন্তরঙ্গতা হয়ে গিয়েছিলো যে দলের অনেকে তাঁকে ডাকতো 'চাচা' বলে। তাঁর বেশ রসবোধ ছিল, প্রায়ই জাপানি জীবনের অনেক কিছু তিনি মজা করে আমাদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। যখন ব্যবস্থাপনায় আশাতিরিক্ত কিছু হতো, যেমন কোন ভাল খাবার বা ভাল হোটেলের ব্যবস্থা আমাদের জন্য করতেন তখন আমরা সমস্বরে বলতাম 'চাচা জিন্দাবাদ'। জিন্দাবাদ শব্দের মাহাত্ম্য তিনি ভালই বুঝতেন—তাই খুব খুশি হতেন। আমাদের দলনেতা খান সাহেব কিন্তু প্রায়ই আড়ালে তাঁকে বলতেন মিজনোর বদলে 'মজনু' বা পাগল। তাঁর দেখাদেখি অন্য কেউ কেউও এটি বলতেন, বিশেষ করে কোন কারণে তাঁর উপর অধৈর্য হয়ে পড়লে। মিজনো সান কখনো রাগ করতেননা, বড় জোর আমাদেরকে কথা বোঝাতে না পারলে নিজের কপাল চাপড়িয়ে বেদনার্ত মুখে বিড় বিড় করে কিছু যেন বলতেন—ভাবখানা এই যেন 'তোদের আমি কখনোই বোঝাতে পারবোনা, এই

হতচ্ছাড়ার দল; পরক্ষণই কিন্তু আবার চেষ্টা করতেন বোঝাতে। জাপানি চালচলন সম্পর্কে আমি অনেকটাই শিখেছিলাম মিজনো সান থেকে; কারণ আমি তাঁকে অনেক কথা জিজ্ঞেস করতাম এবং তাঁকে অনুসরণ করতাম।

মিজনো সানের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার আর একটি কারণ ছিল যে তিনি যেই স্কাউট ট্রুপের স্কাউট মাস্টার, টোকিওর সেই ট্রুপের বেশ কয়েকজন ছেলেও ভ্রমণের একটি বড় অংশে সব সময় আমাদের সঙ্গে ছিল। এই ট্রুপটি পরিচিত ছিল তার নম্বর দিয়ে—হায়াকু নি-জু রকু অর্থাৎ ১২৬। জাপানি সংখ্যা বোঝা খুব সহজ, ১২৬ হলো—একশ (হায়াকু), দুই-দশ (নি-জু) এবং ছয় (রকু)। মিজনো সান এবং হায়াকু নি-জু রকুর ছেলেরা জাপানে আমাদের দিনগুলোকে বেশ প্রাণবন্ত করে রেখেছিলো। জনা পাঁচেক ছেলে সবাই ছোট, আমরা পাকিস্তান দলের জুনিয়রদের চেয়েও খানিকটা ছোট। ফলে ওদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা ছিল বেশি এই জুনিয়রদেরই, বিশেষ করে আমার। ওদের মধ্যে ছিল কাচ্ছান, নূরচান, মিকাচান, টেটচান। সবার নামের শেষটুকু 'চান' হবার কারণ হলো ছোট ছেলেদের নামকে আদুরে নামে পরিণত করার জন্য তাদেরকে সাধারণত এই ভাবেই ডাকা হয়। যেমন টেটচানের আসল নিজের নামটি হলো টেটসুই। ডাক নামে এর সঙ্গে চান লাগাবার সময় সুইটুকু বাদ চলে গেছে। নূরচান ছিল আমাদের মিজনো সানের ছেলে। সে বেশি কথা বলতোনা, শুধু মিষ্টি মিষ্টি হাসতো। আমার সঙ্গে বেশি খাতির ছিল কাচ্ছানের। ভারি স্মার্ট ছেলে। সে ভাষার পরোয়া বেশি করতোনা, কিছু কিছু ইংরেজি শব্দ জানতো সেগুলো যথা সম্ভব প্রয়োগ করে দেখতো। আর কিছু না পারলে খুব লম্বা করে বলতো 'ই-য়ে-স।

দেশে থাকতে ভ্রমণ শুরুর আগে আমি একটি প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছিলাম। ইউনূস ভাই একটি বই যোগাড় করে আমাকে দিয়েছিলেন—'জাপানিজ ইন এ হারি'। এতে জাপানে চলাফেরায় প্রয়োজন হতে পারে এ রকম কিছু টুকটাক কথা শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল, সেই সঙ্গে সরল বাক্য গঠন পদ্ধতি। আমি প্রায় পুরো বইটিই টাইট মুখস্ত করে ফেলেছিলাম, এমন ভাল ভাবে যে ওই জাম্বুরী থেকে দেশে ফেরার পর কোনদিন আর ব্যবহার না করলেও এখনো তার অধিকাংশই মনে আছে। কাচ্ছানদের সঙ্গে আলাপে তখন এটি বেশ কাজ লেগে গেল। ওরা আমার সঙ্গে যে ক'টি কথা ইংরেজিতে বলতে পারতো, ওই বইয়ের কল্যাণে আমি তার চেয়ে বেশি জাপানি বলতে পারতাম। আর বইটির পেছনে ইংরেজি-জাপানি, জাপানি-ইংরেজি শব্দকোষ দেয়া ছিল, তাই প্রয়োজনে দেখে দেখে শব্দ খুঁজে নিয়ে আলাপ একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। অনেক সময় কথাটির প্রয়োজন না থাকলেও নেহাত জানা একটি কথা বলে আলাপের সূত্রপাত করাটাই থাকতো উদ্দেশ্য। যেমন কাছে একটি পত্রিকা দেখে বিনা কারণে কাচ্ছানকে বল্লাম 'শিম্বোন-অ মোত্তেকিতে কুদাসাই' অর্থাৎ 'প্লিজ পত্রিকাটি একটু দেবে?' অথবা কারো টুপির দিকে দেখিয়ে বল্লাম 'কোনো বোশিও স্কী দেস'—ঐ টুপিটি আমার খুব পছন্দ'। এ সব কথার আগে জাপানিদের সবার মুদ্রাদোষ অনুসরণ করে আগে

বলে নিতাম 'আনো নে' অর্থাৎ 'বুঝলে কিনা..' স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরনের কথাবার্তা বেশিক্ষণ চালানো সম্ভব হতোনা—না আমার জাপানি, না তার ইংরেজি। কিন্তু একবার কথা শুরু হলে ভাষার জন্য আটকাতোনা—ইশারায়, হাত পা নেড়ে, বা দু'একটি শব্দের উপর ভর করে আলাপ চলতো; আর কখনো কখনো আলাপ চালাবার জন্য কাচ্ছান ভান করতো আমি জাপানি জানি; তাই নিসঙ্কোচে তার যা বলার সে জাপানিতে বলে যেতো, আর আমিও আমারটি চালিয়ে যেতাম—এমনকি ইংরেজি ছেড়ে বাংলায়ও।

কাচ্ছান ওভাবে জাপানিতে আমাকে কিছু বোঝাবার সময় যাতে ছন্দপতন না হয় সে জন্য জাপানের ভদ্রতা মাফিক একটু পরে পরে আমিও মাথা নেড়ে বলতে থাকতাম 'আহ—সো দেসকা নে' অর্থাৎ 'ওহ তাই নাকি'। যেমন একবার কাচ্ছান আমাকে একটি স্কাউট-স্কার্ফ উপহার দিলো, এতে সুন্দর চিত্রিত লিপিতে জাপানি হরফে কিছু লেখা ছিল। এটি দিয়ে কাচ্ছান আমাকে একটানা জাপানিতে স্কার্ফটির বৈশিষ্ট্য বোঝাবার চেষ্টা করছিল, আর আমিও বোদ্ধার মত 'সো দেস্‌কা', 'সো দেস্‌কা' করে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ওর কথার মধ্যে বার বার আসছিলো জাপানের যুবরাজ আকিহিতো ও যুবরাণী মিচিকোর নাম। যতবার নাম এলো ততবার আমি মাথা নিচু করে জাপানি কায়দায় উচ্ছ্বসিত হয়ে বললাম 'আহ্ আকিহিতো সামা নে', 'আহ মিচিকো সামা নে'—খুব সম্মানীয় ব্যক্তিদের নামের শেষে 'সান' না বলে 'সামা' বলাটাই শোভনীয়, তাই। সব কথা না বুঝলেও ভাবভঙ্গি থেকে এইটুকু বুঝলাম যে স্কার্ফটি সম্প্রতি হয়ে যাওয়া আকিহিতো ও মিচিকোর বিখ্যাত বিয়ের স্মারক স্কার্ফ—সেই সুবাদে এর একটি আলাদা মূল্য রয়েছে। তাই তাকে 'দোমো দোমো আরিগাতো গোজাইমাস'—অনেক অনেক ধন্যবাদ দিতে ভুললামনা।

এই বিয়ে নিয়ে তখন জাপানে তোলপাড় তুলেছিল, সে কথা দেশে পত্রিকায় পড়ে এসেছি, ছবি দেখেছি। এর কারণ ছিল জাপানে সম্রাটের স্থানটি বরাবর ছিল অনেকটা দেবতার মতো, সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধে। এই সেদিন পর্যন্ত সম্রাটকে তাকিয়ে দেখাও নাকি ছিল সাধারণ মানুষের জন্য বেয়াদবি, তিনি সামনে এলে সবাই মাথা নুইয়ে মাটিতে বসে পড়তো। যুদ্ধের পর থেকে অবশ্য সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী সম্রাটের জন্মদিনে প্রাসাদের জানালা থেকে সব মানুষকে দেখা দেন—হাজার হাজার মানুষ এসে তাঁকে সেদিন অভিবাদন জানায়, পতাকা দোলায়। কিন্তু সেটি এক কথা আর সাধারণ পরিবারের কাউকে যুবরাজের বিয়ে করা সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার। রাজ পরিবারের কারো জন্যই সাধারণ কোন নাগরিককে বিয়ে করা অকল্পনীয় ব্যাপার। আর আকিহিতো তাই করেছিলেন। টেনিস খেলতে গিয়ে এর দুবছর আগে (১৯৫৭) তাঁর পরিচয় হয়েছিল রাজ বংশের সম্পূর্ণ বাইরের একজন মেয়ে মিচিকো শোডার সঙ্গে; সেই থেকে প্রেম ও পরিণয়। জাপানের কট্টর রক্ষণশীলরা এমন কি সম্রাজ্ঞী স্বয়ং নাকি এই বিয়ের ঘোরতর বিপক্ষে ছিলেন, এবং অনেক দিন একে ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। এমনও

কথা শোনা যাচ্ছিল যে মিচিকোর বৃহত্তর পরিবার শোডা গোষ্ঠীর মানুষদের উপর এই কারণে জাপানি জঙ্গি রক্ষণশীলদের হামলা হতে পারে মনে করে তাদেরকে নিরাপত্তা দিতে হয়েছিল। কিন্তু জনগণ একে একটি রূপকথার কাহিনীর মতো দারুণ আনন্দের ঘটনা হিসেবে বরণ করেছিলো এবং শেষ পর্যন্ত তাদেরই জয় হয়েছিল। বিয়েটা হলো ১০ এপ্রিল, আর কাচ্ছান আমাকে স্কার্ফটি দিচ্ছিল একই বছরেই (১৯৫৯) আগস্টের দুই কি তিন তারিখের দিকে। তখনো সেটি বেশ টাটকা খবর। এখন অবশ্য আকিহিতো নিজেই জাপানের সম্রাট, আর মিচিকো সম্রাজ্ঞী, বহুদিন ধরেই তাই। তাঁদের আমলে জাপান সম্রাটের রীতিনীতি একেবারেই বদলে গেছে। তাঁরা অন্য যে কোন রাষ্ট্রপ্রধানের মতই সবার সঙ্গে মেলামেশা করেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ইচ্ছে মত বিয়ে থা করেছেন। কিন্তু সেদিন সেটি জাপান তোলপাড় করা ঘটনা ছিল। মজার ব্যাপার হলো সদ্য বিবাহিত তরুণ যুবরাজ আকিহিতোকে এর কয়েকদিন পর ৬ আগস্ট আমি দেখেছিলাম—যখন তিনি নিপ্পন জাম্বুরীতে আমাদের স্যালুট নিয়েছিলেন।

হায়াকু নি-জু রকুর ছেলেদের সঙ্গে একটি কাজে আমাদের কোন ভাষা সমস্যা ছিল না। তা হলো 'উতা' বা গান। কথায় কথায় আমরা বলতাম 'উতাথে কুদাসাই' অর্থাৎ প্লিজ একটি গান গাও। ওরাও বলতো, আমরাও বলতাম। কাউকেই বেশি সাধতে হতোনা। কিছু না হলে, আমরা দুই দলই মিলে গাইতাম 'উতায়ে, উতায়ে; 'উতায়ে উতায়ে'—অর্থাৎ 'গান গাই, গান গাই', এই কথাটিকে নানা সুরে গেয়ে যাওয়া।

চাচা মিজনো সান দায়িত্বশীল স্কাউট মাস্টারের মত আমাদেরকে মাঝে মাঝে বেশ খাটিয়ে নিতেন। যেমন ভ্রমণে মালপত্র বহন করার সময় কাচ্ছানদেরকে এবং আমাদেরকে সমান ভাবে দায়িত্ব দিয়ে দিতেন, অতিথি বলে বেশি খাতির করতেননা। অনেক সময় অনেকখানি পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যেতেন, যা আমরা পছন্দ করতামনা। মিজনো সান বোঝাতেন এভাবে : 'পাকিস্তানি স্কাউট্স জাপানিজ বয়েজ সাইড সাইড, ওয়াক ওয়াক ওয়াক্..।' আমরা যারা একটু আগ্রহ দেখাতাম মিজনো সান বুঝিয়ে দিতেন জাপানি নিয়ম কানুন, কাকে কি সম্বোধন করতে হবে, কি করতে হবেনা, ইত্যাদি। যখন যেখানে যেতাম সেখানকার বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর স্বল্প ইংরেজিতে তুলে ধরার চেষ্টা করতেন। ওসাকা যখন গেলাম বললেন বলতে হবে ও-সাকা। এটি নাকি অতীতে জাপানের বড় ব্যবসা কেন্দ্র ছিল, চালের ব্যবসায় জন্য বিখ্যাত ছিল; টোকিওর লোকেরা ওখানকার লোকদের কিপ্টে আর আনকালচার্ড বলে ঠাট্টা করতো। এখন কিন্তু উঠতি ইলেকট্রনিক শিল্পের একটি কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

আমাদেরকে বিশেষ ভাবে দেখানো হয়েছিলো ওসাকা দুর্গ—১৫ শতকের তৈরি জাপানি কায়দার দুর্গ—পাঁচতলা উঁচু বিশাল টাওয়ারের মত দুর্ভেদ্য একটি এলাকা, চারদিকে উঁচু দেওয়াল, পরিখা, ইত্যাদি নিয়ে পুরো এলাকাটি রীতিমত ব্যাপক। তকুগাওয়া শোগানরা যখন ১৬ শতক থেকে সম্রাটকে কিওতোতে নামে

মাত্র শিখণ্ডিতে পরিণত করে টোকিও থেকে বংশানুক্রমে জাপান শাসন শুরু করেছিলো, এই দুর্ভেদ্য ওসাকা দুর্গে স্বাধীনচেতা স্থানীয় শাসক সেসময় তাদের বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। অবশেষে টোকিও থেকে আসা তকুগাওয়া বাহিনী এই দুর্গকে পদানত করেছিল। সেই থেকে শুরু হয়ে ১৮৬৮ সালে 'মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠা' পর্যন্ত এই তকুগাওয়া শোগানরা সারা দুনিয়া থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এক আত্মকেন্দ্রিক এবং সনাতনী ধ্যান ধারণার জাপানকে শাসন করে গেছে। ওই বছর জাপান সম্রাট মেইজির ক্ষমতা পুনরুদ্ধার হবার পর শোগানদের স্থলে সম্রাটদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলো। হঠাৎ যেন সব বদলে গেল, অতি দ্রুত এক আধুনিক জাপানের জন্ম হলো। ওসাকা দুর্গের মত মধ্যযুগীয় দুর্গকে আশ্রয় করে সামুরাই তরবারি দিয়ে শাসিত জাপান মাত্র ৪০ বছরের মধ্যে পরিণত হলো সামরিক, অর্থনৈতিক এবং সব ধরনের আধুনিকতায় বৃটেন, জার্মানি, বা আমেরিকার সমকক্ষ এবং প্রতিদ্বন্দ্বী। দেখতে দেখতে ১৮৯৪ সালে বিশালাকৃতি চীন, ১৯০৫ সালে ইউরোপীয় পরাশক্তি রাশিয়া, এবং ১৯১৪-১৮ সালে প্রথম মহাযুদ্ধের মিত্র শক্তির অন্যতম হিসেবে শত্রু শক্তিকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে জাপান এই জায়গায় চলে এলো। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা এবং বাণিজ্যেও ওই একই রকম ম্যাজিক দেখালো। তাই মিজনো সান এবং অন্যান্যরা যখন জাপানের ইতিহাসের এটা-সেটা দেখান বা আধুনিক জাপানের কোন কিছুর দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তখন তার দিকে তাকাতে হয় বৈ কি!

টোকিও থেকে ওসাকা এবং ওসাকা থেকে টোকিও দ্রুতগামী ট্রেন ভ্রমণের মাঝামাঝি জায়গায় বড় স্টেশন হলো নাগোয়া। মিজনো সান জানালেন আমরা ইতোমধ্যে যে পাচিংকো খেলায় জাপানিদেরকে অত্যন্ত নিবিষ্ট দেখেছি এই নাগোয়াই হলো তার আধুনিক সৃষ্টিকেন্দ্র। এখানে নাকি অসংখ্য পাচিংকো খেলার দোকান আছে, অনেকে এখানে আসে শুধু পাচিংকোর জুয়া খেলতে। পাচিংকো খেলাটি অনেকটা বাগাডুলির মতো একটি খেলা, জাপানিরা যার সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে এক রকমের জুয়া খেলে। জাপানের সর্বত্র এটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এই বাগাডুলিটি শোয়ানো বোর্ডে নয়, খাড়া বড় মেশিন; মার্বেলের সাইজের চককে ছোট ছোট ধাতব অনেক বলকে বাইরে থেকে খেলোয়াড় দুই হাতে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ভেতর নানা অংশে বিন্যস্ত এক রকম পাখনার মত জিনিস দিয়ে বলগুলোকে নানা বাধার মধ্য দিয়ে নিয়ে গিয়ে একটি ছিদ্রের মধ্যে নিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। যতগুলো ফেলতে পারে সেগুলো জমা দিলে টাকা পাওয়া যায়। সে সময় এগুলো বাগাডুলির মতোই মেকানিক্যাল যন্ত্র ছিল, এখন অবশ্য ইলেকট্রনিক হয়ে গেছে। জাপানি সব কাজে বেশ নিবিষ্ট—সারিবদ্ধ ভাবে পাচিনকো খেলাতে যেমন, তেমনি দেখলাম বাসে ট্রেনে ওঠামাত্র এক মুহূর্ত দেরি না করে দৃশ্যত ঘুমিয়ে পড়তেও তেমন—বসেই থেকে কি দাঁড়িয়েই থেকে। আবার নিজের স্টপেজ আসা মাত্র কেমন করে জানি ঘুম থেকে লাফিয়ে ওঠে চট করে নেমেও পড়ে।

জাপানের অতি প্রাচীন রাজধানী নারা। শুধু ৭১০ সাল থেকে ৭৮৪ সাল পর্যন্ত সম্রাটের রাজধানী থাকার কারণে নয় (জাপানের ইতিহাসে এই সময়কে বলা হয় নারা যুগ), সাতটি প্রাচীন বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরের জন্যও বিখ্যাত এই শহর। এই মন্দিরগুলোও ওই নারা যুগের। এর মধ্যে শহরের মাঝখানে সব চেয়ে বিখ্যাত কফুকুজিতে আমাদের নিয়ে গেলেন মিজনো সান। সব বৌদ্ধ মন্দিরের নামের শেষে ওখানে ওই 'জি' কথাটি থাকে। এ মন্দিরের বেশ ক'টি প্রাচীন সুন্দর ভবনের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে আছে নারার বিখ্যাত সুউচ্চ পাঁচ তলা প্যাগোডা—সব কিছুতে গভীর প্রাচীনত্বের ছাপ। কাছেই খুব অন্য ধরনের বিশাল আর একটি বৌদ্ধ মন্দির টোডাইজি। এটি নাকি পৃথিবীর বৃহত্তম কাঠের তৈরি ভবন। কুফুকুজি মন্দির এবং এই আরো দু'তিনটি মন্দির সহ পুরো বিশাল এলাকা হলো নারা পার্ক। এটিও বেশ প্রাচীন, আর বহুকাল ধরে এতে রয়েছে প্রচুর হরিণ—যাদেরকে ঘিরে রয়েছে অনেক কিংবদন্তি। আমাদের আশেপাশেও বেশ কয়েকটি হরিণ ঘুর ঘুর করছিলো—এরা মানুষকে ভয় করেনা। এর কারণ মহাযুদ্ধের পর আইনটি বদলানোর আগে পর্যন্ত এই হরিণদের আইনগত মর্যাদা ছিল স্বর্গীয় হরিণের। স্বর্গীয় স্ট্যাটাসটি এখন আর না থাকলেও সব মানুষই এদের খুব যত্ন করতে ভোলেনা।

নারা পার্কের গাছের ছায়ায় বেঞ্চে বসে এসব বলতে বলতে মিজনো সানকে খুব মুডে দেখলাম। তিনি আমাদের কয়েকজনকে এ সংক্রান্ত জাপানি শব্দগুলোর তালিম দিচ্ছিলেন। বল্‌লেন 'নারা' বলতে গিয়ে খবরদার কক্ষনো 'ও-নারা' বলবেনা, কারণ তার মানে শরীর থেকে অবাঞ্ছিত বায়ু নিঃসরণ। আর একটি শব্দ নিয়ে কিন্তু মিজনো সানের সঙ্গে একটি ভুল বোঝাবুঝি সত্যি সত্যি আমাদের দলকে দূর করতে হয়েছিল। আমাদের দলের অধিকাংশ মানুষ সব সময় পাঞ্জাবিতে কথা বলছে এবং ওই ভাষায় জোর দিয়ে 'হ্যাঁ' কথাটি বলা হয় 'আহো' এই শব্দে। কাজেই সব সময় কারো কথার সঙ্গে সায় দিতে গিয়ে নানা জন 'আহো', 'আহো', এরকম বলছে। আর জাপানিতে 'আহো' শব্দের মানে হলো 'ইডিয়ট'—যা কিনা জাপানিদের জন্য জঘন্যতম গালগুলোর একটি। ওরা সহজে কেউ কাউকে কখনো আহো বলবেনা।

সনাতন ও আধুনিক

হায়াকু নি-জু রকুর ছেলেরা সব সময় স্কাউট ইউনিফর্ম পরে থাকতো। আমরাও তাই। সে না হয় আমরা স্কাউট বলে; আমাদের কায়দা কানুনের মধ্যেও অদ্ভুত একই রকম আচরণ আছে—যেমন তিন আঙুলে স্যালুট করা, বাম হাতে হ্যান্ড শেইক করা। কিন্তু জাপানে মনে হলো প্রায় সব মানুষই এক রকম ইউনিফর্ম পরে চলছে। শহরের রাস্তা ঘাটে প্রায় সব পুরুষের কালো প্যান্ট, সাদা শার্ট, আর সব মহিলারই ওরকমই কালো স্কার্ট ও সাদা টপ। কালো স্যুটের দেখাও মেলে, কিন্তু গরম কাল বলে সংখ্যা কম।

মহিলাদের মধ্যে অবশ্য কিছু কিছু সনাতন জাপানি পোষাক ঢিলেঢালা কিমনো দেখেছিলাম—সেগুলো রঙিন ও ফুলেল। সব রকম ছাত্রদেরও প্রায় একই রকম পোষাক; স্কুলের ইউনিফর্ম কিনা জানিনা সবারই ওই সাদা-কালো, তার সঙ্গে মাথায় একটি বিশেষ ধরনের ক্যাপ—ছাত্র ছাত্রী মাত্রেরই সেই একই ক্যাপ, কিছুটা বেস বল ক্যাপের মত। বিচিত্র রঙিন পোষাক দেখতে হলে ছোট শিশুদের দিকে তাকাতে হবে—আর শিশুদেরকে চারদিকেই দেখা যায়—বিশেষ করে সুন্দর জায়গাগুলোতে, পার্কে, বাগানে; সঙ্গে শিক্ষক অথবা বাবা-মা। মনে হয় ফুলের মত সাজিয়ে রাখা হয়েছে ওদেরকে। মাথায় ঢিলেঢালা ঘন্টার আকৃতির এক রকম টুপি, কান পর্যন্ত নেমে আসে। গোলগাল চেহারার এই বাচ্চাগুলোকে রাস্তাঘাটে, ফুটপাতে, চত্বরে, পার্কে—যেখানে কিছু না কিছু ঝোপঝাড় সর্বত্র আছে—দেখা যায় বড় মনোযোগের সঙ্গে ফড়িং ধরতে ব্যস্ত। ছিপের মত লম্বা কাঠির মাথায় থাকে একটি জাল, ফড়িং দেখলেই এই জাল তার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে গিয়ে তারা জালে এটি আটকায়। পরে জাল থেকে বের করে সঙ্গের ছোট্ট একটি খাঁচায় পুরে ফেলে। কোন কোন ফড়িং অথবা ঝিঁঝিঁ খাঁচার মধ্যে চি চি করে—বাচ্চারা দেখে খুব মজা পায়। এটি সর্বত্র একটি সাধারণ দৃশ্য।

শিশুরা এভাবে উচ্ছল; বালক বালিকারাও অনেকটা তাই; কিন্তু বয়স্কদের মনে হলো বেশ একটু যান্ত্রিক। ওই সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট, অথবা কালো স্যুট পরিহিত সব বয়স্ক মানুষ পরস্পর দেখা হলে কেমন যেন কিছুটা তফাতে দাঁড়িয়ে ঊর্ধ্বাঙ্গকে একেবারে ভূমি সমান্তরাল করে নুইয়ে সম্ভাষণ করেন পরস্পরকে; তাও একবার নয়, পরপর তিন বার অনেক ক্ষেত্রে। আরো মজার ব্যাপার হলে নতুন পরিচয়ের ক্ষেত্রে এর পরের কাজটি হচ্ছে চট্ করে নিজের বিজ্‌নেস কার্ডটি বের করে পরস্পরের সঙ্গে বিনিময়। জাপানে বোধ হয় সব বয়স্ক মানুষের বিজনেস কার্ড রয়েছে। এর পরই শুধু প্রশ্ন ওঠে হ্যান্ডশেইক করার। পরিচিত আপনা মানুষের সঙ্গে দেখা হলেও হৈচৈ করে হাত বাড়িয়ে দিয়ে, বা জড়িয়ে ধরে আবেগ দেখানো জাপানিদের ধাতে একেবারেই নেই। নানা জনের সঙ্গে এভাবে করতে করতে কিছুটা এরকম সম্ভাষণে আমিও অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম, একেবারে দাড়ি কমা মেনে জাপানি কায়দায় না হলেও। এমন অভ্যস্ত হয়েছিলাম যে দেশে ফিরেও অনেক দিন কারো সঙ্গে দেখা হলে মাথা অনেক খানি ঝুঁকিয়ে হ্যালো করতাম দেখে বন্ধুরা ঠাট্টা করতো।

জাপানে আমাদের ভ্রমণ পরিকল্পনা যাঁরা করেছেন তাঁরা জাপানের ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে কোন কার্পণ্য করেননি। এই সংস্কৃতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে প্রকৃতি ও মানুষকে এক করে তোলা—ঐ শিশুদের ঝোপঝাড়ে ফড়িং খোঁজার মধ্যেও যা আমরা দেখেছি। টোকিও থেকে শ'খানেক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে পার্বত্য নিবাস হেকোনে। এটি একটি ন্যাশনাল পার্ক-পর্বত ও হ্রদ সুশোভিত, অনেকের গন্তব্য জাপানের

প্রতীক আগ্নেয়গিরি ফুজিয়ামার থেকে খুব দূরে নয়। এখানে আমাদের থাকতে দেয়া হয়েছিলো সনাতন জাপানি কায়দার এক সরাইখানায়। ওখানে সবাই জাপানি পোষাক কিমনো পরা। নিজেদের বাড়ির পরিবেশে এখনো অধিকাংশ জাপানিরা যে জীবনযাত্রা অনুসরণ করে এখানে সব কিছু আছে ঠিক সেভাবেই। ঘরের বাইরে জুতা খুলে রাখতে হলো, দেয়া হলো সুন্দর নরম স্যান্ডেল। ঘরের মেঝে সম্পূর্ণ খড়ের মাদুরে মোড়া। খাওয়া হলো মেঝেতে ছোট ছোট মাদুরে বসে সামনে অনুচ্চ টেবিলে। পরিচারিকা পরিবেশন করলেন জাপানি কায়দায় হাঁটু গেড়ে বসে। যে ঘরে শুলাম তাতে কোন আসবাব নেই। মেঝেতেই বিছানা পেতে শোওয়া। এক পাশে বড় একটি চিত্র, ছোট একটি টুলে একটি ফুলদানিতে জাপানের বিখ্যাত ইকেবানা কায়দায় ফুলসজ্জা। পরদিন গোসলের ব্যবস্থাটি থাকলো আরো চমকে দেবার মত। বড় ঘরে বিরাট সুন্দর চৌবাচ্চায় কুসুম গরম পানি। তার মধ্যে নগ্ন স্নানে সরাইখানার আরো মেহমান। ট্রাভেল এজেন্সি থেকে আসা আমাদের গাইড সে ভাবেই ওতে শামিল হয়ে গেলেন, আমরা পারলামনা। স্কুলের বইতে পড়েছিলাম অতীতে বাড়িতে বাবা মা ছেলে মেয়ে সবারই এক সঙ্গে বড় চৌবাচ্চায় নগ্ন স্নান জাপানের নিয়মিত ব্যাপার ছিল, সে অনেক দিনের পুরোনো রেওয়াজ।

টোকিওর কাছে আর একটি জায়গা কামাকুরায় গেলাম প্রধানত ব্যতিক্রমী বিশাল একটি উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্তি দাইবুৎসু (গ্রেট বুদ্ধ) দেখতে—১২৫২ সালে তৈরি এ মূর্তি ব্রোঞ্জে গড়া। প্রায় ১২ মিটার উঁচু এবং ১২টনের বেশি ওজনের এত বড় ধাতব মূর্তি ঢালাই করা কেমন করে সম্ভব হয়েছে এটি এখনো একটি রহস্য। মূর্তিটিতে বুদ্ধের দেহাবয়বের সবকিছু নিঁখুত ভাবে আনতে গিয়ে অনেক প্রযুক্তিগত সমস্যা অতিক্রম করতে হয়েছে, যা আজকের প্রযুক্তিতেও খুবই কঠিন কাজ মনে হয়। আসলে আমরা মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাল অর্থাৎ ১৮৬৮ থেকে আধুনিক জাপানের কথা বলি বটে—কিন্তু তার প্রযুক্তিগত উৎকর্ষের কথা যদি বলি তা হলে এখানে এর বিকাশ অতি প্রাচীন। এই জাপানেই হাজার দশেক বছর আগে মানুষ সর্ব প্রথম পোড়া মাটির পাত্র তৈরি করেছে। আর যে সামুরাই তরবারি মাত্র দেড়শ' বছর আগেও জাপানের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র ছিল ওই বন্দুকের যুগেও, তার নির্মাণ কৌশল জাপানেরই একান্ত অতীত আবিষ্কার। শুধু ধাতু-কৌশলে নয় প্রাচীন কাল থেকে আরো বহু হস্ত-শিল্পে জাপান যে দক্ষ, এবং এখনো যে এর উপর প্রচুর গুরুত্ব দেয়া হয়, তা বুঝলাম এখানকার কয়েকটি হস্ত-শিল্প পল্লী দেখে। এখানে অনেকের কর্মসংস্থান হচ্ছে কাঠের খোদাই, পুতুল তৈরি, গৃহ সজ্জা ইত্যাদির উপর কাজ করে। তাঁদের কাজ যেমন ঐতিহ্যবাহী, পোষাক আশাকও তেমনি খাস জাপানি—কিমনো, মাথায় পট্টি ইত্যাদি। খুব মজা লাগলো যখন দেখলাম লোকজন খড়ম পায়ে রাস্তায় চলাফেরা করছে, যা কিনা আমাদের খড়মের চেয়ে বেশি ভারি, বেশি দৃষ্টিনন্দন। এখানেই আমাদের খান সাহেব এক বৃদ্ধের সঙ্গে রসিকতা করতে গিয়ে ফাউল করেছিলেন, যে কথা আগে বলেছি।

শুধু খড়মের মধ্যে যে আমাদের দেশের সনাতন কায়দা কানুনের সঙ্গে জাপানের মিল খুঁজে পেলাম তাই নয়। দুনিয়ার সর্বোচ্চ উন্নত দেশগুলোর একটি হয়েও বেশ কিছু ব্যাপারে জাপান আমাদের দেশের মতোই। আমরা যে সব জায়গায় থেকেছি অধিকাংশ জায়গায় দেখেছি টয়লেটগুলোতে ইউরোপীয় কমোডের বদলে রয়েছে আমাদের দেশীয় কায়দার প্যান। কোন কোন মন্দিরে দেখলাম নানা মানত করে সুতা টাঙ্গিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা। শোনলাম খুবই আধুনিক হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসা নেবার সময়ও অনেক রোগি শরীরে বিভিন্ন বাঁধন ব্যবহার করে নানা নানা 'কামি' বা দেবতার বাড়তি সহায়তা নেবার চেষ্টা করে। কাজেই অতীতের ধারাবাহিকতা বিবেচনা করলে উভয়ে প্রাচ্যের দেশ হিসেবে আমাদের দেশের সঙ্গে জাপানের যে একটি সাযুজ্য ছিল, এখনো যে আছে, সেটি বেশ বুঝতে পারছিলাম।

তাখারাজকা নামের একটি শহরে আমরা গেলাম অদ্ভুত রকম একটি অনুষ্ঠান দেখতে। এই জায়গার খ্যাতিই হচ্ছে এখানকার 'তাখারাজকা রিভ্যু' নামে পরিচিত মিউজিক্যাল থিয়েটার। এতে স্টেজে এক সঙ্গে শত শত অভিনেত্রী-নর্তকীকে অভিনয় করতে দেখলাম—এক জাপানি লোককাহিনীর মিউজিক্যাল রূপান্তর। এখানে সব শিল্পীই মেয়ে—পুরুষের ভূমিকাগুলোও মেয়েরা পুরুষ সেজে অভিনয় করে। এটি এই থিয়েটারের বড় বৈশিষ্ট্য। সারা জাপানে অনেক মেয়ের সখ তাখারাজগার শিল্পী হবে—এজন্য ছোটবেলা থেকে তাখারাজগায় গিয়ে সেখান থেকে তাদেরকে কঠিন প্রশিক্ষণ নিতে হয়, অনেক প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে বাছাই হতে হয়। এটিও আমাকে আমাদের দেশের যাত্রা দলের শিল্পীদের কথা মনে করিয়ে দেয়—গ্রাম গ্রাম থেকে এসে অনেকে ছোটবেলায় শুরু করে এ অভিনয়ে পারদর্শী হয়ে ওঠে, যাত্রা দলের সঙ্গে নিজের সারা জীবনকে জড়িয়ে নেয়। তবে সবাই মেয়ে-শিল্পী হওয়া ছাড়াও এবং আকারে প্রকারে অনেক বড় মাপের রঙ্গমঞ্চ হওয়া ছাড়াও আরো কিছু দিক থেকে তাখারাজগা যাত্রার থেকে আলাদা। এর অধিকাংশ দর্শকও মহিলা! আর এখানকার খ্যাতনামা শিল্পীদের যে অসংখ্য ভক্ত আছে তারাও অধিকাংশ মহিলা!

প্রাচীন কাল থেকে জাপানের মধ্যে সৌন্দর্য সৃষ্টি ও নান্দনিকতার যে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তার থেকে আমাদের শেখার অনেক বিষয় দেখলাম। পর্বতের বেশ উঁচুতে শৈলাবাস নিক্কোতে গিয়ে এটি বেশ টের পেলাম। জাপানে একটি প্রবাদই আছে 'কেক্কো' কথাটি বলবেনা যতক্ষণ তুমি নিক্কো না দেখেছে"। কেক্কো কথাটির মানে হলো 'নিখুঁত সুন্দর'। প্রকৃতি যেরকম তার সব ক'টি সম্পদ দিয়ে একে সাজিয়ে দিয়েছে সেটি যেমন চমকপ্রদ; তেমনি একে যেভাবে চমৎকার যত্নে রক্ষণ করে নান্দনিকতার সঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে তাও কম কিছু চমকপ্রদ নয়। নানা জলপ্রপাত, আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে জলজমা হ্রদ, পার্বত্য ঝরনা, খাড়া জিগজাগ রাস্তা, সব কিছুকে মিলিয়েই একটি কেক্কো নিক্কো সৃষ্টি হয়েছে। আবার

এখানকারই তোশুগা মন্দিরে রয়েছে সেই বিখ্যাত তিনটি বানর মূর্তি; এগুলোর একটি দুই হাত দিয়ে নিজের চোখ ঢেকে রেখেছে, একটি কানে হাত দিয়ে তা ঢেকে রেখেছে, আর একটি মুখে হাত দিয়ে মুখ চেপে রেখেছে। 'আই সি নো ইভিল', 'আই হিয়ার নো ইভিল,' 'আই সে নো ইভিল'—এই নামে এই তিন বানর দুনিয়া জোড়া মশহুর।

হাজারো স্কাউটদের 'কোকোরো'

আইবানোতে বিওয়া হ্রদের তীরে তাঁবু পড়েছে আমাদের হাজার হাজার স্কাউটের—এখানেই ৬ থেকে ১০ আগস্ট ১৯৫৯ অনুষ্ঠিত হয়েছে 'দ্বিতীয় নিপ্পন জাম্বুরী'। 'কোকারো' কথাটি আমাদের জাম্বুরী সংগীতেরই একটি কথা এর অর্থ হৃদয়—'স্কাউটদের এই মেলা আমাদের হৃদয়ের মেলা, ভালবাসার মেলা' এ কথাই বলা হয়েছে এই জাম্বুরী সংগীতে। এই ক'দিন হায়াকু নি-জু রকুর কয়েক জনের স্কাউটদের মধ্য দিয়েই চিনেছি জাপানি স্কাউটদেরকে, এখন আমরা এসে পড়েছি হাজার হাজার স্কাউটদের মধ্যে যাদের অধিকাংশই জাপানি। আমাদের সেই কমলা রঙের ছয়টি ছোট তাঁবু এর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে। আশে-পাশের জাপানিদের তাঁবু ছাড়া আর দুই দেশের ক্যাম্প দেখছি, এর মধ্যে একটি হলো ওকিনওয়া—যাকে দেশ বলা যায়না; আর অন্যটি হলো যুক্তরাষ্ট্র। ওকিনওয়া বলে যে একটি জায়গা আছে তা এখানে এসেই জানলাম।

ওকিনওয়া হচ্ছে জাপানের একেবারে দক্ষিণে শত শত ছোট দ্বীপ নিয়ে গড়া রিউ কিউ নামের দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণের অংশ। এখানকার আদি বাসিন্দারা ঠিক জাপানি নয়, ১৬ শতক থেকে এখানকার স্বাধীন রাজারা জাপানের তকুগাওয়া শোগানদের করদ রাজ্য হয়ে পড়েছিল। তবে ১৮৬৮ সালে মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার পর পর সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে একে পুরোপুরি জাপানের অঙ্গীভূত করে ফেলা হয়। কিন্তু ১৯৪২-৪৫ এর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় দীর্ঘ যুদ্ধের পর আমেরিকানরা জাপানের এই অংশটি দখল করে নেয়। শুধু এর শেষ আক্রমণ (১৯৪৫) 'ওকিনওয়ার যুদ্ধেই' এই অঞ্চলের এক চতুর্থাংশ বেসামরিক জনসংখ্যা নিহত হয়েছিলো। এরপর ২৭ বছর এটি সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের সেনা বাহিনী শাসিত একটি বিশেষ অঞ্চল ছিল। আমরা যখন নিপ্পন জাম্বুরীতে, তখন ওকিনওয়ার এই অবস্থাই ছিল। সে জন্যই তাদের স্কাউট ট্রুপ ওকিনওয়ার নামেই জাম্বুরীতে এসেছিলো। এর বহু পরে ১৯৭২ সালে আমেরিকা জাপানের কাছে ওকিনওয়ার শাসনভার ফেরত দেয়, কিন্তু তারপরও এখন পর্যন্ত জাপানের অংশ হয়েও মার্কিন সামরিক ঘাঁটিই ও জায়গার গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক স্থাপনা।

জাম্বুরীতে ওকিনওয়া ট্রুপের পোষাক ইত্যাদির মধ্যে জাপানি স্কাউটদের থেকে আমেরিকান স্কাউটের মিলই বেশি দেখতে পেয়েছি, আরো সঠিক ভাবে বলতে গেলে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সঙ্গেই যেন মিল। যেমন স্কাউটদের সবার

শার্টের পকেটের উপর যার যার নাম বড় হরফে ইংরেজিতে লেখা ছিল। ওদের টুপি ছিল মার্কিন এয়ারফোর্সের টুপির মত। ওরা ভাল ইংরেজি বলে, তাদের স্কাউট মাস্টারদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আমেরিকান আছেন। জাম্বুরীতে আমাদের প্রতিবেশী হওয়াতে এবং ইংরেজি জানাতে ওকিনওয়ার স্কাউটদের সঙ্গেই কথা বেশি হয়েছে আমাদের। ওদের মধ্যে জাপান সম্পর্কে তেমন উচ্ছ্বাস দেখলাম না, বরং আমেরিকার সম্পর্কেই তা বেশি। খুব সম্ভব তাদের অনেকেই মনে মনে চাইছিল যে এটি কখনোই আর জাপানের কাছে ফেরত না যাক—বরং আমেরিকান অভিভাবকত্বে স্বাধীন দেশ হোক। যুদ্ধের পর পর এ নিয়ে একটি বড় আন্দোলন ওখানে থাকলেও তখন সেটি কিছুটা ঢাকা পড়েছিল—জাপান-মার্কিন সম্পর্কের খাতিরে। ওকিনওয়ার মানুষের নৃতত্ত্ব, এবং ওদের ইতিহাস ইত্যাদির কথা তারা বেশ উৎসাহের সঙ্গে আমাদেরকে বলতো।

আমাদের অন্য প্রতিবেশী ছিলো মার্কিন স্কাউটদের ক্যাম্প—এটি একটি বিরাট ক্যাম্প। এর সঙ্গেও ছিল সামরিক সম্পর্ক, এবং জাপানি সম্পর্ক। দেখলাম ক্যাম্পে নেতৃত্ব স্থানীয় অনেক স্কাউটারকে অন্যরা সম্বোধন করছে 'সার্জেন্ট' হিসেবে। স্পষ্টত এখানকার অনেকে এসেছে জাপানে ও কাছাকাছি জায়গায় বিভিন্ন মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থেকে। ওদের মধ্যে বালক বয়সের স্কাউটদের একটি বড় অংশ ছিল জাপানি-আমেরিকান। ওদের অধিকাংশই 'নি-সেই' অথবা 'সান-সেই'। এই কথাগুলো আমরা শুনেছি ওদের ওখানে গিয়েই। নি-সেই এর অর্থ জাপানি ভাষায় দ্বিতীয় প্রজন্মের মানুষ—অর্থাৎ আমেরিকায় বা অন্যত্র জাপানি অভিবাসীদের সন্তানরা। মূল অভিবাসীদের নাতি নাতনীরা হচ্ছে সান-সেই অর্থাৎ তৃতীয় প্রজন্মের মানুষ। এরকম অধিকাংশ জাপানি অভিবাসী আমেরিকায় গিয়েছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রধানত কালিফোর্নিয়াসহ আমেরিকার পশ্চিম দিকের অঙ্গরাজ্যগুলোতে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় অভিবাসী সকল জাপানি পরিবারগুলোকে শত্রু ভাবাপন্ন হিসেবে আখ্যায়িত করে বিশাল বিশাল বন্দী শিবির বানিয়ে অন্তরীণ করা হয়—স্ত্রী-পুরুষ-শিশু সবাইকে। এই বিষয়টি পরে আমেরিকায় অনেক তিক্ততা সৃষ্টি করে। নি-সেই ও সান-সেইদেরকে জাম্বুরী উপলক্ষে তাদের পূর্ব পুরুষের দেশ জাপান সফরের সুযোগ দিয়ে সেই তিক্ততা কিছুটা দূর করার চেষ্টা করা হয়েছিল।

জাম্বুরীতে জাপানের নিজেরও কিছু তিক্ততা দূর করার চেষ্টা ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই প্রথম বার যুদ্ধের সময়কার জাপানি অধিকৃত দেশগুলোর তরুণদেরকে জাপানে অভ্যর্থনা জানিয়ে তাদের দুঃসহ স্মৃতিগুলোকে ভোলাবার চেষ্টা করা হয়েছে। বিশেষ করে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়ের মানুষদের অনেক দগ্‌দগে ক্ষত ছিল এই যুদ্ধ নিয়ে। এই ক্ষত এমন যে জাপানি পতাকা এবং জাপানি জাতীয় সংগীত পর্যন্ত ওসব দেশে এখনো ভীতির সঞ্চার করে। ফিলিপিনো ও ইন্দোনেশীয় স্কাউটাররা বিশ্ব জাম্বুরীতে আমাদেরকে বলেছিলো যে

সে সময় তাদের সবাইকে ওই জাতীয় সংগীত গাইতে বাধ্য করা হয়েছে নিয়মিত সব জায়গায়—স্কুল-কলেজেও; আর ওড়াতে হয়েছে ওই পতাকা। এই দুইয়ের সঙ্গে তাদের অনেক নির্যাতনের স্মৃতি রয়েছে। সাদা জমিনের উপর লাল সূর্য আঁকা জাপানের যে পতাকা একে বলা হয় 'হিনোমারু' (অর্থাৎ সূর্যের বৃত্ত)। যদিও এই পতাকা অনেক প্রাচীন, শোগানদের কালেও ব্যবহৃত হয়েছে, মেইজি পুনঃপ্রতিষ্ঠার থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত এই হিনোমারু উগ্র জাতীয়তাবাদী ও আগ্রাসী জাপানের প্রতীক হিসেবে জাপানিরা ব্যবহার করে এসেছে। এ জন্য ১৯৪৫ এর পর মার্কিন দখলদারিত্বের সময় এই পতাকা প্রদর্শন সীমিত করে দেয়া হয়েছিল। তার চেয়েও বেশি ভীতিপ্রদ ছিল আর একটি পতাকা যাতে সাদার উপর লাল সূর্য মাঝখানে থাকে বটে কিন্তু তার থেকে পতাকার কিনারা পর্যন্ত ক্রম প্রসারিত ষোলটি লাল মোটা সূর্যরশ্মিও থাকে। এটি ছিল জাপান নৌবাহিনীর পতাকা, এখনো তাই—তখন ব্যবহৃত হতো জাপানি আগ্রাসনের বেপরোয়া ঝাণ্ডা হিসেবে। এটি জাপানের জনগণের মধ্যে যুদ্ধ-উন্মাদনা তৈরি করতো, আর অধিকৃত দেশ সমূহে সঞ্চার করতো প্রচণ্ড ভীতির। কিন্তু যুদ্ধের পর আমাদের ভ্রমণের কালেও জাপানিরা নিজ থেকেই এর ব্যবহার কিছুটা সীমিত রেখেছিলো এর অতীত অনুষঙ্গের কারণে। জাম্বুরীতে ঘুরে এই ধারণাই হলো যে কোন কোন দেশের অভ্যাগতের মনে যেন কষ্ট না হয় সেই ব্যাপারে জাপানিরা সচেতন ছিল। জাপানের জাতীয় সংগীতেরও তখন সেই একই অনুষঙ্গ। তবুও জাপানি স্কাউটদের ক্যাম্পে ক্যাম্পে নানা অনুষ্ঠানে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়িয়ে বেশ কয়েকবার এ গান শুনেছি। এটি নাকি দশম শতাব্দীতে রচিত—সেই হিসাবে দুনিয়ার সব চেয়ে প্রাচীন জাতীয় সংগীত। খুবই সংক্ষিপ্ত এই সংগীত মূলত সম্রাট বন্দনা, এর নামও হলো 'কিমিগাওয়া' অর্থাৎ মহান সম্রাটের রাজত্ব। অধিকৃত দেশগুলোতে মানুষকে এটি গাইতে যখন বাধ্য করা হতো, তখন এর কথাগুলো তাদের গায়ে কাঁটা ফুটাতো বৈ কি :

> "তোমার রাজত্ব হাজার বছর অক্ষয় থাকুক
> হে প্রভু, তুমি শাসন করে যাও, যতদিন না আজকের নুড়িগুলো
> সময়ের সঙ্গে একত্রে জমাট বেঁধে দুর্ভেদ্য পাথরে পরিণত হবে,
> আর তার পবিত্র গাত্রে জমবে সুদৃশ্য শ্যাওলা।"

আধুনিক জাপানে এই জাতীয় সংগীত চলতে পারে কিনা, তা নিয়ে দারুণ বিতর্ক ছিল। কিন্তু তবুও কিমিগাওয়া এখনো জাপানের জাতীয় সংগীত।

এহেন জাপানের রাজন্যের সাক্ষাৎ আমি সামনে থেকে পেলাম যখন জাম্বুরী আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করলেন যুবরাজ আকিহিতো। সেদিন ছিল অঝোর বৃষ্টির দিন। এর মধ্যে মার্চ করে গেলাম, আমরা কয়েক হাজার স্কাউট—সবাইকে বৃষ্টিতে ভিজতে হলো। তবে যুবরাজকেও যে বৃষ্টিতে নাকাল হতে হলো সেটি দেখে অবাক হলাম। যেখানে তিনি ও অন্য ভিআইপি'রা ছিলেন সেখানেও উপরে

বৃষ্টিরোধক কোন ছাদ ছিলনা। কাজেই যুবরাজ আকিহিতোকে বৃষ্টির মধ্যেই দাঁড়াতে হলো বর্ষাতি পরে। একজন তাঁর মাথার উপর একটি ছাতা ধরে রাখলেন। এক পর্যায়ে যুবরাজ নিজের হাতে তাঁর জুতো খুলে সেখান থেকে কিছু পানি বের করে নিলেন। এর মধ্যে আমরা কিছুটা ঢিলে-ঢালা ভাবে মার্চ করে গেলাম। যুবরাজের সামনে যখন পৌছলাম তাঁর দিকে মুখ ঘুরিয়ে তিন আঙুলের স্কাউট স্যালুট দিলাম। জাপান যে কত বদলে গেছে তা আমার কাছে ওই দিনই খুব স্পষ্ট হয়ে গেল। এই সেই জাপানের ভাবী সম্রাট, যার দিকে মুখ তুলে তাকানোই একদিন নিষিদ্ধ ছিল। আমরা যেমন ঢিলে-ঢালা ভাবে সামনে দিয়ে গেলাম, জাপানি ছেলেরাও সেভাবেই গেল। যুবরাজ নিজেও একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবেই অন্তরঙ্গ ভাবে নিজকে উপস্থাপিত করেছিলেন।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় দেখলাম কখনো আমাদের পিছু ছাড়েনি। নিপ্পন জাম্বুরির তৃতীয় দিন। হঠাৎ 'হোম্বু' অর্থাৎ হেডকোয়ার্টার্সের তরফ থেকে ওসেরাই সান এসে জানিয়ে গেলেন আবহাওয়া অফিস বলেছে টাইফুন হতে পারে। আমরা যাকে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড় বলি জাপানিরা তাকে বলে টাইফুন। কাজেই নানা সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। এই হোম্বুতে আমাদের কয়েক বার আসা যাওয়া করতে হয়েছে—রেজিষ্ট্রেশন, রসদ যোগাড় ইত্যাদি কাজে। তার চেয়ে বেশি ওসেরাই সান আসতেন। তিনি ছিলেন জাম্বুরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আমাদেরকে দেখাশোনার কাজে নিয়োজিত। মোটামুটি ভাল ইংরেজি বলতে পারতেন, কিন্তু তবুও কেমন যেন নার্ভাস নার্ভাস চেহারা ছিল তাঁর। আমাদের নানা কৌতূহল তাঁকে প্রশ্ন করেই মেটাতাম। ওসেরাই সান শেখালেন টাইফুন প্রস্তুতির জন্য কী করতে হবে। দরকারি সবকিছু তাঁবুর মধ্যে নিয়ে রেখে তাঁবুর দড়াদড়িগুলো অনেক বেশি শক্ত করতে হলো। কোমর বেঁধে লেগে গেলাম এসব কাজে। সেই যাযাবরের মত তাঁবুজীবনে বড় কোন টাইফুনের অভিজ্ঞতা যে ভাল হবেনা তা বেশ বুঝতে পারছিলাম। তেমনটি হলে আমাদেরকে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা ছিল। আপাতত কাছের আমেরিকান ক্যাম্পে গিয়ে আশ্রয় নিলাম। এদের বিরাট শক্ত তাঁবু। টাইফুনের জন্য তা আরো শক্ত করা হয়েছে; একে বেশ নিরাপদ মনে হলো। সন্ধ্যার দিকে বাতাসের গতি আস্তে আস্তে বাড়ছিলো। টাইফুন এলো রাতে; মাঝারি গোছের টাইফুন, কিন্তু আমাদের খেলনার মত ছোট তাঁবুগুলো উড়িয়ে নিয়ে যেতে সেটিই যথেষ্ট ছিল। আমরা মার্কিন আশ্রয়ে নিরাপদে টাইফুনের সময়টি কাটিয়ে দিতে পারলেও চারদিকে সব কিছু লণ্ড ভণ্ড হয়ে গেল। পরদিন আশপাশে একটু ঘুরে দেখলাম। দেখলাম খালি গায়ে জাপানি ছেলেরা সব কিছু জোড়া তালি দেবার কাজে লেগে গেছে। আমরাও তাই করলাম। সদা-প্রস্তুত স্কাউটদের কর্মক্ষমতার পরিচয় দেবার এই তো মোক্ষম সুযোগ।

আগের জাম্বুরীগুলোতে যে রকম 'এনিথিং টু এক্সচেঞ্জের' হিসেবি অভ্যাস গড়ে উঠেছিলো, তা নিপ্পন জাম্বুরীতে বেশি কাজে লাগলোনা। বরং প্রতিদিন যে

সব দর্শক আমাদেরকে দেখতে এসেছে তাদের কেউ কেউ আমাদের জন্য নিয়ে এসেছে নানা উপহার—এটি জাপানি আতিথ্যের একটি পরিচয়। জাপানি পুতুল, খেলনা, বিচিত্র জাপানি হাত-পাখা, ছবি আঁকা চীনা মাটির পাত্র, কাগজের ছাতা, কাগজের লণ্ঠন—এসব জিনিসই ছিল বেশি। একটি মেয়ে আমাকে উপহার দিল তাদের জাতীয় পোষাক একটা কিমোনো।

'সায়োনারা'

জাম্বুরীর পর আবার যখন জাপানের নানা জায়গায় ঘুরছি, তখন খুব আশা ছিল যে ওরা আমাদেরকে হিরোশিমা অথবা নাগাসাকি দেখাবে। বিশেষ করে হিরোশিমার খুব কাছে দিয়ে যাবার সময়ও যখন এ সম্পর্কে কিছু বল্‌লোনা তখন একটু নিরাশ হলাম। কয়েক দিন আগে ৬ই আগস্ট দিনটি আমাদের জাপানেই কেটেছে—এটি হিরোশিমা দিবস। ওই দিন সকাল বেলায় অ্যাটম বোমা ফেলে এই শহরটিকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছিল, আর শহরের প্রায় সব মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল, অথবা মারাত্মক ভাবে আহত করা হয়েছিল। সেটি ছিল মাত্র চৌদ্দ বছর আগের কথা। কিন্তু শোনলাম ওখানে রেখে দেয়া একটি ভাঙ্গা ভবন ছাড়া, এই ধ্বংস যজ্ঞের কোন চিহ্নই অবশিষ্ট নেই। এখন এটি আগের মতই একটি রমরমা শিল্প শহর।

১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস। এটি আমরা উদযাপন করলাম রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী বগুড়ার বাড়িতে। কয়েক বছর আগে চট্টগ্রাম রেল স্টেশনে ভীড়ের মধ্য দিয়ে ঢুকে গিয়ে তাঁকে দেখেছিলাম পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী রূপে। আর এই আবার দেখলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে। এবার তাঁর বাড়িতে আমরা মেহমান, তিনি ও তাঁর স্ত্রী সবার খোঁজ খবর নিচ্ছেন। বাঙালি আমাদেরকে দেখে একটু বাংলায় কথা বলার চেষ্টা করলেন, খুব ভাল বলতে পারেননা। টোকিওতে কয়েকজন পাকিস্তানি ছাত্র পড়াশোনা করে, তাঁরাও এই উপলক্ষে রাষ্ট্রদূতের বাসায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে একজন বাঙালি। ওরা সবাই খুব ভাল জাপানি জানে। এ ভাষা না জানলে এখানে পড়াশোনা করার উপায় নেই। ১৯৫৫ সালে প্রধানমন্ত্রীত্ব হারাবার পর থেকে মোহাম্মদ আলী আবার আমেরিকার রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োজিত হন ও পরে জাপানের রাষ্ট্রদূত হন। আরো পরে ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান তাঁকে দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী পদে নিয়োগ দেন এবং এ পদে থাকা অবস্থাতেই পরের বছর তাঁর মৃত্যু হয়।

টোকিওতে আমাদের শেষ অনুষ্ঠানটি ছিল একটি টেলিভিশন সম্প্রচারে যোগ দেয়া। এটি ছিল পাকিস্তানি স্কাউটস ও জাপানি স্কাউটসের একটি সম্মিলিত গানের অনুষ্ঠান। টেলিভিশন জিনিসটিকেই আমি প্রথম দেখলাম এই জাপানে এসেই। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নিজেকেও টেলিভিশনে দেখার সুযোগ হয়ে গেল—কারণ ওই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানটি ব্রডকাষ্ট হয়েছিলো।

মিজনো সান টোকিও এয়ারপোর্ট এসেছিলেন—হায়াকু নি-জু রকুর সব স্কাউটকে সঙ্গে করে। 'সায়োনারা' বা বিদায় শব্দটি জাপানে অবস্থানকালে অনেকবার শুনেছি। কিন্তু এর মর্মটি বুঝলাম আমি তখন—কাচ্ছান, নূরচান, মিকাচানদের ছোট ছোট হাতের বিদায়ী আন্দোলনের সঙ্গে এই সায়োনারা রীতিমত মর্মস্পর্শী।

আমাদের প্রাচ্যভ্রমণের পুরো ব্যাপারটিতেই এখন সায়োনারার সুর। কিন্তু মাঝখানে হংকং এবং ব্যাংককে কয়েকটি দিনও যথেষ্ট রেখাপাত করার মত। টোকিও থেকে এসে বিমান যেভাবে হংকং কাইটেক বিমান বন্দরে নামলো সে এক লোমহর্ষক ব্যাপার। মনে হলো পানির ওপরেই নেমে যাচ্ছি, চাকা স্পর্শ করার ঠিক আগের মুহূর্তে দেখলাম পানি নয়, ভূমিই স্পর্শ করেছে। ওই দ্বীপে সমতল জায়গার অভাবেই এই অবস্থা। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য নতুন বিমান বন্দর করা হয়েছে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করে। হংকং তখন পুরাদস্তুর একটি বৃটিশ কলোনি, যদিও এই দ্বীপ ও তার সঙ্গের কিছু এলাকা মূলত চীন দেশের। ১৮৩৯-৪২ সালে প্রথম আফিমের যুদ্ধে পরাজয়ের খেসারত হিসাবে চীন এই দ্বীপটি বৃটেনকে দিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। পরে এর নিকটস্থ কোওলুন উপদ্বীপ ও মূল ভূখণ্ডের আরো কিছু জায়গা যথাক্রমে ১৮৬০ ও ১৮৯৮ সালে লীজ হিসেবে বৃটেনকে দিতে বাধ্য হয়েছিলো। সম্প্রতি ১৯৯৭ সালে একটি আলোচনা ও চুক্তির মাধ্যমে এই ভূখণ্ড আবার চীনের কাছে ফেরত এসেছে। আমরা যখন গিয়েছি, তখন হংকঙের সব কিছু চলছে ঔপনিবেশিক বৃটিশ কায়দায়। যদিও জনসংখ্যার প্রায় সবাই চীনা, তবুও বৃটিশ মানুষও প্রচুর দেখতে পেয়েছি—প্রশাসনে ও ব্যবসা বাণিজ্যে। আসলে এটি একটি ফ্রি-পোর্ট হওয়াতে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও অর্থবাজারের যেমন একটি কেন্দ্র, তেমনি সব রকম সাধারণ ভোক্তার পণ্য অনেক কম দামে পাওয়া যায় বলে ক্রেতাদেরও স্বর্গ। কিন্তু স্থানীয় কালচার ও চালচলন একেবারেই চীনা। বেশি শিক্ষিত মানুষদের সবাই চীনা টানে ইংরেজিতে কথা বলতে পারছে—বাকিরা কিন্তু স্থানীয় ক্যান্টনীজ চীনা ভাষা ছাড়া আর কিছু বলেনা। তখনো এখানে ধনবৈষম্য প্রচুর—অনেক গরীব চীনা শ্রমিক রয়েছে খুবই উন্নত ও সমৃদ্ধ উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের সঙ্গে। হংকঙের চীনা বাজারে গিয়ে স্থানীয় কালচারের কিছু পরিচয় পেলাম—অন্তত খাদ্য কালচারের। এক অংশে পা থেকে উল্টো করা ঝোলানো রয়েছে অনেক চামড়া ছিলে নেয়া হাঁস, অন্যখানে একই ভাবে অনেক শূকর—চীনাদের কাছে উভয়ে খুব জনপ্রিয় এবং উপাদেয় খাদ্য। বিভিন্ন ধরনের মাছ ও শুটকির বাজার—অনেকটা আমাদের মাছ বাজার বা শুটকি বাজারের মত। বাজারে প্রচন্ড ভীড়, বেশ হৈচৈ। ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়ের মধ্যে নারীদের আধিক্য।

হংকঙের যে পুরো ভূখণ্ড তার অধিকাংশই কিন্তু পাহাড় পর্বত জঙ্গলে ভর্তি। হংকং বলতে যে বিখ্যাত নগরটিকে বোঝানো হয় তা হলো দ্বীপটির উত্তরাংশ আর

অল্প পানি পার হয়ে মূল-ভূখণ্ডের কোওলুন উপদ্বীপের দক্ষিণের খানিকটা অংশ নিয়ে। এখানেই উঁচু সব ভবন, বাণিজ্য, ঘন বসতি। মাঝখানে ওই জলরাশিতে সাধারণ সাম্পান থেকে শুরু করে বড় বড় ফেরিতে করে মানুষ সব সময় এপার ওপার করছে। আমরাও ফেরি দিয়ে কয়েকবার পারাপার করলাম—ভারি সুন্দর এই এলাকার দৃশ্য। হংকঙে তখন পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব ছিল একজন ট্রেড কমিশনারের মাধ্যমে। তিনি আমাদেরকে নিয়ে গেলেন কোওলুন ছাড়িয়ে এক পাহাড়ের উপর সুন্দর একটি রেস্টুরেন্টে—সেখান থেকে পুরো হংকং ও কোওলুনের একটি বিস্তৃত দৃশ্য দেখা যায়। তাঁর কাছে শোনলাম ইচ্ছে করলে এখান থেকে কিছুক্ষণের জন্য সীমান্ত পার হয়ে কম্যুনিস্ট চীনে যাওয়া যায়। সে সময় কম্যুনিস্ট চীন ছিল রীতিমত রহস্যাবৃত একটি দেশ। তাই কোন ভাবে এটি ছুঁয়ে দিয়ে আসতে পারলে যে কোন পর্যটক নিজেকে ধন্য মনে করতেন। আমাদের অবশ্য সে সুযোগ ছিলনা। বরং হংকঙে সবাই যা করে বাকি সময় আমরা তাই করার চেষ্টা করলাম অর্থাৎ কেনাকাটা। লক্ষ্য ছিল ৮ মিলিমিটার হোম-মুভি বানাবার মত মুভি-ক্যামেরা ও প্রজেক্টর কিনবো, সেই সঙ্গে টেইপ রেকর্ডার। সে সময় বড় পর্দার সিনেমার মত এই ক্যামেরা ও প্রজেক্টর ইলেকট্রনিক হয়নি—একেবারেই মেকানিক্যাল অথবা ইলেকট্রিক্যাল। হংকং থেকেই ছিল এসব কেনার সুবর্ণ সুযোগ। পরবর্তী অনেকগুলো বছর আমাদের পরিবারের অনেকেরই নানা সৃজনশীল কাজের হাতিয়ার হয়েছিল এই সবগুলো। হোম-মুভির কাজ আমরা হংকং থেকেই শুরু করে দিলাম। হংকং থেকে রঙিন মুভি ফিল্ম কিনে, তাতে মুভি তুলে আবার হংকঙের দোকানেই তা প্রিন্ট করতে দিয়েছিলাম, যা তারা বাড়িতে পোস্ট করে দেবে। ওই সময় রঙিন ফিল্ম প্রসেস করার কোন ব্যবস্থা পাকিস্তানে ছিলনা। ফিল্মের দোকানের মাধ্যমে তা হয় হংকঙে পাঠাতে হতো, নইলে লন্ডনে।

হংকং থেকে এসে ব্যাংকক এয়ারপোর্টে নামার পর পাকিস্তান দূতাবাস থেকে পাঠানো একজন থাই কর্মচারী আমাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। এমন বশংবদ একটি চরিত্র আমি আগে কখনো দেখেনি। অসংখ্যবার 'ইয়েস স্যার' বলা, অন্যের প্রতিটি কথার সঙ্গে বিগলিতভাবে সমর্থন জানানো, এবং সঙ্গে সঙ্গে নুইয়ে পড়া—সব কিছু মিলে আমার মনে হলো যে এই থাই ভদ্রলোককে পাঞ্জাবি সামন্ততান্ত্রিক ট্রেনিং খুব ভাল করেই দেয়া হয়েছে। কিন্তু পরে তাঁর মনিব মানুষটির সঙ্গে যখন দেখা হলো তখন কিন্তু দেখলাম তাঁর মধ্যে জমিদার সুলভ দিল-দরিয়া ভাবের লেশ মাত্র নেই। তিনি ব্যাংককে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত, বাড়ি পাঞ্জাব। দূতাবাসের গেলে তিনি তাঁর অফিস কক্ষে আমাদেরকে বসিয়ে কিছু খুচরা আলাপ করলেন, সবার হাতে একটি করে ফান্টার বোতল ধরিয়ে দিলেন, এবং তারপর কিছুক্ষণের মধ্যে বিদায় দিলেন। তাঁর আতিথেয়তা ওখানেই শেষ। আমরা সারাটা পথ গালাগালি ও গজর গজর করে করে এলাম। সব চেয়ে বেশি

গালি দিলেন খান সাহেব। অনুপস্থিত রাষ্ট্রদূতের প্রতি তাঁর সেই চোখা পাঞ্জাবি গালি মোটেই কহিতব্য নয়। আমাদের ব্যাংকক ভ্রমণের বশংবদ থাই এবং তাঁর পাঞ্জাবি মনিব এই দুটি চরিত্রের কথা আমি মোটেই ভুলিনি।

ব্যাংককে আমাদেরকে যে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো তাতে কেন জানি আমার মনে হয়েছিল সেদিনকার ব্যাংকক অনেকটা আমাদের চট্টগ্রাম শহরের ব্যবসায়িক অঞ্চলগুলোর মত। একটি জায়গাকে হবহু আমদের বক্সীর হাটের সোনাপট্টির মত মনে হলো—যদিও অলঙ্কারগুলোর প্রকৃতি আমাদের চেয়ে ভিন্ন। দোকানপাটগুলো ছিল সেকেলে ধাঁচের। খুব সম্ভবত আমাদের ভ্রমণের অধিকাংশ হয়েছিল ব্যাংকক শহরের পুরোনো অংশে যা পর্যটকদের জন্য কৌতূহলোদ্দীপক। মনে রাখতে হবে ১৯৫৯ সালের ব্যাংকক আজকের মত গ্ল্যামার সিটি হয়ে উঠেনি। তখনো ওটি ছিল থাই সাবেকি কালচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রাচ্য দেশীয় এই একটি দেশই কেমন করে জানি কয়েক শতাব্দী ধরে ইউরোপীয় বা আমেরিকান ঔপনিবিশক শক্তিগুলো থেকে নিজকে গা বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে অবশ্য আশপাশের কম্যুনিস্ট প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য আমেরিকান অর্থ ও প্রভাব ইতোমধ্যেই কাজ করতে আরম্ভ করেছিলো। ব্যাংককের সত্যিকার চেহারা পরিবর্তন হয়েছে আরো পরে ষাটের দশকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে তার গুরুত্বের কারণে। আমরা দু'দিনের সফরে যে ব্যাংকক দেখতে পেলাম তাকে এক কথায় বলা যায় বৌদ্ধ মন্দির ও রাজা-রাজড়াদের সম্মানে গড়া এক ব্যাংকক। শুধু আমেরিকানদের আনাগোনার কারণে সুন্দর সুন্দর হোটেল ইত্যাদি তখন হচ্ছিল। তারই একটি 'টোকাডোরা হোটেলে আমরা ছিলাম—এই প্রথম একটি বিশ্বমানের হোটেলের অভিজ্ঞতা পাওয়া গেল। এ ছাড়া বাজার অঞ্চলের বাইরে আমাদেরকে দেখানো হয়েছে শুধু মন্দির আর মন্দির; এবং আর দেখেছি বিভিন্ন রাজ প্রাসাদ; সবই মনে হলো ব্যাংককের নদীটির পাড়ে পাড়ে। মন্দির দেখতে দেখতে রীতিমত ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এমনি একটি মন্দিরে দেখা হয়ে গেল বেশ কয়েক জন শিখের সঙ্গে। তাঁদের সঙ্গে দেখলাম আমাদের দলের সদস্যদের পাঞ্জাবি ভাষার বন্যা বয়ে গেল। পরে তানভীর, এনাম ওরা বল্লো তারা এর আগে জীবনে কোন শিখ দেখেনি। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার—লাহোর এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্যান্য অনেক জায়গা ছিল দেশ বিভাগের আগের মুহূর্ত পর্যন্ত শিখ অধ্যুষিত এবং বিশেষ ভাবে শিখ প্রভাবিত অঞ্চল। রাতারাতি তারা সম্পূর্ণরূপে কী ভাবে উৎখাত হয়ে গেল, তারপর থেকে কেউ কোন দিন আর কোন শিখ দেখলোনা—এ এক করুণ কাহিনী।

ব্যাংককের ব্যবসায়িক অঞ্চলে দোকানে দোকানে সেদেশের উঠতি তরুণ বয়সী রাজার ছবি টাঙ্গানো দেখেছিলাম—তিনি বর্তমান রাজা ভূমিবল। তাঁর ছবি ছাড়াও পূর্ববতী রাজাদের এবং রাজপরিবারের ছবিও যথেষ্ট দেখা যাচ্ছিল। টাঙ্গানোর ছবির প্রচুর চাহিদা রয়েছে বলেই হয়তো সেখানে এরকম ছবি বিক্রয়ের,

এবং এগুলো কাচের ফ্রেমে বাইন্ডিং করার অনেক দোকান দেখলাম। দোকানগুলোর ভাবসাব আমাকে চট্টগ্রামের হাজারি গলির এরকম দোকানগুলোর কথা মনে করিয়ে দিলো। রাজার ছবি ছাড়া, অনেক সংখ্যায় অন্য ছবিগুলো হলো মন্দিরের আর ভগবান বুদ্ধের।

ব্যাংকক থেকে আবার রেঙ্গুনে; এবং সেখানে আরো কিছুদিন ঘোরা ফেরা। তারপর আবার সেই পি আই এ ডাকোটা বিমানে চট্টগ্রাম বিমান বন্দরে। আমার প্রাচ্য ভ্রমণ শেষ হয়ে গেল, কিন্তু মনের উপর রেখে গেলো অমোচনীয় একটি ছাপ। পরবর্তী জীবনে বেড়ে ওঠার সময় ছেলেবেলার এই ঘূর্ণিঝড়ের মতো ঘটে যাওয়া দেশে দেশে ভ্রমণের অভিজ্ঞতাগুলোর থেকে মুক্ত হতে আমি কখনোই পারিনি।

প্রবেশিকা

স্কুলে শেষ দিনগুলো

আমাদের বিশ্ব জাম্বুরী দলের বাকিদেরকে এয়ারপোর্টে বিদায় জানিয়ে এসে, এবার স্কুলমুখী হলাম। স্কুলে ফিরলাম রীতিমত এক সিলেব্রেটির বেশে। স্কুলের গেইটে ঢুকতেই কাব স্কাউটরা 'আ-কে-লা, উই উইল ডু আওয়ার বেষ্ট' সেই নেকড়ে বাঘের 'গ্র্যাণ্ড হাউল' দিয়ে অভ্যর্থনা করলো, আর স্কাউটরা দিলো 'স্বাগতম' ইয়েল। পরদিন ইউনূস ভাই ও আমার জন্য একটি সংবর্ধনা সভা আয়োজন করা হলো স্কুলের কমন রুমে। সেখানে খুব সংক্ষেপে আমার অভিজ্ঞতার একটি বর্ণনা দেবার সুযোগ পেলাম। পরে বিভিন্ন ক্লাসের মধ্যেও শিক্ষকরা বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন করে এর নানা বিষয়ে বলার সুযোগ করে দিলেন। তবে এ ক্ষেত্রে সব চেয়ে বেশি উচ্ছ্বাস দেখালেন বড় ওস্তাদজি হাবিলদার মেজর নাজির। এর পর থেকে যতদিন জে সি সি'র ক্লাস চলেছে ওস্তাদজি আমাকে কোন না কোন বক্তব্যের বিষয় দিয়ে দিতেন—প্রায় সবগুলোই জাপানিদের নিয়ে। যেমন একদিন তিনি বল্‌লেন 'জাপানিজ কো ডাসিপ্লিন কি বারি মে কুছ বাতাও', কোন দিন বলেন '...হিম্মত কি বারি মে কুছ বাতাও'। তিনি, যেন ধরেই নিয়েছেন যে জাপানে কয়েকদিন ঘোরাফেরা করেই আমি তাদের 'শৃঙ্খলাবোধ', তাদের 'সাহসিকতা' ইত্যাদির বিশেষজ্ঞ হয়ে গিয়েছি। কিন্তু তাঁকে আমি নিরাশ করতামনা। সাধ্যমত আমার অভিজ্ঞতাগুলোকে টেনে টুনে তাঁর আদ্দিষ্ট বিষয়ের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতাম। যেমন ওস্তাদজি হয়তো আশা করতেন আমি জাপানিদের সামরিক শৃঙ্খলার কথা বলবো। কিন্তু আমি বলতাম জাপানিরা যে রাস্তাঘাটে কোন ময়লা এমন কি কাগজের টুকরাও ফেলেনা সেই কথা; কিংবা কোথাও প্রকাশ্যে রাস্তাঘাটে কোন ঝগড়াঝাটি তাদেরকে করতে দেখেনি, গলা উঁচিয়ে কথা বলতে দেখিনি; সবার সঙ্গে অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ের সঙ্গে আচরণ করে;—ইত্যাদি বিষয়ে তাদের 'শৃঙ্খলার' কথা।

বেলাল ভাই আমার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করলেন। ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে তিনিও তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কিন্তু এখানে তিনি ভূমিকা নিলেন পাকা দস্তুর একজন সাংবাদিকের। এটি কোথাও সম্প্রচার করা বা মুদ্রিত করার কোন ইচ্ছে তাঁর ছিল না। নেহাত তাঁর সাংবাদিকতার মহড়া দেয়া আর আমাদের কেনা নতুন টেইপ রেকর্ডারটি সত্যিকার কাজে ব্যবহার করে দেখাটিই ছিল উদ্দেশ্য। ওই সময় খুব মজা করে আমাদের রেকর্ডারে এরকম অনেক কিছু রেকর্ড করে তা শুনছিল অনেকে। কিন্তু বেলাল ভাইয়ের কাজটি ছিল খুব সিরিয়াস ব্যাপার। তিনি বিশেষ ভাবে ফিলিপাইন জাম্বুরীতে আমরা কী করেছি, ওদেশের নানা বিষয় সম্পর্কে আমার ধারণা কী, এসব নিয়েই প্রশ্ন করছিলেন, আমিও বিজ্ঞের মত তার উত্তর দিয়ে গিয়েছি। সেটি ১৯৫৯ সনের কথা। এক সময় আরো বেশ কিছু টেইপের সঙ্গে এই টেইপটি হারিয়ে গিয়েছিল এবং ২০০৫ সনের দিকে দৈবাৎ একদিন ভুলে যাওয়া পুরোনো ট্রাঙ্কের মধ্য থেকে পুনরুদ্ধার হয়েছে। তখন টেইপগুলো প্রায় গলিত, স্পুল থেকে খোলার চেষ্টা করলেই ছিড়ে ছিড়ে যাচ্ছিল। আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে এই টেইপ থেকেই সবকিছু প্রায় হুবহু পুনরুদ্ধার করতে পেরেছিল ঢাকায় নিউ এলিফ্যান্ট রোডের একটি দোকানের জনৈক তরুণ কুশলী। যার ফলে সেদিনের আমার বালক কণ্ঠে সেই সাক্ষাৎকারটি আমি আজও সিডি থেকে শুনতে পাই। এমনকি এর কিছুটা আমার মোবাইল ফোনেও তুলে রেখেছি।

এদিকে স্কুলের মূল বিষয়ে পানি অনেকখানি গড়িয়ে গিয়েছিল। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দ্রুত এগিয়ে আসছিলো। এক কালে এই পরীক্ষাকে বলা হতো এন্ট্রান্স পরীক্ষা—সেই থেকে বাংলায় 'প্রবেশিকা পরীক্ষা' কথাটি থেকে গিয়েছিল। আরো ছোট বেলায় অনেকের মুখে শুনেছি 'এন্টেস পাশ' কথাটি। যেমন বাদামওয়ালাও তার বাদামের মাহাত্ম্য বোঝাতে বলতো এ হলো 'এন্টেস পাশ'। সে আমলে অবশ্য এই পাশের দামটিও বেশি ছিল। শুনেছি আমার মোক্তাল খালু এন্ট্রান্স পাশ করাতে সারা গ্রামের লোক তাঁকে দেখতে এসেছিলেন। এই পাশের ফলেই তিনি লয়েড্স ব্যাংকে সাহেবের কাছে চাকরি পেয়েছিলেন, এবং সুযোগ পেলেই ইংরেজিতে কথা বলতে পেরেছেন। আমাদের সময়ে ওই গরিমা আর ছিলনা বটে, তবে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা তবুও জীবনের একটি বড় বৈতরণী ছিল—ভাল করতে না পারলে পরে শোধরানো কঠিন হতো। ইতোমধ্যে টেস্ট পরীক্ষা হয়ে গিয়েছে যাতে আমি অংশ নিতে পারিনি। টেস্ট পরীক্ষাটি খুব মনোযোগের সঙ্গে দিয়ে তাতে ভাল করাকে পরীক্ষা-প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ মনে করা হতো। কেউ এ পরীক্ষায় খারাপ করলে স্কুলের বদনাম হবে এই আশঙ্কায় তাকে চূড়ান্ত পরীক্ষায় পাঠানো হতো না, বলা হতো সেন্ড-আপ করা গেলো না। আমার ক্ষেত্রে অবশ্য টেস্ট পরীক্ষা না দেয়াকে সেন্ড-আপ করার অন্তরায় হিসেবে বিবেচনা করা হলো না।

টেস্ট পরীক্ষাটিকে যে কত গুরুত্ব দেয়া হতো তার একটি প্রমাণ হলো এ পরীক্ষা হয়ে যাওয়ার পর ম্যাট্রিক পরীক্ষার প্রস্তুতি চলতো মোটামুটি টেস্ট পেপার ভিত্তিক। টেস্ট পেপার হলো সে বছর প্রদেশের বিভিন্ন স্কুলের ম্যাট্রিক টেস্ট পরীক্ষার সব বিষয়ের সব প্রশ্নপত্র সমূহের একটি সংকলন। ওই প্রশ্নপত্রগুলোর উত্তর দেবার চেষ্টার মাধ্যমেই চলতো শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি। অনেক সময় ঘড়ি-ঘণ্টা ধরে এর উত্তর দেবার চেষ্টা চলতো। প্রস্তুতির সুবিধার জন্য 'আদর্শ' উত্তরগুলো দিয়ে বিভিন্ন 'টেস্ট পেপার মেইড ইজি' পাওয়া যেত। সে সময় টেস্ট পেপার প্রকাশ করার দায়িত্বটি কেমন করে জানি নিয়ে নিয়েছিলো একটি মাত্র প্রকাশক 'আদিল ব্রাদার্স'। মনে পড়ে এর বছর পাঁচেক আগে ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে যখন ঢাকায় গিয়েছিলাম, তিনি আমাকে সঙ্গে করে বাংলা বাজারে আদিল ব্রাদার্সের দোকানে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল ইতোমধ্যে টেস্ট পেপার বের হয়ে গেলে আগেভাগে ওখান থেকেই কিনে নিয়ে আসা—চট্টগ্রামের বাজারে আসতে সময় লাগবে বলে। সেবার ইউনূস ভাইয়ের ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেবার পালা ছিল। কিন্তু আদিল ব্রাদার্স সেদিন তাঁকে টেস্ট পেপার দিতে পারেনি, কারণ প্রকাশের আরো খানিকটা বাকি ছিল। এবার আমার পালা এলে নিজে টেস্ট পরীক্ষা না দিলেও, টেস্ট পেপার সংগ্রহে বিলম্ব করলামনা।

স্কুলে শেষ দিনগুলোতে শিক্ষকরা কিছু কিছু বিশেষ ক্লাস নেবার ব্যবস্থা করেছিলেন। সেগুলোতে উপস্থিত থাকতাম। তবে অনেকেই বিভিন্ন স্যারের কাছে বহু দিন থেকেই প্রাইভেট পড়তো, আমি তা করিনি; তাই ক্লাস বন্ধ হয়ে যাবার পর স্কুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক চুকে গিয়েছিলো। এর পর থেকে পরীক্ষা-প্রস্তুতির পুরো কাজটি সমাধা করতে হলো নীরবে আপন মনে। আর এখানেই বাধলো বিপত্তি।

বিক্ষিপ্ত মনের ঢাকাই দাওয়াই

পরীক্ষা প্রস্তুতি নিতে গিয়ে দেখলাম মনোসংযোগ বেশ কঠিন হয়ে পড়েছে। এর কারণ প্রাচ্য ভ্রমণের দুই মাসের প্রতিদিনের স্মৃতিগুলো যেভাবে মনকে দখল করে রেখেছিলো বার বার মন সেগুলোর দিকেই বিক্ষিপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এই স্মৃতিগুলোর কোনটিই নেহাত আটপৌরে কিছু ছিলনা; প্রত্যেকটি ছিল বালক-মনকে তীব্র ভাবে আন্দোলিত করার মত—যার সদ্য-স্মৃতি যে কোন একা মুহূর্তে মনের মধ্যে বার বার ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে থাকতো। এর মধ্যে সব চেয়ে বেশি ছিল নানা দেশে অল্প কয়েকদিনের জন্য গড়ে ওঠা বন্ধুত্বগুলো, তাদের নিয়ে বহু ঘটনা, মজার কথা, মান-অভিমান ইত্যাদি। তাছাড়া ওখানকার যে যাবতীয় ঘটনা-দুর্ঘটনা, দৃশ্যাবলী ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সে সময় প্রতি মুহূর্তে গিয়েছি তার কোনটিই আমার জন্য সাধারণ বা স্বাভাবিক কিছু ছিলনা। প্রত্যেকটি দিন, প্রত্যেকটি ঘটনা ছিল আমার জন্য স্নায়ুউদ্দীপ্তকারী কৌতূহলপূর্ণ এক একটি

অভিজ্ঞতা যা তখন সুযোগ পেলেই সিনেমার রিলের মত মনের মধ্যে বাজতে থাকতো। এ সবের মোদ্দা ফল হলো পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সঠিক মনোসংযোগ সম্ভব হচ্ছিলনা। অথচ বেশ কিছু বিষয়ের উপর প্রস্তুতি নেয়ার, অনুশীলনের, মনে রাখার চেষ্টার ইত্যাদি করার ছিল। সব চেয়ে বড় কথা হলো সেগুলো নিয়ে গুরুত্ব সহকারে ও ইতিবাচক ভাবে ভাবনার একটি পরিবেশ খুঁজে পাচ্ছিলামনা।

বিষয়টি নিয়ে ইউনূস ভাইকে লিখলে তিনি বল্লেন এ নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবার কিছু নেই। চাটগাঁয় একাকীত্বের মধ্যে লেখাপড়ার চেষ্টাতে এমনটি হচ্ছে, আমি বরং ঢাকায় তাঁর কাছে গিয়ে পরীক্ষা-পূর্ব সময়টুকু কাটালে নতুন পরিবেশে লেখাপড়া ভাল হবে। আমারও প্রস্তাবটি ভাল লাগলো। সমস্ত বই-খাতা নিয়ে ঢাকায় চলে গেলাম—সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। তৃতীয় বর্ষ অনার্সে উঠার কারণে ইউনূস ভাইয়ের ওখানে তখন সিঙ্গেল সীটেড রুম। কাজেই বই খাতা মেলে ওই ছোট ঘরটির প্রায় পুরো দখল নিয়ে নিতে অসুবিধা হলোনা। পরিবেশটি আসলেই দারুণ বদলে গেল, বেশ ফুরফুরে হয়ে উঠলো সব কিছু। হলে ইউনূস ভাইয়ের বন্ধুরা প্রায়ই খোঁজ খবর নিচ্ছেন—তাঁদের মধ্যে এক ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থী বালকের উপস্থিতিতে তাঁরাও বেশ মজা পাচ্ছিলেন। প্রয়োজন মত তাঁদের কাছে পরামর্শ তো পেলামই, তার উপর স্নাতক শ্রেণীর বইয়ের কোন অভাব হলোনা—বিশেষ করে ইতিহাসে আর ভূগোলে। আগেই বলেছি যারা পরীক্ষায় ভাল করার প্রত্যাশী তারা এসব অগ্রসর বই থেকে কিছু বাড়তি তথ্য, মূল লেখকদের কিছু কোটেশন ইত্যাদি না দিলে চলেনা। তাছাড়া ইতিহাসের ও ভূগোলের 'পাণ্ডিত্যপূর্ণ' বিশ্লেষণ ছাড়া প্রতিযোগিতার বাজারে বেশি নম্বর পাওয়া সম্ভব নয়। বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কথাটি কিছুটা সত্য। আমার আশেপাশেই এসব বিষয়ে সব বিশেষজ্ঞ বড় ছাত্ররা ছিলেন। কিছুটা নতুনত্বের কারণে এবং কিছু বোঝার জিনিস, কিছু সম্পাদনার জিনিস পেয়ে আমার মনো-সংযোগও কিছুটা স্থিত হলো। তাছাড়া নক্সা করে, ম্যাপ ও বার কলাম ইত্যাদি এঁকে কিছু জিনিসের উত্তর করার ভঙ্গিগুলোও এই অগ্রসর বইগুলোতে ভাল পেলাম। এই সব বই ইংরেজি এবং আমার পরীক্ষার ভাষা বাংলা হওয়াতে কিছু পরিভাষার অসুবিধা অবশ্য ছিল, সেটি ডিকশনারি ও অন্যান্যদের সহযোগিতায় মেটানো যেতো। প্রত্যেকটি বিষয়ের 'টেস্ট পেপার মেইড ইজি'—দু'একটি ভিন্ন ভিন্ন রকমের ছিল। সেগুলোও কাজে আসছিলো বটে, তবে মনে হলো ওখানে যেভাবে উত্তর আছে, তার চেয়ে ভাল উত্তর আমি নিজে তৈরি করতে পারছি। গণিতের ব্যাপারে, এবং বিশেষ করে অতিরিক্ত গণিতের ব্যাপারে অবশ্য মেইড ইজিগুলো খুব কাজে এলো। যখন কিছুতেই টেস্ট পেপারের কোন অংক করতে না পেরেছি—শেষ পর্যন্ত মেইড ইজি উল্টে দেখে নিয়েছি সমাধান।

সলিমুল্লাহ হলের পরিবেশটি মনে হয়েছে সব সময় খুব সরস ও প্রাণবন্ত। হলের ছাত্ররা অনেকেই আমাকে চিনতেন, এবং কুশলাদি জিজ্ঞেস করতেন; বালক

বয়সী আগন্তুক বলে তাচ্ছিল্য করতেন না। প্রতিদিন সকালে এবং বিকেলে বেশ আয়েস করে হলের ক্যান্টিনে নাস্তা করতাম, কোন কোন সময় ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে, কখনো একা। চট্টগ্রামে বাসার বাবুর্চির একঘেঁয়ে খাবারের তুলনায় হলের ক্যান্টিনের খাবারগুলো বরং আমার কাছে খুব ভাল লাগতো। এখানেও ছাত্ররা আমাকে এটি সেটি জিজ্ঞেস করতেন, তাঁদের গল্পগুজবও আমি শোনতাম। উনিশ শ' ষাট সালের সেই প্রথম দিনগুলোতে হলে রাজনৈতিক উত্তেজনা তেমন কিছু ছিলনা—ছিল সব কিছুতে একটি শান্ত সমাহিত ভাব। মার্শাল ল' ঘোষণার পর দেশে যে রাজনৈতিক স্থবিরতা দেখা গিয়েছিলো তারই ধারাবাহিকতা চলছিল ছাত্রদের অঙ্গনেও। হল সংসদ নির্বাচন নিয়ে যে কথাবার্তাগুলো শোনতাম তাতেও কোন রাজনৈতিক ঝাঁজ ছিলনা, বরং ছিল বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা। এর দু'বছরের মধ্যে অবশ্য অবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়েছিলো।

পড়াশোনার মধ্যে আর একটি অবকাশ পেতাম যখন দুপুরে ও রাতে 'হাসিনা' হোটেলে খেতে যেতাম। এ জন্য আহসান উল্লাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মাঝখানে রাস্তা দিয়ে হেঁটে মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের বিপরীতে জনপ্রিয় ওই ভাতের হোটেলে যেতে হতো। প্রতিদিন ধীরে ধীরে ওই হেঁটে যাওয়া আসাটি খুব উপভোগ করতাম। 'হাসিনার' মেন্যুতে খুব বেশি বৈচিত্র্য থাকতো না, তবে ডালের সাপ্লাইটি এর অফুরন্ত ছিল। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ও বেশ সুলভ বলে দোকানটি কাছাকাছি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং মেডিক্যালের ছাত্রদের নিকট বেশ জনপ্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে রুচি বদলের জন্য 'পপুলার' নামক হোটেলেও খেতাম—প্রায় কাছাকাছি জায়গায়—এটি 'হাসিনার' একটি ভাল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বক্সীবাজারের দিকে আরো এগিয়ে 'ক্যাফে খাস' নামের আরেকটি দোকান ছিল—সাধারণত খাসি-পরোটা এসবের জন্য বেশি পরিচিত ছিল ওটা; মাঝে মাঝে ওখানেও চলে যেতাম।

মোটের উপর দেখা গেল ইউনূস ভাইয়ের প্রস্তাবিত দাওয়াইটি ভালই কাজ করেছিলো। আমার বিক্ষিপ্ত মনকে এটি ভিন্ন পরিবেশে পরীক্ষা প্রস্তুতির দিকে মনোযোগী করে তুলতে পেরেছিলো। পরীক্ষার কয়েকদিন আগে সব বই খাতা আবার বগলবন্দী করে যখন চাটগাঁয় ফিরলাম তখন নিজকে অত অসহায় বলে মনে হচ্ছিলনা। মুসলিম হাই স্কুলে আমাদের সেন্টার পড়েছিল। সেখানে বেশ কয়েক দিন ধরে পরীক্ষাগুলো দিয়ে প্রবেশিকার পর্ব সাঙ্গ করলাম।

কমার্শিয়াল কলেজে শর্টহ্যান্ড

পরীক্ষার পর পর কী করবো তার মোটামুটি একটি ছক কাটা ছিলো। লাইব্রেরিতে অনেক বই চিহ্নিত করে রেখেছিলাম পড়ার জন্য। কিন্তু ইচ্ছে ছিল আরো আনুষ্ঠানিক ভাবে কিছু একটি কাজ করবো। নিজের আনন্দে বই পড়াকে কখনো আমি কোন কাজ হিসেবে গ্রহণ করিনি, করেছি নেহাতই বিনোদন হিসেবে—কোন

কোন ক্ষেত্রে সে বই যতই মনোযোগ ও কসরত করে পড়তে হোক না কেন। আমার মাথায় ছিলো এমন নতুন কোন কাজ শিখবো যাতে বেশ মজাও হবে, আবার সামনে কলেজের লেখাপড়ার কাজে আসবে। কলেজের ক্লাস সম্পর্কে আমার সে সময় এক ধরনের রোমান্টিক উচ্চ ধারণা ছিল। কলেজে লেকচারের সময় সবাই খাতায় নোট নেয় এটি জানতাম। আমি ভাবলাম নোটগুলো যদি আমি হুবহু নিতে পারি শর্টহ্যান্ডে দ্রুত লিখনের মাধ্যমে, তা হলে প্রফেসরদের মূল্যবান ব্যাখ্যাগুলো পরে ভাল করে বুঝে নিতে পারবো। আন্দরকিল্লায় হাজারি গলির মোড়ে 'সুফি কমার্শিয়াল কলেজ' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল যেখানে টাইপ রাইটিং, শর্টহ্যান্ড ইত্যাদি শেখানো হতো। আমি সেখানে গিয়ে ভর্তি হলাম। ইচ্ছে ছিল টাইপ রাইটিং ও শর্টহ্যান্ড উভয়েই শিখবো। অনেক পুরোনো একটি ভবনের দোতলায় মোটামুটি ঘুপছির মধ্যে দুটি কামরা নিয়ে এই 'কলেজ'। যিনি এর মালিক, ম্যানেজার ও প্রধান প্রশিক্ষক তিনি কিন্তু চমৎকার মানুষ। আমার পরিচয় ও উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলার পর আমাকে পরামর্শ দিলেন যে টাইপ রাইটিং কোর্সে আমার ভর্তি হবার দরকার নেই; আমাকে আঙুল রেখে বাড়িতে প্র্যাকটিসের জন্য কী বোর্ডের একটি 'কোয়েরটি' চার্ট দিয়ে দেবেন আর মাঝে মাঝে মেশিন খালি থাকলে কলেজে প্র্যাকটিস করতে দেবেন। ঠিক তাই হলো। আমি কোয়েরটি অর্থাৎ কিউ, ডাব্লু, ই, আর, টি, ওয়াই এই ক্রমে সাজানো চার্টের ব্যবহার করে না দেখে আঙুল চালনাতে শিগ্‌গীর অভ্যস্ত হয়ে পড়লাম। ওভাবে টাইপ করতে পারলাম। শর্টহ্যান্ড শেখাটাই হবে আমার মুখ্য কাজ। পিটম্যান ও গ্রেগ—এই দুটি শর্টহ্যান্ড পদ্ধতির মূল বিষয়গুলো তিনি সংক্ষেপে দেখালেন বই থেকে। এক নজরেই আমার কাছে পিটম্যান শর্টহ্যান্ডটি বেশি পছন্দ হলো—এর সোজাসাপ্‌টা জ্যামিতিক গড়নের জন্য। একটি বই কিনে তখনই শেখা আর প্র্যাকটিস শুরু করে দিলাম। বাড়িতে শিখতাম; পত্রিকা বা বই থেকে কোন লেখাকে শর্টহ্যান্ডে লেখার আর তা থেকে সেটি পুনঃপাঠের চেষ্টা করতাম। সপ্তাহে কয়েক দিন বিকেলে ঘণ্টা খানেকের জন্য সুফি কমার্শিয়াল কলেজে গেলে প্রশিক্ষক আমাকে শ্রুত লিপি দিতেন—আমি সেটি শর্টহ্যান্ডে লেখার চেষ্টা করতাম; পরে তিনি ভুলগুলো দেখিয়ে দিতেন। প্রথম দিকে প্রায়ই শর্টহ্যান্ডে কূল কিনারা না করতে পারলে আমি জায়গায় জায়গায় লংহ্যান্ড অর্থাৎ দ্রুত সাধারণ ইংরেজিতেই তা লিখে ফেলার চেষ্টা করতাম। ধীরে ধীরে অবশ্য সেটি কমে গিয়েছিল। কিন্তু তখনো প্রশিক্ষক ভদ্রলোক বলতেন আমি আরো শর্ট করার সম্ভাব্য সব পদ্ধতি অনুসরণ করিনি, অর্থাৎ আমার শর্টহ্যান্ড যথেষ্ট শর্ট হয়নি।

আসলে পিটম্যান শর্টহ্যান্ড বুঝতে একেবারেই সহজ, বলতে গেলে কয়েক মিনিটে এর মূল নীতিগুলো বুঝে ফেলা সম্ভব—যদিও সত্যি সত্যি ব্যবহার করতে অভ্যাস প্রয়োজন। শোনা আওয়াজগুলোই লেখা হয় এতে—অর্থাৎ এটি ফোনেটিক; মূলত কনসোনেন্ট অর্থাৎ ব্যঞ্জন বর্ণগুলোই লেখা হয় অনেকটা স্বরচিহ্ন

বিহীন ভাবে আরবি যে ভাবে লেখা হয়। অবশ্য আরবির মতই স্বর-চিহ্ন দিয়ে নেয়া যায় এক্ষেত্রেও, ব্যঞ্জনের নানা স্থানে ডট্ অথবা ড্যাশের আকারে; যদিও অধিকাংশ ক্ষেত্রে তার প্রয়োজন হয়না। ব্যঞ্জনগুলো মূলত বিভিন্ন অভিমুখে আঁকা একেকটি ছোট সরল রেখা অথবা বিভিন্ন দিকে মুখ করা অর্ধচন্দ্রাকৃতি বক্র রেখা। হালকা দাগে অথবা মোটা দাগে লিখে তার মধ্যেও বিভিন্নতা আনা যায়—যেমন হালকা দাগে যেটি 'পি', মোটা দাগে সেটি 'বি'। দ্রুত লেখার সময় একটির সঙ্গে একটি লাগিয়ে আরো সংক্ষেপ করা যায়—এদিক থেকেও অনেকটা আরবি লেখার মত। তা ছাড়া খুব ঘন ঘন যে সব শব্দ বা শব্দাংশ ব্যবহৃত হয় সেগুলোর জন্য পৃথক শর্টকাট আছে—এও আবার ওই সরল রেখা কিংবা অর্ধচন্দ্র, কিংবা ছোট বৃত্ত ইত্যাদি দিয়ে। একটি লাইনের উপর সব কিছু লিখতে হয়। লাইনের উপরে, কি নিচে, কি লাইন ভেদ করে লিখলাম তাতেও ওই শর্টকাট চিহ্নের অর্থে একটি পার্থক্য আসে। সেই যে তখন চিহ্নগুলো শিখেছিলাম এখনো তা মোটামুটি মনে আছে, যদিও এখন শ্রুতলিপি শুনতে শুনতে একই তালে এগুলো লিখতে পারবোনা।

সুফি কমার্শিয়াল কলেজে আমি একটু ব্যতিক্রমী ছাত্র ছিলাম। ওখানে সবাই শিখছিলো ষ্টেনো-টাইপিষ্ট হিসেবে কাজ পাবার জন্য, আমি ছিলাম সখের শিক্ষার্থী। তাই বলে আমার প্রয়াসে কোন ঢিলেমি ছিলনা, বরং প্রশিক্ষক আমার কাজকেই আদর্শ উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরতেন প্রায়ই। যথারীতি কোর্স শেষে পরীক্ষা নিয়ে একটি সার্টিফিকেটও দেয়া হয়েছিলো আমাকে। অল্পদিনের জন্য হলেও সেখানে আমার এই নতুন সহপাঠীদের সঙ্গেও বেশ জানাশোনা হয়ে গিয়েছিলো আমার। আমার অন্য কিছু প্রজেক্টের মত এই শর্টহ্যান্ডের প্রজেক্টটিও তার মূল উদ্দেশ্যে কোন কাজে লাগেনি। কারণ কলেজে গিয়ে ক্লাসের বক্তৃতার হুবহু নোট নেবার কোন তাগিদ অনুভব করিনি। কিন্তু আমার কাছে এর একটি মূল্য ছিল একটি গুপ্ত লিপির মত। তখন আমার অভ্যাস ছিল একান্ত আপন কথাগুলো পিটম্যান লিপিতে লিখে রাখা, সহজে যা অন্য কেউ পড়তে পারবেনা। পরে দেখেছি আমার মতো এই অভ্যাস বিখ্যাতদের মধ্যেও কারো কারো ছিল। দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলের আত্মজীবনীতে পড়েছি তিনি স্কুলে থাকতে একটি ডায়েরি লিখতেন, আর সেটি যাতে অন্য কেউ চট্ করে পড়ে ফেলতে না পারে সে জন্য লিখতেন ইংরেজি হরফের বদলে গ্রিক হরফে—যেমন এ'র বদলে 'আলফা' কিংবা এফ এর বদলে 'ফাই' ব্যবহার করে। আমার ধারণা গ্রিক হরফের চেয়ে পিটম্যান হরফ ও লিখন ভঙ্গি অনেক বেশি অপরিচিত—তাই গোপন লিপির বিদ্যায় আমি খানিকটা এগিয়ে ছিলাম বলা যায়।

পিটম্যান শর্টহ্যান্ডের চর্চা কিন্তু আমার বই পড়াকে মোটেই ঠেকিয়ে রাখতে পারেনি। প্রবেশিকার চিন্তাভাবনা থেকে মুক্ত হয়ে মনের আনন্দে লাইব্রেরিগুলো ব্যবহার করছিলাম। পড়ছিলাম বরাবরের মতো বিজ্ঞানের বইই বেশি, কিন্তু অন্য

নানা রকম বইও, যখন যেদিকে মন যাচ্ছিল। এসময় একটি ঘটনা বই পড়াতে সম্পূর্ণ নতুন একটি মাত্রা এনে দিলো সাময়িক ভাবে। আমার সহপাঠী সিরাজের বড় ভাই নজরুল ভাই শহরের কেন্দ্রে একটি সুপরিচিত কাগজের দোকান চালান। একজন বামপন্থী সংস্কৃতি-মনা মানুষ হিসেবে অনেকেই তাঁকে চেনেন। একদিন পথে দেখা হলে জিজ্ঞেস করলেন পরীক্ষার পর কী করছি, কী বই-পত্র পড়ছি ইত্যাদি। বল্‌লেন তাঁর কাছে অনেক ভাল বই আছে, আমার পছন্দ হলে যখন খুশি, যতগুলো খুশি, নিয়ে পড়তে পারি। বইয়ের কোন নতুন ভাণ্ডারের খবর পেলে আমি সাধারণত একে অবহেলা করিনা, এক্ষেত্রেও করলামনা। পরদিন তাঁর কথামতো চন্দনপুরায় নজরুল ভাইদের বাসায় গেলে তিনি তাঁর বিছানার উপর থেকে লেপ তোষক তুলে ফেল্‌লেন। দেখলাম এর তলায় পুরো খাটটি হলো কাঠের একটি বিশাল সিন্দুক। তার কপাটগুলো খুলে দিলে সেখানে অনেক বই দেখতে পেলাম। নজরুল ভাই বল্‌লেন এর সব বাইরে পাওয়া যায়না, যদিও অনেকগুলোই পাওয়া যায়। এগুলোর বেশির ভাগ কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শের বই। ভারতের বেশ কিছু বামপন্থী সাহিত্যিকের মূল অথবা বঙ্গানুবাদ উপন্যাসও রয়েছে—যেমন মূলক রাজ আনন্দের তেলেগু থেকে অনূদিত বেশ কয়েকটি উপন্যাস। তবে সব চেয়ে বেশি ছিল সোভিয়েত সাহিত্য—রাশিয়ান কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস, মার্ক্স ও এঙ্গেলসের নানা রচনা, এবং অবশ্যই বামপন্থী রাশিয়ান সাহিত্য যেমন ম্যাক্সিম গোর্কির 'মা' কিংবা সোলোখভের 'ধীরে বহে ডন' ইত্যাদি। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির নানা বিষয়েও অনেক বই ছিল। সব ধরনের কিছু কিছু বই পড়লাম এখান থেকে নিয়ে। বলতে গেলে কিছুটা ঝুঁকেই পড়লাম মূল কম্যুনিস্ট নীতির দিকে। একদিকে মূলক রাজ আনন্দ বা গোর্কির সাহিত্যের যাদু অনুভব করলাম, অন্যদিকে মার্ক্সের কম্যুনিস্ট ম্যানিফোস্টোর মত বলিষ্ঠ রচনায় মুগ্ধ হলাম। তবে ইতিহাসে কৌতূহলী হিসেবে কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাস পড়তে গিয়ে হোঁচট খেতে হলো। এত সুন্দর একটি ভাবধারার অধিকারীদেরকে মতের অল্প বিস্তর অমিলের কারণে এমন শত্রু ভাবাপন্ন কেন হয়ে পড়তে হবে, কেন তাদের দমন করতে হবে প্রাণদণ্ড দিয়ে? নজরুল ভাই কিন্তু আমাকে উৎসাহিত করে চলেছিলেন তাঁর বইয়ের বিরাট সংগ্রহ থেকে যত বেশি সংখ্যক বই সম্ভব পড়ার জন্য। এসব বই সম্পর্কে আমার কী ধারণা এ নিয়ে কখনো আমার সঙ্গে কোন কথা তিনি বলেননি, কোন কিছু জিজ্ঞেসও করেননি।

চার বন্ধুর অ্যাডভেঞ্চার যাত্রা

ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর আমরা কয়েকজন সহপাঠী মিলে এক রকমের একটি অ্যাডভেঞ্চার ভ্রমণে বের হয়েছিলাম বেশ কিছু দিনের জন্য। অ্যাডভেঞ্চার বলছি এজন্য যে এর খুব নির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা ছিলনা; শেষ পর্যন্ত এটি নানা অনিশ্চয়তার মধ্যে বেশ কিছু রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতাই বয়ে এনেছিল। আপাতত

লক্ষ্য ছিল কক্সবাজার যাওয়া; তারপর অবস্থা বুঝে ঠিক করবো সেখানে কতদিন থাকতে পারবো, এরপর কোথায় যাব। একটি ভরসা ছিল যে আমাদের দলের একজনের—কুতুবুদ্দীনের বাড়ি কক্সবাজার অঞ্চলে—দুলাহাজরায়। এটি পাহাড়ি জঙ্গলাকীর্ণ এলাকা (বর্তমানে ওখানে বিরল পশু-পাখির একটি অভয়ারণ্যও রয়েছে), কুতুবদের পরিবারের বিরাট জমিদারিও সেই এলাকাতে। কুতুব ছাড়া আর যারা ছিলাম তারা হলাম রেজাউল করিম, কেরামত আখতার, আর আমি। আজকের কক্সবাজার ও সেখানে যাবার ব্যবস্থা নিয়ে যারা অভ্যস্ত তারা কল্পনাও করতে পারবেনা কক্সবাজার সে সময় কীরকম একটি বিচ্ছিন্ন, অনুন্নত এবং সম্পূর্ণ প্রকৃতিতে সমর্পিত স্থান ছিল। পুরো পাকিস্তান থেকে অল্প কিছু প্রভাবশালী উচ্চ-বিত্তরা বিমানে সেখানে ছুটি কাটাতে যেতেন, কাছাকাছি জঙ্গলে শিকারেও যেতেন। প্রধানত তাঁদের জন্য সমুদ্র সৈকতে একটি সার্কিট হাউজ ছিল, এবং তাছাড়া সদ্য কয়েকটি মোটেল গড়ে উঠছিল। তখনকার কক্সবাজারে স্থাপনা বলতে মোটামুটি এইই। বিমান বন্দরটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় বার্মা ফ্রন্টের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছিলো। আসলে প্রদেশের প্রায় সব বিমান বন্দরই এই একই কারণে তৈরি হয়েছিলো। সড়ক পথে চট্টগ্রামের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন কোন যোগাযোগ ছিলনা—আরাকান রোডের অনেকাংশ নষ্ট ছিল বলে শুধু স্থানীয় ভাবে কাটা কাটা রাস্তায় বাস ও যানবাহন চলতো। আমরা চার অভিযাত্রীর জন্য তাই সব চেয়ে অনুকূল যানবাহন ছিল সমুদ্র পথে কক্সবাজার যাওয়া। এ কে খান কোম্পানির ছোট জাহাজ তীরের কাছাকাছি থেকে সমুদ্র যাত্রা করে কক্সবাজারে যাতায়াত করতো। আমরা একেই বেছে নিলাম। সঙ্গে প্রত্যেকের কাঁধে নেবার মত একটি ব্যাগ মাত্র। আমার ক্ষেত্রে এর সঙ্গে বাড়তি ছিল টোকিও থেকে কেনা সেই বাস কন্ডাক্টরের কাঁধে ঝোলানো ছোট ব্যাগের মতো চামড়ার আবরণে জাপান থেকে আনা ট্রানজিস্টর রেডিয়ো—আমাদের সামনের বাউন্ডুলে ভ্রমণে যেটি একটি প্রধান অনুষঙ্গ হবে বলে আশা করছিলাম। শহরের সদরঘাট থেকে জাহাজে উঠে কর্ণফুলি মোহনা হয়ে সমুদ্রে। এ আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রা—তাই প্রাণভরে উপভোগ করছিলাম একে। কিন্তু বিপত্তি ঘটলো কুতুবদিয়া চ্যানেলে এসে। চট্টগ্রাম মূল ভূখণ্ড ও কুতুবদিয়া দ্বীপের মাঝখানের সমুদ্র হঠাৎ উত্তাল হয়ে পড়লে জাহাজ ভীষণ ভাবে দুলতে থাকে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিলামনা, হঠাৎ বমি শুরু হয়ে গেল, দেখতে দেখতে জাহাজের ডেকে শুয়ে গড়াগড়ি দিতে থাকলাম বমি করতে করতে। বমির উপশম হবে মনে করে কেরামতকে বললাম ব্যাগ থেকে অরেঞ্জ স্কোয়াশটি বের করে দিতে—কিন্তু কোথায় কেরামত? বন্ধুরা সবাই একই ভাবে গড়াগড়ি খাচ্ছিল আর বমি করছিলো।

জাহাজ কক্সবাজারে কোথায় ভিড়বে, সে সম্পর্কে কোন পূর্ব ধারণা ছিলনা, ধরে নিয়েছিলাম ওই সদরঘাটের মতই কোন সুন্দর ঘাট হবে সেটি। কিন্তু সন্ধ্যার আগে আগে ঘটনা যা ঘটলো তাতে ভড়কে গেলাম। কক্সবাজার সমুদ্র তীর থেকে

অনেক দূরে জাহাজ থেমে পড়লো, বলা হলো ভাটার কারণে আর কাছে যাওয়া যাবেনা। বহু দূরে কক্সবাজারের আলো দেখা যাচ্ছে মাত্র। আশেপাশে দেখলাম ছোট ছোট ছেলেরা ছোট নৌকা নিয়ে এসেছে আমাদেরকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারই একটিতে উঠে পড়লাম। যে ছেলেটি নৌকা চালাচ্ছিল সে মনে হয় ঢেউয়ের তাল সামাল দিতে পারছিলোনা। তাও না হয় চলতো, এর মধ্যে দেখলাম নৌকার পাটাতনের তলায় পানি উঠতে আরম্ভ করেছে—স্পষ্টত নৌকার তক্তাগুলোর মাঝে অনেক ফাঁক। ছেলেটি নির্বিকার ভাবে আমাদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে ছোট গামলার মত জিনিস দিয়ে বল্‌লো ' জলদি পানি সেচতে থাকেন'। আমরা প্রাণ ভয়ে যত দ্রুত সম্ভব তা করে পানি উঠা নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করলাম। অবশেষে সূর্য ডোবার পর পর হাঁটু পানিতে হেঁটে গিয়ে সমুদ্র তীরে উঠে এসে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম। সমুদ্র যাত্রার এমন লেজে-গোবরে সমাপ্তির কথা চিন্তা করতে পারিনি।

আমরা আগে থেকে এমন একটি ধারণা পেয়েছিলাম যে সার্কিট হাউজে গিয়ে ছাত্র হিসেবে দরখাস্ত করলে সেখানে অথবা মোটেলে থাকার জায়গা পেয়ে যাবো। দেখলাম সেটি দুরাশা মাত্র। সার্কিট হাউজ ভিআইপি অতিথি দিয়ে ভর্তি; মোটেলও প্রায় তাই। একটি সিনেমার শুটিং হচ্ছে কক্সবাজারে—এ জে কারদার পরিচালিত 'দূর হ্যায় সুখ কি গাঁও' (ছবিটি শেষ পর্যন্ত রিলিজ হয়নি)। ছবির অভিনেতা, অভিনেত্রী, কলা-কুশলী সবাই সবকিছু দখল করে ফেলেছে। তারপরও সামান্য আশা আছে, আগামী কাল অফিস খুল্‌লে কক্সবাজার কোর্টে গিয়ে এসডিও সাহেবের কাছে দরখাস্ত করে তাঁর অনুমতি আনতে পারলে। আপাতত তাই ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি কোথাও ক্ষুধা মিটাবার ও রাতে মাথা গোঁজার স্থান হলে চলে। কক্সবাজারে শহর বলতে তখন একটাই রাস্তা, মহকুমা শহর হলেও ভাবসাব অনেকটা গ্রামের হাটখোলার মত। সেখানে পর পর কয়েকটি খাবারের দোকান, এগুলোরই দু'একটি থাকার হোটেলও—খুবই মামুলি ধরনের। সমুদ্র থেকে সদ্য ধরা তাজা রূপচাঁদার স্বাদ ঝাল সত্ত্বেও খুব ভাল লাগলো বটে, কিন্তু ওই হোটেলের বিছানা-পত্রের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তবুও আশা ছিল এই এক রাতের পর এসডিও সাহেবের কল্যাণে সরকারী কোন অতিথিশালায় আমাদের ঠাঁই হবে। পরদিন সকালে কক্সবাজারের এসডিও কোর্টে গিয়ে খোঁজ খবর করলাম। শোনলাম অনুমতিটি এসডিও সাহেবের হলেও দরখাস্তটি যেতে হবে নাজির সাহেবের মাধ্যমে। আমাদেরকে যেতে হবে তাঁর কাছে, সরাসরি এসডিও সাহেবের কাছে যাওয়ার কোন সুযোগ নেই। উজির নাজিরদের কথা গল্পে সব সময় শুনলেও সত্যিসত্যি নাজির বলে যে একজন কর্মকর্তা এখনো আছেন সে কথা জানা ছিলনা। শুধু তাই নয়, তাঁর দফতরের একটি গালভরা নামও আছে 'নেজারত'; সব অবশ্য মহকুমা প্রশাসকের অধীনে।

ওই জায়গাটি দেখলাম নানা রকমের উমেদারদের এক অত্যন্ত ভীড়ের জায়গা, এর মধ্যে অদূর ভবিষ্যতে নাজির সাহেবের দেখা পাব এমন কোন সম্ভাবনা ছিলনা। সঙ্গে একটি দরখাস্ত নিয়ে গিয়েছিলাম, সেটি পাঠিয়ে দিলাম বটে কিন্তু সে সম্পর্কে কিছু জানতে পারার কোন সুযোগ ছিলনা। কেউ এটি পড়ে দেখেছে কিনা তাও বুঝতে পারছিলামনা। আমরা তীর্থের কাকের মত সেখানে বসেছিলাম বেলা একটা দু'টা পর্যন্ত। বাইরে পিয়ন বল্‌লেন এবার তিনি খাওয়ার জন্য ওঠে যাবেন—পরে আদৌ ফিরবেন কিনা সন্দেহ। পিয়নকে কিছু নাশতা-পানির পয়সা দিলে তিনি আমাদেরকে অবশেষে নাজির দর্শনে নিয়ে গেলেন। দেখলাম মোটা মতন মাঝ বয়সের এক ভদ্রলোকের গা মালিশ করছে এক ছোকরা। বুঝলাম তিনিই নাজির সাহেব; আমরা ছাত্রের মতো দেখতে চার বালক ঢুকে পড়ায় তিনি খুব যে কিছু অপ্রস্তুত হয়েছেন মনে হলোনা। যে ভাবে ছিলেন সেভাবেই রইলেন। দরখাস্তটির দিকে একবার তাকিয়েই বলে দিলেন—কিছু হবেনা। কোন প্রশ্নই ওঠেনা। কেন প্রশ্ন ওঠেনা তা ব্যাখ্যা করার কোন প্রয়োজনীয়তা কেউ বোধ করলেন না। আমরা সোজা রাস্তায় বের হয়ে এলাম।

বুঝলাম আমাদেরকে নতুন ভাবে পরিকল্পনা করতে হবে; তবে আপাতত আগে বাজারের ওই ভাতের হোটেলে। আমরা খাবারের অর্ডার দেবার উদ্যোগ নিচ্ছি এমন সময় দেখলাম কুতুব ভূত দেখার মত চমকে ওঠেছে। কারণ সে দেখতে পেল আরো কয়েকজন আত্মীয় সহ স্বয়ং মূর্তিমান তার বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন আমাদের সামনে। তিনিও কোর্ট থেকেই এসেছেন; মামলা উপলক্ষে গ্রাম থেকে এসেছিলেন ভোরে, তাঁর আইনজীবী মোক্তার সাহেব ও সঙ্গীদের সঙ্গে নিয়ে খেতে এসেছেন। তাঁকে খবর না দিয়ে এভাবে কয়েক বন্ধুকে নিয়ে বাউন্ডুলের মত কক্সবাজারে চলে আসার জন্য তিনি খুব বকাবকি করলেন কুতুবকে। খবর দিলে আগে থেকে এখানে সব ব্যবস্থা তিনিই করে রাখতেন—তাঁর রাগের কারণ প্রধানত এটি। এ নিয়ে কথাবার্তা বেশি হবার আগেই মোক্তার সাহেব এগিয়ে এসে চমৎকার একটি সমাধান এনে দিলেন। তিনি জানালেন তাঁর বাসা এখান থেকে কয়েক মিনিটের হাঁটা পথে। বাসাটায় এখন শুধু তিনি আছেন, কারণ তাঁর স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে উখিয়ায় বাপের বাড়ি বেড়াতে গেছেন—এ মাসটি পুরোটাই থাকবেন। তিনি বরং তাঁর বাসাটি আমাদেরকে ছেড়ে দেবেন, নিজে কাছেই অবিবাহিত বন্ধুর বাসায় চলে গিয়ে—যেখানে তিনি প্রায়ই গিয়ে আড্ডা দেন। তাঁর বাসার সব কিছু আমরা ব্যবহার করতে পারবো। বাসায় একজন কাজের লোক আছে সে আমাদের যত্ন নিতে পারবে, রেঁধে খাওয়াতে পারবে। এক্ষুণি খাওয়া শেষে তিনি আমাদেরকে বাসায় নিয়ে গিয়ে সব বুঝিয়ে দিতে চান। এমন অপ্রত্যাশিত বদান্যতায় আমরা হতভম্ব হয়ে গেলাম। কুতুবের বাবাও যেন হাতে চাঁদ পেলেন। এই তরুণ মফস্বল আইনজীবীর একটি তড়িৎ সিদ্ধান্ত আমাদের প্রায় ভেস্তে যাওয়া ভ্রমণটিকে জীবন ভর মনে রাখার মত একটি অ্যাডভেঞ্চার

অভিজ্ঞতায় পরিণত করেছিলো। কুতুবের বাবা সেদিন আমাদেরকে ওই হোটেলের মনে হয় সম্ভাব্য সর্বোচ্চ মানের ভোজে আপ্যায়িত করলেন, সেদিনই বিকালে তাঁর দুলাহাজরা চলে যাওয়ার কথা।

এর পরের দশ দিন কক্সবাজারে আমরা একেবারে মুক্ত পুরুষ। শুরুতে বেশ খানিকটা সময় ব্যয় করলাম এ জে কারদারের ফিল্ম শুটিং দলের সঙ্গে সঙ্গে। ওই দল যেখানে যাচ্ছে আমরাও সেদিকে যাচ্ছি। পাঞ্জাবি পরিচালক কারদার এ ছবির মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পীদের সমন্বয় ঘটাবার চেষ্টা করছিলেন। ইতোমধ্যে 'জাগো হুয়া সাবেরা' ছবিতে তিনি মানিক বন্দ্যোপধ্যায়ের 'পদ্মা নদীর মাঝি' উপন্যাস নিয়ে উর্দুতে একটি অনবদ্য সৃষ্টিকর্ম তৈরি করে তাঁর ক্ষমতার প্রমাণ দিয়েছেন। 'দূর হ্যায় সুখ কি গাঁও' তাঁর পরবর্তী প্রচেষ্টা। এর নায়িকা নাকি এদেশেরই নয়—ভারতের আসামের। ফিল্ম শুটিং এর মোহ অবশ্য আমাদের শিগ্‌গীর মিইয়ে গেল—কিন্তু প্রকৃতির মায়া তার স্থান দখল করলো। সেদিনের কক্সবাজারের চেয়ে প্রকৃতির লীলাভূমি আর কিই বা হতে পারতো?

কক্সবাজারে প্রকৃতির মায়ার একটি বড় দিক ছিলো সামুদ্রিক প্রকৃতি—মাইলের পর মাইল উন্মুক্ত সৈকত, অথচ তাতে মানুষ দেখা যাচ্ছে কালেভদ্রে দু'একজন পর্যটক অথবা মৎসজীবী। ভাটার সময় যে নতুন বালুকা ভূমি উন্মুক্ত হচ্ছে সেই কারণে ওটি সমুদ্র জীব-বিজ্ঞানের একটি অদ্ভুত সুন্দর প্রদর্শনীতে পরিণত হতে পারছিলো। আর সেখানেই ঘটে চলেছিলো দিনের পর দিন সারা দিন আমাদের পদচারণা। আমাদের পায়ে পায়ে পড়ছিলো উপুড় হয়ে পড়ে থাকা অসংখ্য স্বচ্ছ জেলিফিশ; এবং খুব ছোট থেকে বেশ বড় অসংখ্য ষ্টার ফিশ; ছোট কড়ির আকার থেকে বড় শঙ্খের আকারের সী-শেল। তা ছাড়া আরো নানা ধরনের শামুক-ঝিনুক জাতীয় মরা প্রাণি, মাছের কঙ্কাল ইত্যাদিও পেতাম পথে পথে। এতো গেল মৃত প্রকৃতি; জীবন্ত প্রকৃতির খেলায় রাজত্ব করছিলো জবড়জঙ্গ সব লাল কাঁকড়ার দল; কিছুক্ষণ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেই পরিবেষ্টিত হয়ে পড়তাম অসংখ্য লাল কাঁকড়ার দ্বারা যারা তাদের গর্ত থেকে উঠে মাথার উপর অ্যান্টেনার মতো একটি বাহু তুলে ধরে এগিয়ে আসতো, একটু নড়লেই উধাও হয়ে যেতো।

কক্সবাজারের সুন্দর অবিকৃত সমুদ্র জীব-বিজ্ঞানেই প্রদর্শনী নিয়েই শুধু আমরা সৈকতে ব্যস্ত থাকতামনা। আমরা চারজন ছিলাম এক রোমান্টিক চতুরঙ্গ—ফেনিল ঢেউ এগিয়ে আসা, পিছিয়ে যাওয়ার খেলা আমরা এখানে প্রত্যক্ষ করেছি দিনের নানা সময় তো বটেই, রাতের বিভিন্ন প্রহরে চাঁদের আলোতেও। সে সময় বোধ হয় কোন দিক থেকে নিরাপত্তার বিষয়টি কারো চিন্তার মধ্যেই ছিলনা। তাই কখনো একেবারে নির্জন গর্জনশীল ঢেউময় সৈকতে দিনের বা রাতের যে কোন সময় কাটিয়ে দিতে কোন উদ্বেগ ঘটেনি। একের পর এক

সেদিনের জনপ্রিয় রোমান্টিক গানগুলো গেয়ে গেয়ে চলতো সাগরবেলায় আমাদের পদচারণা। 'শাপমোচন,' 'পথে হলো দেরি', 'সাগরিকা' ইত্যাদি সিনেমার রোমান্টিক গানগুলো তখন আমাদের সবার কণ্ঠস্থ—গাওয়ার সময় সিনেমার দৃশ্যে উত্তম বা সুচিত্রার মুখগুলো মনে ভেসে উঠতো। তাছাড়া সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের একটি গান তো মুখে লেগেই থাকতো :

'মনে নেই সেকি মনে নেই
সেই সাগর বেলায় ঝিনুক খোঁজার ছলে
গান গেয়ে পরিচয়,
ওগো মোর গীতিময়।'

আমাদের রোমান্টিকতার একটি মোক্ষম রসদ ছিলো আমার সেই ট্রানসিস্টর রেডিয়ো। এটি সব সময় আমাদের কারো না কারো গলায় ঝুলতো আর একটানা বেজেই চলতো। এভাবে হাঁটার সঙ্গে সঙ্গে চলমান গানের উৎস আমাদের নিজেদের জন্য যেমন একটি অভাবনীয় অনুভূতি এনে দিত, পথে যাদের সঙ্গে দেখা হতো তাদেরও এ নিয়ে কৌতূহলের সীমা থাকতো না। এই সংগীতময় অলস পদযাত্রায়ও মাঝে মাঝে কিছু বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের লোভ সামলাতে পারতামনা। লক্ষ্য করলাম খোলা সমুদ্রের ধারে দূর দেশের এমন সব রেডিয়ো স্টেশনের ভাল রিসেপশন পাওয়া যাচ্ছিল যা সচরাচর পাওয়া যায়না। তা ছাড়া রেডিয়োটি কোন দিকে মুখ করে রয়েছে সেদিকে স্টেশনের আওয়াজ ভাল পাওয়া যাচ্ছিল। তখন অবশ্য জানতামনা যে এই ব্যাপারটির সুযোগ নিয়ে বিমানের পাইলট একটি নির্দিষ্ট গন্তব্যের থেকে পাঠানো রেডিয়ো সিগন্যাল যেদিকে গেলে সুউচ্চ রাখা যায় সেদিকে যেতে থাকলে ওই গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারেন। আর ঠিক এভাবেই বিমানের পাইলট নিচে ভূমির কোন কিছু না দেখেই তাঁর গতিপথ চিনে নিতে পারেন। উদাহরণ স্বরূপ আমরা দক্ষিণ-পূর্ব দিক হিসেব করে নিয়ে বার্মার রেঙ্গুনের দিকে যখন রেডিয়োটি তাক করছিলাম সেখানে 'বি বি এস রেঙ্গুন' নামক এক ইংরেজিতে সম্প্রচারিত স্টেশনের (বার্মা ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস) চমৎকার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। এটি আমাদের প্রিয় একটি স্টেশন হয়ে ওঠেছিলো, কারণ সেখান থেকে নিয়মিত পাশ্চাত্য সংগীত বাজানো হতো।

কক্সবাজারে অবশ্য একবার এই রেডিয়ো আমাদের জন্য বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। এক রাতে বাজার থেকে খাওয়া দাওয়া করে আমরা চারজন বেশ আয়েস করে মূল সড়ক দিয়ে সোজা সমুদ্র সৈকতের দিকে হাঁটছিলাম সেখানে আমাদের নিয়মিত নৈশ অভিযানের লক্ষ্যে। আমার গলায় সেই রেডিয়ো; আমরা 'অনুরোধের আসরের' গান শুনছিলাম—সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন প্রমুখের অতি প্রিয় গানগুলোর সঙ্গে নিজেরাও কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে গাইতে রাস্তার মাঝখান দিয়েই দিব্যি হেঁটে যাচ্ছিলাম। ওখানে সে সময় যানবাহন বলতে তেমন কিছু ছিলনা, রাস্তায় মানুষজনও খুব কম। গানে আমরা এমন বুঁদ হয়ে ছিলাম যে

পেছনে যে ইপিআর বাহিনীর (ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল্‌স) একটি লরি হর্ন দিচ্ছিল, সঙ্গে সঙ্গে টের পাইনি। তখন মার্শাল ল'র তুঙ্গের দিন; ইপিআর জোয়ানদেরও মেজাজ তিরিক্ষি। সরে যেতে দেরি হওয়াতে তাদের দু'একজন জওয়ান নেমে এসে উর্দুতে বকাবকি শুরু করলো; 'কৌন হ্যায় তুম, অ্যাক্টর বনকে চলতা হ্যায়'? ঠিক ওই সময় তাদের নজরে পড়লো যে গায়ক শুধু আমরা নই, গলায় ঝোলানো অদ্ভুত যন্ত্র থেকেও গান বেরুচ্ছে। এতে তাদের মেজাজ আরো খারাপ হয়ে গেল—লরিতে আমাদেরকে উঠতে বাধ্য করে স্থানীয় ইপিআর ক্যাম্পে নিয়ে যাওয়া হলো। সেখানে তাদের অফিসারকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে রক্ষা পেয়েছিলাম সে যাত্রা।

কক্সবাজারের প্রকৃতির মায়া শুধু সমুদ্রকে ঘিরেই ছিলনা—আমরা দিনের পর দিন ঘুরে বেড়াতাম এ শহর থেকে দূরে পাহাড়ি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে। ওখানে রয়েছে ছোট ছোট প্যাগোডা অর্থাৎ বৌদ্ধ মন্দির, সরু পাহাড়ি ঝরণা, 'ছরা' নামে পরিচিত সরু পাহাড়ি নদী। ওখানে যখন ঘুরতাম সঙ্গে থাকা বিস্কুট, রুটি ইত্যাদি দিয়ে খাবারের পাট সেরে ফেলতাম, ছরা থেকে বোতলে পানি নিয়ে তাই খেতাম। এ যেন আমাদের এক নিরবচ্ছিন্ন প্রকৃতির মধ্যে বাস। এগুলো এমন সব নির্জন জায়গা যে সারা দিন হয়তো দু'চারজন মানুষের সঙ্গে দেখা হতো।

কক্সবাজারে এভাবে ঘোরার সুবাদে দু' ধরনের পেশার মানুষকে লক্ষ্য করার সুযোগ হয়েছে। এক—মৎস্যজীবী; সমুদ্রে, খালে, নদীতে তাদেরকে কাজ করতে দেখেছি। সৈকতের খুব কাছেই তাদের জেলে নৌকা ঢেউয়ের সঙ্গে ওঠানামা করে; সেখান থেকে তারা জাল ফেলে তা টেনে নেয় ধীরে ধীরে। বেশ বড়সড় ট্রলার জাতীয় জেলে নৌকাকে দেখেছি এখান থেকে সমুদ্রযাত্রা করতে। আবার সমুদ্রের কোমর পানিতে দাঁড়িয়েও অনেক জেলে জাল টানছে—ওঠে আসছে ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছ, চিংড়ি। শহরে কাছে বাঘখালি নদীর মোহনায় একটি জেলে বন্দর। সেখানে জেলেরা নৌকা করে নিয়ে আসছে লোভনীয় সব সামুদ্রিক মাছের চালান—রূপচাঁদা, ছুরি, লটিয়া, লাক্কা, কোরাল, রাঙা চৌক্কা আরো কত কি। শোনলাম মাছের একটি বড় অংশ চলে যায় শুটকি তৈরিতে, আর এই শুটকির আসল তৈরির জায়গা হলো এখান থেকে কিছু দূরে সোনাদিয়া দ্বীপ। পুরো দ্বীপটিই নাকি এই কাজে নিয়োজিত। খুউব ইচ্ছে ছিল নৌকায় ওঠে সেখানে চলে যেতে—কিন্তু যাওয়া হয়নি। অন্য একটি পেশা দেখেছি তরমুজের চাষ। কক্সবাজারে সমুদ্র সৈকতের কাছের গ্রামাঞ্চলে তখন প্রচুর জায়গায় তরমুজের চাষ দেখেছি। নতুন ধরনের হালকা সবুজ রঙের ও ছোট বীজের বা প্রায় বীজহীন 'জাপানি' তরমুজ তখনো দেশে আসেনি। বাইরে কালচে ঘন সবুজ, ভেতর বড় বড় কালো বিচির দেশি 'পতেঙ্গার তরমুজ' বা 'কক্সবাজারের তরমুজ' নামে পরিচিতগুলোই তখন আমরা পেতাম। বালুকাময় মাটিতে কক্সবাজারে কি যত্নের সঙ্গে তার চাষ হতো তরমুজ খেতে সে সব খুব কাছে থেকে দেখেছি; কি

সুন্দর বড় বড় তরমুজ মাটিতে বালির উপর পড়ে আছে সারি সারি তার লতা পাতার সঙ্গে!

ওখানকার বিশেষ ধরনের চাটগেঁয়ে ভাষার বৈশিষ্ট্যের বিষয়েও আমি খুব মনোযোগ দিচ্ছিলাম। সেই যে ছোট বেলায় আশার বাপ দাদু আমাকে রোহিঙ্গা ভাষার সঙ্গে আমাদের চাটগেঁয়ের তফাতগুলো ধরিয়ে দিচ্ছিলেন এখানে সেগুলো যেন আবার ফিরে পেলাম। চাটগেঁয়েতে আমরা ছোট ছোট ফলকে 'গুলা' বলি যেমন জামকে 'জামগুলা', বা বেতফলকে 'বেতগুলা' ইত্যাদি। বড় ফলকে কোনদিন গুলা বলতে শুনিনি। এখানে দেখলাম তরমুজ চাষিরা তরমুজকে সব সময় বলছে 'গুলা'। একদিন দেখলাম তরমুজ খেতে দুই তরুণের মধ্যে ভীষণ ঝগড়া—প্রায় মারামারি পর্যায়ে। ঘটনা হলো ওদের একজন রাগের মাথায় অন্যজনের ক্ষেতে কিছু তরমুজ এলোমেলো করে দিয়েছে, নষ্ট করার চেষ্টা করেছে। তরমুজ মালিকের বক্তব্য 'তুই আমার গুলা নষ্ট করলি কেন? আমি তোকে ধাক্কা দিয়েছি তুই আমাকে ধাক্কা দিতি। আমার গুলায় হাত দিলি কেন? আমার গুলা আমার জান; তোর হাত ভেঙে দেব'; ইত্যাদি।

এত যে খেয়ালখুশির ঘোরাফেরা আমাদের গৃহকর্তা মোক্তার সাহেব প্রায়শ নিজের বাড়িতে এসে আমাদের খোঁজ-খবর করতেন, বাসার কেয়ার টেকারকে বার বার করে বলে যেতেন আমাদেরকে যত্ন করতে। আমরা তাঁর প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলাম আমাদেরকে এভাবে সুযোগ করে দেয়ার জন্য। দিন দশেক পর ভাবলাম এবার কুতুবদের বাড়ি দুলাহাজরায় চলে গিয়ে কিছুদিন সেখানে কাটাই। মোক্তার সাহেব আমাদেরকে যত্ন করে চকরিয়ার বাসে তুলে দিলেন—পথে দুলাহাজরায় নেমে যাবো।

কুতুবদের বাড়ি আরাকান রোড থেকে বেশি দূরে নয়। আমাদের কাছে মনে হলো জায়গাটি প্রকৃতির একটি স্বর্গরাজ্য। আধুনিক কালে যে এখানে বাংলাদেশের অভয়ারণ্য গড়ে তোলা হয়েছে তা বিনা কারণে হয়নি। আর সাবেকী জমিদার পরিবারের জীবনযাত্রা দেখার জন্যও এটি ছিল হয়তো আমাদের জন্য শেষ একটি সুযোগ। কুতুব আমার সহপাঠী বটে কিন্তু তার বড় ভাইদেরকে আমি তার সঙ্গে পরিচয় হবার আগে থেকেই চিনতাম। তার মেজ ভাই শামসুদ্দিন ভাই কলেজিয়েট স্কুলে ও চট্টগ্রাম কলেজে ইউনূস ভাইয়ের সহপাঠী ছিলেন। কলেজে নির্বাচনের সময় ইউএসপিপি'র পক্ষে তাঁর জ্বালাময়ী ভাষণ শুনেছি (পরে ডাক্তার, বাংলাদেশে আওয়ামী লীগ সংসদ সদস্য)। আর এক ভাই মহীউদ্দিন কলেজিয়েট স্কুলে ইউনূস ভাইদের কিছু জুনিয়র ছিলেন—স্কাউটিং করতেন। কুতুবদের বাড়িতে গিয়ে মহীউদ্দিন ভাইকে পেলাম নানা রকম সাংস্কৃতিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত। জমিদারির কাজ, অর্থাৎ বিস্তীর্ণ কৃষিজমি ও লবণের জমির দেখাশোনা করছেন কুতুবের বাবা ও সবার বড় আর এক ভাই। এই ভাই আবার সম্প্রতি বিয়ে করেছেন; বাড়িতে তাই নতুন ভাবীকে নিয়ে মহা-আনন্দ চলছিল, প্রতিনিয়তই

পিঠা-পায়েস-মিষ্টির বন্যা চলছে, আর চলছে মেজবানের খানা। দক্ষিণ চট্টগ্রামের বিশেষ বিশেষ পছন্দের খাবারগুলো দেদার খেলাম—মোষের দই, লাক্কা মাছের শুটকি ইত্যাদি।

গ্রামে একটি নাটক অভিনীত হবে, মহীউদ্দিন ভাই এর মহড়া নিয়ে বেশ ব্যস্ত। কিন্তু গোল বেঁধেছে এর নায়ক হবেন যে সুশ্রী ব্যক্তিটি সেই নবীন সরকারী কর্মচারী তহশিলদারের সঙ্গে কিছু জমিজমার বন্দোবস্তি নিয়ে সবার বড় ভাইয়ের সম্পর্ক ভাল যাচ্ছিলনা। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন ওই তহশিলদার নায়ক থাকলে তিনি এই নাটকের ধারে কাছে নেই। মজার ব্যাপার হলো এই হবু-নায়কের সঙ্গে ইতোমধ্যে আমাদের পারিচয়ও হয়ে গিয়েছিল এক সঙ্গে দিঘিতে গোসল করতে গিয়ে।

ওই জমিদার বাড়ির অলস দুপুর বেলাটি কাটে তাসখেলা দিয়ে। মহীউদ্দিন ভাইয়ের নেতৃত্বে বেশ ক'জন খেলতে বসে, আর অন্যান্য আরো নানা আত্মীয়-স্বজন দর্শক হিসেবে যোগ দেন। আমরা চারজনের কেউ কেউ যোগ দিলেও আমি কিন্তু তাস খেলাটি পছন্দ করতামনা, জানতামও না। তবে খেলার আসরে যে সব আলাপ হতো তা শুনতে খুব পছন্দ করতাম। আমার ভীষণ উৎসাহ ছিল জমিদারি এলাকাগুলো ঘুরে ঘুরে দেখতে। এ এক অদ্ভুত সুন্দর জায়গা। বন-পাহাড়ের মধ্যে আন্দোলিত ধানখেত—মাঝে মাঝে খাল। তবে সব চেয়ে বেশি মনোযোগ কাড়লো লবণের মাঠগুলো। এখানে সমুদ্র-সংযুক্ত বড় খালের থেকে ছোট ছোট খাল কেটে ঢোকানো হচ্ছে লবণাক্ত পানি। চারদিকে আইলে ঘেরা লবণ চাষের জমি, একেবারে শক্ত কাদামাটিতে লেপা। এ জমিতে ঢোকানো হচ্ছে এই পানি। তারপর ধীরে ধীরে সূর্যের তাপে বাষ্পীভূত হয়ে এই পানি পরিণত হচ্ছে অতি ঘন লবণ দ্রবণে। তখন একে স্থানান্তরিত করা হচ্ছে প্রায়ই একই রকমের আইলে ঘেরা আসল লবণ বেডে। এখানে দেখলাম সাদা আস্তরণের মত লবণ জমে ওঠেছে পানি সম্পূর্ণ শুকিয়ে গিয়ে। ওখানে নেমে দেখলাম এভাবে জমতে জমতে বেশ পুরো হয়ে লবণ সঞ্চয় ঘটেছে সেখানে। তখন শ্রমিকরা নেমে কোদাল দিয়ে সব লবণ এক পাশে স্তূপ করছে। এভাবে কোদালে জড়ো করতে গিয়ে বালি, মাটি, লবণ একাকার হয়ে যাচ্ছিল। শোনলাম পটিয়ার কছে লবণ গুদামে নিয়ে রেখে সেখানে এগুলো পরিস্কারের ব্যবস্থা হয়—তারপরেই আমাদের কাছে বাজারের সুন্দর সাদা লবণ আসতে পারে।

কুতুবদের বাড়ির একটি প্রায় নিয়মিত সখ ছিল হরিণ শিকার। কাছেই জঙ্গলে প্রচুর হরিণ ছিল, এবং হরিণ শিকারের উদ্দেশ্যে দূরের আত্মীয় স্বজন, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার শহর থেকে বন্ধু-বান্ধব, অভ্যাগতরা প্রায়ই বেড়াতে আসেন। তাঁদেরকে সঙ্গ দেবার জন্য বন্দুকসহ পাকা শিকারি এ বাড়িতে মজুদ ছিলেন। আমাদেরও ইচ্ছে ছিল এমনি এক শিকারে তাঁদের সঙ্গী হই। কিন্তু কুতুবের বাবার এতে ঘোরতর আপত্তি ছিল। এর পেছনে যে কারণ, সেই করুণ কাহিনী আমাদের

জানা ছিল। বেশ কিছু বছর আগে আমাদের কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক হোস্টেল-সুপার নূর আহমদ সাহেবের ছেলে এমনি ভাবে তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে এসে শিকারে গিয়েছিলো এই প্রায় আমাদের বয়সেই। শামসুদ্দিন, মহীউদ্দিন সব ভাইয়েরা হোস্টেলে থেকেছে বলে স্যারের সঙ্গে তাঁদের প্রায় পারিবারিক সম্পর্কের মতই ছিলো। শিকারের সময় ছেলোটির গায়ে ছিল খয়েরী রঙের সোয়েটার; শিকারিরা যখন হরিণের পেছনে ছুটছিল সে ভুল করে কেন জানি সেদিকে গিয়ে কিছু গাছপালার আড়ালে পড়েছিলো। শিকারি গাছপালার মধ্যে খয়েরি রঙের কিছুকে নড়াচড়া করতে দেখে সেটিকে হরিণ মনে করে বন্দুক চালিয়েছিল। ভাগ্যিস গুলি নাজুক কোন অঙ্গে না লাগায় ছেলেটি বেঁচে গিয়েছিলো—কিন্তু দীর্ঘদিন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিলো। এ বাড়িতে এটি তখনো দগদগে স্মৃতি হিসেবে ছিল।

তবে শিকারের বদলে আমাদের জন্য যা আয়োজন করা হলো সেটি আরো চমকপ্রদ। বেশ অভিজ্ঞ একজন মানুষকে বাড়ি থেকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পাহাড়ি জঙ্গলে ভ্রমণে গেলাম—সেখানে যে কয়েকটি বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ থাকে তাদের জীবনযাত্রা দেখবো, গাছপালা, জীবজন্তু সব কিছু দেখবো; এই আশা ছিলো। ওখানে ছিল কিছু মারমা, তংচইঙ্গা, চাকমা ও মুরং আদিবাসী। ভূমি থেকে বেশ ওপরে তাদের টঙের মত কিছু বাড়ি ঘর, পাড়া দেখলাম। বাগানে বাঁশ কাটা, কাঠ কাটা, ছোট খাট জুম চাষ এসবে তারা ব্যস্ত। এখানকার একটি ছোট টং ঘরে আমাদের রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হলো। পর দিন ওই টং থেকে নানা জায়গায় ঘুরে দেখলাম আমাদেরকে গাইডকে সঙ্গে নিয়ে। সকাল থেকে টং ঘরটির নিচে দেখেছি এক আদিবাসী তরুণ তাঁর ছোট্ট একটি দু'তিন বছর বয়সী বাচ্চাকে দেখাশোনা করছেন। ছেলেটি কান্নাকাটি করলে তাকে এটি সেটি খাওয়াচ্ছেন, তাকে নিয়ে ঘুরছেন, তার সঙ্গে খেলছেন। দিনের নানা সময়ে তাদেরকে কাছে ধারেই দেখলাম। বিকেলের দিকে দেখা মিল্‌লো ওই বাচ্চার মায়ের। মাথায় একটি ঝুড়ি বাঁধা, হাতে দা; জঙ্গলে সারাদিন কাজ করে এসেছেন। এসে ছেলেকে দেখাশোনা করছিলেন—আমরা গিয়ে আলাপ করলাম। এর আগে ছেলের বাবার সঙ্গে যখনই কথা বলার চেষ্টা করেছি উনি শুধু মিষ্টি মিষ্টি হেসেছেন, ছেলেটি খুব জ্বালাতন করছে ওসব বোঝাচ্ছিলেন। ওই বাচ্চার প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন প্রসঙ্গ তাঁর কাছে পেলামনা। মা আসার পর চিত্র বদলে গেল। মহিলা দা নাচাতে নাচাতে আমাদেরকে বোঝালেন যে বাঙালিদের হস্তক্ষেপের ফলে তাঁদের জীবনযাত্রা দিন দিন কঠিন হয়ে পড়ছে। ওরা এখানে পাহাড়িদের ভূমি দখল করে নিচ্ছে, এসব তাঁরা বেশিদিন সহ্য করবেন না। মনে হলো ব্যক্তিগত এবং গোষ্ঠীগত অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার সব দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছিলেন এই মহিলা। আর বাচ্চা পালনের ভার দিয়েছেন তাঁর ভাল মানুষ স্বামীটার উপর। মাতৃতান্ত্রিক সমাজের একটি জ্বলজ্যান্ত উদাহরণ দেখলাম সেদিন।

আমরা হরিণ শিকার করতে না গেলেও শিকার করা হরিণ কিন্ত আমাদের জন্য বাড়িতে চলে এলো। দুলাহাজরায় আমাদের শেষ ভোজটি হলো এই হরিণের গোশতে। কুতুব ছাড়া বাকি তিনজন বাসে রওয়ানা হলাম। ভেঙ্গে ভেঙ্গে কয়েকটি বাসে দোহাজারিতে শঙ্খ নদীর পাড়ে এসে নামলাম। শঙ্খ নদী নৌকায় পার হলাম বটে কিন্তু নদীটি এমন নিচে যে নৌকা থেকে নেমে পাড় বেয়ে ওঠার সময় পা ফসকে প্রায় নদীতে পড়ে যাবার অবস্থা হলো। মাতামুহুরি, শঙ্খ এসব নদীর ওপর তখন সেতু ছিলনা বলে আরাকান রোড দিয়ে একটানা চলাচল করার সুযোগ ছিলনা—বাস চলতো স্থানীয় ভাবে। কেরামত আর রেজাউলের যাত্রাও শেষ হয়ে গেল পটিয়ায় এসে। তাদের দু'জনেরই বাড়ি পটিয়ায়। রাত হয়ে গিয়েছিলো বলে সে রাত পটিয়ায় রেজাউলদের বাড়িতে কাটিয়ে পরদিন বাড়ি গেলাম।

বাড়ি ফেরার আগেই কয়েকদিন ধরে একটু জ্বর জ্বর লাগছিলো, এবং দুই কানের কাছে ব্যাথা। ফেরার পর দু'চার দিনের মধ্যে প্রকাশ পেলো এটি পুরা দস্তুর মাম্পস—বেশ ভোগাবার মত একটি ভাইরাল অসুখ; অবশ্য সাধারণত জীবনে একবারই হয়। জ্বর অনেক বেড়ে গেল, আর মুখ ফুলে বেশ ভরাট আকার ধারণ করলো। এ জন্যই চাটগেঁয়ে ভাষায় এ অসুখের নাম—'গাল টাউয়া'। কাজেই বাউন্ডুলে ভ্রমণ শেষ হলেও সেখান থেকে নিয়ে আসা ধকলের রেশ শেষ হতে আরো কিছুদিন সময় লাগলো।

কলেজের হাতছানি

অবশেষে প্রবেশিকার মাধ্যমে কলেজে প্রবেশের হকদার হলাম। স্কুলে ও পরিবারে আমার কাছ থেকে যা প্রত্যাশা ছিল নানা ঘটনা-দুর্ঘটনা সত্ত্বেও তা পূরণ করতে পারলাম—আমি পূর্ব পাকিস্তান সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড ঢাকার মেধাতালিকায় ছাব্বিশতম স্থান পেলাম। ত্রিশ জনের এই মেধা-তালিকায় থাকার জন্য প্রদেশের ভাল ভাল স্কুলগুলোর মধ্যে তখন থাকতো তীব্র নীরব প্রতিযোগিতা। সেদিক থেকে আমাদের স্কুল দারুণ স্বস্তি পেলো, কারণ জাম্বুরী উপলক্ষে বেশ কিছু দিন হারিয়ে যাওয়ার জন্য আমার অনেক শিক্ষক আমার উপর আর ভরসা রাখতে পারছিলেননা, তাছাড়া প্রাইভেট না পড়ায় তাঁদের সঙ্গে শেষের দিকে আর পড়াশোনার যোগাযোগটি ছিলনা। পরিবারের সবাই ভীষণ খুশি আমার সাফল্যে।

তবে সঠিক ফলাফলটি জানতে পারার আগে একটু নাটকীয়তা হলো। চট্টগ্রামের কয়েকটি স্থানীয় পত্রিকার একটি বড় আয়ই ছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফলাফলটি এক দিন আগে ব্যক্তিগত ভাবে বলে দেবার মধ্য দিয়ে। এবার এই সুবিধাটি নিয়েছিলো এখানকার পত্রিকা 'দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান'। ফলাফল প্রকাশের আগের সন্ধ্যায় ওই পত্রিকা অফিসের সামনে ফল-প্রার্থীদের দীর্ঘ লাইন। যে কেউ রোল নম্বরটি একটি কাগজের টুকরায় লিখে পাঁচটি টাকা সহ তা কাউন্টারে দিলে ওখানকার লোক তালিকা দেখে তলায় 'এক' 'দুই' 'তিন' অথবা 'এফ' লিখে

দিচ্ছিলেন। এক, দুই তিনের মানে ফার্স্ট ডিভিশন, সেকেন্ড ডিভিশন বা থার্ড ডিভিশনে পাশ, আর 'এফ' মানে ফেইল। ওই তিন ডিভিশনের তালিকায় না থাকলে 'এফ' ধরে নেয়া হতো। আমিও আর সবার মত এক রাত আগে ফলাফলটি পাওয়ার লোভে চিরকুট দিলাম। কিন্তু সেই চিরকূট 'এফ' লেখা অবস্থায় ফেরত এলো। ভুল হয়েছে মনে করে আরেকজনকে দিয়ে আবার চিরকূট পাঠালাম, একই ফল এলো। জীবনে এত বড় শক্ বোধ হয় খুব বেশি পাইনি। খুব যৌক্তিক ভাবে চিন্তার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিলাম তাই আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলাম—নির্ঘাত পরীক্ষার একটি খাতা কোন খান থেকে গায়েব হয়ে গেছে, অথবা এমনি অন্য কোন অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে। হাজার হলেও এতো দু'একটি খাতার ব্যাপার নয়, প্রদেশ জুড়ে লক্ষ খাতার মামলা—কোন খাতা কোথায় চলে যাচেছ তার কি কোন পাত্তা আছে। বাসায় ফিরে বড়দাকে বল্লাম। তিনি এসব চিন্তাকে পাত্তা না দিয়ে পরদিন ঢাকার পত্রিকায় ফলাফল দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বল্লেন। কিন্তু মন কি মানে—রাতটা প্রায় নির্ঘুম, ছটফট করেই কাটলো। এরকম খাতা গায়েব হলে তার কোন প্রতিকার আছে কিনা সেই সব নিয়ে ভাবছিলাম।

পরদিন বড়দাই প্রায় চিৎকার করতে করতে সকালের পত্রিকা নিয়ে এলেন; ঢাকার, চট্টগ্রামের যে ক'টা পেয়েছিলেন সব রকম পত্রিকা। প্রত্যেকটির প্রথম পৃষ্ঠাতেই মেধা তালিকায় আমার নাম, রোল নম্বর, স্কুলের নাম স্পষ্ট অক্ষরে লেখা রয়েছে। দৈনিক পূর্ব পাকিস্তানের লিষ্টে মেধাতালিকার রোল নম্বরগুলো বোধ হয় কোথাও ছিলনা, অথবা তারা সেখানে এই নম্বরটি খোঁজার কোন চেষ্টাই করেনি। বড়দা খুশি ও রাগের এক মিশ্র অনুভূতি নিয়ে ওই অবস্থায় সব পত্রিকা আর ওই চিরকূট নিয়ে 'দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান' অফিসে গিয়ে বকাবকি করে এলেন। পত্রিকার লোকজন অবশ্য এই অনাকাঙ্খিত ঘটনার জন্য বার বার মাফ চাইলেন।

প্রবেশিকার পর এবার কলেজের কথা ভাবা আরম্ভ করতে হয়। সে সময় সদ্য কলেজমুখী ছেলে মেয়ের সামনে থাকতো একটি বড় প্রশ্ন—'আর্টস' না 'সায়েন্স'? ওই অবধি দুনিয়ার তাবৎ কিশোর কিশোরী যেন একই জগতের মানুষ থাকে—যাদেরকে বাংলা, ইংরেজি, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি এক সুরে পড়তে হতো। আর ঠিক এই জায়গাটিতে এসে ওরা দুই ভিন্ন জগতের মানুষে বিভক্ত হয়ে যায়—হয় আর্টস নতুবা সায়েন্স। অবশ্য কমার্স বলে আরো একটি জগত ছিল অল্প কিছু ছাত্র সে পথে যেত, এটি আলাদা কমার্স কলেজেই বেশি পড়ানো হতো। আমার নিজের ক্ষেত্রে আর্টস সায়েন্স নিয়ে কোন দ্বিধা দ্বন্দ্ব ছিলনা—অনেকদিন ধরে বিজ্ঞান আমার কাছে নেশার মত। আগে পাঠ্য হিসেবে বিজ্ঞান না থাকলেও এর পর থেকে ভাল ভাবেই থাকবে এটি আমার পূর্ব-নির্ধারিত ছিল। কিন্তু একটু দুঃখ হচ্ছিল এখন থেকে পাঠ্য হিসেবে আর ইতিহাস ও ভূগোল থাকবে না বলে। এ দুটি বিষয় আমার খুবই প্রিয় বিষয় ছিল—এমনকি এর

পরীক্ষা প্রস্তুতি করাটিও ছিল আমার জন্য একটি খুব আনন্দময় অভিজ্ঞতা। পরে ম্যাট্রিকের বিস্তারিত নম্বর পেলে দেখেছি মেধা-তালিকার থাকা অধিকাংশের থেকে আমি এই দুটিতেই বেশি ভাল করেছি।

অন্য দিকে বিজ্ঞানের উচ্চতর পাঠ্য বই কেমন হয়, এ সম্পর্কে আমার কোন ধারণাই ছিলনা। যেমন বিজ্ঞানের সমস্যা সমাধানের জন্য কীভাবে অংক করতে হয়ে তার কোন চর্চা আমার ছিলনা। অথচ পাঠ্য বই নয় এমন বিজ্ঞানের যাবতীয় রকমের বই গোগ্রাসে আমি পড়েছি। এখন এই দুইয়ের মধ্যে কী রকম সম্পর্ক দেখার জন্য উদগ্রীব ছিলাম। ভাবলাম কলেজে যে পাঠ্যবইগুলো পড়তে হবে সাধারণ পাঠ্য হিসেবে এখন সেগুলো পড়ে দেখিনা কেন। মজার ব্যাপার হলো সেকালে ইন্টারমিডিয়েটের বহুল প্রচলিত বিজ্ঞানের বেশ কিছু পাঠ্য বই সর্বত্র সব কলেজে, এমন কি ভারতেও একই ছিল। প্রফেসররাও এগুলোই ব্যবহার করতেন। এগুলো আসলে বহু আগে থেকেই চলে আসছিলো, নতুন নতুন সংস্করণ বের হয়ে। এভাবেই ছিল বোস অ্যান্ড চাটার্জির ফিজিক্স, কে সি রয়ের কেমিস্ট্রি, এ,সি দত্তের বোটানি—ইত্যাদি। আমাদের শুধু জুলজির বইটি ছিল ভূঁইয়া অ্যান্ড টিমের—উভয় লেখক দেশের বাসিন্দা। টিম্ ছিলেন ফাদার টিম্—নটারডাম কলেজের জীব-বিজ্ঞানের বিখ্যাত শিক্ষক, পরে এনজিও নেতা। বইগুলো কিনে পড়ার চেষ্টা করলাম। একটু বেশি আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে লেখা এই যা, পড়তে মোটেই খারাপ লাগলোনা, বুঝতেও বেশি অসুবিধা হলোনা। তবে ফিজিক্সে বিভিন্ন সমস্যার গাণিতিক সমাধান খোঁজার কাজটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে এসেছে, তা দেখলাম। অন্যদিকে বোটানি আর জুওলজিতে খটমটে সব ল্যাটিন শব্দ মুখস্থ করেই মনে রাখতে হবে সেটিও বুঝলাম। সাধারণ পাঠ্য জনপ্রিয় বিজ্ঞান বইয়ে এই দুয়ের কোনটিই করতে হয়না। এই পার্থক্য অবশ্য আমার কাছে কলেজের হাতছানিকে বিন্দুমাত্র কমিয়ে দিতে পারলোনা।

'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলমেন'

কলেজি জীবনে উত্তরণ

আমাদের সময়ে স্কুল শেষ করে কলেজে যাওয়াকে জীবনের একটি বড় উত্তরণ মনে করা হতো; আজকের বিভিন্ন 'স্কুল অ্যান্ড কলেজে' পড়া ছাত্ররা দশম ও একাদশ শ্রেণির মধ্যে সে রকমের উত্তরণ খুঁজে পাবেনা। এর একটি বড় কারণ ছিল বৃটিশ আমল থেকে কলেজ জীবন সম্পর্কে একটি পৃথক সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল যেন এটি আর ছেলে মেয়েদের নয় বরং পূর্ণবয়স্ক তরুণ তরুণীদের শিক্ষালয়। এখানে ছাত্র ছাত্রীরা সম্পূর্ণ সচেতন ও দায়িত্বশীল ভাবে নিজেরাই জ্ঞান খুঁজে নেবে। এই সংস্কৃতিটি বহিরঙ্গে রূপ লাভ করেছে কিছু কিছু অদ্ভুত অভ্যাস ও নিয়মের মধ্যে। যেমন যেই দিন আমি কলেজে যাওয়া শুরু করবো সেদিন থেকে স্কুলের মত ব্যাগ নেয়া, বই বহন করা ইত্যাদি আমার জন্য সম্পূর্ণ বেমানান হয়ে যাবে। আসলে শিক্ষার্থীর অন্য কোন চিহ্ন ধারণও আমার কাছে প্রত্যাশিত হবেনা। বরং আমার উচিত হবে বড় জোর একটি পাতলা খাতার কোনাটি কোন রকমে আলগোছে ধরে ক্লাসে আসা যাওয়া করা। সেখানে অধ্যাপক বক্তৃতা দেবেন, আমি ইচ্ছে হলে শুনবো, এমনকি ওই খাতায় কিছু নোট করবো; আবার ইচ্ছে না হলে বিরাট ক্লাস বা লেকচার গ্যালারির কোন এক কোণে বসে নিজেরা অনুচ্চ স্বরে আলাপ চালাবো।

কলেজে সারা দিন একের পর এক ক্লাসের সবগুলোতে আমি থাকবো এমন কোন কথা নেই। স্কুলের মত একই ক্লাসে বসে থাকার রেওয়াজ কলেজে নেই। বরং রুটিনে স্থান-কাল-পাত্র দেখে বেছে বেছে এখানে ওখানে গিয়ে কিছু কিছু ক্লাসে উপস্থিত থাকবো—এটিই স্বাভাবিক। তাও আবার 'প্রক্সি' নামের একটি ব্যবস্থাও রয়েছে; দু'চারজন বন্ধু মিলে এক জনকে ক্লাসে পাঠিয়ে দিলাম সে লেকচার গ্যালারির কোন এক অদৃশ্য কোণে বসে রোল কলের সময় বিভিন্ন কণ্ঠে নানা জনের জন্য 'ইয়েস স্যার' বলবে এটিই আশা করা হয়। নিজেরা না যাওয়ার

কারণ হলো নানা ব্যস্ততা—যেগুলো সাধারণভাবে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেয়ার ব্যস্ততা; সেটি রাজনৈতিক, অরাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, পরচর্চা ইত্যাদি যে বিষয়েই হোক না কেন। কলেজ জীবনের পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করার জন্য এ ধরনের আড্ডাকে অপরিহার্য মনে করা হতো। এই রকম কলেজ জীবন যে সবার জন্য বাধ্যতামূলক ছিল তা বলবোনা, তবে যারা কলেজের সব ক্লাস নিয়মিত করতেই অভ্যস্ত ছিল তাদের মধ্যেও যে কখনো কখনো এই 'কলেজ সংস্কৃতি' ভর করতোনা একথা কেউ দাবি করতে পারবেনা।

এই প্রচলিত সংস্কৃতির কথা পুরা দস্তুর জানা থাকলেও আমি নিজে কিন্তু গোড়া থেকেই এর বাইরে থেকে কলেজ জীবনের অন্য রকম অর্থ খোঁজার চেষ্টা করেছি। কলেজে ভর্তি হবার আগে পিটম্যান শর্টহ্যান্ড শেখার চেষ্টা করার মধ্যেই তার প্রমাণ মেলে। তবে ক্লাস করার মধ্যেই কলেজ জীবনকে সীমাবদ্ধ রাখবো সেরকম ইচ্ছেও আমার ছিলোনা। এসব ভাবনা থেকে আমি খাতার কোনা ধরে ক্লাসে যাবার চিন্তা বাদ দিলাম—সে জায়গায় উদ্ভাবনশীল নতুন কিছু করার ইচ্ছে হলো। আমার সমাধানটি হলো একটি ক্লিপ ফাইল। প্লাষ্টিকের দুটি কভারের মাঝখানে একটি বড় ক্লিপে বেশ কিছু ফুলস্কেপ সাইজের আলগা সাদা কাগজ। বিভিন্ন ক্লাসের আলোচ্য বিষয় বিভিন্ন কাগজে নোট করে পরে যার যারটি আলাদা ফাইলভুক্ত করে নেবো এটিই ছিল পরিকল্পনা। সমাধানটি সরল, কিন্তু তার মধ্যেও ফাইলের মলাটের ভেতরের দিকটি আমি বেশ অর্থবহ ভাবে সাজালাম। সেখানে পাশাপাশি ছবি লাগালাম নিউটনের ও আইনস্টাইনের। আর ঠিক মাঝখানে পাকিস্তানি বিজ্ঞানী আবদুস সালামের। আবদুস সালাম তখনো নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী হননি, বয়স তখনো তাঁর চল্লিশ পেরুলো মাত্র; কিন্তু ইতোমধ্যেই তিনি বিশ্ব-বিখ্যাত বিজ্ঞানী, ইম্পেরিয়াল কলেজের ইতিহাসের কনিষ্ঠতম অধ্যাপক, রয়্যাল সোসাইটির ফেলো, পদার্থবিদ্যার গূঢ় সব রহস্যের সন্ধানে রত। আবদুস সালামের প্রতি আমার শ্রদ্ধার আর একটি কারণ ছিল দেশের তরুণ বিজ্ঞানীদের প্রতি তাঁর প্রায়শ উৎসাহ প্রদান; বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতি। কিছুটা স্ক্র্যাপ বুকের মতো সাজানো ফাইলের ওই অভ্যন্তরীণ মলাটটিই বলে দিচ্ছিলো কলেজের লেখাপড়াকে, বিশেষ করে এখানকার বিজ্ঞান শিক্ষাকে, আমি বেশ গুরুত্ব দিচ্ছিলাম, বেশ স্বপ্নিল চোখ দিয়ে দেখছিলাম।

স্কুল জীবন থেকে কলেজ জীবনে উত্তরণে আর একটি বড় উপাদান ছিল শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজির ব্যবহার। এখানে প্রফেসর ইংরেজিতে বলবেন এটিই স্বাভাবিক—ক্লাসে এবং ক্লাসের বাইরেও। আর আমাদেরকেও ক্লাসে প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে ইংরেজিতে, পরীক্ষার খাতায়ও সব কিছু লিখতে হবে ইংরেজিতে। এটিও জীবনের একটি বড় উত্তরণ বৈকি। এরই ফলে দেখা যেত ইংরেজির ব্যবহার বিস্তৃত হয়েছে ক্লাস রুম থেকে আড্ডায়ও।

উত্তরণের সবগুলো উপাদান যেন একসঙ্গে প্রতিভাত হলো আমাদের প্রিন্সিপ্যাল ইংরেজির অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ যখন সব সেকশনকে এক সঙ্গে করে ইংরেজির ক্লাস নিলেন—এটি কলেজে আমাদের পরিচিতি মূলক ক্লাসও বটে। প্রথমেই সম্বোধনের ধাক্কা দিয়ে তিনি আমাদেরকে চমকে দিলেন—'লেডিজ অ্যান্ড জেন্টেলম্যান'। গম্ভীর কণ্ঠের ওই একটি সম্বোধনেই কলেজ জীবনে উত্তরণ সম্পর্কে অনেকগুলো কথা তিনি এক সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দিলেন। মনে করিয়ে দিলেন যে এখন আমরা স্কুলবয় আর নই, আমরা জেন্টেলম্যান—জ্বলজ্যান্ত এক এক জন ভদ্রলোক, বয়স চৌদ্দ-পনরো-ষোল যাই হোক না কেন। আরও বড় কথা আমরা জেন্টেলম্যানরা এখন আর ক্লাসে একা নই, সঙ্গেই রয়েছে 'লেডিজ'রাও। আমাদের প্রায় সবার সঙ্গেই শিক্ষালয়ে কোন পর্যায়ে লেডিজ দূরে থাক কোন কিশোরী, বা বালিকা-শিশুরও কোনদিন সংশ্রব ছিলনা। এখন হঠাৎ করে সমবয়সী এরাই সহপাঠীনী—অধিকাংশই বড়দের মত শাড়ি পরে রীতিমত লেডিজ সেজে এসেছে। আমাদের জন্য এ এক সম্পূর্ণ নতুন অভিজ্ঞতা। তবে তাই নিয়ে আমাদেরকে আপাতত তেমন কিছু ব্যস্ত হতে হলোনা, কারণ ওই লেডিজরা পুরা দস্তুর নিখাদ লেডিজ থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল। ক্লাসের সময় ছাড়া বাকি পুরোটা সময় তারা 'লেডিজ কমন রুমের' বাসিন্দা। ঠিক ক্লাসের আগে সেখান থেকে একটি দল বেরিয়ে আসে। অধ্যাপক মহোদয় নিজ কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসা পর্যন্ত এ দল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে; তিনি বের হয়ে এলে তাঁকে সিঙ্গল লাইনে অনুসরণ করে ক্লাসে প্রবেশ করে। ক্লাসে ঢুকে সামনে একেবারে আলাদা এক জায়গায় একসঙ্গে তারা আসন নেয় এবং প্রায় পুরোটা সময় নিশ্চল ও নীরব থাকে। কাজেই লেডিজদের যা কিছু চাঞ্চল্য তা শুধু ওই তথাকথিত লেডিজ কমরুমের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। এ সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বাইরে থেকে ওই চাঞ্চল্যের শব্দ শোনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যেমনটি বেলাল ভাই তাঁর সময়ে 'কলেজী জিন্দেগির আসল কবিতা'তে লিখেছিলেন :

'আছে, লেডিজ কমন রুম
রুম ঝুম, যেন জীবন্তিকা।'

প্রথম ক্লাসে প্রফেসর মোজাফ্ফর আহমদ আমাদেরকে শেক্সপিয়ারের একটি সনেট পড়াবেন—পঞ্চান্নতম সনেট :

'নট মার্বেল, নর গিল্ডেড মনুমেন্টস...'

আজ তিনি দেবেন সনেটটির সামান্য ভূমিকা মাত্র। ইংল্যান্ডের একটি ম্যাপ এনে টাঙ্গিয়ে দিয়েছেন, আর অত্যন্ত নাটকীয় ভঙ্গিতে নিখুত কিংস ইংলিশ উচ্চারণে তিনি এলিজাবেথান যুগের ইংল্যান্ডের বর্ণনা দিচ্ছিলেন শেক্সপিয়ারের যুগকে বোঝার সুবিধার্থে। শোনলাম সনেটের ওই চতুর্দশ পদকে তিনি অনেক দিন ধরে পড়াবেন, তারপর আর কিছু পড়াবেন না—বাকি ইংরেজি সাহিত্য অন্যরা পড়াবেন। বাংলার অধ্যাপক আহমদ হোসেন আমাদেরকে চমৎকৃত করলেন

চট্টগ্রাম কলেজে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অনেক সৃষ্টিকাররা যে সাম্প্রতিক কালেও পড়িয়েছেন সে কথা তুলে ধরে। কিছুদিন আগেও এখানে পড়াতেন মনসুর উদ্দিন, মোতাহার হোসেন চৌধুরী ও আবুল ফজলের মত সাহিত্যিক।

প্রত্যেকটি বিজ্ঞান-ক্লাসে শুরুটি আমার খুব পছন্দ হলো—ঠিক যেমনটি আশা করেছিলাম তেমনি। বিজ্ঞানের আনন্দ বরাবরই আমার কাছে শুধু পড়ার কারণে নয়, করার কারণেও বটে। অন্তত এই প্রথম দিকের ক্লাসগুলোতে কয়েকজন বেশ সপ্রতিভ অধ্যাপক নিজ নিজ বিষয়কে পরিচিত করতে গিয়ে চমৎকার সব প্রদর্শনের সহায়তা নিলেন। এই ব্যাপারটি আমার দারুণ লাগলো—ভবিষ্যতে আরো আনন্দের হাতছানি দিলো। ক্লাসের কক্ষগুলোও অভিভূত হবার মতো—চট্টগ্রাম কলেজের বিখ্যাত পিএলটি আর সিএলটি; অর্থাৎ ফিজিক্স ল্যাবোরেটরি থিয়েটার, এবং কেমিষ্ট্রি ল্যাবোরেটরি থিয়েটার। অশ্বখুরাকৃতি ধাপে ধাপে গ্যালারিগুলোর বিন্যাস অনেক ওপরে পর্যন্ত; নিচে মাঝখানে বিশাল দরাজ মজবুত টেবিল; পেছনে দীর্ঘকায় ব্ল্যাক বোর্ড। এখানে অনেক ছাত্র এক সঙ্গে অধ্যাপককে শুধু শুনতেই পারে না, ওই বিশাল টেবিলের ওপর তিনি যে সব বৈজ্ঞানিক প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবেন সেগুলো দেখতেও পারে। এক বা একাধিক ডেমোনস্ট্রেটর তাঁর এই সব প্রদর্শনীতে সহায়তা দেবার জন্য হাজির থাকতেন। খুবই ঐতিহ্যবাহী কায়দায় এই সবকিছু বিন্যস্ত। প্রথম দিনগুলোর সেই বক্তৃতা, সেই প্রদর্শন মনের মধ্যে এখনো গেঁথে আছে। পদার্থবিদ্যার ক্লাসে প্রফেসর দেওয়ান মোহাম্মদ আহমদ একেবারে আনুষ্ঠানিক ফিজিক্সের ভাষায় বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন একটি সিষ্টেমের মধ্যে যত রকম ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ঘটুক না কেন ওসবের আগে পরে মোট মোমেন্টাম কিন্তু একই থাকবে; অর্থাৎ মোমেন্টামের নিত্যতার নীতি। এর জন্য তিনি নিয়ে এসেছিলেন গায় গায়ে লেগে থাকা অনেকগুলো সুতায় ঝোলানো ধাতব বল। এদের এক প্রান্তের একটিকে টেনে ছেড়ে দিলে অন্য প্রান্তে একটিই পরস্পর সংলগ্ন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসে; দুটি এক সঙ্গে টেনে ছেড়ে দিলে তার ধাক্কায় অন্য প্রান্ত থেকে ঠিক বেরিয়ে আসে দু'টি; এমনি ভাবে প্রত্যেক ক্ষেত্রে। সবই মোমেন্টামের নিত্যতার ফল।

এরকম প্রথম দিনের প্রদর্শন আরো অনেক বেশি নাটকীয় হয়ে উঠলো কেমিষ্ট্রির প্রফেসর ওয়াজেদের ক্লাসে। কোন রকম কোন কথাবার্তা ছাড়াই আমরা শুনতে পারলাম নানা রকম বিস্ফোরণের আওয়াজ, আর গ্যালারির সামনের দিকটা ভরে গেল সাদা লাল এক ধরনের ধোঁয়ায়; সামনে যে মেয়েরা বসেছিল তাদেরতো আতঙ্কের আর্তনাদ শোনা গেল, ছেলেরাও কম ভয় পায়নি। ধোঁয়া কেটে গেলে দেখা গেল আমাদের অধ্যাপক বীর দর্পে স্মিত হাস্যে দাঁড়িয়ে আছেন। এর পর তাঁকে আমরা দেখলাম এক রকম যাদুকর পিসি সরকারের ভূমিকায়—টকটকে রঙিন তরলকে আর একটি রঙিন তরলের সঙ্গে মিশিয়ে একেবারে বর্ণহীন পানির মত তরলে পরিণত করছেন, টলটলে স্বচ্ছ পানিকে মুহূর্তে পরিণত করছেন

একেবারে ঘন ঘোলা পানিতে, যাতে চকের গুড়ার মতো অনেক তলানি পড়লো। অধ্যাপক বোঝালেন রসায়নের পক্ষে সবই সম্ভব, আমাদের জীবনকে রঙিন ও চমকপ্রদ করার জন্যই এসেছে রসায়ন। শুধু খটকা লাগলো একটি বিষয়ে—প্রফেসর ওয়াজেদের ঘাড়ের কাছে বেশ খানিকটা জায়গায় কালো পোড়া দাগ—এটি অতীতের এমনি কোন আনন্দের ক্লাসে বেঘোরে কোন দুর্ঘটনার সাক্ষী কিনা সে কথা তিনি বললেননা। পদার্থবিদ্যার আর একজন প্রফেসর হাবিবুল বাশার আপাদমস্তক একজন দার্শনিক। পিএলটি'র এক কোণে দু'জন ছাত্রকে বেশ স্পষ্টভাবে অমনোযোগী ও আলাপরত দেখে তিনি খুব দরদ দিয়ে তাদের একজনকে জিজ্ঞেস করলেন 'জেন্টেলম্যান, আই ফীল ইউ আর আন-হ্যাপি উইথ ফিজিক্স টুডে। হোয়াই আর ইউ আন-হ্যাপি?' ওই ছেলে জীবনে কোনদিন এ জাতীয় প্রশ্নের সম্মুখীন হয়নি।

বায়োলজি লেকচার থিয়েটারটি ছিল অপেক্ষাকৃত নবনির্মিত, তাই ওটি ওই ক্ল্যাসিকাল ধাঁচের অশ্বক্ষুরাকৃতি লেকচার থিয়েটার নয়, আধুনিক অডিটোরিয়ামের মতো অনেকটা। কিন্তু এখানেই আমাদের জুলজি প্রফেসর আবদুস সাত্তার তাঁর প্রথম দিনটাতেই আমাদের ভাষা বদলিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। তিনি নিয়ে এসেছিলেন একটি বড় গরুর মূর্তি, আর একটি জ্বলজ্যান্ত ভেটকি মাছ। তাঁর কথা হলো প্রাণিবিদ হিসেবে আমরা সাধারণ শব্দাবলীর বদলে বৈজ্ঞানিক শব্দাবলী ব্যবহার করবো—তা হলে অর্থগুলো খুব সুনির্দিষ্ট থাকবে। প্রথমদিন প্রাণির মরফোলজি অর্থাৎ তার বাইরের আকৃতি-রূপ ইত্যাদি বোঝাবার প্রসঙ্গে বল্‌লেন আমাদের জন্য প্রাণির উপরটি আপসাইড নয় বরং 'ডরসাল', তেমনি নিচের দিক 'ভেন্ট্রাল', সামনের দিক তেমনি ফ্রন্ট নয় বরং 'এন্টেরিয়র', আর পেছন দিক 'পোষ্টেরিয়র'। গরুর মডেলের গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে বলতে শেখালেন কোনটি ডরসাল, কোনটি ভেন্ট্রাল, কোনটি এনটেরিয়র আর কোনটি পোষ্টেরিয়র। একই কাজ ভেটকি মাছের ক্ষেত্রেও করলেন; এমন ভাবে সব কিছু করলেন যাতে আমরা এই নতুন ভাষাতেই অভ্যস্ত হয়ে পড়ি। এই কাজটিই আরো সর্বাংশে করেছিলেন বোটানির তরুণ অধ্যাপক ওবায়দুল্লাহ—তাঁর কথা শিগ্‌গীর অনেক বলতে হবে। অবাঙালি প্রফেসর আবদুস সাত্তার বয়সে যথেষ্ট সিনিয়র হয়েও খুব রসিক ছিলেন। কিছুদিন পর কলেজের একটি পরীক্ষায় প্রাণিবিদ্যার প্রশ্নপত্রে তিনি আমাদের চমকিয়ে দিয়েছিলেন। একটি ইংরেজি কবিতার কয়েক লাইন দিয়ে তিনি আমাদেরকে তার ভাব সম্প্রসারণ করতে দিয়েছিলেন। কবিতায় ছন্দ মিলিয়ে যা বলা হয়েছে তা হলো 'সে এক অদ্ভুত ব্যাপার! মিস্ টি যা খান তাই মিস্ টি হয়ে যায়!' প্রকারান্তে তিনি প্রাণির পরিপাক সিষ্টেমের কাজ সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন। আমার খুব আশা ছিল বিজ্ঞান সম্পর্কে জ্ঞান যাচাই করার সময় ভবিষ্যতেও এমনি মজার মজার প্রশ্ন করা হবে—কিন্তু কার্যত তা হয়নি। সব কিছু শেষ পর্যন্ত বেশ কিছুটা গতানুগতিক লেখাপড়ায় পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও অন্তত শুরুর দিকে কলেজ জীবনের নতুন দিকগুলো দারুণ উপভোগ করেছি।

আজম খানের সৌজন্যে দেশ-দর্শন

যেই তিনজন জেনারেলের প্রত্যক্ষ সহায়তায় আইয়ুব খান মার্শাল ল'র ক্ষমতায় এসেছিলেন তাঁদের অন্যতম ছিলেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান। একজন অভ্যন্ত অভিজ্ঞ এবং কড়া সামরিক অফিসার হিসেবে আজম খান পরিচিত ছিলেন। ইতোপূর্বে একবার এক স্থানীয় মার্শাল ল'র সময় লাহোরের সামরিক শাসক হিসেবে ওখানে কাদিয়ানি বিরোধী দাঙ্গা তিনি যে রকম কড়া পদক্ষেপে দমন করেছিলেন তাতে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি-কুখ্যাতি ছিল। ১৯৫৮ এর মার্শাল ল'তে তিনি প্রথমে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিয়োজিত হয়েছিলেন। পরে ১৯৬০ এর এপ্রিল মাসে পূর্ব পাকিস্তানের নতুন গভর্নর হয়ে আসেন। এখানে আসার পর তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়; তিনি কেমন করে জানি এখানকার সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে একাত্ম হয়ে যান। বিশেষ করে ১৯৬০ এর অক্টোবরে এবং পরে আবার ১৯৬১ সালে চট্টগ্রামের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের পর তিনি ভূক্তভোগী মানুষের পাশে যে ভাবে দাঁড়িয়ে তাদের একজনে পরিণত হয়েছিলেন তা এক রকম কিংবদন্তিতে পরিণত হয়েছিলো। এর পর থেকে তাঁকে দেখা গেছে প্রদেশের গ্রামে গ্রামে ঘুরে কৃষক, জেলে, শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলতে। সেখানে তাঁর সার্বক্ষণিক সম্বোধন 'চাষি ভাইয়ো, জেলে ভাইয়ো' তখন সবার মুখে মুখে ছিল; আর যেখানে যেতেন কৃষকরা, মহিলারা লাউ-কুমড়া, মাছ ইত্যাদি যেভাবে হাতে করে তাঁর জন্য নিয়ে যেতো, আর তিনি খুব সাদরে সেগুলো নিতেন—সেও এক অদ্ভুত পরিচিত দৃশ্যে পরিণত হয়েছিলো।

তবে শুরুর দিকে এখানে সাধারণ্যের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা শুরু হয়েছিল ছাত্রদের দিয়ে। তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের নানা হল হোস্টেল ঘুরে এসে ছাত্র ছাত্রীদের সুবিধা-অসুবিধার বিষয়ে নিজে পরিচিত হবার চেষ্টা করেছেন, এবং কিছু কিছু সমস্যার সমাধানও করেছেন। ইউনূস ভাইদের মুখে শুনেছি যে সলিমুল্লাহ হলের পেছনের বৃটিশ কাউন্সিলের দিক থেকে সরাসরি ডাইনিং রুম দিয়ে হলে ঢোকার যে ঘরোয়া দরজা রয়েছে, সেখান দিয়ে একবার হঠাৎ করে দুপুরে খাওয়ার সময় সোজা ডাইনিং রুমে এসে হাজির হয়েছিলেন। এসেই ছাত্রদের সঙ্গে খেতে বসে পড়েছিলেন সেই লম্বা টেবিলে। একটু খানি খেয়ে খাবারটি তাঁর ভাল লেগেছিল সেটা জানিয়েছিলেন, কিন্তু পরিবেশ একেবারে ভাল লাগেনি। কাঠের টেবিলে পাতা থাকতো বিশ্রী দাগ পড়া কাপড়ের দস্তরখানা। তিনি সঙ্গে থাকা ব্যক্তিগত সেক্রেটারিকে লিখতে বল্‌লেন টেবিল টপটি হবে মার্বেল পাথরের, দুই পাশে সাউন্ড বক্স থাকবে খাওয়ার সময় মৃদু মিউজিক বাজার জন্য। এই পাথরে ঢাকা টেবিল, এই মিউজিক, দু'বছর পর আমিও হলে গিয়ে পেয়েছিলাম।

চট্টগ্রাম কলেজে আজম খানের জনপ্রিয় কাজগুলোর একটির নগদ লাভ হাতে হাতে পেলাম। তিনি নাকি বলেছেন 'মাই বয়েজ গুড সী দি কান্ট্রি অ্যান্ড লার্ন অ্যাবাউট ইট'। যেই বলা সেই কাজ। ১৯৬১ এর গরমের ছুটিতে ট্রেনের কিছু বিশেষ বগির ব্যবস্থা করা হলো—যাতে চট্টগ্রামের কয়েকটি কলেজের নির্বাচিত আমরা অনেক ক'জন ছাত্রের পূর্ব পাকিস্তান দর্শনের ব্যবস্থা হলো। তাৎক্ষণিক উদ্দেশ্য ছিল দেশে যে বড় বড় অর্থনৈতিক উদ্যোগগুলো রয়েছে তার সঙ্গে পরিচিত হওয়া। আমাদের সেই আকর্ষণতো ছিলই—তার সঙ্গে ছিল ফূর্তি করে বেড়াবার আনন্দ। চট্টগ্রাম কলেজের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক) আমাদের শিক্ষক-দলপতি হলেন। অত্যন্ত অমায়িক মানুষ তিনি, ছাত্রদের সকল উপদ্রব হাসি মুখে সহ্য করেন; তাদের সঙ্গে আনন্দ ফুর্তিতে যোগ দেন, তারা সব কিছু যেন ভাল করে দেখতে পারে সে ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু তারপরও ছাত্রদের আচরণ মাঝে মাঝে তাঁকে কান্নার পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছিল। দলে আমরা নবাগতরা যেমন ছিলাম, বেশ কয়েকজন সিনিয়র ছাত্র ছিলেন। যেমন অর্থনীতির অনার্সের ছাত্র ফরিদ ভাই, আশফাক ভাই, ফজলুল কাদের ভাই তাঁরাও আমাদেরকে যথেষ্ট দেখাশোনা করছেন।

ট্রেনে প্রদেশের এ মাথা থেকে ও মাথা ঘোরা—সে এক অনন্য অভিজ্ঞতা। আমাদের ছোট দলে ছিলাম বোরহান, আহমদ উল্লাহ, এবং আরো কয়েকজন—রাত দিন একই কম্পার্টমেন্টে গুলজার করছি। বোরহানের নেতৃত্বে একটানা গান যেমন চলছিল—আহমদউল্লার নেতৃত্বে তেমনি কাব্য চর্চা। এই শেষোক্ত জনের সঙ্গে কলেজেই পরিচয়—খুবই ভাবপ্রবণ ছেলে, প্রতিভাবান ছাত্র (পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক, সুইডেনে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ কালে আত্মহত্যা করে)। অতি সাধারণ দৃশ্য, সাধারণ ঘটনাকে আহমদউল্লাহ যেভাবে তার অতিপ্রাকৃত বর্ণনায় সবার জন্য মনোগ্রাহী করে তুলছিল সেটি ছিল বেশ মজার। সিলেটে গিয়ে থাকলাম মুরারী চাঁদ কলেজের হোস্টেলে—ছাত্ররা বাড়িতে চলে যাওয়াতে আমরা আপাতত তাদের জায়গা নিলাম। এই ভ্রমণেই প্রথম দেখি এদেশের ঐতিহ্যবাহী কলেজগুলো এক একটি কত সমৃদ্ধ সব ক্যাম্পাসের অধিকারী। মুরারী চাঁদ কলেজ তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এই যাত্রায় আরো দেখেছি দিনাজপুরের সুরেন্দ্রনাথ কলেজ এবং খুলনায় ব্রজলাল কলেজ। সব জায়গায় আমরা হোস্টেলে থেকেছি এক একটি কলেজের এক একটি নতুন পরিবেশের স্বাদ নিয়েছি। সিলেট থেকে দেখা হলো ছাতক সিমেন্ট ফ্যাক্টরি—যেখানে ভারত থেকে রোপ-ওয়ে দিয়ে চুণাপাথর আসছে। এতে বেশ চমৎকৃত হলাম। বড় বড় বালতির মত পাত্র ঝুলছে মাথার উপর দিয়ে খাটানো ধাতব দড়ি থেকে; কপিকলের সাহায্যে দড়ির চলাচল এই পাথরভর্তি বালতিগুলোকে ভারত থেকে এগিয়ে আনছে, আর চূণাপাথর নামিয়ে দিয়ে খালি বালতি ভারতে ফেরত নিচ্ছে।

সিলেট থেকে ট্রেনে সোজা ঢাকা এসে ঢাকা কলেজ হোস্টেলে ঠাঁই নিলাম। ঢাকা তখন মোটেই অপরিচিত জায়গা নয় আমার কাছে। কিন্তু দলগত ভাবে আমরা মফস্বলের ছাত্র—এবার সেটিই মূল সুর। আমরা এসেছি 'রাজধানীর বুকে'। সেই ১৯৬০ এর জানুয়ারিতেই মুক্তি পেয়েছে এহাতেশামের পরিচালিত এবং রহমান-শবনম অভিনীত ফিল্ম 'রাজধানীর বুকে'; এর গানগুলো তখন আমাদের মুখে মুখে; বিশেষ করে তালাত মাহমুদের গাওয়া 'তোমারে লেগেছে এতো যে ভাল, চাঁদ বুঝি তা জানে'। আমরা ট্রেন ভর্তি মফস্বলের ছাত্রদের এবার ঢাকা আসা যেন ওই সিনেমার ঘোর চোখে নিয়ে—ছবিটি যেমন করে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে রাজধানীর আকর্ষণগুলোকে—সে ভাবে। বোরহানের সেজ ভাই আবুল মামুন আবদুল্লাহ হোসেন সিদ্দিকী কিছুদিন আগে পর্যন্ত সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্র সংসদের ভিপি ছিলেন, এবং সেই সুবাদে ছিলেন ছাত্র রাজনীতির কেন্দ্র স্থলে। অবশ্য মার্শাল ল'র শুরুর ওই বছরগুলোতে ছাত্র রাজনীতিতে তেমন উত্তাপ ছিলনা। তখন তিনি সরকারী চাকরী জীবনের শুরুতে যথারীতি মেসে থাকেন। বোরহান আর আমাকে নিয়ে গেলেন চু-চিন-চাও রেস্টুরেন্টে খাওয়াতে। ঠিক সেদিনের ঢাকাতে কাউকে যদি সর্বোচ্চ স্টাইলে কোথাও খাওয়াতে হয় তা বোধ হয় ছিল প্রদেশের প্রথম এই চাইনিজ রেস্টুরেন্টে। এর মাধ্যমেই শুরু হয়েছিলো চাইনিজ খাবারের কালচার যা পরে দ্রুত বিস্তার লাভ করে। সেই গুলিস্তান সিনেমা ভবন, তাতেই সাম্প্রতিকতম যোগ ঘটেছিল চু-চিন-চাও। নতুন ধরনের চেহারার রেস্টুরেন্ট, সামনের দ্বার রক্ষায় নিয়োজিত স্মার্ট ইউনিফর্ম পরা একজন বামন। চাইনিজ খাবারের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকলেও এরপর থেকে প্রথম দিকের যতগুলো চাইনিজ রেস্টুরেন্ট হয়েছে সবগুলোতে এর খর্বাকৃতি দ্বাররক্ষী থাকাটি প্রায় বাধ্যতামূলক ছিল; চু-চিন-চাওয়ের পথিকৃতের ভূমিকাটি ছিল এতই সুদূর প্রসারী।

নেক্স্ট স্টপ দিনাজপুর। ফুলছড়ি ঘাট দিয়ে বিশাল যমুনা নদী পার হয়ে হয়ে এদিকের ট্রেন থেকে ওদিকের ট্রেনে যেতে হলো। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ কলেজের হোস্টেলে ঠাঁই নিয়ে দেখলাম সব স্থানীয় ঐতিহ্য ও ইতিহাসের নিদর্শন—রাজবাড়ি, রাম সাগর দিঘি ইত্যাদি। মানুষের হাতে কাটা দিঘি যে এত বড় হতে পারে সে সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা ছিলনা। এক সহপাঠী বন্ধু এখানে তার আত্মীয় জেলা জজ সাহেবের বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিল। বয়সী জেলা জজ তাঁর মেয়েকে ইংরেজি কবিতা পড়াচ্ছিলেন তখন, যে কবিতাটি সেটি আমাদেরও পাঠ্য—উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'দি সলিটারি রীপার'।

আমরা যখন কামরায় সন্তর্পনে ঢুকলাম তখন মেয়েকে সামনে বসিয়ে চোখ বুজে জজ সাহেব আবৃত্তি করছিলেন, আর ইংরেজিতেই কবিতার ভাবটি আরো ব্যাখ্যা করে চলছিলেন :

বিহোল্ড হার সিঙ্গেল ইন দি ফিল্ড,
ইয়োন সলিটারি হাইল্যান্ড ল্যাস!
রীপিং অ্যান্ড সিংগিঙ্গ বাই হারসেল্‌ফ;
স্টপ হেয়ার, অর, জেন্টলি প্যাস!

তিনি এমন ভাবে কবিতার দৃশ্যটিকে, ভাবটিকে তাঁর আবৃত্তিতে ও ব্যাখ্যায় ধারণ করছিলেন পুরো কবিতাটি ও তাঁর সকল কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমরা একটি টু শব্দ করেও সেই মোহাবিষ্ট পরিবেশ নষ্ট করতে চাইছিলাম না। ক্লাসে সাহিত্যের জাঁদরেল অধ্যাপক নন, ছোট্ট শহর দিনাজপুরে এক জেলা জজ তাঁর মেয়েকে এতটা দরদ দিয়ে ইংরেজি কবিতার রাজ্যে নিয়ে যেতে চাচ্ছেন—এই দৃশ্যে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছিলাম।

দিনাজপুর থেকে ফেরার পথে রাতের ট্রেন এক জায়গায় থামলে ঘুম ভেঙ্গে চোখ কচলাতে কচলাতে দেখলাম সামনে একটি রাস্তায় বেশ গাড়ি ঘোড়া আটকে আছে, আর তাদের সামনে একটি ফ্ল্যাগ পোস্টে উড়ছে ভারতীয় পতাকা। শোনলাম এটি হিলি—একটি সীমান্তবর্তী স্টেশন। হঠাৎ এক নজর ভারত দেখা হয়ে গেল, সেকালে যেটি অসম্ভব ব্যাপার ছিল। আবার দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে ঈশ্বরদিতে বৃটিশ রাজের অপূর্ব কীর্তি পদ্মার ওপর দীর্ঘ রেল সেতু হার্ডিঞ্জ ব্রিজ বা সারাহ ব্রিজ দেখা, গঙ্গা-কপোতাক্ষ পরিকল্পনার কথা জানা, এবং তারপর এখানকার বিখ্যাত কৃষি গবেষণা কেন্দ্র ও সরকারী খামার ভ্রমণ। গবেষণা কেন্দ্রের কৃষি কর্মকর্তা দেশের কৃষি গবেষণা সম্পর্কে যতই জানাতে চান আমাদের সতীর্থরা ততই অধৈর্য হয়ে আমাদের জন্য রক্ষিত কলা ইত্যাদি ফলারের উপরই বরং আগাম আক্রমণ চালায়। জ্ঞান নিতে এই অনীহার জন্য আমাদের অধ্যাপক দলপতি আনিসুজ্জামান স্যারকে আমাদের পক্ষ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমা চাইতে হলো।

এবার আরো দক্ষিণে খুলনা—ব্রজলাল কলেজ হোস্টেলে। খুলনা, খালিশপুর একে মোটামুটি শিল্প এলাকা হিসেবেই আমরা দেখলাম। পাটের কল, ম্যাচের কল, এসব দেখে দেখে কয়েকদিন কাটিয়ে দিলাম খুলনায়। তারপর ঢাকায় ফেরা।

জেনারেল আজম খান যে তাঁর 'বয়েজ'দেরকে দেশ দেখাবার সংকল্প করেছিলেন তার প্রথম সুবিধাভোগীদের মধ্যে আমরা ছিলাম অন্যতম। এই পুরো অভিজ্ঞতায় আমাদের 'ফ্রেম অব রেফারেন্স' ছিল আমাদের ট্রেনটি—এটিই ছিল আমাদের নিত্যকার আশ্রয় এর ভেতরে আমাদের প্রায় নিরবচ্ছিন্ন আড্ডা, গান, চলেছে তো চলেছেই। বাইরে জানালায় পার হয়ে গেছে দেশের নানা দৃশ্য, ধান খেত, নদী নালা, স্টেশন, হাট বাজার—কত কিছু! মাঝে মাঝে কলেজ হোস্টেলে রাত কাটিয়েছি বটে, কিন্তু সেগুলো আর সেখানকার ঘটনাবলী এই আছে, এই নেই; ট্রেনটিই ছিল আমাদের মূল আশ্রয়, ভ্রমণের মূল সুর। জনপ্রিয় জেনারেল সাহেবের সৌজন্যে দেশের পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণ পাড়ি দেবার এই যে একটি মজার অভিজ্ঞতা আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম তার কোন তুলনা হয়না।

কলেজে বিজ্ঞান-আবহ

এতদিন বিজ্ঞান জিনিসটি আমার জন্য নেহাত ব্যক্তিগত পড়া, ব্যক্তিগত করা, এবং নিজে নিজে আনন্দ পাওয়ার বিষয় হয়ে ছিল। কলেজের আবহেও অন্তত এর কোন কোন দিককে কিছুটা অন্যভাবে উপভোগ করলাম। সব কিছু যদি নেহাত ক্লাসের কাজে সীমাবদ্ধ থাকতো তা হলে এমনটি হতোনা। আমরা ক্লাসে বা ল্যাবোরেটরিতে যা করছি তার কিছু কিছু আমাদের বাইরের আলোচনায় ও অভ্যাসে নিয়ে এসেছি। যেখানেই পারতাম আমি এতে একটি অগ্রণী ভূমিকা নেবার চেষ্টা করতাম বিশেষ করে প্র্যাকটিকালের কাজগুলোকে আমি প্রায়ই বন্ধুদের আড্ডায় নিয়ে আসতাম; বন্ধুরা কখনো তাতে খুব উৎসাহ নিতো, আবার কখনো মনে করতো আমি অনর্থক গাদ্যিক জিনিস এনে তাদের কাব্যিক আড্ডা নষ্ট করে দিচ্ছি। কিন্তু এই প্রথম দলেবলে বিজ্ঞান সম্পর্কীয় একটি আবহ সৃষ্টির প্রয়াস পেলাম।

যেমন পদার্থবিদ্যার ল্যাবোরেটরিতে সরল দোলককে দুলতে দিয়ে আমরা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ জনিত ত্বরণ নির্ণয় করতাম। ওখানে স্টপ ওয়াচ ইত্যাদি দিয়ে যথেষ্ট কায়দা করে ভাবে করলেও, আড্ডায় একটি সুতা যে কোন গোলগাল জিনিসে বেঁধে একটি যেনতেন দোলক বানিয়ে নিয়ে হাত ঘড়ি দিয়েই মোটামুটি মেপে ফেলতাম তার দোলন কাল; সেখান থেকে মাধ্যাকর্ষণের মত একটি গূঢ় জিনিসের মোটামুটি মাপ আড্ডা দিতে দিতেই পেয়ে যেতাম। ল্যাবে কনভেক্স মিরর অর্থাৎ বাইরের দিকে বক্রাকার আয়না নিয়ে চুলচেরা রশ্মি বিশ্লেষণ করে তার প্রতিবিম্ব পরীক্ষা করার পর আমরা একই জিনিস নিয়ে আরো হালকা মেজাজে গাড়ির রিয়ার-ভিউ-মিররে অথবা আয়নার মত চকচকে কোটের বোতামের ওপর ওই জ্ঞানের প্রয়োগ করতাম। তবে প্রাণিবিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের এই বিজ্ঞান সংস্কৃতি যেমন জমে উঠেছিল, তেমন আর কিছুতে নয়।

উদ্ভিদবিদ্যা এবং প্রাণিবিদ্যার প্র্যাকটিকাল ক্লাসে আমাদের প্রধান কাজ ছিল দেহ ব্যবচ্ছেদ করা, তাতে নানা জিনিস লক্ষ্য করা, ও তা প্রদর্শন করা। চারাগাছের কাণ্ডের, শিকড়ের ব্যবচ্ছেদ যেমন, তেমনি ব্যাঙ, তেলাপোকা ইত্যাদির দেহ ব্যবচ্ছেদও। উদ্ভিদের ক্ষেত্রে এর মাধ্যমে দেখতাম তার রস-সংবহন নালি ইত্যাদির গুচ্ছকে; আর ওই প্রাণিগুলোর ক্ষেত্রে হয়তো তার পৌষ্টিক ব্যবস্থা, অথবা রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা, অথবা প্রজনন ব্যবস্থা, অথবা স্নায়ু ব্যবস্থা—বা এমনি কিছু। আমাদের বেশ ক'জনের এতে বাড়তি উৎসাহ ছিল। প্র্যাকটিকাল ক্লাসে যে সময়টুকু পেতাম তাতে মন ভরে এগুলো দেখা সম্ভব হতোনা। তাই ল্যাবের ব্যবস্থাগুলোকে অনুকরণ করে বাড়িতে হুবহু একই রকম আয়োজন করে নিলাম। পুরোনো একটি টিনের বাসনের মধ্যে অনেকখানি পুরু করে মোম দিয়ে ঢেকে নিলাম যার উপর পিন দিয়ে গেঁথে তেলাপোকা কিংবা ব্যাঙকে ধরে রেখে ব্যবচ্ছেদ করতাম।

কারো বাড়িতে তেলাপোকার কোন অভাব ছিলনা, আর আমাদের বাসা নিরিবিলির আশপাশে এত এ্যাঁদো জায়গা ছিল যে ব্যাঙেরও দেখা মিলতো, অন্যদের সাহায্য নিয়ে ধরাও যেতো। শুধু সমস্যা হতো কলেজের ল্যাবে যেভাবে ক্লোরোফরম করে বেঁহুশ অবস্থায় ব্যবচ্ছেদ করা যায় (তাতে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়াগুলো চালু থাকে), বাড়িতে তা করা যেতোনা। তারপরও আমাদের বেশ ক'জন বন্ধুর প্রাণিবিদ্যার জ্ঞান অনেকখানি পোক্ত হয়েছে—আমার ওই মোম দেয়া টিনের বাসনের ওপর 'নিরিবিলিতে' ব্যবচ্ছেদের মাধ্যমে। এসব দিক থেকে কলেজের বেশ কাছেই অবস্থিত আমাদের বাসা নিরিবিলি আমাদের বৈজ্ঞানিক আড্ডার একটি বর্ধিত অংশে পরিণত হয়েছিল। এখানে আর একটি আকর্ষণ ছিল জাপান জাম্বুরী থেকে ফেরার পথে হংকং থেকে কেনা একটি ভাল মাইক্রোস্কোপ। সুন্দর কাঠের বাক্সে সংরক্ষিত এই মাইক্রোস্কোপটি দেখতে ছোটখাট—কিন্তু ১০০ গুণ, ২০০ গুণ, ও ৩০০ গুণ বড় করে দেখার তিনটি বিকল্প লেন্স এর ছিল। আমরা ব্লেড দিয়ে খুব পাতলা করে উদ্ভিদের কর্তিত অংশ নেবার পদ্ধতি আয়ত্ত করেছিলাম। এগুলো দিয়ে এবং বিভিন্ন বিশেষ রঞ্জক পদার্থ ব্যবহার করে দুই কাচের প্লেটের মাঝখানে রেখে স্লাইডও তৈরি করতাম। রঞ্জক পদার্থগুলো কোষ-দেয়াল ইত্যাদি জায়গায় শোষিত হয়ে ক্ষুদ্র দেখার জিনিসগুলোকে আরো স্পষ্ট করে তুলতো। কাজেই খুব ধীরেসুস্থে আমরা উদ্ভিদের কোষকলা দেখতে পারতাম, বোঝার চেষ্টা করতে পারতাম তাদের কাজ। প্রাণিদেহের নানা ক্ষুদ্র অংশও এভাবে বিবর্ধিত করে দেখতাম। যা দেখছি আমার একটি খাতায় সেগুলো সুন্দর করে এঁকেও রাখতাম। ওই মাইক্রোস্কোপ আমাদের পরীক্ষণ ক্ষমতা বাড়িয়ে দিয়েছিলো অনেকখানি।

আমাদের কলেজী সংস্কৃতিতে খুবই আনন্দময় একটি বিজ্ঞান-আবহ সৃষ্টি করার এক জোরালো নেতৃত্ব পেয়ে গিয়েছিলাম আমাদের একজন শিক্ষকের কাছ থেকে। তিনি উদ্ভিদবিদ্যার তরুণ শিক্ষক ওবায়দুল্লাহ (ড.একেএম ওবায়দুল্লাহ, পরে শিক্ষা সম্প্রসারণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ, অকাল প্রয়াত)। আমরা যখন কলেজে তখন তিনি অপেক্ষাকৃত নবীন অধ্যাপক, উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে তখনো যাননি। কিন্তু কলেজে আমার ওই দুই বছরে আমি তাঁর মধ্যে সত্যিকারের বিজ্ঞান প্রেমিক একজন আদর্শ শিক্ষককে খুঁজে পেয়েছিলাম। কখনো তিনি পরীক্ষার ভয় দেখাচ্ছেন না, কোন জটিলতা দেখিয়ে ঘাবড়ে দিচ্ছেন না, স্রেফ এতে আনন্দের উপাদানগুলো দেখিয়ে দিচ্ছেন, আর বুঝিয়ে ছাড়ছেন যে এই আনন্দের স্বাদ না নিলে আমাদের জীবন বৃথা। আজ এতদিন পর, শিক্ষার ও শিক্ষকের সম্বন্ধে এত অভিজ্ঞতার পর, পেছনে ফিরে তাকালে আমার আদর্শ বিজ্ঞান শিক্ষক হিসেবে বার বার তাঁকেই খুঁজে নিতে হয়।

আমার এই ধারণার বড় কারণটি হলো নিজের বিষয় উদ্ভিদবিদ্যা সম্পর্কে তাঁর গভীর নেশা ও ভালবাসা, এবং সেই নেশা ও ভালবাসাকে ছাত্রদের কাছে

সঞ্চারিত করতে তাঁর প্রচণ্ড চেষ্টা। এটি তিনি করতেন আমাদের উৎসাহকে নানা ভাবে জাগ্রত করে—ফুসলিয়ে, আনন্দের লোভ দেখিয়ে, রহস্যময়তা সৃষ্টি করে, রসিকতা করে, এবং শেষ পর্যন্ত অনুরোধ উপরোধ এমন কি অস্থির ভাবে হাত-পা ছুঁড়ে তাঁর তূণে যত সম্মোহন বাণ আছে সবই প্রয়োগ করে। সুন্দর নায়ক সুলভ চেহারা তাঁর; মনে হতো আয়েস করে সব কিছু উপভোগ করছেন—মাঝে মাঝে তৃপ্তি করে একটি পান খেতে ভালবাসতেন যা তাঁর স্মার্ট আধুনিক জীবনযাত্রার মধ্যেও বেমানান কিছু ছিলনা; বরং কিছুটা আত্মভোলা প্রকৃতির জন্য তাঁকে আরো বেশি ভাল লাগতো। অনর্গল সুন্দর ইংরেজি বলার মাঝখানেও যখন কোন একটি জিনিস কিছুতেই আমাদেরকে বোঝাতে পারতেননা তখন ইংরেজি বাংলা মিশিয়ে অদ্ভুত ভাষায় কথা বলতেন।

তাঁর কাজ ছিল উদ্ভিদবিদ্যার জন্য আমাদের মধ্যে একটি রীতিমত হুজুগ তৈরি করে দেয়া, এটি তিনি খুব সফল ভাবে করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের একটি চুক্তি হয়েছিলো আমরা পারতপক্ষে কোন গাছ-গাছড়া, এমনকি প্রাণির কথা বলার সময় তার সাধারণ নাম বলবোনা, যখনই সম্ভব বৈজ্ঞানিক নাম ব্যবহার করবো। কাজেই আমরা কখনো ভাত খেতামনা, খেতাম 'ওরাইজা সেটাইভা', তাও 'পুনটিয়াস টিক্‌টো' দিয়ে অর্থাৎ পুঁটিমাছ দিয়ে। আর প্রায়ই আলাপ করতাম আমরা 'হোমো সেপিয়েন্সদের' অর্থাৎ মানুষদের কী হবে তাই নিয়ে। এই বুদ্ধি তিনি দিয়েছিলেন আমাদের অর্থাৎ তাঁর বিজ্ঞান শিষ্যদের একটি স্বাতন্ত্র্য সৃষ্টির জন্য; আমরা যেন একটি অদ্ভুত গোষ্ঠী—ভিন্ন ভাষায় কথা বলি, অদ্ভুত সব বিষয়ে আগ্রহ দেখাই। কলেজের ক্যাম্পাসে যতগুলো গাছ-গাছড়া আছে তার সব ক'টার বোটানিক্যাল বৃত্তান্ত আমাদের নখদর্পণে ছিল ওবায়দুল্লাহ স্যারের কারণে। ক্যাম্পাসে সাধারণ চলাফেরার সময় আমাদের নিয়ে তিনি খুবই সাধারণ আটপৌরে আলাপের ছলে হাতে এ গাছের একটি পাতা, ওই গাছের একটি ফুল, এর একটি ফল নিয়ে, ছিড়ে বা খুলে দেখাতেন; ওটার মধ্যে এটা-সেটা চমকপ্রদ বিষয় বের করতেন। এমনকি রাস্তার পাশের দুর্বাঘাসের এক মুঠো তুলে বলতেন "দেখ এটিও 'গ্রামিনী' পরিবার ভুক্ত, ওরাইজা স্যাটাইভাও (ধান) 'গ্রামিনী' গোষ্ঠীভুক্ত—গম, ধান, ভুট্টা, আখ—সবই কিন্তু গ্রামিনী (ঘাস)"।

এসবের একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব অন্তত আমার উপর পড়েছিলো। ওই কলেজের দিনগুলোর পর যদিও জীববিদ্যা কখনো আমার আর পাঠ্য বিষয় ছিলনা—কিন্তু এটিই বরাবর আমার খুব প্রিয় বিষয় রয়ে গেছে, এ নিয়ে আনন্দময় ভাবে বেশি পড়েছি, লিখেছিও বেশি। তাঁর 'হুজুগে' যোগ দেবার পথে অন্য কোন হুজুগ যেন আমাদের জন্য বাধা হয়ে না দাঁড়ায় সেদিকেও ওবায়দুল্লাহ স্যারের খুব নজর ছিল। একবারের কথা মনে পড়ে তিনি যথারীতি ক্লাসে আমাদেরকে প্রাণপণে বোঝাচ্ছেন, কিন্তু ছাত্রদের মন তখন উচাটন ঢাকায় পাকিস্তান-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে। বাইরে যারা রেডিয়ো শুনছে তারা পেছন থেকে

লেকচার থিয়েটারে কিছুক্ষণ পর পর স্কোর, উইকেট পতন ইত্যাদির খবর পৌঁছে দিচ্ছিল, এবং তা ক্লাসে ক্ষণে ক্ষণে অমোনোযোগ ও উত্তেজনা সৃষ্টি করছিল। সবাইকে অবাক করে দিয়ে ওবায়দুল্লাহ স্যার বললেন যে টেস্ট ম্যাচের নাড়ী নক্ষত্র খবর তিনি রেখে চলেছেন তাঁর কাছেই থাকা রেডিয়োর মৃদু আওয়াজে। এই মুহূর্তে একেবারেই গোবেচারা একটি ড্র' হওয়া ছাড়া এ টেস্টের অন্য কোন ভবিষ্যৎ নেই। তারপরও পনরো মিনিট পর পর খেলার অবস্থা সম্পর্কে তিনি নিজেই একটি ভাষ্য রাখবেন বলে কথা দিলেন। মাঝখানে যেন ছাত্ররা ক্লাসের কথাগুলোতে মনোযোগী হয়।

আমরা এক দিনের একটি 'বোটানি ভ্রমণে' গিয়েছিলাম ওবায়দুল্লাহ স্যারের নেতৃত্বে। ট্রেনে করে সীতাকুণ্ডে সেই ভ্রমণ, সেখানকার বিখ্যাত মেলার দিন। ভারতীয় উপমহাদেশের অসংখ্য হিন্দু-তীর্থের সম্পর্কে বলা হতো এর সর্ব পশ্চিমের বড় তীর্থস্থান হলো মরু-তীর্থ হিংলাজ, আর সর্ব পূর্বের বড় তীর্থস্থান হলো চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড। যখনকার কথা বলছি তখনো প্রতি বছর ওখানকার মেলার দিন স্ত্রী-পুরুষ অনেক তীর্থযাত্রী সারা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে আসতো। আমাদের ভ্রমণের দিন নিজের চোখে এই দৃশ্য দেখলাম। সীতাকুণ্ড শহরের কাছে চন্দ্রনাথ পাহাড়ে রয়েছে যে উষ্ণ প্রস্রবণ সেটিই রামায়নের সীতার নামের কুণ্ড, আর এই পাহাড়ের সুউচ্চে রয়েছে চন্দ্রনাথের মন্দির। তীর্থযাত্রীদের দীর্ঘ সারিতে শামিল হয়ে গিয়ে আমরা জঙ্গলাকীর্ণ পাহাড়ি হাঁটা রাস্তা বেয়ে বেশ পরিশ্রম করেই ওই মন্দিরে গিয়েছি। কিন্তু আমাদের উদ্দেশ্য ভিন্ন—সেটি হলো বিজ্ঞান; এখানকার বেশ ব্যতিক্রমী সব উদ্ভিদ খুঁটিয়ে দেখা এবং তার থেকে গুরুত্বপূর্ণ নমুনা সংগ্রহ। একমাত্র স্যারের প্রত্যক্ষ নির্দেশনার মাধ্যমেই আমরা এটি করতে পারছিলাম। নমুনা নেয়ার জন্য বড় বড় ব্যাগ সঙ্গে আনা হয়েছিল, তিনিই দেখিয়ে দিচ্ছিলেন কী দেখতে হবে, কোনটি নিতে হবে, কেন নিতে হবে—ইত্যাদি। মজার ব্যাপার হলো তীর্থযাত্রীদের হাতেও এখানকার এরকম অদ্ভুত সব উদ্ভিদের কিছু কিছু নমুনা দেখতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা এগুলো পবিত্র বলেই সংগ্রহ করছিলেন, বৈজ্ঞানিক গুরুত্বের কারণে নয়। এমনি একটি জিনিসকে তাঁরা বলছিলেন 'সীতার লাঠি'—বেশ লম্বা ও আঁকাবাকা বিশাল শুকনা একটি তেঁতুল-আকৃতির ফল। নমুনা সংগ্রহ করতে করতে বেশ বুঝতে পারছিলাম এগুলো হবে সামনের দিনগুলোতে ওবায়দুল্লাহ স্যারের সঙ্গে আমাদের বৈজ্ঞানিক হৈচৈ এর নতুন আরো কিছু উপাদানের সংযোজন।

সীতাকুণ্ড বাজারে এক রেস্টুরেন্টে স্যারের সঙ্গে বসে সবাই মধ্যাহ্ন ভোজন করলাম ডিম-আলু তরকারি ও ডাল দিয়ে। তারপর যোগ দিলাম মেলা উপলক্ষে সরকারী ভাবে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে সীতাকুণ্ড হাই স্কুলের মাঠে। চট্টগ্রামের ডিভিশনাল কমিশনার এসেছিলেন সেখানে বক্তৃতা করতে, আর এই বেশ খ্যাতনামা ঝানু সরকারী অফিসারটি ছিলেন ইংরেজ মানুষ—ডিকে পাওয়ার। পুরো

নাম আগে তাঁর কী ছিল জানিনা তবে একজন নাম করা বাঙালি মহিলাকে (জহরত আরা) বিয়ে করার পর তাঁর নাম হয়েছিল ডেভিড খালিদ পাওয়ার। একটি দুর্দান্ত বোটানিক্যাল ভ্রমণের পর এই অনুষ্ঠানটির কথা বিশেষ ভাবে মনে আছে জবরদস্ত এক সাহেব আমলার সঙ্গে স্থানীয় বাদ্য বাজনা ও লোক সংস্কৃতির মিশ্রণের কারণে। কমিশনার সাহেব এলেন রীতিমত একটি মিছিল সঙ্গে নিয়ে তার মধ্যে একেবারেই গ্রামীণ একটি ব্যান্ড পার্টি—লুঙ্গি-ধুতি পরা কিছু মানুষ ঢাক্, বাঁশি, খঞ্জনি ইত্যাদি বাজাতে বাজাতে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে এসে মঞ্চে তুলে দিলো। ওখানে চলছিলো মেলা উপলক্ষে আসা নানা বাউল, বোষ্টম-বোষ্টমী, কীর্তনিয়া ও অন্যান্য ভক্তিমূলক গানের লোকজ শিল্পীরা। দারুণ উপভোগ করেছিলাম; আরো উপভোগ করেছি সাহেব আমলার বাংলা বক্তৃতা, উপমহাদেশের এই মহামিলনের মেলাকে এর সনাতন ঐতিহ্যবাহী রূপে সংরক্ষণ করার জন্য তাঁর সংকল্পের কথা শোনলাম।

'অন্বেষা'

'অন্বেষা' চট্টগ্রাম কলেজের বার্ষিকীর ঐতিহ্যবাহী নাম, এবং বহু বছর ধরে এই প্রকাশনাটি ছাত্রদের ও অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এসেছে। কলেজে ছাত্র রাজনীতির সুবাদে আমি ১৯৬১ সালের চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদে বার্ষিকী সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলাম। আমার কলেজ জীবনের এটি ছিল লেখাপড়ার বাইরে অন্য একটি বড় দিক; শুধু ছাত্র রাজনীতি বা অন্বেষা সম্পাদনাই নয়, এ ছাড়াও কলেজের নানা ছোট-বড় গোষ্ঠী ও তাদের কাজ কর্মের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ সে সময় ঘটেছে। আমাদের কলেজের দুটি পর্যায় ছিল—একটি ইন্টারমিডিয়েট অর্থাৎ আমরা যারা স্কুল থেকে সদ্য গিয়ে দুই বছর আই এ অথবা আই এস সি কোর্সে পড়ছি; আর একটি ছিল যাঁরা সিনিয়র ক্লাসে অর্থাৎ স্নাতক পাস বা অনার্স শ্রেণীতে পড়ছেন। সেকালে এই দুই পর্যায়ের মধ্যে মেলামেশার সুযোগ এখনকার চেয়ে বেশি ছিল। তার একটি কারণ ছিল তখনো চট্টগ্রাম কলেজের মতো দেশের সেরা কলেজগুলোর স্নাতক শ্রেণী বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকের থেকে খুব বেশি পিছিয়ে ছিলো না, আর এখানকার অধ্যাপকরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সেয়ানে সেয়ানে ছিলেন—এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁদেরকে ছাড়িয়েও যেতেন। ফলে আমাদের সিনিয়র স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের সাধারণ মান উঁচু ছিল এবং তাঁদের মধ্যে নানা খ্যাতনামা গুণীদের সংখ্যাও কম ছিলনা। তাঁদের সান্নিধ্যে আসতে, এক সঙ্গে কাজ করতে, এবং ছাত্র রাজনীতিতে অংশ নিতে আমাদের আগ্রহ থাকতো প্রচুর।

তারপরও আমাদের সরাসরি জগতটি ছিল নিজেদের মত ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণীর বন্ধুদের নিয়ে। বিজ্ঞানের ক্লাসগুলোর জন্য আমাদেরকে যেভাবে দুটি সেকশনে বিভক্ত করা হয়েছিলো, তাতে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিলো এমন

সেকশনে যেখানে ইংরেজি মাধ্যমে ও উর্দু মাধ্যমে যারা স্কুল করে এসেছে তারাও অন্তর্ভুক্ত ছিলো; কাজেই এখানে ছেলেমেয়েরা ছিলো কিছুটা মিশ্র পটভূমির। যেমন আমাদের একমাত্র বিদেশী সহপাঠী ছিল এখানেই। আসলে এই বিদেশী ছাত্রটি অর্থাৎ বার্মা থেকে আসা স্ট্যালিন লা-সেইন ছিল আমাদের একটি ছোট বিশেষ বন্ধুগোষ্ঠীর অন্যতম সদস্য। একে অনেকে 'সিড়ির তলার গ্রুপ' বলেও ডাকতো, কারণ আমরা সুযোগ পেলেই একটি সিড়ির তলায় কিছুটা নির্জন স্থানে আড্ডায় মিলিত হতাম। এ গ্রুপের মধ্যে বোরহান, সাজ্জাদ আর আমি আগেই বহুদিন থেকে বন্ধু। কলেজিয়েট স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে এসে যোগ দেবার পর থেকে সাজ্জাদ (পরে ডা. সাজ্জাদুর রহমান, খ্যাতনামা শল্য চিকিৎসক, বৃটেন প্রবাসী) আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। কৃতী কূটনীতিবিদ এবং পরে জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ূন রশীদ চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় তখনকার চট্টগ্রামের ডিভিশনাল ফরেষ্ট অফিসার জনাব মতিয়ুর রহমানের ভাই সাজ্জাদ। তাঁর ফরেষ্ট হিলের বাসায় ওর থাকার কারণে সাজ্জাদের মাধ্যমে সিলেটের ওই বর্ণাঢ্য পরিবারের অনেকের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ হয়েছিলো; একই সঙ্গে বন বিভাগের মত একটি প্রতিষ্ঠানের চমকপ্রদ যে কর্মকাণ্ড তাও কিছুটা দেখেছি। আমাদের সিড়ির তলার গ্রুপে আর ছিল আলাউদ্দীন উর্দু মিডিয়ামের ছাত্র কিন্তু উর্দু-বাংলা উভয় ভাষায় দক্ষ (পরে ড.আলাউদ্দিন, বাংলাদেশ জুট রিসার্চ ইনস্টিউটের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী)। আমাদের এই বন্ধুগোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণ বন্ধনটি ছিলো দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আমাদের আগ্রহ—বিশেষ করে সাংস্কৃতিক জগত নিয়ে। স্ট্যালিন ছিল এর মধ্যে আন্তর্জাতিকতার একটি সেতুবন্ধ। ওর বাবা বার্মা ওয়ারওয়েজ বিমান কোম্পানিটির চট্টগ্রামস্থ ম্যানেজার ছিলেন। সেই উপলক্ষে ওদের চট্টগ্রামে থাকা। ওর কারণে আমাদের আড্ডা কথায় কথায় নিজের দেশের পরিস্থিতি থেকে বার্মার পরিস্থিতিতে চলে যেতে পারতো।

তবে এই গ্রুপের আসল মধ্যমণি ছিল সাফাত আলী। সাফাত ও বোরহান ছাড়া আমাদের আর কেউ সত্যিকার গায়ক না হলেও সাফাত কিন্তু আমাদের আড্ডাটিকে খুবই সংগীতমুখী করে তুলেছিলো। ওর তখনই মনে মনে স্বপ্ন তরুণদের জন্য নতুন ধরনের সংগীতের প্রবর্তন করার। রবীন্দ্র, নজরুল, আধুনিক, লোকগীতি সব কিছুকে নিয়ে বাংলা গানকে সে পাশ্চাত্য পপ সংগীতের আদলে বাঁধতে চায়, পাশ্চাত্য অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে। এটি ছিল তখনকার দিনের জন্য সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ স্রোতের একটি চিন্তা; কিন্তু সাফাত আমাদেরকে বুঝিয়ে চলেছিলো এটি সম্ভব শুধু নয়, আধুনিকতার ও আন্তর্জাতিকতার খাতিরে প্রয়োজনীয়ও বটে। তখনই এর কিছু কিছু নমুনা সে তৈরি করে আমাদের মধ্যে পরিবেশন করতো, আমাদেরকে এর মধ্যে যোগ দেওয়াতো। তার মন জুড়ে ছিল এলভিস প্রেজলি এবং তাঁর রক-এন-রোল—সে মনে করতো বাংলা সংগীতকেও সেদিকে নেয়া চাই।

সাফাতের আসল কাজ চলতো তার বাড়িতে—প্রধানত দুই স্কুলগামী ছোট বোন নাজমা পারভীন ও শেহলা পারভীনের সঙ্গে, এবং ঘনিষ্ঠ আরো দু'একজন শিল্পী বন্ধুর সঙ্গে। ওদের নিয়ে তখনই সাফাত গড়ে তুলেছিল দেশের প্রথম পপ মিউজিক ব্যান্ড—'জিঙ্গা গোষ্ঠী'। তাদের প্রথম কয়েকটি সৃষ্টির পরীক্ষামূলক রেকর্ডিং ঘটেছিল নিরিবিলিতে আমাদের টেইপ রেকর্ডারে। কিন্তু শিগ্‌গীরই জিঙ্গার গানগুলো প্রথমে চট্টগ্রামে এবং তারপর বাইরে জনপ্রিয় হতে থাকে। কলেজের পরও সাফাতের কাজ লক্ষ্য করে গেছি। সাফাত এর প্রাণপুরুষ হলেও এর জনপ্রিয় কণ্ঠ হয়েছে তার বোন নাজমা (পরে নাজমা জামান)। ১৯৬৫ তে পাকিস্তান টেলিভিশন ঢাকায় প্রথম পপ ব্যান্ড হিসেবে অনুষ্ঠান করে এবং এর পর সেখানে নিয়মিত প্রচার করে জিঙ্গা বিশেষ প্রচার পায়। আরো পরে সাফাতের স্ত্রী নিঘাত, ছেলে শায়ান, মেয়ে সাজিয়া, এবং নাজমার ছেলে ববি জামান এটিকে পরিবার ভিত্তিক একটি জমজমাট সংগীত গোষ্ঠী হিসেবে গড়ে তুলেছিলো। দুঃখের বিষয় ছিল সাফাত নিজে নব্বই এর দশকের শেষের দিকে অকাল প্রয়াত হয়ে তাদেরকে ছেড়ে গিয়েছে। সব সময় মনে পড়ে সাফাত সেই কৈশোরেই আমাদের সিড়ির তলার গ্রুপের মধ্যমণি ছিল।

আমার বৃহত্তর দলটি অবশ্য ছিল সেই ইউএসপিপি—'ইউনাইটেড স্টুডেন্টস প্রগ্রেসিভ পার্টি'—যার কাজকর্মে মুগ্ধ ছিলাম সেই স্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় থেকেই। অবশ্য এখন মার্শাল ল'র শুরুর দিকে ছাত্র সমাজের রাজনৈতিক সক্রিয়তা তেমন ছিলনা। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ এবং পুরো কলেজ প্রশাসন খুব ভালভাবেই মার্শাল ল' কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে যাচ্ছিলেন। একজন কর্নেল সাহেব প্রশাসনকে 'সহায়তা' দেবার জন্য কলেজেই কাজ করতেন। তিনি কার্যত কলেজের নানা বিষয়ে নাক গলাতেন, তাঁর কথার ব্যতিক্রম কলেজে তেমন কিছু হতোনা। তারপরও অবশ্য ছাত্রদলগুলো অনানুষ্ঠানিক ভাবে কাজ করছিলো—দল হিসেবে বাইরে সভা-সমাবেশ করতে না পারলেও। কলেজ ছাত্র সংসদের নির্বাচনে সরাসরি দল হিসেবে অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও বোঝা যেত কারা কোন দল। আমাদের আগের বারের সংসদের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন মুরিদ ভাই (পরে মুক্তি যুদ্ধে শহীদ); তিনি ইউএসপিপি'র সদস্য ছিলেন। এবার আমাদের পালা এলো, সাধারণ সম্পাদকের জন্য ইউএসপিপি'র থেকে মনোনীত হলেন মাহবুবুল আলম, যিনি তারা মিয়া নামেই বেশি পরিচিত ছিলেন (পরে খালেদা জিয়ার প্রথম প্রধানমন্ত্রীত্বের কালে জাতীয় সংসদের হুইপ)। তারা ভাই সব সময় বামপন্থী ছাত্র রাজনীতি করেছেন, ইউএসপিপি'র সিনিয়র অন্যান্য বেশ ক'জনও সে রকম অভিজ্ঞ। আমাদের বিপক্ষে যারা প্রার্থী হলো তারা ছাত্র রাজনীতির কোন আলামতই রাখলোনা—রাজনীতিবিহীনভাবে নেহাত সংসদের কাজ করবে এমন ভাব দেখালো। ইউনূস ভাইদের সময় ইউএসপিপি আর ওয়েলফেয়ারের মধ্যে যে তীব্র নির্বাচনী প্রচারের প্রতিযোগিতা দেখেছিলাম

সেভাবে সভা, মিছিল, পোস্টারিং করে কিছু এখন করার উপায় ছিলনা। জনে জনে গিয়ে গিয়ে প্রচার কার্য চালালাম, কিছুটা দলবদ্ধ ভাবেও; তবে সবই খুব নিম্ন স্বরে, উচ্চকিত ভাবে নয়। কলেজে মার্শাল ল কর্তৃপক্ষের কারণে সাবধানের মার নেই।

নির্বাচন হলো দুই পর্বে—প্রথমে ১৮ সেপ্টম্বর (১৯৬০) শ্রেণী প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হলাম, পরদিন প্রতিনিধিরা নিজেদের মধ্য থেকে সংসদে নানা পদে নির্বাচিত করলাম। ফলাফলে তারা ভাই সহ আমরা ইউ এস পি পি'র প্রার্থীরাই অধিকাংশ জিতলাম, কিন্তু অন্য প্রার্থীরাও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে জিতলেন। তাঁদের মধ্যে সব চেয়ে সিনিয়র পদে নির্বাচিত হলেন সংস্কৃতি সম্পাদক হিসেবে মোহাম্মদ মোহসীন—যিনি আমাদের সংসদে এক রকম বিরোধী দলীয় নেতার ভূমিকা পালন করে গেছেন। আমার সহপাঠীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হলো ছাত্রী-নাট্য সম্পাদক সুরাইয়া বেগম (পরে সুরাইয়া রহমান, বাংলাদেশ সেনা বাহিনীতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও প্রখ্যাত গাইনোকোলোজিষ্ট)। সংসদে যথারীতি অভিষেক, শপথ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে দায়িত্ব নিলাম বটে, কিন্তু পুরো সংসদ একযোগে তেমন কোন কাজ করতে পেরেছে বলে মনে হয়নি। সামরিক শাসনের নানা বিধি নিষেধের মধ্যে রাজনৈতিক ভাবে সংসদ কোন ক্ষেত্রে তেমন ফলপ্রসূ হতে পারেনি। কিন্তু প্রত্যেক দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্যের নিজ নিজ ক্ষেত্রের কাজগুলো যথারীতি হয়েছে—যেমন ক্রীড়া, নাট্যানুষ্ঠান, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি, এবং আমার ক্ষেত্রে কলেজ বার্ষিকী অন্বেষার প্রকাশ। এগুলো করতে গিয়ে অবশ্য আমরা কোন কোন ক্ষেত্রে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের সম্মুখীন হয়েছি। প্রত্যেক সদস্যের সঙ্গে ভারপ্রাপ্ত এক বা একাধিক অধ্যাপক ছিলেন। সাধারণত তাঁরা বেশি হস্তক্ষেপ করার কথা না থাকলেও মার্শাল ল'র ভয়ে তাঁরা সব ব্যাপারে খুব সাবধানী ভূমিকা পালন করার চেষ্টা করছিলেন, পাছে কোন রাজনৈতিক বক্তব্য এসে যায়। আমাদের অধ্যক্ষ এমনিতে উদার মনের মানুষ, কিন্তু তাঁর পথ আগলিয়ে বসেছিলেন মার্শাল ল' নিয়োজিত 'শিক্ষানুরাগী' কর্নেল সাহেব। তাঁর ছাড়পত্র না পেলে কোন কাজ করা দায়। অন্বেষা প্রকাশের ক্ষেত্রে সেটি খুব বড় বাধা না হলেও তাতেও কিছু গোল বেধেছিলো বৈকি।

'অন্বেষার' সম্পাদনার কাজটি আমি খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছিলাম। এটি আমার জন্য ছিল একটি অনন্য অভিজ্ঞতা ও সম্মান। আগের অন্বেষাগুলোতে বর্ষে বর্ষে তালিকায় দেখছিলাম ১৯৪৮ সাল থেকে বিভিন্ন বছর কারা এই বার্ষিকী সম্পাদনা করেছেন। এই তালিকায় বেশ কিছু পরিচিত ও শ্রদ্ধাভাজনদের নাম আমাকে বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছিলো। যেমন ১৯৫০ সালে এর সম্পাদক ছিলেন বিখ্যাত বামপন্থী ছাত্র নেতা আবদুল্লাহ আল হারুণ (যাঁর কথা ইউএসপিপি প্রসঙ্গে আগে বলেছি); ১৯৫৬ সালে সম্পাদক ছিলেন রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক পরিচয়ে খ্যাত জওশন আরা রহমান (পরে ইউনিসেফে কর্মকর্তা এবং জেন্ডার বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর অবদানের জন্য বিশিষ্ট); ১৯৫৭ সালে ছিলেন ফজলুর

রহমান—যাঁকে সে সময়ের ইউনূস ভাইদের কলেজ নির্বাচনে দেখেছি স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার দলের সুসাহিত্যিক ছাত্র নেতা হিসেবে। আমার সময়েও বার্ষিকী সম্পাদনার জন্য যথারীতি একটি বেশ জবরদস্ত সম্পাদনা পরিষদ গঠন করা হয়েছিলো, যার সভাপতি ছিলেন স্বয়ং আমাদের অধ্যক্ষ; ছিলেন অন্যান্য কয়েকজন অধ্যাপকও। ছাত্র-সদস্যদের নাম বিভিন্ন বর্ষের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্য থেকে কিছু আমি প্রস্তাব করেছি, কিছু অধ্যাপক-উপদেষ্টারা ঠিক করে দিয়েছেন। আমি আমার সহপাঠী ও বন্ধুদের মধ্য থেকে এতে অন্তর্ভুক্ত করলাম বোরহান, সৈয়দ রেজাউল করিম (পরে বহুজাতিক কোম্পানি হোয়েষ্টের বড় কর্মকর্তা), ও অনিমা ভট্টাচার্যকে (আমার শিক্ষক প্রফুল্ল ভট্টচার্যের মেয়ে)। বাকিরা সিনিয়র ছাত্রদের মধ্য থেকে এলেন। ভাল লেখা সংগ্রহের কাজে সম্পাদনা পরিষদের কেউ কেউ কিছুটা সহায়ক হলেও, আসলে সত্যিকার সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে এই পরিষদের তেমন কোন ভূমিকা ছিলনা। কাজ যা করার তা করতে হয়েছে আমাকে এবং এতে খুবই ঘনিষ্ঠভাবে পরামর্শ ও সহযোগিতা দিয়েছিলেন ইংরেজির অধ্যাপক মুহাম্মদ শামসুদ্দোহা (পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক)। শামসুদ্দোহা স্যার বার্ষিকীর ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন, এবং তিনি এ কাজটিকে বেশ দায়িত্বের সঙ্গেই নিয়েছিলেন।

আমার মনের মধ্যে ছিল অন্বেষাকে একটি আধুনিক সাহিত্য ম্যাগাজিনের আঙ্গিকে প্রকাশ করা। ঢাকায় সম্প্রতি প্রকাশিত কিছু ম্যাগাজিন আমাকে এই প্রেরণা দিয়েছিলো। বিশেষ করে তখন সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ছাত্র এনামুল হক (পরে জাতীয় যাদুঘরের প্রধান) এবং ইউনূস ভাইয়ের যৌথ সম্পাদনায় বের হচ্ছিল 'উত্তরণ' নামের চমৎকার ম্যাগাজিন। ভাল মান অর্জনের জন্য অন্বেষার একটি ভাল প্রচ্ছদ জরুরি ছিল। ঢাকায় ইউনূস ভাই ও তাঁর বন্ধুদের মাধ্যমে চেষ্টা চল্‌লো তখনকার নামকরা শিল্পীদের কারো দ্বারা এই প্রচ্ছদ করানো যায় কিনা। রাজি হলেন আশীষ চৌধুরী, তাঁর আঁকা বিমূর্ত চিত্রের চমৎকার প্রচ্ছদটি ডাক যোগে পেয়ে গেলাম। চট্টগ্রামের প্যারামাউন্ট প্রসেস ব্লক তিন রঙা এই প্রচ্ছদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্লকগুলো করে দিলো। কিন্তু আমার আকাঙ্খা ছিল একটু বেশি, অন্বেষায় আমাদের নেতৃস্থানীয় চিত্রশিল্পী কারো একটি পূর্ণাঙ্গ শিল্পকর্ম থাকবেনা তা কেমন করে হয়? ঢাকা আর্ট কলেজের অধ্যাপক মোহাম্মদ কিবরিয়ার খ্যাতি ইতোমধ্যেই তুঙ্গে। 'উত্তরণ' তাঁর মাছের মোটিফে আঁকা 'মাছ' শিরোনামের একটি তৈলচিত্রের হুবহু ছবি প্রকাশ করেছিলো। শিল্পীর অনুমতি নিয়ে তা পুনর্মুদ্রণের জন্য উত্তরণের কাছ থেকে এর ব্লকগুলো চেয়ে নিলাম। বার্ষিকীতে এ জন্য উত্তরণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানানো হয়েছিলো। একটি দ্বিতীয় প্রচ্ছদের মত এই রঙিন আর্ট প্লেটটি পৃথক ভাবে আর্ট পেপারের উপর ছাপিয়ে তা সাধারণ পৃষ্ঠার উপর প্যাষ্ট করে দেয়া হলো। এভাবে অন্বেষা আমাদের সাম্প্রতিকতম চিত্রকলার একটি উদাহরণকেও তুলে ধরলো।

এই সব নানা কাজে অন্বেষা প্রকাশ কালে দিনের একটি বড় সময়েই কাটাতে হতো ফিরিঙ্গি বাজারে আর্ট প্রেসে। আর্ট প্রেস এবং সেই সঙ্গের প্রকাশনা সংস্থা 'বইঘর' শুধু চট্টগ্রামের নয়, পুরো পূর্ব পাকিস্তানেরই প্রকাশনার ক্ষেত্রে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ছিল। তখন এবং এর পর পর মুদ্রণ শিল্পের অনেক কিছুর একটি পথিকৃৎ হিসেবে কাজ করেছে এটি—যেমন অফসেট মুদ্রণ পদ্ধতি চালু করার ব্যাপারে। শিশু সাহিত্যিক এখলাস উদ্দিন আহমদের সম্পাদনায় এখান থেকে বের হয়েছিলো শিশু-কিশোরদের জন্য সেকালের অনবদ্য ম্যাগাজিন 'টাপুর টুপুর'। আর্ট প্রেস আর বইঘরের কর্ণধার ছিলেন সৈয়দ মোহাম্মদ শফি—যাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভা ও উৎসাহের ফলেই এসব সম্ভব হয়েছিলো। তাঁর ভাই যিনি 'ডাক্তার সাহেব' বলে পরিচিত ছিলেন, মূলত চিকিৎসক হলেও আসলে প্রেসটির কাণ্ডারি ছিলেন। তাঁর প্রতিভা ছিল মুদ্রণ যন্ত্র ও মুদ্রণ শিল্পে। অন্বেষার কাজের সময় শফি সাহেব ও ডাক্তার সাহেবের কাছাকাছিই থাকতাম, প্রত্যেকটি বিষয়ে তাঁরা অত্যন্ত সস্নেহে সাহায্য করেছেন এবং প্রকাশনায় সর্বোচ্চ সম্ভব মান আনতে সহায়তা করেছেন। সেখানে আমার কাজ ছিলো প্রধানত বার বার প্রুফ দেখা—সদ্য কম্পোজ হওয়া প্রথম গ্যালি প্রুফ (পানিতে ভেজা নিউজ প্রিন্টে) থেকে শুরু করে একেবারে ঝকঝকে মেশিন প্রুফ পর্যন্ত, ছাপার মান নিয়ে ডাক্তার সাহেব ও শফি সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা বলা, এমনকি ভেতরে গিয়ে মেশিনম্যানের সঙ্গেও। পুরোটা ম্যাগাজিনকে এভাবে ফর্মার পর ফর্মায় মনের মত করে মুদ্রিত রূপ দিতে সমানে তদারকি করে গিয়েছি। আসলে ওই সময়টায় আমি আরো স্থায়ী ভাবে, বলতে গেলে সারা জীবনের জন্য চিরস্থায়ীভাবে, এই কাজগুলোকে বরণ করে নিচ্ছিলাম অন্য কারণেও—সে কথায় পরে আসবো। অদ্ভুত এক যোগাযোগে আজ যখন আর্ট প্রেসের সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা লিখছি তার অল্প কয়েকদিন আগে মাত্র (২০১৪) প্রয়াত হয়েছেন সৈয়দ মোহাম্মদ শফি, এবং টাপুর টুপুর সম্পাদক এখলাস উদ্দিন আহমদ উভয়ে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে।

অন্বেষার মুদ্রণের ও অঙ্গসজ্জার কথাতেই প্রথমে চলে গিয়েছি বটে, কিন্তু তার আগে এর লেখাগুলো সংগ্রহ ও সম্পাদনা করতে হয়েছিলো। এ কাজে অধ্যাপক শামসুদ্দোহা নিজেও যথেষ্ট দায়িত্ব নিয়েছিলেন। বিশেষ করে ছোট যে ইংরেজি অংশটি অন্বেষায় ছিল তা তিনি ভাল করে দেখে দিয়েছিলেন। অন্বেষায় অনেকের অনেক লেখার সমন্বয় ঘটেছিলো : আমি নিজে লিখেছিলাম, আমার সহপাঠী ও বন্ধুরাও অনেকে লিখেছিলো—কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ। অধ্যাপকদের মধ্যেও অনেকে লিখেছিলেন। মজার ব্যাপার হলো বিজ্ঞান-পাগল ওবায়দুল্লাহ স্যার কিন্তু লিখলেন একটি চমৎকার ছোট গল্প। ওরকম নবীন গল্পকারদের মধ্যে আরো ছিলেন ফেরদৌস কোরেশী (পরে ডাকসুর ভিপি, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ), তখন চট্টগ্রাম কলেজে পদার্থবিদ্যা অনার্সের ছাত্র। সুরাইয়া লিখেছে কবিতা, বোরহান

এবং আর এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু বরকত দু'জনেই গল্প লিখেছিলো। সহপাঠী বন্ধু সৈয়দ রেজাউল হায়াত (পরে সরকারের সেক্রেটারী) নজরুল কাব্যের বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলো। মজার ব্যাপার হলো বোরহান, বরকত, এবং হায়াত এই তিন জনেই পরে লাহোরে পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি থেকে স্নাতক হয়েছে; সেসময় ওখানে গিয়ে আমি তাদের আতিথ্য নিয়েছি। অন্বেষায় ছোট একটি উর্দু সেকশন ছিলো—ওটার বিষয়ে আমার কিছু করার ছিলোনা। ওটি ছেড়ে দিয়েছিলাম সম্পাদনা পরিষদের উর্দুভাষী সদস্য মোজাম্মেল হোসেন রিজভীর উপর।

শুধু একটি জায়গাতে গিয়ে অন্বেষায় কিছুটা অচলাবস্থা সৃষ্টি হলো। কলেজ কর্তৃপক্ষ নীরবে একটি অলিখিত নিষেধাজ্ঞা দিয়ে দিয়েছিলো যে রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্র সাহিত্য সম্পর্কে কিছু এখানে দেয়া যাবেনা, কারণ মার্শাল ল'র লোকজন এটি চায়না। এটি এমন ভাবে নীরবে কার্যকর করা হয়েছিলো যে—না অধ্যাপকদের কাছ থেকে, না ছাত্রদের কাছ থেকে এরকম কোন লেখা এসেছে। অথচ মাত্র কয়েক মাস আগে উদযাপিত হয়ে গেছে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীতে প্রকাশিত কলেজ বার্ষিকীতে এ সম্পর্কে উল্লেখ মাত্র থাকবেনা, এমনটি কি হতে পারে? আমি অন্বেষার সম্পাদকীয়টি তাই লিখলাম রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে। শামসুদ্দোহা স্যার এটি পড়ে আঁৎকে উঠলেন, বুঝলেন বিপদ আসন্ন। তিনি সাধারণভাবে আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন বটে, কিন্তু জোর করলেন না। বিষয়টি চলে গেল অধ্যক্ষের কাছে, যিনি সম্পাদনা পরিষদের সভাপতিও বটেন। অধ্যক্ষ মোজাফ্ফর আহমদ, অধ্যাপক শামসুদ্দোহা, অধ্যাপক আহমদ হোসেন (বাংলার অধ্যাপক, তিনিও বার্ষিকীর একজন উপদেষ্টা ছিলেন) এক সঙ্গে আমাকে নিয়ে বৈঠক করলেন, কিন্তু জট ছাড়লোনা। আমি ব্যাপারটি জি এস তারা ভাই ও সংসদের অন্যদের জানালাম—তাঁরাও আমাকে সমর্থন করলেন। বেশ কিছুদিন একটি অচলাবস্থার মতো হয়ে রইলো, অন্বেষা বেরুতে দেরি হতে লাগলো। অবশেষে অধ্যক্ষ কিছুটা নড়লেন, একটি রফা হলো। রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকীটি সম্পাদকীয়ের একমাত্র বিষয়বস্তু থাকবেনা, এতে অন্য বিষয়ও থাকবে। 'অন্বেষার' মূল সুর, বিজ্ঞান ও কারিগরি সংস্কৃতি প্রতিফলন এতে কী ভাবে এসেছে, আর চট্টগ্রামের উপর দিয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদিকেও আনা হলো জন্মশতবার্ষিকীর সঙ্গে। একটি পৃষ্ঠার মধ্যে সবকিছু সুন্দর ভাবে আনতে আমাকে লেখার প্রচুর কসরত করতে হলো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমার ইচ্ছেটি পূর্ণ হলো—১৯৬১ সনের অন্বেষা রবীন্দ্র জন্ম শতবার্ষিকীর উল্লেখ ছাড়া বেরোলোনা; বেরোলে সেটি একটি খারাপ রেকর্ড হয়ে থাকতো।

আমাদের ছাত্র সংসদের আরো নানা কাজের মধ্যে শুধু একটিকে এখানে উল্লেখ করতে চাই, তা হলো নাট্যানুষ্ঠান। পর পর তিনটি রাতকে বার্ষিক নাট্যানুষ্ঠানের জন্য ঠিক করা হয়েছিল—প্রথম দু'রাত ছেলেদের নাটক, তৃতীয় রাত মেয়েদের নাটক। সেদিনের এই বৈশিষ্ট্যটি বলার জন্যই এর উল্লেখ। তখন

ছেলেরা মেয়েরা এক সঙ্গে অভিনয় করার রেওয়াজ ছিলনা। ছেলেদের নাটকে ছেলেরাই মেয়ের ভূমিকাগুলোতে অভিনয় করতো, আর মেয়েদের নাটকে মেয়েরাই ছেলে সাজতো। ছেলেদের সঙ্গে একই ক্লাসরুমে ওরা বসতো এটিই ছিল যথেষ্ট তখন, মঞ্চে একই সঙ্গে অভিনয় করবে, দিনের পর দিন এর জন্য এক সঙ্গে মহড়া দেবে, এতখানি মেলামেশার কথা কল্পনাও করা যেতোনা। এসব জিনিস সহজ ও স্বাভাবিক হতে আরো বহু বছর সময় লেগেছিলো। সেবার ছেলেদের নাটক হয়েছিলো নূরুল মোমেনের 'যদি এমন হতো', আর মেয়েদের নাটক বনফুলের 'নব সংস্করণ'। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে কয়েক জন অধ্যাপকের কিন্তু খুবই আগ্রহ ছিল। অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী আর অধ্যাপক লুৎফুল হায়দার চৌধুরী দিনের পর দিন এই নাটক দুটির পরিচালনা নিয়ে অসম্ভব পরিশ্রম করে গেলেন। আর আমাদের অধ্যক্ষ নিজেও একজন নাটক-পাগল মানুষ। তিনিও যখনই পারেন তখনই নির্দেশনায় হাত লাগিয়েছেন। আমার কাছে মনে হয়েছে এঁরা সবাই ছিলেন নাটকের নাচুনি বুড়ি, ঢোলের বাড়ি পড়তেই নেচে উঠেছেন।

'বিজ্ঞান সাময়িকীর' জন্ম

অতৃপ্তি থেকে উদ্যোগ

স্কুল থেকে কলেজে আসার পর যে পদক্ষেপ নেয়াটি আমার সারা জীবনকে সব চেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে তা হলো বিজ্ঞান বিষয়ে নিয়মিত পত্রিকা মাসিক 'বিজ্ঞান সাময়িকীর' প্রকাশ—যা আজ অবধি আমি একই ভাবে বের করছি। আমার জীবনে পরবর্তী অনেক বড় বড় সিদ্ধান্ত, বড় বড় কাজের উৎস হলো এই বিজ্ঞান সাময়িকী।

কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষা থেকে আমার প্রত্যাশা, এবং সেই প্রত্যাশায় অপূর্ণতার অনুভূতি থেকে আমার কাছে সাময়িকী প্রকাশের চিন্তাটি এসেছিলো। কলেজে সব কিছু শুরু হয়েছিলো চমৎকার ভাবে। বিজ্ঞানের প্রত্যেক অধ্যাপক তাঁদের বিষয়গুলো খুবই নাটকীয় ও লোভনীয় ভাবে উপস্থাপন করে প্রথম দেখা দিয়েছিলেন। ওবায়দুল্লাহ স্যারের মত বিজ্ঞান প্রেমিক তরুণ শিক্ষক এই চমৎকারিত্বকে অনেক দূর নিয়ে গিয়েছিলেন—দুটি বছর জুড়েই। কিন্তু এসব ছিল ব্যতিক্রম। বরং এই ব্যতিক্রমগুলো আমার প্রত্যাশাকে সামনে এনে দিয়ে অপূর্ণতাকে আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। কারণ কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষার মূল সুরটি দেখলাম একেবারেই আড়ষ্ট আনুষ্ঠানিকতায় ভরা, প্রাণের ছোঁয়া সেখানে কম। অধ্যাপকদের ভঙ্গিটি মনে হলো একটি ভুল চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবার মত—সেটি নিবিড়ভাবে কৌতূহলী হবার বা বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে তাতে আত্মনিয়োগের চ্যালেঞ্জ নয়; বরং নাক মুখ বন্ধ করে কসরত করে, প্রয়োজনে মুখস্থ করে, পরীক্ষায় ভাল করার চ্যালেঞ্জ। দেখা গেল সব কিছুকে খুব কঠিন ও কসরত-সাপেক্ষ করে তোলার একটি প্রচেষ্টা রয়েছে, আর সেই জট ছাড়ানোর জন্য ক্লাসের ভেতরে ও আলাদা ভাবে অধ্যাপকদের মুখাপেক্ষি থাকাটিকেই জোর দেয়া হয়েছে বেশি।

সব কিছুর মধ্যে একটি অভাব বোধ আমাকে খুব কষ্ট দিল—সেটি হলো পাঠ্য বইয়ের লাইনে লাইনে থাকা বিষয়গুলোর বাইরে প্রতিদিন বিজ্ঞান জগতে যা হচ্ছে তার কোন ছোঁয়া কোথাও না থাকা। পাঠ্য বই থেকে যা পড়ছি, যা ক্লাসে পড়ানো হচ্ছে, পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তার মধ্যেও বিভিন্নটিতে এমন মর্মবস্তু নিশ্চয়ই রয়েছে যার সঙ্গে আধুনিক কালে যা ঘটছে তার একটি সম্পর্ক থাকার কথা। কিন্তু না আমরা ছোঁয়া পাচ্ছি ওই মর্মবস্তুর, না দেখতে পাচ্ছি ওই সম্পর্কগুলোকে। আগে থেকে নিজের আনন্দে বিজ্ঞান পড়ার অভ্যাসটি ছিল বলে কলেজ জীবনে বকায়দা বিজ্ঞান-ছাত্র হিসেবেও সেই আনন্দটি আশা করছিলাম। যদি সাধারণভাবে দেশের স্কুল ও কলেজগুলোতে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রকৃত চিত্র নিয়ে আমার পূর্ব-অভিজ্ঞতা থাকতো, তা হলে হয়তো এতটা উচ্চাশা করতামনা, আশাহত হবার দুঃখটি এত বেশি হতো না। যে ক্লিপ ফাইলটি নিয়ে কলেজে যেতাম তার ফাইল কভারের ভেতরে যে নিউটন, আইনস্টাইন এবং আবদুস সালামের ছবি লাগিয়েছিলাম তাতেই আমার সে আশাটির একটি প্রকাশ ছিল। তাঁদের জীবন, তাঁদের কথা, বিশেষ করে আমাদের দেশেরই আবদুস সালামের মত বিজ্ঞানীর কথা ক্লাসে শিক্ষকদের কাছে শুনবো, আমাদের পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে তাঁদের সংযোগটি দেখতে পাবো সেই রকম আশাই প্রতীকী ভাবে ওই ছবি লাগাবার পেছনে কাজ করেছ। সেটি হবার তেমন কোন লক্ষণ দেখতে পাইনি।

তবে অন্যান্য নানা সূত্রে চমকপ্রদ বিজ্ঞান জগতের ঘটমান সংবাদগুলো কিছু কিছু আমাদের কাছে আসছিলো। এর মধ্যে সব চেয়ে বর্ণাঢ্য সংবাদগুলো আসছিলো মহাশূন্য থেকে। কয়েক বছর আগে স্পুটনিক এসে আমাদের চোখ যে মহাশূন্যে নিয়ে গিয়েছিলো, সেখান থেকে সহজে চোখ ফেরেনি। কলেজে যাবার আগের বছর ১৯৫৯ সালেই ঘটেছিল কয়েকটি বড় বড় ঘটনা যা পত্রিকায় বেশ ফলাও করে এসেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং আমেরিকা উভয়েই এবার শুধু পৃথিবীর উপগ্রহ নয়, গ্রহের মত সূর্যের চারদিকে ঘোরার অথবা আমাদের চাঁদের চারদিকে ঘোরার মত কৃত্রিম বস্তুও পাঠিয়ে দিয়েছিলো। এই বছর জানুয়ারিতে সোভিয়েত লুনা-১ এভাবে সূর্যকে প্রদক্ষিণের কক্ষে চলে গেল—সেখানে মানুষের প্রথম সংযোজন হিসেবে। মার্চে আমেরিকা পাইয়োনিয়ার-৪ মহাশূন্যযানকে একেবারে চাঁদের গা ঘেষে গিয়ে সূর্যের কক্ষে পাঠিয়ে দিলো। সেপ্টম্বর মাসে লুনা-২ চাঁদের দিকে গিয়ে চাঁদের উপর আছড়ে পড়লো—এই প্রথম পৃথিবীর বাইরে কোথাও আমাদের তৈরি কোন জিনিস গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছলো। পরের মাসে ঘটলো আরো দুর্দান্ত ব্যাপার—লুনা-৩ চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে করতে চাঁদের পিঠের ছবি তুলে পাঠাতে লাগলো—এভাবে চাঁদের পিঠের ৭০ শতাংশ ভূমির ছবি মানুষের কাছে চলে এলো; চাঁদের যে পিঠ পৃথিবী থেকে কখনো দেখা যায়না, তার ছবিও আমরা পেয়ে গেলাম। ১৯৬০ এ এমনি আরো চাঞ্চল্যকর খবর আমরা আশা করেছিলাম; কিন্তু সেভাবে না এলেও পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রম করার জন্য

কৃত্রিম উপগ্রহকে এবার সত্যিকার অর্থে কাজে লাগনো হলো। এপ্রিলে মার্কিন উপগ্রহ টাইরোস-১ প্রথম বারের মত পৃথিবীর নানা অঞ্চলের আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে কাজে এলো, পরিক্রমণের সময় মেঘ ও বায়ুমণ্ডলের অবস্থা নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করে এবং সে খবর পাঠিয়ে। আগস্টে ঘটলো সোভিয়েত প্রচেষ্টার খুব মজার একটি সাফল্য—বেশ বড়সড় একটি মহাশূন্যযানে করে স্ট্রেলকা ও বেলকা নামে দুটি কুকুরকে পাঠানো হলো মহাশূন্যে। কয়েক বছর আগে তারা যখন কুকুর লাইকাকে পাঠিয়েছিল মহাশূন্যেই সেটি মারা গিয়েছিলো—খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। কিন্তু এবার দুটি কুকুরকেই জীবন্ত ফিরিয়ে আনা সম্ভব হলো। কিন্তু সত্যিকার দুর্দান্ত খবর এলো পরের বছর (১৯৬১) ১২ই এপ্রিল—মানুষ প্রথম মহাশূন্যে ভ্রমণ করলো। রাশিয়ান টেস্ট পাইলট ইউরি গ্যাগারিন মহাশূন্যযানে পৃথিবীকে সম্পূর্ণ একবার প্রদক্ষিণ করে এসে মহাশূন্যে প্রথম মানুষ হিসেবে চিরস্মরণীয় হলেন। সেই থেকে কিছুদিন আমরা গ্যাগারিনের কথা ছাড়া আর কিছুই মনে স্থান দিতে পারছিলামনা। এটি অবশ্য কিছু পরের কথা।

ভাবলাম, আমরা কি শুধু দৈনিক পত্রিকার দু'চার কথার খবর জেনেই এতে সন্তুষ্ট থাকবো, নাকি নিজেরাই একটি উদ্যোগ নেব—নিজেরাই এমন একটি ফোরাম তৈরি করে নেবো যেখানে নিয়মিত তথ্য পাওয়ার সুযোগ হবে, খোঁজ খবর করে যা জানতে পারবো তা অন্যদেরকেও ভালো লাগার মত করে জানাতেও পারবো। আর শুধু মহাশূন্যের মত চাঞ্চল্যকর খবরই বা কেন? বিজ্ঞানের জগতে আরো অনেক ছোট বড় যে সব বিষয়ে আমাদের কৌতূহল আছে এবং আমাদের মত আরো অনেকের থাকার কথা—সে সব কিছু আমরা এই ফোরামে নিয়ে আসিনা কেন। স্বভাবতই মনে হলে এমনি একটি উদ্যোগ হতে পারে একটি বিজ্ঞান পত্রিকা বের করা—যা হবে আমাদের পত্রিকা; আমরাই লিখবো, অন্যেরাও লিখবে, আমরা আলাপ-আলোচনা করবো সে সব বিষয়ের উপর—এই পত্রিকাতেই। কলেজের বিজ্ঞান শিক্ষায় যে অতৃপ্তি অনুভব করছিলাম, তারই একটি প্রতিকার হিসেবে এই কাজটি নিজের হাতে নিয়ে নিলাম।

পত্রিকা নিজে কখনো বের করিনি, কিন্তু অন্যদেরকে পত্রিকা বের করতে দেখেছি। ইউনূস ভাই যখন কলেজে ইউ এস পি পি'র মুখপত্র 'দু'পাতা' সম্পাদনা করতেন, ছাপাতেন তখন খুব মনোযোগ দিয়ে দেখেছি। ওই সময়ের পর শাকুর ভাই বের করতেন 'অরণি' সাহিত্য পত্রিকা; সেটিও চট্টগ্রাম থেকে বের হতো, ইউনূস ভাইদের আসরে এ নিয়ে মেলা আলোচনা হতো। যখন ঢাকা থেকে যে 'উত্তরণ' ইউনূস ভাইয়েরা বের করছেন তাও দেখি, সে সম্পর্কে শুনি। পত্রিকা সম্পাদনার কথা, ছাপাখানা ও মুদ্রণ সংক্রান্ত নানা কলা-কুশলতার কথা—এ সব কখনো আমার চিন্তা ভাবনা থেকে খুব বেশি দূরে ছিলনা। কিন্তু এখন যখন সত্যি সত্যি একটি পত্রিকা বের করার প্রশ্ন উঠলো তখন এক সঙ্গে এর নানা দিকের

কথা চিন্তা করে অস্থির হয়ে পড়লাম। একটি দু'টি সংখ্যা বের করার জন্য হয়তো টাকা যোগাড় করা যাবে, কিন্তু যদি নিয়মিত ভাবে করতে চাই তা হলে সেই দিকটির একটি সুরাহা করতে হবে। তাছাড়া ওই সময়টা ছিল খুব কঠিন সময়—কথায় কথায় সব রকমের কাজে মার্শাল ল'র নানা আইনের বাধা এসে পড়তো; সৃজনশীল ও ব্যতিক্রমী কোন কাজ স্বচ্ছন্দে করা যেতোনা। বিশেষ করে ছাত্রদের কাজকর্ম একেবারে হাতের মুঠোয় রেখে দেবার জন্য মার্শাল ল' তখন খুবই তৎপর। সে জন্য এত সুন্দর, এত প্রাণবন্ত যে কলেজ সংসদ নির্বাচন তাকে করে ফেলা হয়েছিলো ক্লাস-প্রতিনিধি নির্বাচনের মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচিত সংসদ, এর কাজকে করে ফেলা হয়েছিল একেবারে আমলাতান্ত্রিক কাজের মতো। এদিকে যা কিছু মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত তাকে বেঁধে ফেলা হয়েছে কঠিন প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স রেগুলেশন্সে। এজন্য ঠিক করলাম প্রথমে বেশ কয়েক সংখ্যা বিজ্ঞানের পত্রিকা অনিয়মিত ভাবে বের করবো, যাতে আইনের ব্যত্যয় না ঘটে। তারপর একবার ধাতস্থ হয়ে পেলে আইনী ডিকলেয়ারেশন নেবার উদ্যোগ নেবো।

পত্রিকার নাম নিয়ে ভাবলাম। নানা রকম সুন্দর সুন্দর নামের কথা চিন্তা করলাম যেখানে বিজ্ঞান রহস্যের আভাস থাকে আবার সাহিত্যিক দ্যোতনা থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে ওসব নামে পত্রিকার মুল উদ্দেশ্যটা চট্ করে বোঝা যাবে না। তাই একেবারে চাঁছা ছোলা নামের কথা ভাবলাম 'বিজ্ঞান সাময়িকী'। সময়ের সঙ্গে বিজ্ঞানের জগতে যা ঘটছে তাকে নিয়মিত ভাবে আমাদের জগতে নিয়ে আসার জন্যই তো এই পত্রিকা—তাই এটি হোক 'বিজ্ঞান সাময়িকী'। দেখলাম যাকেই বল্লাম সেই নামটি পছন্দ করলো, বিজ্ঞান সাময়িকী স্বনামে দাঁড়িয়ে গেলো। কিন্তু আমিতো একে নেহাত একটি পত্রিকা হিসেবে দেখতে চাইনি। আঙ্গিকটি পত্রিকার হলেও আমি একে দেখছিলাম একটি ফোরাম হিসেবে, আরো ভাল করে বলতে গেলে একটি আন্দোলন হিসেবে—যেখানে আমরা বিজ্ঞানের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা-সমালোচনার একটি হৈচৈ শুরু করতে পারবো—তাকে নিয়ে বিজ্ঞানের বিভিন্ন আসরে যেতে পারবো। সব চেয়ে বড় কথা সাধারণ যারা বিজ্ঞানের কথা ভাবেনা, তাদেরকে বিজ্ঞানের কথা ভাবাতে পারবো। আপাতত মনের মধ্যে সাধারণ পাঠক বলতে রয়েছে আমাদের মতো ছাত্রদের কথা—আমাদের কলেজে, এবং দেশের অন্য সব কলেজে। কিন্তু আসলে ভাবছিলাম শেষ পর্যন্ত কলেজকে ভিঙ্গিয়ে আমরা দেশের সব মানুষকেই এর লক্ষ্য করবো।

তাই শিগ্‌গীর 'বিজ্ঞান সাময়িকী'র নামের সঙ্গে লেখা হতে লাগলো 'বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ'—এই কথাটি। কিন্তু শুরুতে কিছু সংখ্যায় আমরা এর জন্য একটি ফোরামের কল্পনা করলাম, যাকে বললাম 'ক্ষুদে বিজ্ঞানী সমষ্টি'। নামের নিচে মুদ্রিত থাকলো 'ক্ষুদে বিজ্ঞানী সমষ্টির উদ্যোগে প্রকাশিত বিজ্ঞান-বার্তাবহ'। ওই ফোরামের উদ্যোক্তার জন্য আমরা একটি চরিত্র সৃষ্টি করলাম—সেটি 'ক্ষুদে

বিজ্ঞানীর' চরিত্র। সে মানসিকতায় বিজ্ঞানী, বিজ্ঞানের সব কিছু বুঝতে চায়, এ নিয়ে আন্দোলিত হতে চায়, কাজ করতে চায়; কিন্তু বয়সে ও জ্ঞানে সে এখনো নবীন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্ষুদেও বলা যায়। চরিত্রটি এমন যে বিজ্ঞান সাময়িকী যা কিছু করছে সেটি আসলে ক্ষুদে বিজ্ঞানী করছে, তার যে মতামত সেটি ক্ষুদে বিজ্ঞানীর মতামত। প্রতি সংখ্যার সম্পাদকীয়ের উপরে সম্পাদকীয় না লিখে লিখতাম 'ক্ষুদে বিজ্ঞানীর দফতর'। এই সব কিছু কিন্তু মনের প্রত্যাশা থেকে মাধুরী মেশানো আমার কল্পনা মাত্র। ধরে নিলাম পত্রিকা বেরোতে থাকলে এগুলো সব একটি অবয়ব পাবে—এক ধরনের 'ক্ষুদে বিজ্ঞানী সমষ্টি' দেখা দেবে, গড়ে উঠবে 'বিজ্ঞান আন্দোলন'। আপাতত আমি এক্ষেত্রে বলতে গেলে একা, আর সেটিই হলো সমস্যা।

বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রথম সংখ্যাটি একটি ট্যাবলয়েড পত্রিকার আকারেই বের হলো। সেটি ছিল ১৯৬০ সালের সেপ্টম্বর মাস। ট্যাবলয়েডের চারটি পৃষ্ঠার জন্য যে পরিমাণ লেখার প্রয়োজন ছিল তা নেহাত কম নয়। মোটের উপর সে সবের সব দায়িত্ব আমাকেই নিতে হলো। এক মাস আগে স্ট্রেলকা ও বেলকা নামের কুকুর দুটি ২৭ ঘণ্টা ধরে পৃথিবীকে ১৮ বার পূর্ণ প্রদক্ষিণ করে সুস্থ দেহে পৃথিবীতে ফেরত এসেছে। এর সম্পর্কে যত সূত্র থেকে যত খবর নিতে পেরেছি তাই নিয়ে সাজালাম একটি ফিচার—'সাম্প্রতিক'। আসলে ওই প্রথম সংখ্যাতেই এমনি রকম আরো কয়েকটি ফিচার চালু করলাম। একটির নাম দিলাম 'নবতম'—অদ্ভুত কিছু আবিষ্কারের কথা কল্পনা করে লেখা, যা এখন নেই কিন্তু হতে পারে, হলে ভাল হয়। এটি কখনো বেশ মজার বা কৌতূহলোদ্দীপক হতে পারে, আবার কখনো মনে হতে পারে—ও তাইতো এরকম হলে তো মন্দ নয়। এই 'নবতম'টি সব সময় আমি লিখতাম 'আগামী যুগ বিজ্ঞান পরিষদ' এই নামের এক কাল্পনিক সংগঠনের পক্ষ থেকে।

প্রথম সংখ্যার 'নবতমে' প্রস্তাব করা হয়েছিলো একটি নতুন ধরনের চশমার, যাতে চোখ নিজেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে চশমার পাওয়ার প্রয়োজনমত বাড়াতে ও কমাতে পারবে। আবার এতে একটি স্ক্রু ঘুরিয়ে দূরের জিনিস কাছে আনা থাকে (দূরবীক্ষণের মত) অথবা কাছের সূক্ষ্ম জিনিসকে বড় করে দেখা যাবে (অনুবীক্ষণের মত)। শুধু তাই নয় এতে ইনফ্রা-রেড অথবা আলট্রা ভায়োলেট আলোকে সাধারণ দৃশ্যমান আলোতে পরিণত করে সম্পূর্ণ অন্ধকারে এবং কুয়াশার মধ্যেও দেখার ব্যবস্থা থাকবে। বৃষ্টির পানিতে চশমা যেন অস্বচ্ছ না হয়ে পড়ে সেজন্য এক ধরনের সূক্ষ্ম ওয়াইপার থাকবে এটি ক্রমাগত পরিস্কার রাখতে। এতে চশমাটিকে দেখতে খারাপ লাগবেনা কারণ সব যন্ত্রপাতি লুকানো থাকবে তার ফ্রেমের মধ্যে; এর জন্য যে শক্তিটুকু দরকার তা আসবে শরীরের উত্তাপ থেকে। মজার ব্যাপার হলো আজ একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে এসে দেখছি

এর অনেক কিছুই অর্জিত হয়ে গেছে, কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের সেই নবতমের চেয়ে অনেক বেশি।

আর একটি ফিচার প্রথম সংখ্যা থেকেই চালু করলাম—'বর্ণালী'। এ নাম দেয়া হলো রঙধনুর মত বর্ণালীতে সাতরঙের উপস্থিতিকে মনে করিয়ে; কারণ এতে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টি হতে পারে এমন কিছু ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের সাধারণবোধ্য বিস্তারিত ব্যাখ্যা থাকতো। যেমন প্রথম সংখ্যাটিতে থাকলো—কসমিক রে' বা মহাজাগতিক রশ্মি, তেজস্ক্রিয়তা, ইনফিনিটি বা অসীম, কৃত্রিম বস্তু নাইলন, এবং বর্ণালী জিনিসটারই নানা ব্যবহার নিয়ে।

বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্মের মূল কারণটি তুলে ধরলাম স্পষ্ট করে প্রথম সংখ্যার সম্পাদকীয়তেই অর্থাৎ 'ক্ষুদে বিজ্ঞানীর দফতরে'। এতে লিখলাম আমাদের উদ্দেশ্য সবাইকে বিজ্ঞান ভাবাপন্ন করে তোলা—কারণ এই বিজ্ঞানের যুগেও আমরা বিজ্ঞানের দৈনন্দিন অগ্রগতির খবর রাখছিনা, এমন কি কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান পড়া সত্ত্বেও তা করিনা। আর এই মুহূর্তে বিজ্ঞান সাময়িকী চেষ্টা করছে পাঠ্য বইয়ের বাইরেও যেন আমরা বিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে পারি—আর এজন্য এটি পুরো ছাত্র সমাজের সহযোগিতা চাইছে। একটি বড় প্রবন্ধও ছিল এই সংখ্যায় ফিউশন নিউক্লিয়ার শক্তি নিয়ে। হাইড্রোজেন বোমায় বা সূর্যের অভ্যন্তরে যে প্রক্রিয়ায় হাইড্রোজেন থেকে শক্তি উৎপাদিত হয় সেটিই ফিউশন প্রক্রিয়া। একই প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের উপায় আবিষ্কারের যে গবেষণা চলছে তাকে নিয়ে ছিল ওই প্রবন্ধ। এটি সফল হলে সমুদ্রের পানি থেকেই আসতে পারবে আমাদের সব শক্তি। দুঃখের বিষয় হলো এত দিন গবেষণার পরও এখনো (২০১৫) আমরা এ কাজে সফল হইনি।

সম্পাদক ও প্রকাশক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে বিজ্ঞান সাময়িকী শুরু করলাম বক্সীর হাট রোডের ঠিকানা থেকে। ছাপানো হলো কোর্ট রোডের ক্রিসেন্ট প্রেস থেকে। ইউনূস ভাই এর একটি সুন্দর লোগো এঁকে দিলেন যা তখন থেকে আজ অবধি বিজ্ঞান সাময়িকী পত্রিকাতে এবং এর লেটার-হেড সহ দাপ্তরিক কাজে ব্যবহার করে আসছি। তিনি কয়েকটি ফিচারের নিয়মিত শিরোনাম-ছবিও এঁকে দিলেন। প্রথম ব্যয় নির্বাহ হলো নিজেদের অর্থে। তবে ছোটবেলা থেকে বন্ধু ও সহপাঠী মির্জা আবু মনসুর তাদের শিল্পের একটি বিজ্ঞাপন দিয়ে কাজটিকে সহজ করে দিলো। মির্জাবু ওয়্যার ম্যানুফেকচারিং অ্যান্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেডের একটি বিজ্ঞাপন প্রথম পৃষ্ঠাতেই গেলো, এদের এই শিল্পে তার-কাঁটা, তার, পেরেক, স্ক্রু, রিভেট, ষ্ট্যাপল ইত্যাদি তৈরি করা হতো। বায়জিদ বোস্তামী শিল্প এলাকায় তাদের কারখানা দেখতে কয়েক বারই গিয়েছি মনসুরদের জীপে চড়ে। বোরহান, মনসুর, সাজ্জাদ, কেরামত এবং আরো কয়েকজনকে নিয়ে সহযোগীদের নামও ছাপা হলো এতে। সেই যে যাত্রা শুরু হলো, আর পেছনে তাকাতে হয়নি বিজ্ঞান সাময়িকীকে।

উনিশ শ' ষাটের সেপ্টম্বরে বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রথম প্রকাশ নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম, আর তার পরের মাসেই প্রত্যক্ষ করলাম প্রকৃতির একটি ভয়াবহ ধ্বংস যজ্ঞ—একবার অক্টোবরের ১০ তারিখ, তারপর আবার অক্টোবরের ৩১ তারিখ। এই দুইই ছিল প্রবল আকারের ঘূর্ণিঝড় ও এর সঙ্গের সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস। এর আগে আমাদের কালে এ ধরনের বড় কিছু হতে দেখিনি। তবে নানা প্রসঙ্গে শুনেছি উন্ষাট মঘীর তুফানের কথা—এক চট্টগ্রামেই নাকি তখন দুই লক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। আমাদের বৃহত্তর পরিবারে ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পুরোনো দিনের অনেক কাহিনীতে এই উনষাট মঘীর তুফানটি একটি রেফারেন্স পয়েন্ট হিসেবে কাজ করতো। মঘী সন গণনা পদ্ধতিটি মূলত বার্মা থেকে আরাকান রাজত্বের সময় চট্টগ্রামে এসেছিল—পঞ্চদশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে। কিন্তু কেন জানিনা উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতেও সনাতন চট্টগ্রাম সমাজে পুরোনো দিনের হিসেব রাখার ক্ষেত্রে এই মঘী সন ব্যবহারের রেওয়াজ ছিল। ওই উনষাট মঘীটি ছিল ১৮৯৭ সালের দিকে—ওই বছর চট্টগ্রামের সেই ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের কথা বংশ পরম্পরায় এখানকার মানুষ শুনেছে। আমরা দেখলাম ১৯৬০ সালের অক্টোবরের দুটি প্রায় একই রকম ঘটনা—অবশ্য ক্ষয়ক্ষতি তুলনামূলক ভাবে ওটির চেয়ে অনেক কম।

অক্টোবরের ১০ তারিখের তুফানটির ক্ষতি বেশি হয়েছিলো নোয়াখালির মাইজদিও হাতিয়া অঞ্চলে; ৩১ তারিখেরটির চট্টগ্রামে। এই শেষেরটিতে বিকেল থেকে অল্প অল্প বৃষ্টি হচ্ছিল, তার সঙ্গে ঝড়ো হাওয়া। সন্ধ্যার পর বৃষ্টি কমে গেলেও বাতাস বেড়ে যায় প্রচণ্ড ভাবে। রাত আটটা, ন'টার দিকে বাতাস কমে যায়, আর তখুনি এসেছিলো ১০-১২ ফুট উঁচু সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস সমুদ্র তীর থেকে ভূখন্ডের ভেতরের দিকে অনেকখানি ঢুকে গিয়েছিলো এই জলোচ্ছাস শহরের কাছে হালিশহর ইত্যাদি এলাকা পর্যন্ত। পরে সরকারী হিসেবে ১৬ হাজার মানুষ মারা গিয়েছিলো বলা হয়েছে। অনেকের ধারণা মৃতের সংখ্যা ছিলো এর চেয়ে অনেক বেশি। চট্টগ্রাম শহরের অনেকটা অঞ্চলও ঘূর্ণিঝড়ে তছনছ হয়ে গিয়েছিলো। কয়েকটি দিন বিদ্যুৎ ছিলনা, পানি ছিলনা, যাতায়াতও ছিল অত্যন্ত কঠিন। এসব কারণে ত্রাণ কর্মসূচি বেশ ব্যাহত হয়েছিলো। এই সংকটের সময় বিশেষ ভাবে মানুষের কাছে এসেছিলেন ইতোমধ্যে জনপ্রিয় প্রাদেশিক গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল আজম খান। তিনি ব্যক্তিগত ভাবে ত্রাণ কার্য পরিচালনা করে, এবং ভুক্তভোগী মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে এ সময় জনপ্রিয়তার তুঙ্গে উঠেন।

প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধকলের কারণে বিজ্ঞান সাময়িকীর দ্বিতীয় সংখ্যা বেরুলো নভেম্বর সংখ্যা রূপে। এ সংখ্যাতেই এর ট্যাবেলয়েড আকৃতি পরিবর্তন করে আট পৃষ্ঠার ম্যাগাজিন আকারে ছাপানো হয় এবং এর পর থেকে কিছু দিন

এই আকারই ছিলো। কিন্তু পাঁচ ছয়টি সংখ্যা পর আমরা বইয়ের আকৃতিতে চলে গেলাম—সেই থেকে এখন অবধি সেভাবেই আছে। ওই দ্বিতীয় সংখ্যাটি ঝড়ের পর পর প্রকাশিত বলে বিজ্ঞান সাময়িকী প্রাকৃতিক দুর্যোগ নিয়ে বিশেষ ভাবে প্রশ্ন তুললো—আমরা কি দুর্যোগের কাছে অসহায় ভাবে নিজেকে সমর্পণ করবো, এখন যেমনটি করছি; নাকি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিতে বলীয়ান হয়ে একে মোকাবেলা করবো?

বিজ্ঞান সাময়িকীর উদ্দেশ্য ছিল একটি আন্দোলনের দিকে যাওয়া, তাই এটি শুধু নিজে নিজে নিজেদের কলেজের জন্য প্রকাশ করে গেলে চলবেনা। ওই দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেই আমরা বৃহত্তর পাঠক গোষ্ঠীর দিকে নজর দিলাম। শুধু পাঠক হিসেবে নয়, লেখক ও অন্যান্য ভাবেও যেন অনেকে এর সঙ্গে জড়িত হতে পারে, তার দিকে মনোযোগ দিলাম। বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন শহরে এবং বিশেষ করে বিভিন্ন কলেজে যেন বিজ্ঞান সাময়িকী পাওয়া যায় সেই চেষ্টাই ছিল চ্যালেঞ্জ। আপাতত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল আমাদের প্রথম লক্ষ্য। 'অনুসন্ধিৎসা' নামে একটি নতুন ফিচার চালু করলাম—যেটিতে পাঠকরা বিজ্ঞান বিষয়ে যে কোন প্রশ্ন করতে পারতো। পত্রিকা যত বেশি পাঠকের কাছে গেল ততই অনুসন্ধিৎসাতে প্রশ্নের সংখ্যা বাড়লো। এগুলোর উত্তর দেয়া আমার জন্য একটি বড় কাজ হয়ে দাঁড়ালো। বেশির ভাগই আমি নিজে সামাল দিতে পারতাম, বাকিগুলোর জন্য বন্ধুবান্ধব, শিক্ষক, এমনকি ইউনূস ভাইয়ের মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর বন্ধুদের সাহায্যও নিতে হতো। এই ফিচারটি বিজ্ঞান সাময়িকীর জনপ্রিয়তা বাড়ালো।

পত্রিকা যেন বিভিন্ন জায়গায় উৎসাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে, সেখান থেকে উপযুক্ত লেখা পাওয়া যেতে পারে, প্রশ্ন পাওয়া যেতে পারে, গ্রাহক পাওয়া যেতে পারে, সে জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং কলেজে কলেজে বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতে বেশ কয়েকজনকে রাজি করালাম। তাঁদের নাম পত্রিকায় দিয়ে দেয়া হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধি হলেন ওয়ালিউল ইসলাম—ইউনূস ভাইয়ের বন্ধু, সলিমুল্লাহ হলে পরে আমিও ছাত্র রাজনীতিতে তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি, পরবর্তী কালে খ্যাতনামা আমলা ও সচিব। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিনিধি ছিলেন তৈয়ব হোসেন। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বয়ং বেলাল ভাই, তিনি তখন ওখানে ভর্তি হয়েছেন। ঢাকায় ইডেন কলেজে ছিলেন মতিয়া চৌধুরী (পরে বিখ্যাত ছাত্র নেত্রী এবং মন্ত্রী)। মতিয়া চৌধুরী তখন জীববিজ্ঞানে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রী। অন্যান্য বিভিন্ন কলেজে প্রতিনিধিদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল আমার কলেজিয়েট স্কুলের বন্ধুরা—তখন দেশের নানা কলেজে ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন মোমিনুল হক চৌধুরী (যে আমাকে সিলেটি শেখাত) ঢাকা কলেজে; ওমর ফারুক মালিক (যে আমাদের না-হওয়া ব্যান্ড পার্টির দলপতি ছিল) নটরডাম কলেজে; নাজির হাট কলেজে মঞ্জুরুল ইসলাম; মাসুদুজ্জামান কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে; কুতুবুদ্দীন (কক্সবাজার অভিযানে সাথী) চট্টগ্রাম কমার্স কলেজ; কাজী নাসির ফৌজদার হাট ক্যাডেট কলেজে (সে স্কুল থেকে ওখানে

চলে গিয়েছিলো বলে ওই কলেজে আমাদের আসা যাওয়া হতো)—এমনি ভাবে দেশের নানা কলেজেও বিজ্ঞান সাময়িকী পৌঁছে গেল।

কিন্তু পত্রিকা শুধু পৌঁছালে হবেনা, এর পেছনে বড় বিজ্ঞানীর একটি বড় আদর্শ থাকতে হবে। শুরু করার কয়েক মাসের মধ্যে সেই আদর্শ দিয়ে দিলেন আমাদের গর্ব—বিজ্ঞানী আবদুস সালাম। ১৯৬১ এর জানুয়ারিতে ঢাকায় বসেছিলো পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলন। এর মূল সভাপতি ছিলেন আবদুস সালাম, আর সেই সুবাদেই তিনি কার্জন হলের সামনের সম্মেলন মঞ্চে তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণটি দিলেন। আমরা এর বিশেষ কিছু অংশের অনুবাদ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সংখ্যা বিজ্ঞান সাময়িকীতে ছাপিয়েছিলাম। ভাষণটি কেন ঐতিহাসিক? আবদুস সালাম এখানে একজন তাত্ত্বিক পদার্থবিদ হিসেবে তাঁর গবেষণার বিষয়ে কিছু বলেননি, বরং তাঁর ভাষণটির নাম ছিল 'দারিদ্রের বিরুদ্ধে বিজ্ঞানীর সংগ্রাম'। তিনি দেশের অর্থনৈতিক বাস্তবতাগুলো তুলে ধরে এই করুণ বাস্তবতার পরিবর্তনে আমাদের প্রচলিত সংস্কৃতি যে নেহাতই অপ্রতুল সেটিই দেখাতে চেয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন এর মোকাবেলা একমাত্র সম্ভব কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতির মাধ্যমে—অথচ আমরা আছি তার থেকে অনেক অনেক দূরে। লাহোরে বড় হয়ে ওঠা সালাম ওখানকার মল এলাকার রেস্তোরাগুলোতে তরুণরা যে কাব্যময় আড্ডায় দিন কাটায় তার বদলে তিনি দেখতে চেয়েছেন দেশের অর্থনীতিতে কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি নিয়ে তাদের জোরালো আলোচনা। অথচ দেশে বিজ্ঞান নিয়ে আলোচনা খুব ক্ষীণ, উদ্যোগও খুব ক্ষীণ, সত্যিকার বিজ্ঞানী তৈরির চেষ্টাটিও ক্ষীণ। আমাদের এই সনাতন সংস্কৃতিই এর জন্য দায়ী—এ সংস্কৃতির বৈজ্ঞানিক মোড় নেয়াটি একান্ত প্রয়োজন।

বিজ্ঞান সাময়িকীর পেছনে যে বক্তব্য ছিল, আবদুস সালামের ভাষণ তাতে আরো শক্তিশালী ভাষা দিয়েছিলো—সে কারণে ওটি আমাদের কাছে ছিল রীতিমত ঐতিহাসিক, যার মর্মবাণী বিজ্ঞান সাময়িকী আজও বহন করছে। আবদুস সালাম নিজেও তাঁর এই ভাষণকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন। সেই বিশ্বজোড়া খ্যাতির প্রথম পর্যায়ে এই ভাষণ দেবার পর সারা জীবন নিজ দেশকে এবং উন্নয়নশীল দেশের বিজ্ঞানীদেরকে বিজ্ঞানের উচ্চতম পর্যায়ে নেয়ার জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। ইতালির ত্রিয়েস্তে 'আবদুস সালাম তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যা কেন্দ্র' তাঁর একটি চমৎকার অবদান। সেই কাজের ধারাবহিকতায়, বিশেষ করে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভের পর ওই কাজের মূল সুরগুলো নিয়ে তাঁর রচনাগুলো বিশ্ব বিজ্ঞান সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। এ সম্পর্কে প্রকাশিত তাঁর রচনাসমগ্র গ্রন্থে সর্ব প্রথম অবদান হিসেবে স্থান পেয়েছে ১৯৬১ এর জানুয়ারিতে তাঁর ঢাকা ভাষণটি। পরে ত্রিয়েস্তে এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপের সুযোগ আমার হয়েছে। তিনি নিজেও মনে করেন ঢাকা ভাষণটি দেবার পর থেকেই দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কারিগরি ও বিজ্ঞান সংস্কৃতির ভূমিকা সম্পর্কে তিনি অধিকতর নিশ্চিত হয়েছেন।

বিচিত্র আয়োজন, বিচিত্র সহযোগিতা

যদিও আইনগত কারণে তখনো 'মাসিক' কথাটি লিখছিনা, বিজ্ঞান সাময়িকী মোটামুটি নিয়মিত মাসিক পত্রিকায় পরিণত হচ্ছিল, আর এটাই ছিলো আমার ইচ্ছা। এ সময় পাকিস্তান বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি পূর্বাঞ্চলীয় শাখার (পাকিস্তান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্স) মুখপত্র হিসেবে ঢাকা থেকে বাংলায় একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা বের হতো, নাম 'বিজ্ঞান বিচিত্রা'। সম্পাদক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক শাহ ফজলুর রহমান। এর আগে সত্যেন্দ্রনাথ বসু (বিশ্ববিখ্যাত পদার্থবিদ) যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান ছিলেন (ত্রিশ ও চল্লিশের দশকে) তিনি, সাহিত্যিক অন্নদা শঙ্কর রায় (তখন সরকারী কর্মকর্তা), কাজী মোতাহার হোসেন (তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রভাষক) তাঁরা কয়েকজন মিলে ঢাকায় 'বারো জনা' বলে একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনা সভা গঠন করেছিলেন। তাঁরাও 'বিজ্ঞান পরিচয়' নামে একটি পত্রিকা অনিয়মিত ভাবে কিছুদিন বের করেছিলেন। তাই ঠিক করেছিলাম যে 'মাসিক বিজ্ঞান সাময়িকী' হিসেবে বের হয়ে আমাদের পত্রিকা দেশের সর্ব প্রথম বিজ্ঞান মাসিক হিসেবে দাবি করতে পারবে। প্রথম কয়েকটি সংখ্যার জন্য যে অভিনন্দন পেলাম তাতে সাহস বেশ বেড়ে গেল, তাই ওরকম বড় বড় বিজ্ঞানীদের 'বিজ্ঞান বিচিত্রা', 'বিজ্ঞান পরিচয়' ইত্যাদির থেকে ভিন্ন ছোট প্রয়াস হিসেবে নিজেদেরটিকে মোটেই দেখছিলাম না। পত্রিকায় আমাদের কথাগুলো বড়দের মতই ছিল—পুরো জাতি, বিশেষ করে তরুণ সমাজের পক্ষ থেকেই আমরা এতে কথা বলছিলাম।

ঢাকার সাহিত্য পত্রিকা 'উত্তরণ' বিজ্ঞান সাময়িকী সম্পর্কে আলোচনায় লিখলো : '...বিজ্ঞান বস্তুটির সঙ্গে আমাদের আত্মীয়তা দূরে থাক, চেনা জানাই হয়না। তাই উত্তর কালে আজকের বিজ্ঞান-নিয়ন্ত্রিত বৃহত্তর দুনিয়ার সঙ্গে যখন আমাদের যোগসূত্র ঘটে তখন বিজ্ঞানের সঙ্গে একান্ত হবার কোন পথ আর সুগম থাকেনা।...ফলে বিজ্ঞানের প্রসঙ্গে এলেই ধারাল মাথাটি নুয়ে পশ্চিমমুখো হয়ে আমাদের হাত বাড়াতে হয়—এটা দাও ওটা চাই; এবং চাই মিস্ত্রি সমেত। ...বিজ্ঞান সাময়িকীর ক্ষুদে বিজ্ঞানীরা তাদের ক্ষুদ্রতা সম্পর্কে সচেতন থেকেও এই সমূহ গুরু দায়িত্ব নিজেদের সাধ্যানুযায়ী পালন করবার ভার নিয়েছে। নিঃসন্দেহে এ একটি প্রতিশ্রুতিশীল পদক্ষেপ।...'

ঢাকার আর একটি সাহিত্য সাময়িকী 'পরিচয়' লিখলো : '...এর জন্য (বিজ্ঞান চর্চার) চাই প্রচুর পরিমাণে জনসাধারণের মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে ধারণা জন্মানো। বিজ্ঞান সম্পর্কে আপামর জনের অহেতুক বিমুখতা অপসারণ করা এখনকার মতো আমাদের কর্তব্য।...একটা সচিত্র চটুল সিনেমা পত্রিকা বা নিরামিষ সাহিত্য পত্র বের না করে বিজ্ঞান-পত্রিকা প্রকাশ করার মধ্যে 'ক্ষুদে বিজ্ঞানীদের' সাহস আছে বলতে হয়। পাকিস্তানের নানা বিষয়ে নানা আন্দোলন

হলো, কিন্তু বিজ্ঞানের আন্দোলন একটিও হলোনা।' প্রথম কয়েকটি সংখ্যা বের হবার পরই এরকম উৎসাহব্যঞ্জক প্রতিক্রিয়া পেতে আরম্ভ করেছিলাম।

বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য আমার সব চেয়ে বেশি যে কাজ করতে হলো তা হলো লেখা। পত্রিকার বড় অংশটি আমাকে লিখতে হতো—সব ফিচারগুলো, প্রশ্নের উত্তর, এবং সম্পাদকীয়। এ ছাড়া স্বনামে এবং অন্যদের নামে প্রায় সব সংখ্যাতেই অন্তত একটি বড় প্রবন্ধ লিখতে হতো। সেই থেকে লেখা এবং প্রেস থেকে আসা প্রুফ কপির কয়েক দফা প্রুফ দেখা (নিজের ও অন্যের লেখার) আমার জন্য শ্বাস প্রশ্বাসের মতই নিয়মিত কাজে পরিণত হয়েছিল। আজ এত বছর পরও ব্যাপারটি অনেকটা তাই রয়েছে। মনে পড়ে বিকেলে বন্ধুরা যখন ঘুরতে যাচ্ছে, বা আড্ডা দিতে যাচ্ছে—আমি যাচ্ছিনা, কারণ আমাকে লিখতে হবে—কি সন্ধ্যায়, কি রাতে। তবে গোড়া থেকেই এ কাজে দারুণ আনন্দ পেতাম। এখন অবধি যে কটি জিনিসে আমার সব চেয়ে বেশি আনন্দ, তার মধ্যে লেখা হলো একটি। লেখার জন্য রসদ সে সময় মোটেই সহজলভ্য ছিলনা। বই-ম্যাগাজিনের দোকানে খুব সাম্প্রতিক যা পাওয়া যায় কেনার চেষ্টা করতাম। সেখানে বিজ্ঞানের ম্যাগাজিন থাকতো না বল্‌লেই চলে—কিন্তু রীডার্স ডাইজেস্টের মত যা পাওয়া যেত তাতেও মাঝে মাঝে বিজ্ঞান সম্পর্কিত মজার প্রবন্ধ, খবর ইত্যাদি পেতাম। একটি ভাল উৎস শিগ্‌গীর আবিষ্কার করলাম—সেটি হলো ঢাকার মার্কিন তথ্যকেন্দ্র ইউএসআইএস। তাদেরকে একটি চিঠি লিখলাম—বিজ্ঞান সাময়িকীর প্যাডে। পত্রিকার উদ্দেশ্য ইত্যাদি বর্ণনা করে তাদের কাছ থেকে যথাযথ ম্যাগাজিন, তথ্যপত্র ইত্যাদির সহযোগিতা চাইলাম। একই রকম চিঠি অন্যান্য নানা দূতাবাস ও তথ্যকেন্দ্রে দিলাম।

প্রায় শুরুতেই সক্রিয় বিজ্ঞান সাংবাদিকতা করার একটি সুযোগ পেয়ে গেলাম—চট্টগ্রামের সন্তান বিজ্ঞানী ড. কামাল উদ্দিন আহমদকে এখানে একটি নাগরিক সংবর্ধনা দেবার আয়োজন হলো মুসলিম ইনস্টিটিউটে। আমার জন্য এর একটি পূর্ব-পটভূমি ছিল। সপ্তম শ্রেণীতে পড়ার সময় ইউএসআইএস লাইব্রেরিতে চমৎকার একটি বই পড়েছিলাম ছোটদের জন্য লেখা 'দি ষ্টোরি অফ ওয়ান্ডার ড্রাগস'। এতে সে সময় নতুন এসে দারুণ সফল হওয়া আধুনিক অ্যান্টিবায়োটিকগুলো সম্পর্কে লেখা হয়েছিল। নতুন অ্যান্টিবায়োটিকের মধ্যে এতে উল্লেখ ছিল ঢাকার রমনা এলাকার নামে নামকরণ করা 'রমনাসিনের'। আমেরিকার একটি বইতে এই নাম দেখে পুলকিত হয়েছিলাম। পরে শুনেছি এই রমনাসিনের আবিষ্কর্তা হলেন চট্টগ্রামের তরুণ কামালউদ্দিন আহমদ যিনি আমেরিকার উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করার পরপর গবেষণায় ১৯৫৫ সালে বিখ্যাত 'নেচার' পত্রিকায় এই আবিষ্কার প্রকাশ করেন। পরে এই বিজ্ঞানী ভিটামিন সি ও ই এর উপকারিতা ও প্রতিক্রিয়া সহ আরো অনেক বড় আবিষ্কার করেছেন। শুধু তাই নয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ এবং

পরে পুষ্টি বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের সৃষ্টি, এগুলোর জন্য উদ্যোগ গ্রহণ ও তাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ব্যবস্থা ইত্যাদির মাধ্যমে ব্যতিক্রমী বিজ্ঞান সংগঠক হিসেবে নিজকে প্রমাণ করেছেন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি অদ্ভুত সাড়া জাগিয়েছিলো। বিশাল জন সমাগম হয়েছিল, তাঁর আবিষ্কারগুলো সম্পর্কে মনোগ্রাহী আলোচনা হয়েছিল। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল সুন্দর করে বোঝালেন ওষুধ গবেষণা কী ভাবে নানা পর্যায়ে দীর্ঘ পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে কার্যক্ষম ওষুধে পরিণত হয়। কবি মাহবুবুল আলম চৌধুরী ড. কামাল সম্পর্কে একটি সুন্দর কবিতা পড়লেন। তিনি সেই কবি যিনি একুশের উপর প্রথম কবিতা 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি' লিখেছিলেন। বিজ্ঞানী সম্পর্কে তাঁর এই কবিতা, আলোচনার সারাংশ, সবই বিজ্ঞান সাময়িকীতে ছাপিয়েছি। পরে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার পর প্রফেসর কামাল উদ্দিনের স্নেহধন্য হতে পেরেছিলাম। তাঁর ছেলে কামাল আহমদকে সাম্প্রতিক কালে দেখছি শিক্ষা সংগঠক হিসেবে সাফল্যের পরিচয় দিয়ে চট্টগ্রামে 'এশিয়ান ইউনিভার্সিটি ফর উইমেন' নামে একটি বিশ্বমানের আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। মজার ব্যাপার হলো কামাল আহমদ যখন স্কুলে পড়ে তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার শিক্ষক-কোয়ার্টার বাসার পাশে নির্জন জায়গায় একটি চালাঘর তুলে পথ শিশুদের একটি স্কুল চালাতো নিজেই।

বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য সাম্প্রতিক তথ্য সংগ্রহের উৎস সন্ধান করতে গিয়ে—চমৎকার সহায়তা পেলাম ইউএসআইএস থেকে। তখন থেকে প্রতি সপ্তাহে একটি মোটা মার্কিন খাম বিজ্ঞান সাময়িকীর সম্পাদকের কাছে আসতে থাকলো। এতে থাকতো 'মার্কিন পরিক্রমা' নামক তথ্যপত্র এবং মাঝে মাঝে আরো কিছু সংবাদ বিজ্ঞপ্তি। আরো ভালো ব্যাপার হলো এতে প্রায়ই প্লাস্টিকের কিছু ব্লক থাকতো। সাধারণত ছাপার ব্লক হতো সীসার। 'লাইন' ব্লক হলে তাতে এর তল হিসেবে উঁচু অংশ আর ডেবে থাকা নিচু অংশ থাকতো—ছাপা হতো একই শেইডের সাদা-কালোতে। আর যদি 'হাফটোন' ব্লক হতো তাতে উঁচু অংশটি গঠিত হতো অসংখ্য ছোট ছোট বিন্দুতে—কোথাও ঘন ও মোটা বিন্দু, কোথাও ক্ষুদ্রতম পাতলা বিন্দু কোথাও এই দুইয়ের মাঝামাঝি নানা রকম। সেই হিসেবে মুদ্রণে নানা রকম শেইড পাওয়া যেতো। ইউ এস আই এস থেকে পাওয়া এই ব্লকগুলো হতো প্লাস্টিকের হাফটোন ব্লক, ফটোর মত ছবির। সীসার ব্লকের মতই এগুলোকেও কাঠের পুরু টুকরার উপর 'মাউন্ট' করে নিতে হতো যাতে করে সীসার টাইপের ছাপার 'ম্যাটারের' (যেখান থেকে ছাপা হবে) মধ্যে একে সেঁটে নেয়া যায় একই ফ্রেমে। কোন ব্লক ছাপাবার সিদ্ধান্ত হলে তা ব্লকের দোকানে নিয়ে গিয়ে ওভাবে মাউন্ট করে নিতাম। মার্কিন পরিক্রমার বেশির ভাগ তথ্য আমাদের কোন কাজে আসতোনা। কিন্তু তার পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল অনেক—বেশ পুরু ভাল কাগজ, কাগজের শুধু এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। কাজেই এটি চমৎকার ভাবে অন্য

কাজে লাগাতাম; আমার যাবতীয় লেখা এর উল্টো পৃষ্ঠায় লেখা চলতো—কাগজ কেনার পয়সা বাঁচতো। পরে শুনেছি নানা পত্রিকা অফিসেও নাকি এমনটি করা হতো। তবে এগুলোর চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস ওখান থেকে পেতে আরম্ভ করলাম কিছুদিন পর থেকে—যেটি হলো মাসিক 'সায়েন্স ডাইজেস্ট' পত্রিকা। বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সর্বশেষ অগ্রগতি জানার জন্য এটি ছিলো একটি সোনার খনি। আরো কিছু পরে ধীরে ধীরে পেতে থাকলাম আরো মূল্যবান বিশ্বখ্যাত ম্যাগাজিনগুলো—'সায়েন্স', 'সায়েন্টিফিক আমেরিকান' এবং 'পপুলার সায়েন্স'। এগুলোর তথ্যের ভিত্তিতে বিজ্ঞানের যে কোন শাখার বিষয়গুলো আমাদের পাঠকদের জন্য আকর্ষণীয় করে বাংলায় লেখার অভ্যাস আমার এ ভাবেই গড়ে ওঠেছিলো। একই ভাবে বিজ্ঞানের সব শাখার খোঁজ খবর রাখতে, এবং সেগুলো বোঝার চেষ্টা করতেও একটি আনন্দময় কৌতূহলও গড়ে ওঠেছিল। এভাবে তখন থেকেই আমি যেমন নিজকে সব রকম বিজ্ঞানের ছাত্র হিসেবে, তেমনি বিজ্ঞানের সাংবাদিক হিসেবেও মনে করে এসেছি। ইউ এস আই এস এর বদান্যতায় উৎসাহী হয়ে পরে বৃটিশ কাউন্সিলের কাছেও এরকম দেন দরবার করেছি যার ফলে 'নেচার' এবং 'নিউ সায়েন্টিস্টের' মত—একাধারে খুব সুখপাঠ্য অন্যদিকে অত্যন্ত পেশাদার সাময়িকী নিয়মিত পড়ার ও ব্যবহারের সুযোগ পেয়েছি।

কিন্তু বিজ্ঞান সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বড় সমস্যাটি থেকেই গেল। বেশ বুঝতে পারছিলাম যে দেশে যেটুকু বিজ্ঞান চর্চা হচ্ছে—তা সে যতই সামান্য হোক না কেন—তার খবর রাখা দরকার, সে সম্পর্কেও বিশ্লেষণ দরকার। নইলে শুধু অন্যদের কীর্তিকলাপ মুগ্ধ নয়নে দেখেই আমাদেরকে খুশি থাকতে হবে, বিজ্ঞান সাময়িকীর আসল উদ্দেশ্য সফল হবেনা। কাজটি ছিল আমাদের জন্য খুব কঠিন। যারা বিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রগুলোর কাছাকাছি রয়েছেন তাঁদের সাহায্য নেবার চেষ্টা করলাম—বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অন্যত্র। ইউনূস ভাইয়ের বন্ধুদের সুবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে—সলিমুল্লাহ হলে, কার্জন হলে অনেক গুণী মানুষের আমি স্নেহধন্য ছিলাম। আহসান ভাই (যিনি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র থাকার সময় আমাকে লাইব্রেরির সুযোগ করে দিয়েছিলেন), এখলাস ভাই (যিনি আমি স্কুলে থাকতেই বড় বিজ্ঞান আসরের সন্ধান দিয়েছেন) তাঁরা দেশের বিজ্ঞান চর্চার খবর রাখতেন। এমন অগ্রবর্তীদের কিছু কিছু লেখা পেতে থাকলাম। যেমন সেই ১৯৬১ এর ফেব্রুয়ারি সংখ্যাতেই আমরা ছাপাতে পারলাম ত্রয়োদশ পাকিস্তান বিজ্ঞান সম্মেলনের একটি বিবরণী যা তাঁরা লিখে পাঠালেন, দেশের ঘটমান বিজ্ঞান গবেষণাগুলোর ওপর যেসব প্রবন্ধ পাঠ করা হয়েছিলো তার ভিত্তিতে।

দেশের গুণী বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে তাঁদের নিজেদের মৌলিক আবিষ্কার নিয়ে ঠিক যে ধরনের লেখা আশা করেছিলাম, তা বেশ প্রথম দিক থেকেই ধারাবাহিক ভাবে পেয়ে গেলাম একজন প্রবীণ এবং বিদগ্ধ গণিতবিদের কাছ

থেকে। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিতের অধ্যাপক আজিজুর রহমান খলিফা। এই একটি ক্ষেত্রে অন্তত আমরা লেখককে খুঁজে নিলামনা, তিনিই আমাদেরকে খুঁজে নিলেন। তিনি চিঠি লিখলেন 'প্রিয় সম্পাদক সাহেব' এই সম্বোধন করে। আমিও চিঠিতে কখনো বলার চেষ্টা করিনি যে এ পত্রিকার পেছনের মানুষটি আসলে ইন্টারমিডিয়েটের ছাত্র মাত্র। তিনি 'গণিত সহজ না কঠিন' এই শিরোনামে তাঁর চমৎকার কিছু মৌলিক অবদান নিয়ে লিখতে লাগলেন—যা সাধারণ ছাত্রকে গণিতের এক একটি বিষয় বিভিন্ন ভাবে দেখার সুযোগ করে দেয়। 'খলিফা মেথড' নামে তাঁর তত্ত্ব গণিতের ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই সুপরিচিত ছিল। দুবছর পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর ছাত্র হবার আগে পর্যন্ত তিনি বুঝতে পারেননি যে কোন বয়সের সম্পাদকের সঙ্গে তিনি এত দিন পত্রালাপ করে এসেছেন। এরপর তাঁর উৎসাহ বরং আরো বেড়ে গিয়েছিলো।

কৃতী বিজ্ঞানীদের কারো কারো লেখা আমরা সরাসরি পুনর্মুদ্রণ অথবা অনুবাদ করে ছাপাতে পেরেছি। আবদুস সালামের সেই বিখ্যাত প্রবন্ধ দিয়ে শুরু করে পরে তাঁর নিজের গবেষণার বিষয়ে কিছু কিছু লেখা এভাবে তখন ছাপাতে পেরেছি। তাঁর ব্যাপারটিই আলাদা—কারণ তিনি নিজে বিশ্বাস করতেন বিষয় যত কঠিন হোক না কেন সাধারণ পাঠকের বোঝার মত করে সেটির পরিবেশন সম্ভব; আর একাজে সব চেয়ে দক্ষ ছিলেন তিনি নিজে। অতীতের কৃতী বিজ্ঞানীদের কিছু কিছু লেখা বা তার অংশ ছাপাবার জন্য সংগ্রহ করলাম পুরোনো বই ঘেঁটে। এজন্য 'বিজ্ঞান-গুরুদের লেখা থেকে' নামে একটি নতুন ফিচার প্রবর্তন করলাম। তাতে দুনিয়াময় বিজ্ঞান-গুরুদের মূল ক্লাসিক লেখা থেকে যেমন অনুবাদ করে প্রকাশ করতাম তেমনি আমাদের যাঁরা বিশ্ব-বিজ্ঞানে অবদান রেখেছেন—সত্যেন্দ্রনাথ বসু, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, সি ভি রমন তাঁদের লেখা থেকেও। এসব লেখা থেকে স্বল্প দৈর্ঘের উদ্বৃতির জন্য পাদ-পূরক হিসেবেও অন্য লেখার নিচে এগুলো ব্যবহার করতাম। এ ভাবে আধুনিক বিশ্ববিজ্ঞানের সঙ্গে দেশের বর্তমান ও অতীত বিজ্ঞান চর্চাগুলো তুলে ধরার কিছু সুযোগ বিজ্ঞান সাময়িকী সৃষ্টি করতে পেরেছিলো। তবে দেশ বিদেশ নির্বিশেষে দৈনন্দিন ঘটমান বিজ্ঞানের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, একে বোঝার চেষ্টা এবং এ নিয়ে ভাবনাটাই ছিল অধিকাংশ লেখার উদ্দেশ্য।

লেখার জন্য ম্যাগাজিন ইত্যাদি যোগাড় করতে গিয়েই বিজ্ঞান সাময়িকীর পক্ষ থেকে আমার প্রথম 'ভিক্ষাপত্র' লেখার অভ্যাস। পরে এই কাজে বেশ দক্ষ হয়ে পড়েছিলাম দূতাবাস, তথ্যকেন্দ্র, বিজ্ঞাপনদাতা, অনুদানদাতা এরকম নানা প্রতিষ্ঠানের বরাবরে নানা রকম ভিক্ষাপত্র লিখতে গিয়ে। পত্রিকাকে চালু রাখার অন্য রসদ অর্থাৎ অর্থের যোগাড়ে এটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজনীয় ছিল। অর্থের বড় অংশটি আসতো বিজ্ঞাপন থেকে; তবে পত্রিকা বিক্রয় এবং গ্রাহক চাঁদা থেকেও কিছু আসতো। কিন্তু পাঠকের সংখ্যা বাড়াবার জন্য অর্থমূল্য ব্যয়ের চেয়ে

কম রাখতে হতো, নইলে খুব উৎসাহীরা ছাড়া বাকি পাঠকদেরকে হয়তো হারাতে হতো। কাজেই ঘুরে ফিরে বিজ্ঞাপনই বড় ভরসা। কিছু বিজ্ঞাপন মোটামুটি নিয়মিত ভাবে পেয়েছি—অন্তত প্রথম দিকে। এর সবই বন্ধুদের কল্যাণে, তাদেরই পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের—যে সব ব্যবসা বিজ্ঞাপন দানের উপযুক্ত ছিল। মনসুরদের মির্জাবু কোম্পানির কথা আগেই বলেছি। এমনি আর একটির ওপর ভরসা রাখতে পারতাম—চট্টগ্রামের বেশ খ্যাত আল করিম পেইন্টস; করিম সাহেবের মেয়ে আমার সহপাঠীনী ছিল। 'চট্টগ্রাম বোর্ডিঙের' মালিক খুবই সংস্কৃতি-মনা মানুষ ছিলেন, এবং এই সুবাদে, সবার সার্বজনীন 'চাচা'। আমিও তাঁর সাংস্কৃতিক আড্ডায় বিজ্ঞান সাময়িকীকে নিয়ে গেলাম, গোড়ার দিকে নিয়মিত কিছুদিন একটি বিজ্ঞাপনও পেলাম।

তবে শিগ্‌গীর বোঝা গেল ক্রমে নতুন নতুন জায়গা থেকে বিজ্ঞাপনের চেষ্টা করে যেতে হবে—এটি আমার একটি নিয়মিত কাজে পরিণত হলো। একদিনের কথা মনে করে খুব হাসি পায়। ও সময় আমাদের একটি পারিবারিক গাড়ি কেনা হয়েছিলো। মা, টুনু সবাইকে নিয়ে আব্বা ইতোমধ্যে নিরিবিলিতে চলে এসেছিলেন। তাই আব্বাকে বক্সীর হাটে আনা নেয়ার জন্যই প্রধানত লাগতো গাড়িটি। আমার বিজ্ঞাপন-অভিযানগুলোতে দূরে দূরে যেতে হতো বলে মাঝে মাঝে গাড়িটি ব্যবহার করতাম। এ গাড়ির ড্রাইভার ছিলেন একটু বয়স্ক একজন মজার মানুষ—একসময় অল্প বয়সে আমার ফোররখ মিয়া দাদার ভাড়ার গাড়ি চালাতেন; আমরা তাঁকে মামা-ড্রাইভার বলতাম। সেদিন এমনি বিজ্ঞাপন অভিযানে কয়েকজন মিলে এ গাড়িতে বের হয়েছি—এই কোম্পানি ওই কোম্পানিতে ঢুঁ দিয়েছি (কেউ কেউ বিজ্ঞাপন দিলেও অনেকবার ঘুরিয়ে তারপর দিতো)। এসব নিয়ে নানা আশা-নিরাশা-হতাশার কথা নিজেদের মধ্যে বলে চলেছি। মামা ড্রাইভার এক পর্যায়ে বল্‌লেন—'ভাগিনা, তোমাদের ব্যবসাটি যে কী তা জানিনা, তবে যে ভাবে তোমরা লেগে রয়েছো, তাতে একদিন না একদিন ব্যবসায় সফল হবেই, হাল ছেড়ে দিওনা'।

আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে, বিজ্ঞান সাময়িকীর অর্থায়নের একটি বিকল্প সম্ভাবনা দাঁড়িয়ে গেল, যাতে বিজ্ঞাপনের উপর আর এতখানি নির্ভর করতে হলোনা। আমাদের কাছের মানুষদের মধ্যেই কতজন যে অত্যন্ত আদর ও উৎসাহের সঙ্গে বিজ্ঞান সাময়িকীকে গ্রহণ করেছিলেন তা আমি নিজেই শুরুতে ওভাবে উপলব্ধি করতে পারিনি। কলেজে বাংলা বিভাগের আমাদের প্রিয় শিক্ষক অধ্যাপক আহমদ হোসেন হঠাৎ করে সচিব হিসেবে ঢাকায় বাংলা একাডেমিতে বদলি হয়ে গেলেন। তিনি আমাদেরকে মাইকেল মধুসূধন দত্তের জীবনের ওপর লেখা একটি নাটক পড়াতেন; তাঁর চমৎকার পরিবেশনায় যা আমাদেরকে নিয়ে যেতো অন্য এক কালের অন্য এক কবির অদ্ভুত এক সৃজনশীলতার নেশার রাজ্যে। আমার বিজ্ঞান সাময়িকী উদ্যোগটিকে তিনি অত্যন্ত প্রশংসার চোখে

দেখতেন। যাবার সময় নিজেই বল্‌লেন তাঁকে একটি চিঠি দিতে যাতে বাংলা একাডেমি এর অর্থ সাহায্যে এগিয়ে আসে। প্রধানত তাঁর চেষ্টাতেই বিজ্ঞান সাময়িকী বাংলা একাডেমি থেকে একটি ছোট কিন্তু নিয়মিত অনুদান লাভ করেছিলো—যার ফলে আর্থিক দিক থেকে একটি ন্যূনতম সম্বলের ওপর আমরা নির্ভর করতে পেরেছি। একই রকম ব্যক্তিগত উৎসাহে পরে টেক্সবুক বোর্ড এবং আরো পরে ইউনিসেফের শিক্ষা বিভাগ থেকে এমন অনুদান বিজ্ঞান সাময়িকী বিভিন্ন সময়ে পেয়েছে। সরাসরি বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত নন এমন সব চিন্তাশীল মানুষের সমর্থন এভাবে পেয়েছি বলেই বিজ্ঞান সাময়িকী এত দিন ধরে তার প্রকাশনা অব্যাহত রেখে সত্যি সত্যি একটি বিজ্ঞান আন্দোলনের কাজ করতে পেরেছিলো, নিতে পেরেছিলো বিভিন্ন রকম উদ্যোগ।

ব্যয় সংকোচ এবং কোর্টের সমন

আয়ের সংস্থানটি যেমন জরুরি ছিল, বিজ্ঞান সাময়িকীর নিয়মিত প্রকাশনার জন্য ব্যয় সংকোচেরও চেষ্টা করতে হলো। লক্ষ্য করলাম প্রেসে গিয়ে এতটা সময় কম্পোজিটারের সঙ্গে কাটাতে হচ্ছে—বার বার প্রুফ দেখে এবং নানা নির্দেশনা দিয়ে; একই সঙ্গে প্রেসের বিলটিও বেশ বড় হচ্ছে। যদি মেশিনে দেবার আগের কাজগুলো সব বাসা থেকে নিজেই করে দিতে পারি তা হলে সময় ও খরচ উভয়েরই সাশ্রয় হয়। প্রেস কর্তৃপক্ষ বলছিলেন তাঁদেরকে যদি পৃষ্ঠার 'ম্যাটারগুলো' (সীসার টাইপ বিন্যাসে তৈরি ছাপ দেবার জিনিস) দিয়ে দিই, তা হলে ছাপার খরচ অল্পই হবে। ঠিক করলাম এক একটি সংখ্যা বিজ্ঞান সাময়িকী ছাপাতে যে পরিমাণ টাইপ লাগতে পারে তা কিনে ফেল্‌বো, সেই সঙ্গে বিভিন্ন টাইপ বিভিন্ন খোপে রাখার জন্য যে কাঠের 'কেইস' তাও কিনবো। নিরিবিলির খালি গ্যারেজে এগুলো বসানো হবে, এক জন কম্পোজিটর সুবিধামত সময়ে এসে কাজ করবেন। ঠিক এমন ব্যবস্থাই করলাম।

সেই আমলে সব জায়গায় ছোট বড় অনেক প্রেস ছিল, সবই সনাতন 'লেটার প্রেস'—তাই টাইপ, কেইস, এসব সরবরাহের কিছু কোম্পানি ছিল। কাগজের পুটলিতে এক পুটলিতে 'ক' কতগুলো, 'খ' কতগুলো বা বিভিন্ন যুক্তাক্ষর, র'ফলা, য'ফলা ইত্যাদির কোনটির কতগুলো লাগবে তার একটি হিসেব তাদের জানা ছিল। সেই হিসেবে প্রয়োজনীয় টাইপ কিনে ফেল্‌লাম—যার মধ্যে নানা সাইজের হেডিং টাইপ, আবার বেশি ছোট সাইজের টাইপও থাকলো (বড়গুলো ১৬ পয়েন্ট, ১৮ পয়েন্ট ইত্যাদি আর ছোটগুলো ৮ পয়েন্ট, ১০ পয়েন্ট ইত্যাদি)। একজন কম্পোজিটর আসতেন বিকেলে বা রাতে—তাঁর নিয়মিত চাকরির পর। তাঁর সঙ্গে বসে বাসাতেই সব কাজ সারতে পারলাম এখন। আনাড়ি ভাবে কেনার কারণে প্রায়ই টাইপ সংকট দেখা দিত। হঠাৎ দেখা গেল যে কিছু 'পরীক্ষা' শর্ট পড়েছে; অর্থাৎ আমাদের টাইপের ভান্ডারে 'ক্ষ' আর নেই। বলার সুবিধার জন্য 'ক্ষ' কে

'পরীক্ষা', 'স্ক' কে 'পরিস্কার' এমনি ভাবে বলা হতো। এরকম টাইপ শর্ট পড়লে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ভাবে লেখাটিই একটু বদলে নিতাম। যেমন এই বিশেষ ক্ষেত্রে 'ক্ষ' বর্জিত শব্দ ব্যবহারের চেষ্টা করতাম, তবে পরে আরো কিছু 'পরীক্ষা' কিনে নিয়ে আনতে বলতাম কম্পোজিটারকেই।

দুই স্তরে কম্পোজিটরের সামনে, ডানে ও বামে এসব যাবতীয় অক্ষরের খোপগুলো কাঠের 'কেইসে' থাকতো—উপরের কেইসগুলো একটু ঢালু খাড়া ভাবে থাকতো, এদের বলা হতো 'আপার কেইস', আর নিচের কেইসগুলো প্রায় বিছানো অবস্থায় থাকতো, বলা হতো 'লোয়ার কেইস'। ইংরেজির ক্ষেত্রে আপার কেইসে বড় হাতের এবং লোয়ার কেইসে ছোট হাতের অক্ষর থাকতো বলে, ওই সীসার টাইপ কম্পোজের পুরো ব্যাপারটিই পরে চুকেবুকে গেলেও এখন অবধি বড় হাতের টাইপকে আপার কেইস, আর ছোট হাতের টাইপকে লোয়ার কেইস টাইপ বলা হয়। কম্পোজিটর না দেখে অন্ধ ভাবেই প্রত্যেকটি টাইপ যথাযথ খোপ থেকে নিয়ে নিতে পারতেন অত্যন্ত দ্রুত; আর কাজ ফুরিয়ে গেলে 'ম্যাটার' ভেঙ্গে প্রত্যেকটিকে সঠিক খোপে একই দ্রুততায় রেখেও দিতে পারতেন; অবশ্য সেক্ষেত্রে উল্টো ছাপের সীসার অক্ষর পড়ে পড়ে রাখতে হতো। এসবই ছিল তাঁর ট্রেনিং। ঠিক এই কাজের জন্য না হলেও ছাপার জগতে অনেক ট্রেনিং আমার নিজেরও হয়ে গেল, বিশেষ করে কাজগুলো বাসায় হবার কারণে। ভাগ্যক্রমে এ সময় কলকাতায় প্রকাশিত চমৎকার একটি চটি বই পেয়ে গেলাম, যার নাম 'আমরাও হতে পারি মুদ্রণ বিশারদ'। দারুণ বই, খুব রসিয়ে রসিয়ে লেখা; পাতায় পাতায় ছবি, আর ছাপার বিভিন্ন পর্যায়ে ভাল কাজ আর বাজে কাজের উদাহরণ একেবারে ছাপিয়েই হাতে নাতে তুলে ধরা—যেমন বাজে ভাবে প্রুফ দেখা, বাজে ভাবে পৃষ্ঠা বিন্যাস ইত্যাদি। ছোট্ট এই একটি বই থেকে প্রকাশনার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মজা করে এত কিছু শিখতে পেরেছি যা সচরাচর হবার কথা নয়। আর এই শেখাটি সারা জীবন কাজে লেগেছে, কারণ এই কাজটির সঙ্গে সারা জীবনই জড়িত আছি।

ব্যয় সংকোচের আর একটি ছোট ক্ষেত্র আবিষ্কার করলাম, তা হলো পোস্ট অফিসের সহায়তা নিয়ে পত্রিকা পাঠাতে খুব কম ডাক মাশুল দেয়া। আসলে পোস্ট অফিস ছিল তখন বিজ্ঞান সাময়িকীর অনেক কাজের সহায়। পত্রিকার মধ্যেই গ্রাহক হবার নিয়মে লেখা থাকতো বার্ষিক গ্রাহক চাঁদাটি মানি অর্ডার যোগে পাঠিয়ে দিতে। মানি অর্ডারের ফরমের তলায় একটু খানি অংশ থাকতো সেটি টাকার সঙ্গে আমরা রেখে দিতে পারতাম। ওতে গ্রাহক লিখে দিতেন কোন ঠিকানায় পত্রিকা পাঠাতে হবে, এবং তাঁর আরো কোন বক্তব্য থাকলে তাও সেখানে চিঠির আকারে লেখা যেতো। আমাদের কাজ হলো ফরমের ওই অংশগুলো সংরক্ষণ করা এবং সেই অনুযায়ী নাম ঠিকানা গ্রাহক তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা। একটি পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন করিয়েছিলাম, সেই রেজিস্ট্রেশন

নম্বরটি ব্যবহার করলে খুব কম ডাক মাশুলে গ্রাহককে পত্রিকা পাঠাতে পারতাম। দেশের নানা জায়গায় বই-ম্যাগাজিনের দোকানে সাময়িকী পাঠাবার জন্য ভিপিপি ব্যবস্থাটি খুব কাজে আসতো। ভিপিপি মানে হলো ভ্যালু পেয়েবল পোস্ট, অর্থাৎ প্যাকেটের সব পত্রিকার যে দাম সেটি ডাক পিয়নের কাছেই প্রাপক মিটিয়ে দিলে তবে তাঁকে সেই প্যাকেট দেয়া হতো। টাকাটি পোস্ট অফিস থেকে আমাদেরকে পৌঁছিয়ে দেয়া হতো। এভাবে পোস্ট অফিসের সঙ্গে একটি নিত্য সম্পর্ক তৈরি হয়েছিলো। প্রায় প্রতিদিন কিছু না কিছু গ্রাহক মানি অর্ডার, ভিপিপি'র টাকা, লেখা, প্রশ্ন ইত্যাদি নিয়ে ডাক পিয়ন আসতো। এগুলো বুঝে নেয়া, সামাল দেয়া—এসবও একটি কাজ ছিল। প্রথম দিকে যখন বক্সীর হাটই ঠিকানা ছিল সেখানে আমাদের দোকানের লোকজনই তা নিয়ে যত্ন করে রাখতো পরে আমাকে দেয়ার জন্য। আবার প্রত্যেকবার বিজ্ঞান সাময়িকী বের হবার পর হাতে ঠিকানা লিখে বিশেষ ভাবে মুদ্রিত কাগজে প্রত্যেক গ্রাহকের কপি মুড়িয়ে সবগুলো এক সঙ্গে পোস্ট অফিসে দিয়ে আসতে হতো। তাছাড়া গ্রাহকদের, পাঠকদের চিঠিপত্রের জবাব দেবার ব্যাপারটি তো ছিলই। এজন্য পরে আলাদা পোস্ট কার্ড ছাপিয়ে নিয়েছিলাম বিজ্ঞান সাময়িকীর লোগো ইত্যাদি সহ।

মার্শাল ল'র কড়া শাসন কালে পত্রিকার ডিক্লেয়ারেশনটি তাড়াতাড়ি নিয়ে নেয়া জরুরি ছিল। তাই দু'এক সংখ্যা বের করেই চট্টগ্রামের জেলা ম্যাজিস্টেটের কাছে দরখাস্ত করেছিলাম। এর জন্য নির্ধারিত ফরমে যেখানে জিজ্ঞেস করা হয়েছে পত্রিকার আর্থিক ভিত্তি কী, সেখানে জটিলতা এড়াতে সোজা উত্তর দিয়েছি আমার আব্বা হাজী দুলা মিয়া সওদাগর এর প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিবেন। এজন্য আব্বাকে সব কিছু বুঝিয়ে বলতে হয়েছে, নিশ্চিত করতে হয়েছে যে এ জন্য কোন ঝামেলা পোহাতে হবেনা। সেই ভাবে ডিক্লেয়ারেশনও যথারীতি পেয়ে গিয়েছি—কারণ বিজ্ঞান পত্রিকা হিসেবে এখানেও বিজ্ঞান সাময়িকী সবার কাছে অভিনন্দিত হয়েছে। এটি হাতে পাওয়ায় পোস্টাল রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি সহজে পেতে আর কোন অসুবিধা হয়নি। মুদ্রণকারী প্রেসের নাম হিসেবে তখনকার ক্রিসেন্ট প্রেস ছাড়াও আরো কিছু সম্ভাব্য প্রেস উল্লেখ করেছিলাম।

এদিকে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের অফিসে এক প্রেস ক্লার্ক যার মাধ্যমে ডিক্লেয়ারেশনের কাগজপত্র গিয়েছে আব্বাকে চিনতেন এবং তাঁর নাম এখানে লক্ষ্য করলেন। এই ক্লার্ক ভাবলেন যে হাজী সাহেব তো এই জগতের মানুষই নন্, তাঁকে যদি গিয়ে বলি যে এরকম পত্রিকার কাজে গিয়ে এই মার্শাল ল'র সময় ছেলে একটি বড় বিপদে পড়তে যাচ্ছে, আর সে বিপদ থেকে এই প্রেস ক্লার্কই শুধু রক্ষা করতে পারবেন, তা হলে হয়তো তাঁর কাছ থেকে একটি মোটা ঘুষ পাওয়া যেতে পারে। আব্বাকে গিয়ে তিনি সেভাবে বোঝালেন। আমি অবশ্য আব্বাকে আশ্বস্ত করেছিলাম যে ওই লোকের এসব কথায় কান দেয়ার কোন প্রয়োজন নেই। সেই প্রেস ক্লার্ক তখন খেপে গিয়ে একটি অদ্ভুত মামলা ঠুকে

দিলো আমার নামে। এর প্রতিপাদ্য ছিল যে বিজ্ঞান সাময়কীর নাম করে আমি একটি রাষ্ট্র বিরোধী কাজের জন্য অবৈধ একটি প্রেস চালাচ্ছি। তিনি ভেবেছিলেন যে এই মামলা সবাইকে ভয় পাইয়ে দেবে এবং তাঁর উদ্দেশ্য হাসিল হবে। মামলাটি নিজের গতিতে চলে নোটিশ ইত্যাদি আমার নামে জারি হলো। ঢাকায় ইউনূস ভাই বিশ্ববিদ্যালয়ের তুখোড় ছাত্র শাহেদ লতিফের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন। মেধাবী ছাত্র হিসেবে শুধু নয় ছাত্র ইউনিয়নের বাগ্মী নেতা হিসেবেও শাহেদ লতিফ ভাই খুব পরিচিত ছিলেন (পরে আমার বিশ্ববিদ্যালয় কালের শুরুতেও তাঁর জোরালো ইংরেজি বক্তৃতা শুনেছি)। তাঁর বড় ভাই সে সময় চট্টগ্রামের অ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। বিষয়টি ওভাবে অ্যাডিশন্যাল ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের গোচরে এলো এবং তিনি কাগজপত্র দেখে চট্ করে পুরো ব্যাপারটি ধরে ফেল্লেন। ওভাবেই একদিন মামলাটি মহকুমা হাকিমের কোর্টে উঠলো এবং সেখানে আমি উকিল সহ হাজিরা দিলাম। সেই পরির পাহাড়ের উপর বৃটিশ স্থাপত্যের বিশাল চট্টগ্রাম কোর্ট বিল্ডিং যেখানে আমার শৈশব থেকে অনেক সময় কেটেছে। কিন্তু এই আমার প্রথম সত্যি সত্যি বিচারিক কোর্ট দর্শন এবং লাল সালুর আওতায় যাওয়া। কয়েকটি মামলা নিস্পত্তির পর আমারটি উত্থাপিত হলো—'সরকার বনাম বিজ্ঞান সাময়িকী'। বেশি দূর এগোবার আগেই সরকার পক্ষ বল্লো অভিযোগ তারা প্রত্যাহার করে নিচ্ছে—কাজেই মামলা ডিসমিস। শুনেছি পরে ওই প্রেস ক্লার্ককে বরখাস্ত করা হয়েছিলো দুর্নীতির দায়ে। এভাবে এক্কেবারে শুরুতেই বিজ্ঞান সাময়িকী নিয়ে অভিজ্ঞতাগুলো কোনো দিক থেকে বাকি রইলোনা।

পদার্থবিদ্যার আকর্ষণ

উৎসাহ জাগানিয়া বই

আমি যখন ইংল্যান্ডে সাউদাম্পটন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম আসি, তখন আমার পিএইচডি সুপারভাইজার ব্রায়ান হপকিন্স একটি কথা বলেছিলেন যা খুব মনে পড়ে। তিনি বলেছিলেন 'এখন ক্রমে শীত তীব্র হবে; ক্রমাগত মেঘলা আকাশ, বৃষ্টি ও কনকনে তীব্র শীতল বাতাসে এবং এখানকার চালচলনে তোমাদের সঙ্গে বৈপরীত্য হয়তো তোমার মন খারাপ করতে চাইবে। কিন্তু একটা বিষয়ে তুমি অন্যান্য আগন্তুকদের থেকে ভাল থাকবে, সেটি হলো ফিজিক্সের নিরবচ্ছিন্নতা। তুমি আগেও যে ফিজিক্সের আবহে ছিলে এখানেও সেই একই ফিজিক্সের আবহে তোমার অধিকাংশ সময় কাটবে—কাজেই তেমন কোন পরিবর্তন দেখবেনা'। কথাটি নিয়ে পরে যখন ভেবেছি তখন সত্যিই মনে হয়েছে এই নিরবচ্ছিন্নতাটি শুধু সেদিনের নয়। আমার মধ্যে অনেক আগে থেকেই তো এই পদার্থবিদ্যা কোন না কোন ভাবে বেশ রহস্যময় হয়ে বাস করে আসছে—ঐ সেই ছোট বেলা থেকে। ফুল-ফল-চারা, পোকামাকড় এসব প্রাকৃতিক বিষয়ে স্বাভাবিক ভাবে চমৎকৃত হওয়া অবশ্যই ছিল, কিন্তু বৈজ্ঞানিক রহস্য বলতে যা বোঝায় তার অনেকটাই এনে দিয়েছিলো 'অ্যাটম', 'রকেট', 'বিদ্যুৎ', 'রেডিয়ো' ইত্যাদি—অর্থাৎ বলতে গেলে তখন রহস্যময় বিজ্ঞান বলতে বুঝেছি পদার্থবিদ্যাকে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময় জাহাজের উপর ভ্রাম্যমাণ যে 'অ্যাটম ফর পীস' প্রদর্শনী দেখেছিলাম তার পর থেকেই অণু-পরমাণু সম্পর্কে যেখানে যা পেয়েছি পড়ার চেষ্টা করেছি। সপ্তম অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমার কিছু যন্ত্রপাতি তৈরির কথা আগে বলেছি। কিন্তু তারও আগে আমি বইয়ের ছবি দেখে কাদা দিয়ে নিউক্লিয়ার ফিশনের মডেল তৈরি করেছি; ছোট ছোট কাদার তৈরি পুঁতির মত দানার কোন কোনটিকে লাল রঙ দিয়ে প্রোটন এবং কালো রঙ দিয়ে নিউট্রন বুঝিয়ে সেগুলোর একত্র সমাহারে ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াস তৈরি করেছি।

পুরোটাকে একটি কাঠের উপর খাড়া করা পেরেকের উপর সাজিয়েছি। এর পরেই আরেকটা পেরেকের উপর দেখা যাচ্ছে ইউরেনিয়াম ভেঙ্গে অন্য দুটি মৌলিক পদার্থের নিউক্লিয়াস তৈরি হয়েছে একটি নিউট্রন এতে এসে আঘাত করার ফলে। রঙ করা কাদার পুঁতিগুলোর উপর স্বচ্ছ আঠার বার্ণিশ লাগিয়ে চকচকে করে তুলেছিলাম—খুব সুন্দর লাগছিলো। এসব কোথাও দেখানো হয়নি, নেহাত নিজে বুঝে নেবার জন্য, আনন্দ পাওয়ার জন্য করা। বাসার সবাই শুধু কৌতূহল ভরে এগুলো দেখতো; বড়দা মজা করে বলতেন 'রকেট তো পুরোনো জিনিস, দেখো ও বানাবে বকেট!'

স্কুলে এবং পরে কলেজে ছাত্র থাকা কালে ধাপে ধাপে গোড়া থেকে না এগিয়েও পদার্থবিদ্যার সঙ্গে এক রকম পরিচিতি ঘটেছে এ বিষয়ে বিভিন্ন রকমের বই পড়ার মাধ্যমে। সেদিক থেকে অনেক ক্ষেত্রে এর অ আ ক খ বুঝে উঠতে পারার আগেই তার একেবারে সর্বশেষ কিছু ধ্যান ধারণার কথা জানতে পেরেছিলাম। ওই আনুষ্ঠানিক অ আ ক খ এলো কলেজের পাঠ্য বইয়ে—সেই বোস অ্যান্ড চ্যাটার্জি থেকে। এখানে এসে অবশ্য পদার্থবিদ্যা হয়ে পড়ে বেশ কিছুটা বীজ গণিতের মত আর জ্যামিতির মত। কিছু পরে সেটি হয়ে পড়েছিলো অনেকখানিই ক্যালকুলাসের মত এবং গণিতের আরো বিভিন্ন উচ্চতর বিষয়ের মত। ওই গণিতের মধ্যে মূল বিষয়টির খেই হারিয়ে ফেল্‌লে আমি খুব অসহায় বোধ করতাম। বন্ধুরা অনেকে দেখতাম ওই গাণিতিক হিসেবগুলো ঠিক মতো করে ও বুঝে নিয়ে তৃপ্ত থাকতো—হয়তো তারা গণিতের ভেতর দিয়েই পুরো জিনিসটি স্বচ্ছ ভাবে দেখতে পেতো। আমি কিন্তু সব ক্ষেত্রে তা পেতামনা, ওর মধ্যে মূল পদার্থবিদ্যাকে খোঁজার চেষ্টা করতাম, না পেলে মন খুব খারাপ হয়ে যেতো। পরে দেশে বিদেশে আলোচনায়, কনফারেন্সে বড় বড় পদার্থবিদকে বলতে শুনেছি 'এর মধ্যে ফিজিক্সটা কোথায়?' এরকম একই কথা তাঁরাও বলছেন শুনে আমি খুব সান্ত্বনা পেতাম। অবশ্য কলেজে বোস অ্যান্ড চ্যাটার্জির আমলে এই অসুবিধাটি বিশেষ হতোনা। এমন সনাতন পাঠ্য বইয়েরও কিছু কিছু সাধারণ জিনিসে খুব চমৎকৃত হতাম, বেশি স্পষ্ট ডায়াগ্রাম ইত্যাদি না থাকা সত্ত্বেও। যেমন বলের সামন্তরিকের মাধ্যমে যখন বুঝলাম একটি নৌকা যেদিকে যেতে চায় প্রায় সেদিক থেকেই বাতাস প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও কীভাবে নৌকার পালকে এমন তেরচা ভাবে ব্যবহার করা যায় যে ওই বাতাসের বলের একাংশকে তার প্রায় বিপরীত দিকে যাওয়ার কাজে লাগানো যায়—খুব ভাল লেগেছিলো।

এভাবে পাঠ্যবই অনুসরণ করার বহু আগেই পদার্থবিদ্যার সর্বশেষ চমকপ্রদ আবিষ্কারগুলোর মর্ম যেখান থেকে যতটুকু পেরেছি বোঝার চেষ্টা করেছি। এটি করেছি খুব উৎসাহ-জাগানিয়া কিছু বইয়ের সাহায্যে। এমনি একটি বই বাংলায় পড়েছি প্রথমে স্কুলে থাকতে, পরে বিভিন্ন সময় আরো কয়েক বার। প্রত্যেক বার মনে হয়েছে আর একটু ভাল বোঝেছি। এটি হলো স্যার জেমস জীন্সের লেখা

ক্লাসিক জনপ্রিয় বই 'বিশ্ব রহস্য' (দি মিষ্টেরিয়াস ইউনিভার্স)। সব কিছু বোঝা কঠিন হলেও বইটিকে অনবদ্য মনে হতো তার লেখার ভঙ্গির কারণে আর বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্বের কারণে। এটি অনেকদিন আগে ১৯৩০ সালে লেখা—ঐ অগ্রসর বিষয়গুলো যে সময় সবে আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র; আর বিজ্ঞানীরাও তখন বোঝার চেষ্টা করছিলেন সেগুলোর পুরো তাৎপর্য। জেমস্ জীন্স নিজেও সেই বিজ্ঞানীদের পুরোভাগে ছিলেন। তাঁর বইটি পরিণত হয়েছিলো সাধারণ ভাবে আগ্রহীদের উদ্দেশ্যে লেখা একটি বিজ্ঞান ক্লাসিকে। লেখক শুরুতেই প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর 'রিপাবলিক' নামক বইয়ে দেয়া জ্ঞান সম্পর্কে একটি উপমা উদ্ধৃত করেছেন, এবং এটিকে বার বার প্রাসঙ্গিক ভাবে এনেছেন। এতে মানুষ হলো শেকলে আষ্টেপৃষ্ঠে আবদ্ধ, তার মুখ গুহার নিরেট দেয়ালের দিকে। পেছনে প্রজ্জ্বলিত আগুনের সামনে নানা ঘটনা ঘটছে—মানুষ তার শুধু ছায়া গুহার দেয়ালে দেখছে, আসল ঘটনা দেখার সুযোগ তাদের কখনো হবেনা। তাদের অধিকাংশই তাই ছায়াকে আসল ঘটনা মনে করে। শুধু দার্শনিক যাঁরা তাঁরা তাঁদের চিন্তাশক্তি ও উচ্চতর জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে ওই ছায়ার অন্তর্নিহিত আসল ঘটনাকে উদ্ঘাটন করার চেষ্টা করেন—ক্রমাগত চেষ্টা করে সেই অন্তর্নিহিত সত্যের ক্রমে অধিকতর কাছাকাছি যান। এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীই সেই দার্শনিক।

উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে জীন্স সহ কয়েক জন বিজ্ঞানীর শক্তি বিকিরণ তত্ত্বে যে সংকট সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে উদ্ধার পেতে ১৯০০ সালে এসেছিলো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব। তারও পরে বিশের দশকে হাইজেন-বার্গ ও শ্রোয়েডিঙ্গার প্রমুখরা একে পরিণত করেছেন পূর্ণাঙ্গ একটি কোয়ান্টাম মেকানিক্সে (কোয়ান্টাম বলবিদ্যা)। এর মধ্যে আইনস্টাইন দিয়েছেন যুগান্তকারী আর একটি তত্ত্ব—আপেক্ষিক তত্ত্ব। মানুষের সাধারণ ধারণার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তো বটেই এমন কি প্রচলিত চিরায়ত পদার্থবিদ্যার ধারণার তুলনায়ও এরা অত্যন্ত বৈপ্লবিক। জীন্স এগুলো বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিক তত্ত্বের (জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভিটি) আলোকে তিনি ব্যাখ্যা করেছেন সব চেয়ে শক্তিশালী মাউন্ট উইলসন দূরবীক্ষণ থেকে সদ্য আবিষ্কৃত মহাবিশ্বের নানা বিষয়কে—যেমন একটি তারার জন্ম, বার্ধক্য ও মৃত্যু। অন্য দিকে ইলেকট্রন কণাকে যদি খুব সরু জায়গা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় তা হলে সেটি আলোর মতই বেঁকে গতিপথ বদলায় এই চিত্র দেখিয়ে কোয়ান্টাম তত্ত্বে একই জিনিসের তরঙ্গ ধর্ম ও কণিকা ধর্ম উভয়েই থাকার মত অদ্ভুত কথাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আপেক্ষিক তত্ত্ব কী ভাবে বহুদিন প্রচলিত ইথারের ধারণাকে নাকচ করছে তাও জীন্সকে খুব ভাবিয়েছে।

আরো কয়েকটি বইতে এরকম সাম্প্রতিক বৈপ্লবিক বিষয়গুলোকে পড়ে কিছু বুঝেছি বলে মনে হয়েছে—এগুলো ইংরেজিতে। বার্ট্রান্ড রাসেলের ১৯২৫ সালে লিখিত 'এ বি সি অফ রিলেটিভিটি' বইটি কঠিন বিষয়কে যথেষ্ট প্রাঞ্জল করে

লেখার একটি চমৎকার উদাহরণ। রাসেলকে সবাই দার্শনিক ও আধুনিক জগতজীবন ও রাজনীতিতে বলিষ্ঠ কণ্ঠ হিসেবেই বেশি চেনেন। কিন্তু মূলত তিনি গণিতবিদ, এবং গণিতের খুব মৌলিক অবদানের জন্য খ্যাত। তাঁর এ বি সি অফ রিলেটিভিটি পড়ার সময় আমার মনেই হয়নি যে একজন গণিতবিদ বা একজন দার্শনিকের লেখা পড়ছি—এতই সহজ সরল সেই লেখা। তবে সে সময় আধুনিক পদার্থবিদ্যা নিয়ে যে বই সব চেয়ে বেশি উপভোগ করেছিলাম তা হলো জর্জ গ্যামেয়ের 'ওয়ান, টু, থ্রি—ইনফিনিটি'—১৯৪৭ সালে লেখা। মনে হয়েছিলো রীতিমত বিনোদনের জন্য লেখা এই বই—এতোই রসময় এর বোঝাবার চেষ্টা, এতই সুন্দর এর উপমাগুলো, এমনকি প্রাসঙ্গিক অনেক গল্পও। সঙ্গে রয়েছে কার্টুনের মতো করে আঁাকা ছবি ও ডায়াগ্রাম। বইয়ের নাম যা নিয়ে—সেই গণিতের নাম্বার থিওরি, অসীম সংখ্যা ইত্যাদির বইয়ের প্রথম অংশে খুব মজা করে লেখা হয়েছে। তবে আমার নজর ছিলো এর পরের অংশে বেশি, কারণ ওখানে আছে পরমাণুর গঠন, নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া, তেজস্ক্রিয়তা, কোয়ান্টাম তত্ত্বে অনিশ্চয়তার নীতি, পরম কণিকা ইত্যাদি সব দুর্দান্ত বিষয় যা এভাবে কেউ এত মজা করে বুঝিয়ে দেবে সে ভাবাও যায়না। এই বইতেই প্রথম মহাবিশ্বের প্রসারণ, সৌরজগতের সৃষ্টি সম্পর্কে নতুন তত্ত্বগুলোর কথা জানতে পেরেছি। আসলে গ্যামেয় নিজেও এই তত্ত্বগুলোর কোন কোনটির একজন রূপকার। এরকম তত্ত্বের উপর গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রবন্ধের লেখক ছিলেন হান্স বেথে ও তিনি জর্জ গ্যামেয়। এটি যাতে আলফা বীটা গামা প্রবন্ধ হিসেবে পরিচিত হতে পারে তাই এতে তিনি আরেকজন বিজ্ঞানী আলফারের নাম যোগ করেছিলেন—আলফা বীটা গামা হলো গ্রিক ভাষায় এবিসি। এতই রসিক ছিলেন গ্যামেয়। এসব বইয়ে তত্ত্বগুলো যে ভাবে আছে পরে সে সম্পর্কে কিছু কিছু ধারণায় ছোট বড় অনেক পরিবর্তন এসেছে। বিশেষ করে জেম্‌স জীন্সের বইয়ের ধারণাগুলো পরে আরো অনেক বিস্তৃত হয়েছে, বদলেছে।

কিন্তু এই বইগুলোই এবং সেরকম আরো কয়েকটি বই আমার মনের মধ্যে খুব রেখাপাত করেছিলো। সেটি যতটা না তত্ত্বগুলোর খুঁটিনাটি নিয়ে তার চেয়ে অনেক বেশি আমার মনের মধ্যে আগ্রহের ভিত রচনা করে। মনে হয়েছে বিষয়গুলো চারদিকে সকল অস্তিত্বের জন্য এত মৌলিক যে এগুলো না জানলে, না বুঝলে, জীবনটাই বৃথা। অন্যদিকে জীববিজ্ঞান, এমন কি রসায়নও দৈনন্দিন কৌতূহলের জন্য খুবই আগ্রহ জন্মালেও সেদিনের বইপত্র এমনকি পাঠ্য বইয়ে বা পাঠ্য বস্তুতে ওইগুলো ছিল অনেকটা বর্ণনামূলক—তখন এগুলোকে মৌলিক ভাবে দেখার চেষ্টাটি অন্তত আমি দেখতে পাইনি। পরে আধুনিক জেনেটিক্স, ডি এন এ, বিবর্তন তত্ত্বের চমৎকার ব্যবহার ও বিস্তৃতি, ইত্যাদিও আমাকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করেছে—কিন্তু সেটি অনেক পরের কথা। সেই ছোটবেলা থেকে পদার্থবিদ্যাই শুধু তার নিত্য ধারাবাহিক একটি ভাবনা ও আগ্রহ আমার মধ্যে

বজায় রাখতে পেরেছিলো। হয়তো এটিই পদার্থবিদ্যার সব ছাত্রের কাছে আশা করা হয়—সে যেখানে যে দেশেই থাকুক না কেন। সাউদাম্পটনে ব্রায়ান হপকিন্স এ জন্যই ফিজিক্সের আবহের ওই নিরবচ্ছিন্নতার কথা বলেছিলেন।

১৯৬০ সালের জুন মাসে কলেজে আসার ঠিক পর পর একটি ঘটনা আমাকে বেশ আত্মবিশ্বাস দিয়েছিলো যে আধুনিক পদার্থবিদ্যার আমার যেটুকু সামান্য ধারণা তা নিয়ে বলতে বা লিখতে আমি সক্ষম। পাকিস্তান বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতির পক্ষ থেকে প্রকাশিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার প্রবীণ অধ্যাপক শাহ ফজলুর রহমান সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'বিজ্ঞান বিচিত্রায়' একটি বেশ দীর্ঘ লেখা পাঠিয়েছিলাম 'আপেক্ষিকতার বিশ্বে' এই নামে। এখানে আমি আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্বের বিভিন্ন বিষয়কে আমি যে ভাবে বুঝেছি সে ভাবে খুব সাদামাটা ভাষায় লেখার চেষ্টা করেছি। জীন্স, রাসেল ও এরকম আরো দু'একটি প্রামাণ্য লেখার সঙ্গে মিলিয়ে যথাসাধ্য দেখেছি কোথাও কোন ভুল হলো কিনা। যে পত্রিকায় প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীরাই প্রধানত লিখছিলেন সেখানে আমার লেখাকে হুবহু প্রকাশিত হতে দেখে আমি খুব আশ্বস্ত হয়েছিলাম যে অন্তত আমি যা বুঝছি তা অপাঙক্তেয় নয়। এর কিছুদিন পর 'বিজ্ঞান সাময়িকী' প্রকাশ করতে এটি আমাকে অনেক উৎসাহিত করেছিলো।

গানের আবহে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা

কলেজে বিজ্ঞান নিয়ে এবং পদার্থবিদ্যার চমকপ্রদ সব ভাবনা নিয়ে আমার যত আনন্দ থাকুক, এখানকার বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলে আমাকে প্রথম দু'তিন জনের সঙ্গে পাওয়া গেলনা প্রধানত গণিত আর বিজ্ঞানের বিষয়গুলোরই কারণে। এ নিয়ে আমার যতটা না দুশ্চিন্তা ছিল তার চেয়ে বেশি ছিল আমার শুভানুধ্যায়ী কয়েক জন শিক্ষকের মধ্যে। নানা বিষয়ে আগ্রহ ও কাজের কারণে আমি অনেক শিক্ষকেরই স্নেহধন্য ছিলাম। আশানুরূপ ফলাফল না দেখে তাঁরা ব্যথিত হয়েছেন। তাঁদের সবাই সরাসরি আমার শিক্ষকও ছিলেননা। এমন শিক্ষকদের মধ্যে আমার সবচেয়ে বেশি নৈকট্য ছিল ইতিহাসের অধ্যাপক আলমগীর মোহাম্মদ সিরাজুদ্দীনের (পরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) সঙ্গে। তিনি ইউনূস ভাইয়ের বন্ধু, আমাদের পরিবারেরও ঘনিষ্ঠ। সপ্তম-অষ্টম শ্রেণীতে যখন ইউনূস ভাইয়ের কাছে সলিমুল্লাহ হলে যেতাম অনেক সময় তাঁর রুমেই থেকেছি। আলমগীর ভাই কলেজে অধ্যাপক হয়ে আসার পর স্বভাবতই আমার খোঁজ খবর রাখতেন। আমার খারাপ ফলাফল নিয়ে তিনি তাঁর সহকর্মী আমার সরাসরি শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলেছেন, এবং সে ভাবে আমাকে পরীক্ষার বিষয়ে উপদেশ দিয়েছেন। আমাদের গণিতের অধ্যাপক এই ক্লাসের বীজগণিত বইয়ের প্রণেতা প্রফেসর শরফুদ্দীনও আমাকে প্রায়ই অংকের ব্যাপারে আরো অনুশীলনের পরামর্শ দেন, এবং প্রয়োজনে তিনি সহায়তা করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু আমি যেটুকু পারছিলাম নিজে নিজেই করতে চাইছিলাম।

একেবারে পরীক্ষা-প্রস্তুতির অনুশীলন বলতে যা বোঝায় তা আমি নিজে পূববর্তী পরীক্ষা সমূহের প্রশ্নপত্রের নানা সংকলন এবং সেগুলোর প্রকাশিত মেইড ইজি'র মাধ্যমেই সেরে ফেলতে চাচ্ছিলাম। গ্রুপে গ্রুপে বা ভাল ছাত্রদের কয়েক জন করে অধ্যাপকদের সঙ্গে যে কোচিঙের ব্যবস্থা ছিল তাতে যোগ দেবার মত ইচ্ছে বা সময় আমার ছিলনা। লেখাপড়া ছাড়াও বিজ্ঞান সাময়িকী চালাবার মত একটি সার্বক্ষণিক কাজ তখন আমি নিজের জন্য বরণ করে নিয়েছি। তাছাড়া 'নিরিবিলি' তখন অন্যান্য নানা মজার কাজের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তাতে অংশ নিচ্ছিল বড়দা ছাড়াও আমার ছোট ভাইয়েরা—আইয়ুব, আজম ও জাহাঙ্গীর। ইউনূস ভাইয়ের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জীবন তখন প্রায় শেষ হতে চলছিলো। তিনিও মাঝে মাঝে এসে এসব কাজের নেতৃত্ব দিতেন। নিরিবিলির ব্যস্ততার অনেকখানি ছিল আমাদের টেইপ রেকর্ডার, হোম-মুভি ক্যামেরা ইত্যাদিকে ঘিরে। বন্ধু বান্ধব গায়করা তো বটেই, চট্টগ্রামের পরিচিতি অনেক নামী শিল্পীও আসতেন গান রেকর্ড করতে, প্রায়শ রীতিমত গানের অনুষ্ঠান হয়ে যেতো। হোম-মুভির যে ক্যামেরা ছিল তাও আমাদেরকে ছোট ছোট ফিল্ম তৈরিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। এর মধ্যে বড়দা করাচি ভ্রমণে গিয়েছিলেন—তিনি পুরো ভ্রমণটির উপর একটি মুভি তৈরি করে ফেল্‌লেন। সৃজনশীল ফিল্ম তৈরির চেষ্টাও করেছি আমরা। একটি ফিল্ম বেশ ভাল হয়েছিলো। এর নাম দেয়া হয়েছিলো 'বাঁচার তাগিদে'; এতে চট্টগ্রাম শহরে কত বিচিত্র রকম পেশার মানুষ কাজ করছে, তাদেরকে তুলে ধরা হয়েছে কিছুটা ডকুমেন্টারি ঢঙে, আবার অংশ বিশেষ অভিনয়ের মাধ্যমে। এতে নির্দেশনার, ফটোগ্রাফির, ও সম্পাদনার অনেকখানি করেছিলেন ইউনূস ভাই। শিশুশ্রমের একটি দৃশ্যে জাহাঙ্গীর অভিনয় করেছিলো। আমরা সবাই মিলে কাজ করতাম এরকম এক একটি সৃজনশীল প্রজেক্টকে সার্থক করতে। আমাদের প্রজেক্টারে দেয়ালের উপর প্রক্ষিপ্ত করে নিজেরা বার বার এসব দেখতাম, অন্যদেরকে নিমন্ত্রণ করে দেখাতাম। এর নির্মাণের সবল দিক, দুর্বল দিক, এসব নিয়ে বোদ্ধাদের সঙ্গে আলোচনা হতো।

এর মধ্যে ১৯৬১ সালে আমাদের পরিবারে একটি মহা খুশির পরিবর্তন ঘটলো—বড়দা বিয়ে করলেন, ভাবী ঘরে এলেন। এই বিয়ে উপলক্ষে নিবিবিলিতে বেশ কিছু দিন ধরে গানের আসর ইত্যাদির ধূম পড়লো—এগুলো সব রেকর্ড করা হলো। এগুলো নিয়ে যে টেইপ সেটি পরে দেখেছি খুবই উচ্চ মানের গানের সমাহারে হয়েছিলো। এর কারণ বড়দা ও ইউনূস ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ বন্ধুগোষ্ঠীতে এমন কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা চট্টগ্রামের তো বটেই পরে পুরো দেশে উঁচু দরের গায়ক হিসেবে পরিচিত হয়েছেন। ঢেকি যে রকম স্বর্গে গেলেও ধান ভানে সেরকম বিয়েতে আমার বিশেষ দায়িত্ব হলো এই উপলক্ষে একটি সুশোভন স্মারক ছাপানো। এটি ঠিক পুস্তিকা বা ব্রোশিওরের আকৃতিতে নয় বরং প্রস্থের দিকে লম্বা আয়তাকার আর্ট পেপারে মুদ্রিত একটি সুন্দর জিনিস হলো—

বাইন্ডিঙের বদলে ছিদ্রের মধ্য দিয়ে সুদৃশ্য লাল সরু ফিতা দিয়ে বাঁধা হলো। এর জন্য বড়দার নানা বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন থেকে ছোট ছোট বাণীর মতো লেখা সংগ্রহ করলাম। আমি মনে করছিলাম যে আমার হাত দিয়ে এই স্মারকটি একটি অনবদ্য ব্যতিক্রমী জিনিস হয়েছিলো—যা সবাইকে অবাক করে দেয়ার জন্য শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জন্য সিক্রেট রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে আমার নানার সঙ্গে একটি ঘটনা বেশ মনে পড়ে; আমাদেরকে মজার মজার খাবার খাওয়ানোতেই যাঁর আনন্দ ছিল, আর গল্প শোনাতে। আমার প্রয়াত দাদার মতো ধরাছোঁয়ার বাইরের মানুষ ছিলেন না তিনি, ছিলেন একেবারেই বন্ধুর মতো। তখন তিনি খুবই বয়োবৃদ্ধ—তবুও সবার বড় মুরুব্বি হিসেবে তিনি আমাদের সঙ্গে বাসে বরযাত্রী হিসেবে গেলেন—ভ্রমণে, বিশেষ করে হাঁটাতে নানার কোন ক্লান্তি কখনোই দেখিনি। তিনি আগেই বাণ্ডিল খুলে আমাকে একটি স্মারক বই দিতে বল্লেন। আমার সেই সংকল্প থেকে নানার জন্যও ব্যতিক্রম না করে জানালাম যে এটি এখন সিক্রেট, যথা সময়ে দেবো। এই ঘটনার পর তিনি যাঁকে পেয়েছেন তাকেই বুঝিয়েছিলেন যে এই নাতি তাঁর একটি ছোট্ট কথা রাখেনি। বড়দার বিয়ের অল্প কিছু দিন পর নানা অসুস্থ হওয়াতে চিকিৎসার জন্য তাঁকে আমাদের বাসায় এনে রেখেছিলাম। তিনি যেখানে থাকতেন তার কাছেই টেলিফোনটি থাকতো বলে, প্রায়ই তাঁকেই ওটি ধরতে হতো এবং আমাদেরকে নানা মেসেজ ইত্যাদি দেয়ার অনুরোধ আসতো। ওই ঝামেলা যেন না হয় তিনি ফোন ধরে হ্যালো না বলে বলতেন 'আমি তাদের নানা'। এ নিয়ে আমরা খুব হাসাহাসি করতাম। এই অসুস্থতাতেই নানা কিছুদিন পর মারা গিয়েছিলেন। রঙিন শৈশবের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত অতি আপন এই বর্ণাঢ্য মানুষটিকেও আমরা হারিয়ে ফেল্লাম।

লেখাপড়া এবং অন্য সব কাজের মধ্যে টেইপ রেকর্ডার থেকে এবং রেডিয়ো থেকে সারাক্ষণ গান শোনা আমার একটি অভ্যাসে পরিণত হলো। এটি বিশেষ করে একটি নতুন রূপ পেলো রবীন্দ্র সংগীত শোনা—আরো নির্দিষ্ট করে রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যগুলো শোনা। ওসময় লং প্লেয়িং রেকর্ডের সদ্য প্রচলন হয়েছে। এতদিন পর্যন্ত আমরা কলের গানের সঙ্গে খুব দ্রুত ঘোরা ৭৮ আর পি এম (মিনিটে ৭৮ বার ঘূর্ণন) ভারি শ্যালাকের রেকর্ড ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলাম। এখন জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ধীরে ঘোরা ৩৩ আরপিএমের লং প্লেয়িং রেকর্ড—যা এক পৃষ্ঠায় প্রায় ৪০ মিনিট বাজতো, আগের দ্রুতগুলো যেখানে মাত্র ৩-৪ মিনিট বাজতো। তাছাড়া এই রেকর্ডগুলো বেশ হালকা পাতলা ভিনাইল প্লাস্টিকের তৈরি। কলের গানও এখন ইলেকট্রনিক রেকর্ড প্লেয়ারে পরিবর্তিত রূপে হয়ে গিয়েছিল সুন্দর ছিমছাম। তার আওয়াজও একেবারে মূল সংগীতের প্রায় হুবহু। এমন প্রযুক্তিতেই আমরা পেলাম 'শ্যামা', 'চিত্রাঙ্গদা', 'মায়ার খেলা' ইত্যাদির এক একটি রেকর্ড। যথারীতি এগুলো আমাদের টেইপ রেকর্ডারে রেকর্ড করে নিলাম। সেই থেকে এগুলো এতবার এক নাগাড়ে শুনেছি যে আগাগোড়া পুরোটা মুখস্থ

গাইতে পারতাম—বিশেষ করে চিত্রাঙ্গদা এবং শ্যামা। আমার পড়াশোনা চলতো কখনো এগুলোর রেকর্ডিং শোনে, কখনো নিজে গুণগুণ করে পুরো গীতিনাট্যটি গেয়ে। আবার কখনো হয়তো একটি গানই ওভাবে বার বার গেয়ে চলেছি। যেমন মনে পড়ে এক একবার নিরিবিলি থেকে কলেজে হেঁটে গিয়েছি শুধু চিত্রাঙ্গদা থেকে একই গান বার বার মনে মনে গেয়ে গেয়ে :

'রোদন ভরা এ বসন্ত—
সখি কখনো আসেনি বুঝি আগে...'

সেই বহনযোগ্য 'ন্যাশনাল' রেডিয়োটিও পড়ালেখায় আমাকে সঙ্গ দিতো—এবং তা শুধু গান দিয়ে নয়, অন্য নানা রকম অনুষ্ঠান দিয়েও। সব সময় যে মনোযোগ রেডিয়োর দিকে থাকতো তা নয়; কিন্তু ওটি বেজেই চলতো। এমনি একটি একটানা চলতে থাকা অনুষ্ঠান মাঝে মাঝে পেয়ে যেতাম সেটি হলো পাকিস্তান টিমের সঙ্গে চলছে এমন কোন ক্রিকেট টেস্টম্যাচের ধারা বিবরণী। এমনটি হলে এর থেকে কখনোই বেশিক্ষণ দূরে থাকতামনা। সেই সঙ্গে দু'জন মানুষের অনবদ্য ধারা বিবরণীর বিশেষ আকর্ষণটিও ছিল—জামসেদ মার্কার এবং ওমর কোরেশি। তাঁরা দু'জন একটি দীর্ঘ সময় দেশের ক্রিকেটামোদীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রেখেছিলেন। তাঁরা যে ভাবে পরস্পরের মন্তব্যগুলোকে সম্মান করতেন আর 'থ্যাংক ইউ ওমর' অথবা 'থ্যাংক ইউ জামশেদ' বলে পরস্পরকে মাইক্রোফোন ছেড়ে দিতেন, সেটিও আমাদের সবার কাছে একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে ছিলো। কখনো তাঁদের চেহারা দেখিনি, শুধু কণ্ঠ শুনেছি, ইংরেজি বাচন ভঙ্গিতে মুগ্ধ হয়েছি, এক একটি উইকেট পতন বা বাউণ্ডারিতে তাঁদের আবেগের প্রকাশ দেখেছি। অবশ্য জানতাম যে জামশেদ মার্কার ছিলেন দেশের একজন কৃতী কূটনীতিবিদ, আর ওমর কোরেশি ছিলেন একজন নাম করা লেখক ও সাংবাদিক। ধারা বিবরণীও সাধারণত এক রকম আবহ সংগীতের মতো পটভূমি রচনা করতো আমার কাজের, স্টেডিয়ামের দর্শকরা হঠাৎ হৈচৈ তুল্‌লে অথবা জামশেদ মার্কার বা ওমর কোরেশি চেঁচিয়ে উঠলে মনোযোগ দিতাম, অন্য সময় নয়।

এর মধ্যেই আমার প্রস্তুতি চলছিল ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার জন্য—১৯৬২ সালের শুরুতে যে পরীক্ষা দিতে হলো। আগের পরীক্ষাগুলোর বিশেষ করে প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রস্তুতির থেকে খুব বেশি পার্থক্য এর ছিলনা। যথারীতি পরীক্ষা হয়েও গেল। আগে এরকম পরীক্ষার পর প্রচুর সময় পাওয়া যেতো ইচ্ছে মত বই পড়ার জন্য তো বটেই, তা ছাড়া বেড়াবার, অন্য কিছু শেখার ইত্যাদির জন্য; এবার কিন্তু তার সুযোগ কম ছিল। কারণ এখন 'বিজ্ঞান সাময়িকী' নামক আমার একটি প্রায় ফুল টাইম কাজ থেকে গিয়েছিলো। পরীক্ষার জন্য তাকে কিছুটা অবহেলা করতে হয়েছে, নিজের লেখালেখি তার জন্য বেশি করতে পারিনি, অন্য কাজগুলোও কম হয়েছে। এখন কোমর বেঁধে বিজ্ঞান সাময়িকীর কাজে নামতে পারলাম।

আগে শুধু বই পড়াটাই আনন্দ ছিলো। এখন দেখলাম লেখাটিও বেশ আনন্দের কাজে পরিণত হয়েছে। নানা রকম সংবাদ মাধ্যম, বিজ্ঞান পত্রিকা এবং বইপত্র ঘেঁটে নিত্য নতুন বিষয়ে সাময়িকীর জন্য ফিচার, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয় লিখতে আমার খুবই ভাল লাগতো; তাছাড়া সময়মত এসব লেখার এক রকম বাধ্যবাধকতাও ছিল। ফিচারগুলোর মধ্যে সব চেয়ে বেশি ভাল লাগতো নিজে ভেবে ভবিষ্যৎ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির জন্য নতুন নতুন আইডিয়া দিয়ে 'নবতম' লিখতে। লিখতে এই ভাল লাগাটি আমার সারা জীবন শুধু বজায় থাকেনি—এটি আমার জীবনের গুটি কতেক বড় আনন্দের কাজের একটিতে পরিণত হয়েছে। সেই তখন থেকেই বিজ্ঞান, বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান অভিযান এসবের বিষয়ে লিখতেই আমার বেশি ভাল লাগতো। বিজ্ঞান সাময়িকীর প্রথম দিকে পত্রিকায় বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীও থাকবে এমন একটি চিন্তা ছিল। আমি নিজেও দু'একটি লিখেছি। একটি গল্পের নাম 'মঙ্গুলে মাস্টার'। এতে মঙ্গলগ্রহ থেকে ভিজিটিং টিচার হয়ে একজন শিক্ষক এসেছিলেন পৃথিবীর স্কুলে পড়াতে—তিনি মানুষ ছিলেননা ছিলেন মঙ্গুলে জ্ঞানী ব্যক্তি। ছাত্র ছাত্রীরা তাঁর বিদঘুটে চেহারা, কথাবার্তা, আচার আচরণ নিয়ে এমন খেপাতো যে তাঁর জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলো। তিনি পড়াতেন 'মঙ্গুলে ভাষা' এবং 'আন্ত-গ্রহ সম্পর্ক' বিষয়ে। সে সব বিষয়ের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা ছিল গল্পে। এ সবের ক্ষেত্রেও মঙ্গুলে মাস্টারের দৃষ্টিভঙ্গি ও ছাত্রদের পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে প্রায়শ পার্থক্য দেখা দিত বলে তা নিয়েও মেলা ঝামেলা বাঁধতো। তিনি দেখছিলেন এভাবে অবাধ্য, উশৃঙ্খল ছাত্রদের মধ্যে মাস্টারি করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। পদত্যাগ করে ফিরে যাবার কিছু আগে ওই ক্লাসের মধ্যেই আন্তগ্রহ রেডিয়ো মেইলে খবর এলো রকেট দুর্ঘটনায় তাঁর ছেলে মারা গেছে। সেই যে ক্লাসে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন—ছাত্র ছাত্রী সেই দুঃখের সমব্যথী হয়ে পড়লো এবং তাঁকে নানা ভাবে সান্ত্বনাই শুধু দিলোনা, তাঁর পদত্যাগটিও ঠেকালো। এরকম কল্পকাহিনী লিখতে ভাল লাগতো, অন্যরাও লিখতে চাইতো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যে মনে হলো যে সব বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী পাচ্ছিলাম তাতে কল্পকাহিনীই বেশি থাকছিলো, বিজ্ঞান তেমন থাকছিলো না—বিজ্ঞান নেহাতই গল্পের একটি গৌণ অনুষঙ্গ হতো। তাই সায়েন্স ফিকশন ছাপানো বন্ধই করে দিলাম। বহুদিন পর নতুন লেখক হুমায়ুন আহমদের একেবারে প্রথম দিককার লেখা সায়েন্স ফিকশন 'তোমাদের জন্য ভালবাসা' বই হিসেবে প্রকাশের আগে বিজ্ঞান সাময়িকীতে ধারাবাহিকভাবে ছাপিয়ে এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেছিলাম।

বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য সারাক্ষণ লিখতে গিয়ে আর কোন পত্র পত্রিকার জন্য লেখার সুযোগ আমার কমে গেল। এর আগে দৈনিক পত্রিকা সহ নানা ম্যাগাজিন, সাময়িকীতে মাঝে মাঝে লেখার একটি অভ্যাস গড়ে উঠেছিলো। এখন সেটি খুব

কমে গেল, কারণ কিছু লিখলে বিজ্ঞান সাময়িকীকেই প্রাধান্য দিতাম। এই অসুবিধাটিও সাময়িকীর সেই প্রথম দিনগুলো থেকে শুরু করে আজ অবধি মেনে নিতে হয়েছে।

যথা সময়ে পরীক্ষার ফলাফল বের হলো। সে সময় এই পরীক্ষাকে বলা হতো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা—অর্থাৎ স্কুল আর বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের 'মধ্যবর্তী' পরীক্ষা। সায়েন্স গ্রুপের ছাত্ররা পেতো আইএসসি (ইন্টারমিডিয়েট সায়েন্স) সার্টিফিকেট, আর্টস গ্রুপেররা পেতো আইএ, আর যারা কমার্স গ্রুপের তারা পেতো আইকম সার্টিফিকেট। পরীক্ষা নেয়া হতো বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কারণ কলেজ শিক্ষা ছিলো বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণে। সে সময় প্রদেশে ছিল মাত্র দুটি বিশ্ববিদ্যালয়—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়; আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে। পত্রিকায় প্রকাশিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইএসসি'র ফলাফলে নিজের নাম মেধা তালিকার নবম স্থানেই দেখতে পেলাম। আমার ফলাফলে পরিবারে, কলেজে সবাই দারুণ খুশি। মজার ব্যাপার হলো যেদিন ফল প্রকাশ হলো ঠিক সেদিনই দেশে প্রথম কোকা কোলা বাজারে এসেছিলো—ক'দিন ধরে চলছিলো বিজ্ঞাপনে তার ঘোষণা। কাজেই সুখবরটি একটু ব্যতিক্রমী ভাবে উদযাপন করা গেলো—সবার বহুদিন ধরে শোনা অথচ নতুন পানীয় কোকা কোলা দিয়ে। সে সময় এক বোতল কোকা কোলার দাম নির্ধারিত হয়েছিলো পঁচিশ পয়সা—অর্থাৎ এক টাকার চার ভাগের এক ভাগ। উল্লেখযোগ্য যে এর মাত্র কিছু দিন আগে ১৯৬১ সালে সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ দশমিক মুদ্রার প্রচলন করেছিলো—অর্থাৎ ১৬ আনায় এক টাকা হওয়ার বদলে ১০০ পয়সায় এক টাকা হবার নিয়ম প্রচলিত হয়েছিলো।

গঙ্গাদার বাটার টোস্ট

কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থবিদ্যা বিভাগ যেই চিনতো সে সময়, সেই গঙ্গাদার বাটার টোস্টের মাহাত্ম্যও জানতো। তাঁর চায়ের দোকানটি আসলে ঠিক দোকান ছিলনা। সেটি ছিল কার্জন হলের নিচের তলায়, পদার্থবিদ্যা বিভাগের অফিসের কাছেই প্রশস্ত বারান্দার এক কোনায় চা তৈরির একটু খানি ব্যবস্থা মাত্র। চা'য়ের সঙ্গে আরো দু'একটি জিনিস পাওয়া যেতো তার মধ্যে সব চেয়ে জনপ্রিয় ছিল বাটার টোস্ট অর্থাৎ রুটির গায়ে মাখন আর চিনি লাগিয়ে টোস্ট। গঙ্গাদা ছিলেন বিভাগীয় প্রধানের খাস দপ্তরি, এবং বর্তমান প্রধানের আগে পূর্ববর্তী আরো অনেক বিভাগীয় প্রধানেরও। যাদের জীবনে তখন ফিজিক্স নিয়ে নিরবচ্ছিন্নতা, গঙ্গাদার বাটার টোস্টও তাদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই চা ও সেই বাটার টোস্ট খেয়ে খেয়ে এখানে আমার দীর্ঘ দিন কাটাবার পালা এখন শুরু হলো বলে। কারণ ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের কিছুদিন পরপরই শুরু হয়ে

গিয়েছিলো বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে প্রবেশের জন্য আমাদের প্রারম্ভিক কাজগুলো। সে জন্য এবার প্রায় স্থায়ী ভাবেই চলে গেলাম ঢাকায় (এপ্রিল ১৯৬২)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা বিভাগে পড়বো, সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে থাকবো, এ নিয়ে কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব আমার কখনই ছিলনা। তাই বন্ধু বান্ধবদের অনেকেই যখন সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলো, আমি তখন সোজা আমার পূর্ব পরিচিত নতুন ঠাঁই সলিমুল্লাহ হলে চলে গেলাম আর সেখান থেকে কার্জন হলে নিত্য আনাগোনা। ইউনূস ভাই ইতোমধ্যে পাশ করে চট্টগ্রাম চলে এসে চট্টগ্রাম কলেজে অর্থনীতির প্রভাষক হিসেবে যোগ দিয়েছেন। এই কলেজ থেকে ছাত্র হিসেবে আমার প্রস্থান এবং শিক্ষক হিসেবে তাঁর আগমন প্রায় একই সময়ে ঘটলো। সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে তখনো তাঁর অনেক বন্ধু—শাকুর ভাই, কায়সার ভাই, কামাল ভাই (আমাদের আত্মীয়)—তাঁরা তো আমারও একান্ত ঘনিষ্ঠ। কাজেই কাগজেপত্রে সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক হবার আগে থেকেই ওখানে বেশ কায়েম মোকাম হয়ে গেলাম। ভাইয়ের বন্ধুদের কারণে এই সময়টায় আমার ঠাঁই ছিলো একেবারে সিনিয়র ছাত্রদের অংশে—যাঁরা ইউনূস ভাইদের পরের ব্যাচেই বেরিয়ে যাবেন। এই অংশটিকে ছাত্ররা রসিকতা করে বলতেন 'ফেডারেল ব্লক'—কারণ ছাত্ররা খুব সিনিয়র হওয়াতে ওয়েস্ট হাউস এবং ইস্ট হাউস নামের দুই অর্ধাংশের জন্য যে পৃথক হাউস টিউটরগণ রয়েছেন তাঁদের এখতিয়ার প্রয়োগ এখানকার শৃঙ্খলার জন্য যথাযথ হতোনা; তাঁদের জন্য স্বয়ং প্রভোস্টের শাসন অর্থাৎ কেন্দ্রীয় শাসনের (ফেডারেল) প্রয়োজন হতো। অবশ্য এটি ছিল নেহাত কথার কথা। ওরকম কোন শৃঙ্খলা বা শাসন হলের কোথাও প্রয়োজন হতোনা। হলের ছাত্ররা চলতেন একেবারেই এর ঐতিহ্য অনুসরণ করে নিজস্ব স্ব-আরোপিত নিয়ম কানুনের ভেতরেই। ওই ফেডারেল ব্লকের যাঁদের মধ্যে সে সময় বেশ কয়েকটি দিন কাটিয়েছি তাঁদের একজন ছিলেন সৈয়দ আবদুল হাদী। কথায় কথায় সবাই তাঁকে গানের অনুরোধ জানাতেন, আর তিনি অম্লান বদনে গেয়ে যেতেন। এ সময় এহতেশাম পরিচালিত রহমান-শবনম অভিনীত ঢাকায় নির্মিত চমৎকার উর্দু ছবি 'চান্দা' সদ্য মুক্তি পেয়ে সারা দেশে হৈচৈ ফেলে দিয়েছিলো। সবাই সৈয়দ আবদুল হাদীকে প্রায়ই চান্দার গান গাইতে অনুরোধ করতেন। হাদী ভাইয়ের গান আজও (২০১৫) টেলিভিশনে শুনে নিত্য মুগ্ধ হই।

এবার কার্জন হলে পদার্থবিদ্যার পূর্ণ আবহে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরু হলো। সহপাঠীদের সঙ্গে পরিচয় হলো; দেখলাম তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন পদার্থবিদ্যার প্রেমে রয়েছে, এটিই যে পড়বে তাতে অনেকদিন থেকে নিঃসন্দেহ। মজার ব্যাপার হলো ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় মেধা তালিকার প্রথম দশ জনের মধ্যে অধিকাংশই এই দলের অন্তর্ভুক্ত। বুঝলাম নানা আকর্ষণীয় পেশাগত দিকে যাওয়ার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পদার্থবিদ্যার মৌলিক রহস্যগুলোর আকর্ষণ তারাও

এড়াতে পারেনি। উৎফুল্ল হলাম এই ভেবে যে নিজেদের মধ্যে এ নিয়ে আলাপ, তর্ক-বিতর্ক ভালই জমবে। বেশ কিছু বুদ্ধিদীপ্ত ছাত্র ছাত্রীর সঙ্গে আমরা এ যাত্রায় ক্লাসে রয়েছি বিশ-পঁচিশ জনের মত। আমাদের সঙ্গে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় এবং এই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উভয়টিতে যে প্রথম স্থান পেয়েছিলো সেই আহমেদ শফি আছে—শুধু পরীক্ষার ফলেই নয় সবদিক থেকে তুখোড় চিন্তার ছেলে হিসেবে তার স্থান ঈর্ষণীয়। দীর্ঘকাল আমরা এই পদার্থবিদ্যা বিভাগে শিক্ষক হিসেবে সহকর্মী ছিলাম। ক্লাসের অন্যান্য অনেকের প্রতিভাও ছিল নানা দিকে বিস্তৃত।

আমার সঙ্গে তাৎক্ষণিক বন্ধুত্ব হয়ে গেলো আজিজুল বারীর সঙ্গে—ফেণী কলেজ থেকে এসেছে। স্বভাবসিদ্ধ ভাবে দিলখোলা ও রসজ্ঞান সম্পন্ন এ ছেলেটির সঙ্গেই আমাকে পাড়ি দিতে হবে বহু পথ—একেবারে শাব্দিক অর্থেই, কারণ আমি ছাড়া একমাত্র সেই কার্জন হল থেকে দূরে সলিমুল্লাহ হলের আবাসিক ছাত্র। বাকিরা সবাই ফজলুল হক হল অথবা ঢাকা হলের (বর্তমানে শহীদুল্লাহ হল), অথবা জগন্নাথ হলের ছাত্র। এর কারণ ফজলুল হক হলকে ও ঢাকা হলকে ঐতিহ্যগত ভাবে বিজ্ঞানের ছাত্রদের, এবং একই ভাবে সলিমুল্লাহ হলকে কলা অনুষদের (তখন সামাজিক বিজ্ঞান সমূহ সহ) ছাত্রদের উপযুক্ত আবাস মনে করা হতো (বিশেষ করে সিএসএস অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সুপেরিয়র সার্ভিস পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ রাজকার্যের প্রত্যাশীদের জন্য)। এদিক থেকে বারী আর আমি ব্যতিক্রম। সিনিয়রদের মধ্যে বিজ্ঞানের ছাত্র আর মাত্র তিন চারজন ছিলেন পুরো সলিমুল্লাহ হলে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন চৌধুরী শফি সামি (পরে রাষ্ট্রদূত, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা)—পদার্থবিদ্যার সফল ছাত্র, মুসাব্বির চৌধুরী গণিতের ছাত্র (পরে খ্যাতনামা গণিতবিদ, মহাশূন্য ও দূর অনুধাবন প্রতিষ্ঠান স্পার্সোর প্রধান)।

বারী আর আমি দু'জন সলিমুল্লাহ হল আর কার্জন হলের মধ্যকার দূরত্বটি প্রায় দিনই হেঁটে একাধিকবার পাড়ি দিতাম। এটিও আমাদেরকে নিয়মিত দীর্ঘ আলাপের সুযোগ করে দিত। গ্রীষ্মের তপ্ত দুপুরে হাঁটার সময় ওই কষ্ট ভুলিয়ে দিতে বারী মাঝে মাঝে বলতো—'মনে কর এই যে সুশীতল আকাশ, মলয় সমীরণ, চাঁদের আলোয় আমরা হেঁটে যাচ্ছি অলস পদ চারণায়...'। মাঝে মাঝে দেরী হয়ে গেলে অবশ্য আমরা হলের সামনে থেকে বাস নিতাম। এগুলো ছোট লক্কড় বাস—আমরা বলতাম মুড়ির টিন। পলাশীর দিক থেকে এসে জগন্নাথ হল, মেডিক্যাল, পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে দিয়ে চকবাজারের দিকে পুরোনো ঢাকার অলিগলিতে চলে যেতো। আমরা চান খাঁর পুলে নেমে যেতাম কার্জন হলের কাছে। বাস পুরাপুরি থামতোনা, কনডাক্টর 'ইনভার্সিটি-চান খাঁর পুল' হাঁক দিলে গতি কমা বাস থেকে নেমে যেতাম। তবে কোন দিন কোন মহিলা যাত্রী যদি নামতো, তা হলে—কন্ডাক্টরের হাঁক বদলে যেতো 'লে-ডি-জ, বন্‌কে, চার চাক্কা জাম'। অর্থাৎ পুরা ব্রেক দিতে হবে। কন্ডাক্টররা বেশির ভাগ ঢাকার আদি বাসিন্দা

হওয়াতেই তাদের হাঁক ডাক ঢাকাইয়া উর্দুতেই হতো। ছাত্র রাজনীতিতে বারী কিন্তু আমার প্রতিপক্ষ ছিল, এবং পরে হলের ভিপি হওয়ার নির্বাচনে আমার সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। বাংলাদেশ বিমানের সিনিয়র অ্যারোনেটিক ইঞ্জিনিয়ার থাকা কালে হঠাৎ হার্টফেল করে অকাল প্রয়াত হবার ঠিক আগের দিন পর্যন্ত আমরা এক সঙ্গে নানা কাজ করেছি।

আর একজন নতুন সহপাঠী ফজলুর রহমান ফিজিক্স নিয়ে নানা তর্ক তুলতে পারদর্শী, আবার বেশ আবেগ-প্রবণ বলেও ইতোমধ্যে খ্যাতি পেয়েছে বিশেষ করে তার ফজলুল হক হলের ঘনিষ্ঠদের কাছে (পরে সচিব ও বাংলাদেশ স্কাউটসের দীর্ঘকালীন জাতীয় কমিশনার)। সূক্ষ্ম রসবোধের জন্য শাহ আবু নঈম গোড়াতেই সবার দৃষ্টি কেড়েছে, রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান (বাবা তখন প্রাদেশিক মন্ত্রী, অনেক পর ভাই ব্রিগেডিয়ার হান্নান শাহ বিএনপি রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী) নঈমের মত এমন হাসি খুশি হৈচৈ একজন তরুণ যে সুপ্রীম কোর্টের আপিল বিভাগের গম্ভীর বিচারপতি হিসেবে তার কর্মজীবন শেষ করবে একথা কি আমরা তখন ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পেরেছি! তখনই লক্ষ্য করেছি—সহপাঠী মনোরঞ্জনের নানা বিষয়ে, নানা শাস্ত্রে গভীর আগ্রহ ও বন্ধুদের সঙ্গে সেগুলো পর্যালোচনায় উৎসাহ; পরে যখন বাংলাদেশ বেতারে কারিগরি নিয়ন্তা হিসেবে কাজ করেছে ও আরো পরে বেশ কয়েকটি প্রাইভেট এফ এম রেডিয়ো স্টেশনকে দাঁড় করিয়ে দিতে প্রচুর পরিশ্রম করেছে তখনো তার ওই উৎসাহগুলো বিন্দুমাত্র ক্ষীণ হয়নি। তখনই রাজনীতিতে সক্রিয় আমিনুর রশীদের (পরে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি) সঙ্গে পরে ভিন্ন দলে ভিন্ন হলে ছাত্র রাজনীতি করেছি, একই সময় দুই ভিন্ন হলে সংসদের ভিপি ছিলাম, বিভাগে দীর্ঘকাল এক সঙ্গে শিক্ষকতাও করেছি।

মেয়েদের মধ্যে সবার সঙ্গে হৈচৈ করে মাতিয়ে রাখতো ফৌজিয়া—যে এদিক থেকে সে যুগের একেবারেই ব্যতিক্রম। বিদেশে চলে যাবার আগে পর্যন্ত শিক্ষক হিসেবে এখানে আমাদের সহকর্মী ছিল; তার ভাই আবদুল মুঈন খান দু বছর পরেই বিভাগে ছাত্র হয়ে এসেছিলো, এবং শিক্ষক হিসেবে আমরা দীর্ঘদিন সহকর্মী ছিলাম (পরে রাজনীতিবিদ ও মন্ত্রী)। ছাত্রীদের মধ্যে আর একজন বেশ বিশিষ্ট ছিল সুলতানা রাজিয়া, সে পরে আহমেদ শফিকে বিয়ে করে সুলতানা শফি হয়েছিলো; দীর্ঘ সময় আমরা এখানে শিক্ষক হিসেবে সহকর্মী ছিলাম। ইন্টার-উইং স্কলারশিপ নিয়ে এসে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে যে ক'জন পদার্থবিদ্যায় আমাদের সহপাঠী হয়েছিলো তাদের মধ্যে রোখসানা আর ইকবাল ইউনূসের কথা ভোলা কঠিন। করাচির মেয়ে রোখসানা এখানে সবাইকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো আধুনিক মেয়ে হবার মানে কি, আর লাহোরের ছেলে ইকবাল ইউনূস বুঝিয়ে দিয়েছিলো যে ছাত্র অবস্থাতেই চিন্তাশীল ও বিদগ্ধ হবার যে একটি গুমোর বাঙালিদের রয়েছে সেটি মোটেই বাঙালির একচেটিয়া নয়। অত্যন্ত ভাবুক ও সপ্রতিভ ছেলে

ইকবালের উৎসাহেই একবার আমরা দুজনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের ছাত্রদের নিয়ে একটি জনপ্রিয় বিজ্ঞান সমিতি গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নিয়েছিলাম 'পসডু' নামে (পপুলার সায়েন্স সোসাইটি, ঢাকা ইউনিভার্সিটি)। সে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে এগোতে চেয়েছিলো, তাই ব্যাপারটি বেশিদূর এগোয়নি। রোখসানা ও ইকবাল কারো সঙ্গেই পরে আর যোগাযোগ থাকেনি। বহুকাল পর আমেরিকায় থাকা বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম যে ইকবাল সেখানে বিজ্ঞানে ইসলামের অবদানের উপর আমেরিকা জুড়ে একটি সচেতনতা মূলক আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে।

এদের সঙ্গে যোগাযোগ না থাকলেও, এক বছর পরে আসা পাঞ্জাবি মেয়ে আসগরী মালিক পদার্থবিদ্যা বিভাগের সবার তো বটেই, রোকেয়া হলেরও সবার মন জয় করেছিলো শুধু তার সারল্য আর বন্ধুত্ব দিয়ে। বহুদিন পর আশির দশকের একেবারে শুরুর দিকে ফিজিক্সের একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজক হিসেবে আমরা ইসলামাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের নবীন শিক্ষিকা ড.আসগরীকে দাওয়াত করেছিলাম। কোন এক গোলযোগে আমরা কেউ বিমান বন্দরে (তখনো তেজগাঁয়) তাকে আনতে সময়মত গিয়ে পৌঁছতে পারিনি। সে এক মুহূর্ত দেরি না করে একটি রিক্সা নিয়ে তার শিশু মেয়েকে সহ যাবতীয় মালপত্র নিয়ে সোজা কার্জন হলে বিভাগে এসে হাজির হয়েছিলো; এতদিন পর, ভিন দেশ হয়ে যাবার পর, নিজকে শুধু বিভাগের একজন পুরোনো ছাত্রী হিসেবেই ভেবে নিয়ে ঠিক আগের মতই স্বচ্ছন্দে। যেন গৃহ প্রত্যাবর্তন করে হৈচৈ শুরু করে দিলো।

এরকমই সব ছেলে মেয়ে সেদিন আমরা গঙ্গাদার বাটার টোস্টের গন্ধে গন্ধে ও জায়গায় ঘোরাফেরা করছিলাম, আর ফিজিক্স নিয়ে বুঝি না বুঝি, আলোচনার ঝড় তুলছিলাম। আসলে গঙ্গাদা'কে আমরা পেয়েছিলাম অল্প কয়েকদিন মাত্র, কিন্তু ঠিক সেই একই ভাবে একই ভূমিকায় পরে বহুদিন পেয়েছি হীরালাল দা'কে। তাঁরা দু'জনেই এমন ভাবসাব দেখাতেন যেন প্রফেসর বলতে একজনেই ছিলেন—তিনি সত্যেন বসু (তাঁদের ভাষায় বোস সাহেব); নিজেদের তরুণ বয়সে বোস সাহেবের স্নেহধন্য দপ্তরি ছিলেন তাঁরা। এমনকি ভারত কাঁপানো পদার্থবিদ কৃষ্ণানও (পরে এফআরএস এবং বিশ্বখ্যাত) এক সময় আমাদের বিভাগের শিক্ষক থাকলেও বোস সাহেবের কাছে কিছুই না। হীরালালদা'দের কীংবদন্তি মতে 'বোস সাহেব কখনো পি এইচ ডি না করলে কী হয় বিভাগে কতজনকে দেখলাম বোস সাহেবের ফেলে দেয়া কাগজ ঝুড়ি থেকে তুলে এনে তা দিয়ে ডক্টরেট করেছে'। এ কথা অতিরঞ্জিত হলেও এই সত্যেন বসু যে বোস আইনস্টাইন সংখ্যায়নের জনক তাতো আর অতিরঞ্জন নয়। আর দুনিয়ার পদার্থ বিজ্ঞানের তাবৎ ছাত্র যে জগতের সব মৌলিক কণিকাকে দুই ভাগে বিভক্ত

হিসেবে জানে এবং তার একটি ভাগ যে 'বোসন' নামে পরিচিত আমাদের সত্যেন বসুর নামে, সে কথাও তো মোটেই অতিরঞ্জন নয়। আর আমরা এখন পড়তে এসেছি তাঁরই ঐতিহ্য-ধন্য বিভাগে। তখন আমাদের বিভাগটির প্রত্যেকটি দেয়াল, আসবাব ও যন্ত্রপাতির সঙ্গে ছিল সত্যেন বসুর ছাপ ও স্মৃতি—বিভাগীয় প্রধানের বিশাল টেবিল, গ্র্যান্ড ফাদার ক্লক—যাতে একটি ভারি ওজন ক্রমাগত খুব ধীরে নিচে পড়ার মাধ্যমে ঘড়িকে সচল রাখে, এবং নানা রকম যন্ত্রপাতি যার কিছু কিছু এখনো ব্যবহারে আছে, অনেক কিছু ভাঙা। যন্ত্রপাতিগুলোর অনেকগুলো সরাসরি তাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরি; পদার্থবিদ্যার ইতিহাসে তাঁর নামটি অক্ষয় হয়ে যদিও রয়েছে তাত্ত্বিক পদার্থবিদ্যায় অসামান্য অবদানের জন্য, বিভাগের পরীক্ষণ গবেষণার ক্ষেত্রেও তিনি সরাসরি নেতৃত্ব দিতেন। তাঁর তৈরি সেকালের এক্সরে টিউব ইত্যাদি এখনো বিভাগে রয়েছে। তাছাড়া কৃষ্ণান ও এসএন মিত্রের মত বিজ্ঞানীদের কাজের নমুনাও ছিল আমাদের চারদিকে। একটি সাবেকি ভাব কার্জন হলের স্থাপত্য থেকে শুরু করে সব কিছুতেই—আমাদের ক্লাস রুম, ল্যাবোরেটরি, বারান্দা, গঙ্গাদা'র চায়ের কর্নার সব কিছুতে। এসবের মধ্যেই আমরা আধুনিক পদার্থবিদ্যার সৃষ্টিকালে এই বিভাগের গৌরবময় উপস্থিতিটির রেশটুকু অনুভব করছিলাম।

আমাদের গুরুশ্রেষ্ঠ ছিলেন তিনজন মানুষ; দু'জন প্রফেসর—ইন্নাস আলী ও আবদুল মতিন চৌধুরী, এবং একজন রীডার—শাহ ফজলুর রহমান। ইন্নাস আলী সাহেব বিভাগীয় প্রধান হিসেবে বসেন কার্জন হলের এক প্রান্তে বিভাগীয় অফিসে, আর মতিন চৌধুরী সাহেব বসেন নিজস্ব কক্ষে একেবারে অন্য প্রান্তে—দু'জনের মধ্যে খুব বেশি কথাবার্তা হতো বলে মনে হয়নি। শাহ ফজলুর রহমান সাহেবের নামটিই বরং আগে থেকে বেশি জানতাম 'বিজ্ঞান বিচিত্রার' সম্পাদক হিসেবে ও তাঁর কাছে আমার লেখা পাঠাবার কারণে। তাঁদের মধ্যে মতিন চৌধুরী স্যার ও ফজলুর রহমান স্যার প্রথম দিন থেকেই আমাদেরকে পড়িয়েছেন। মতিন চৌধুরী স্যারের একটি আলাদা গর্ব ছিল যে সেদিনকার কার্জন হলে একমাত্র তিনিই ছিলেন সত্যেন বসুর সরাসরি ছাত্র। আমি আশা করেছিলাম তিনি আমাদের বিভাগের পদার্থবিদ্যার ঐতিহ্য, এবং আধুনিক পদার্থবিদ্যার দুর্বার আকর্ষণগুলোর কিছু ইঙ্গিত দিয়ে শুরুতে আমাদেরকে উৎসাহিত করবেন। কিন্তু সে রকম কিছু তিনি করলেন না। তিনি ক্লাসে এলেন একটি ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে করে (এটি তিনি বরাবরই করেছেন), তারপর কোন ভূমিকা না করে চলে গেলেন পৃথিবী উত্তর-দক্ষিণে একটু খানি চাপা হওয়াতে তার মাধ্যাকর্ষণে যে সূক্ষ্ম পরিবর্তন আছে সেটি নির্ণয়ের জন্য উচ্চতর গণিত কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেই প্রসঙ্গে। মজার ব্যাপার হলো এই গণিত তখনো আমাদের জানার কথা নয়, বিষয়টিও আমাদের সে সময়ের পাঠ্যও নয়, এবং এই জটিল তত্ত্ব একমাত্র যে

বইতে পাওয়া যাওয়ার কথা বললেন তা একটি অতি বিশেষায়িত বই—শুধু ওই গোলকের কিছুটা উপবৃত্তাকার হওয়ার ফল নিয়ে, অথচ আমাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য। এভাবে তিনি রীতিমত আমাদের কাছে একটি বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন, অথবা বলা যায় আমাদেরকে ভয় পাইয়ে দিলেন।

অন্য দিকে তরুণ শিক্ষক ড. আবদুল লতিফ চৌধুরীর পদার্থবিদ্যা পড়ানোর ভঙ্গিটি আমার খুব পছন্দ হলো। তিনি পদার্থবিদ্যার মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ইতোমধ্যে যা শিখেছি তার ভিতটি কতখানি মজবুত সেদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেই শুরু করতে চাইছিলেন। ওইসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক প্রাক্তন ছাত্র সালামত উল্লাহ তাঁর অদ্ভুত সব বিজ্ঞান-বিরোধী কথার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি-কুখ্যাতি পেয়েছিলেন। তিনি এসব বক্তব্য নিয়ে বেশ কিছু পুস্তিকাও ছাপিয়েছিলেন—যেমন একটির নাম ছিল 'পৃথিবী ঘোরেনা, সূর্য ঘোরে'। সালামত উল্লাহ এ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের খেলার মাঠে বেশ লোক জমিয়ে প্রায়ই বক্তৃতা দিতেন। মাঠটি কার্জন হলের কাছেই—সে সময় আমরা সলিমুল্লাহ হলের দিক থেকে কোনাকুণি এই মাঠের উপর দিয়ে হেঁটেই বিভাগে যেতাম। লতিফ স্যার একদিন সালামতউল্লার ওই বক্তৃতার কতগুলো যুক্তির কথা উল্লেখ করে আমাদেরকে ক্লাসে তা খণ্ডন করার কাজ দিলেন। এটি করতে গিয়ে পদার্থবিদ্যার কিছু অ আ ক খ সম্পর্কে আমাদের মৌলিক উপলব্ধির পরিচয় দিতে হলো। ছাত্রদেরকে চ্যালেঞ্জ করার এই ভঙ্গিটিই বরং আমার বেশি ভাল লেগেছিলো। লতিফ চৌধুরী এর কিছুদিন পরেই বিদেশে চলে যান এবং আমেরিকার নাম করা সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিক্সের কৃতী অধ্যাপক হিসেবে আজীবন কাজ করেছেন—আমরা তাঁর ছুঁড়ে দেয়া ওই প্রিয় চ্যালেঞ্জগুলোর আনন্দ বেশি দিন পাইনি।

শাহ ফজলুর রহমান স্যার যখন পড়াতে এলেন পাকিস্তান বিজ্ঞান উন্নয়ন সমিতি'র ও 'বিজ্ঞান-বিচিত্রা'র মানুষ হিসেবে তাঁর কাছে আমার প্রত্যাশা ছিল তিনি অন্তত তাঁর দেয়া কোর্স মডার্ন ফিজিক্সের একটি পটভূমি ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার ইশারা শুরুতে দেবেন। কিন্তু তাঁর কাছেও নিরাশ হলাম, কারণ তিনিও সোজা জটিলতার মধ্যে চলে গেলেন। বরং এদিক থেকে অনেক তরুণতর শিক্ষক জয়কুমার সারোগি আমাকে মুগ্ধ করলেন। তাঁর ক্লাস হচ্ছিল পি-২৪ নামে পরিচিত বিশাল ও উঁচু কাঠের গ্যালারিওয়ালা কক্ষে। এর দেয়ালে সে সময় টাঙ্গানো ছিল সত্যেন বসু, কৃষ্ণান, সি ভি রমন প্রমুখ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বিশ্ব বিখ্যাত পদার্থবিদদের ছবি। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল যে এই ছবিগুলো সেখানে অনেক বছর ধরে রয়েছে। সারোগি স্যার তাঁর ক্লাসের প্রথম দিন এঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি আমাদের অপটিক্স অর্থাৎ আলোক বিদ্যা পড়াবেন। এরই ভূমিকা স্বরূপ তিনি ১৯২৮ থেকে ১৯৩৩ সাল এই পাঁচ বছর এ বিভাগে থাকতে কে এস কৃষ্ণান কী দারুণ আবিষ্কার করেছিলেন তা বোঝাবার

চেষ্টা করলেন। এখানে তাঁর তরুণতর সহকর্মী শান্তিলাল ব্যানার্জি আর আশুতোষ মুখার্জির সঙ্গে তিনি ক্রিষ্টালের চৌম্বক গুণের সঙ্গে এর গঠনের সম্পর্ক নির্ণয়ে বিখ্যাত একটি পরীক্ষণ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন যা লন্ডনে রয়্যাল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হয়েছিলো। পরে তিনি সি ভি রমনের সঙ্গে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী রমন এফেক্টের আবিষ্কারে অংশ গ্রহণ করেন এবং এটি ও অন্যান্য আবিষ্কারের মাধ্যমে অত্যন্ত উঁচু মাপের বিশ্বখ্যাত পদার্থবিদের স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। রমন এফেক্ট ও ক্রিষ্টাল সম্পর্কে আমাদেরকে খুব সরল একটু ধারণা দিয়ে সারোগি স্যার আমাদেরকে তাঁর নিজের গবেষণার বিষয়ের প্রতি চমকপ্রদ ভাবে আকৃষ্ট করেছিলেন। জয়কুমার সারোগি বাঙালি না হয়েও চমৎকার বাংলা বলতে পারতেন এবং বোঝার কোন উপায়ই ছিলনা যে তিনি একজন মারোয়াড়ি যাঁর পরিবার নারায়ণগঞ্জের ব্যবসায়ী; তাঁর ধর্ম জৈন, তাই তিনি ছিলেন একেবারে কড়াকড়ি ভাবে নিরামিষাহারি এবং জীব-দয়ায় বিশ্বাসী। এমন মানুষটি কয়েক বছর পর হলের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে দুর্বৃত্ত কোন ছাত্রের দ্বারা ছুরিকাহত হয়েছিলেন। সে কথা যথাস্থানে হবে। বেশি বয়সেও অধ্যাপক বা রীডার না হয়ে, পদার্থবিদ্যায় তেমন পণ্ডিত না হয়ে, আমাদের বিভাগে সব চেয়ে জনপ্রিয় শিক্ষক ছিলেন শ্মশ্রু মণ্ডিত চিরকুমার মাহমুদ ইমরান স্যার। এর কারণ তিনি ছাত্রদের বিনোদনের সব কাজে অসম্ভব উৎসাহী সংগঠকের দায়িত্ব পালন করতেন এবং তাদের ভাল উপদেষ্টা ছিলেন।

সেযুগে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের আমাদের মেলামেশার ও অভিজ্ঞতার গণ্ডি বেশ প্রসারিত ছিল। স্নাতক সম্মান পর্যায়ে প্রথম দু'বছর দুটি ভিন্ন বিষয়কে সাবসিডিয়ারি হিসেবে পড়তে হতো—আমার ছিলো গণিত ও রসায়ন, তাই ওই দুই বিভাগেও শিক্ষক-ছাত্রদের সঙ্গে যথেষ্ট মেশার সুযোগ পেয়েছি। শুধু তাই নয় ওই দুটি বিভাগের নিজস্ব 'সংস্কৃতির' সঙ্গেও বেশ মাখামাখি হয়ে গিয়েছিলো। রসায়নের ল্যাবোরেটরির ওই বিশেষ গন্ধ, আমারো পরিচিত গন্ধ হয়ে ওঠেছিলো; তেমনি গণিতেরও বিশেষ আবহ। সাবসিডিয়ারি ক্লাসের একটি বৈশিষ্ট্য হলো অন্য বেশ ক'টি বিভাগের ছাত্রদের সঙ্গে ওই ক্লাসে পরিচয় ঘটেছে, কারণ তাদেরো একই সাবসিডিয়ারি। উদাহরণ স্বারূপ গণিতের ক্লাসে রসায়নের দুই মহারথী ছাত্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ওদের একজন হলো কামাল সিদ্দিকী যে পরে রসায়নের স্নাতোকত্তর হয়েও পি এইচ ডি করেছিলো অর্থনীতিতে এবং আমলা জীবনে বিএনপি আমলে প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি হিসেব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে; এবং প্রশাসন ও উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা ও লেখালেখি করেছে। অন্যজন হলো সফিউল্লাহ—পরে জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক, নিজস্ব বামপন্থী ধ্যান ধারণা ও ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের জন্য খ্যাত।

গণিত বিভাগে আমার আলাদা আকর্ষণ ছিল একজন অধ্যাপকের প্রতি যিনি জবরদস্ত গাণিতিক হওয়া ছাড়াও 'বিজ্ঞান সাময়িকীর' নিয়মিত লেখক ছিলেন—তিনি প্রফেসর আজিজুর রহমান খলিফা। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির পরই তিনি জানতে পারলেন যে আমি তাঁর সম্পাদক। এতে যদি হতাশ হয়েও থাকেন সেটি তাঁর চোখে মুখে মোটেই প্রকাশ পায়নি, বরং মনে হলো বেশ মজা পেয়েছেন এতে। সেই থেকে প্রায়ই আলাপ হতো তাঁর সঙ্গে গণিত বিভাগে ক্লাস করতে গেলে। তাঁর মূল ধারাবাহিক লেখাটি শেষ হয়ে গেলে তিনি আরো নতুন কিছু বিষয়ে লেখা দিলেন যাও তাঁর নিজের উদ্ভাবন নিয়ে—অথচ বোঝার জন্য খুব উচ্চ গণিত-জ্ঞানের প্রয়োজন হয়না। বহিরঙ্গে খলিফা স্যার ছিলেন সেকেলে ধরনের—সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি থাকতো আগোছালো, পকেট থেকে বিরাট একটি চাবির গোছা বের করে দরজা খুলতেন নিজের কামরার; কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বল্‌লে বা তাঁর লেখা পড়লে বোঝা যেত গণিত-চিন্তায় তিনি কত আধুনিক।

সে সময় গণিত আর সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগ ছিল কাছাকাছি একই ভবনে। আর ওখানে তখনো অধ্যাপনার শেষ দিনগুলো কাটাচ্ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব চেয়ে বর্ণাঢ্য মানুষদের একজন—কাজী মোতাহার হোসেন। দীর্ঘ সময় তিনি বিজ্ঞানের ডীন ছিলেন। আমার সহপাঠীদের যাদের সাবসিডিয়ারি সংখ্যাতত্ত্ব ছিল তাদের সরাসরি শিক্ষক ছিলেন তিনি। তাদের মুখে শোনেছি বাংলায় কী চমৎকারভাবে তিনি সংখ্যাতত্ত্বকে সহজ করে তুলতেন, বিশেষ করে তাঁর নিজস্ব মজার সব উদাহরণ দিয়ে। সত্যেন বসুর সময় তাঁর শিক্ষকতা শুরু পদার্থবিদ্যা বিভাগেই। সেই তখন থেকেই সাহিত্যের জগতেও তাঁর বিচরণ, বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনেও তিনি একজন পুরোধা ছিলেন। নজরুলের তিনি বন্ধু ছিলেন, নজরুল ঢাকায় এলে তাঁর বর্দ্ধমান হাউসের (এখন বাংলা একাডেমির পুরোনো ভবন) বিশ্ববিদ্যালয় কোয়ার্টারে উঠতেন। ঢাকায় সত্যেন বসুদের 'বারো জনার' তিনি ছিলেন কনিষ্ঠতম সদস্য, এবং সেই সঙ্গে অনিয়মিত পত্রিকা 'বিজ্ঞান পরিচয়ের'। বিজ্ঞান সাময়িকীর জন্য চট্টগ্রামে থাকতেই তাঁর লেখা পেয়েছিলাম—এটি এই পত্রিকার একটি সমালোচনা; এতে তিনি আমাদের শব্দ প্রয়োগ পদ্ধতিতে কিছু ত্রুটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। পরে আরো লেখা তিনি বিজ্ঞান সাময়িকীতে লিখেছেন। সাময়িকীর জন্য তাঁর সাক্ষাৎকারও নিয়েছিলাম আমি। প্রধানত সত্যেন বসুর উৎসাহেই তিনি সংখ্যাতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ হয়ে ওই বিভাগটিতে গিয়েছিলেন এবং সংখ্যাতত্ত্বে তাঁর নিজস্ব অবদান রেখেছিলেন। তাঁর বর্ণাঢ্যতা কিন্তু বিজ্ঞান ও সাহিত্যে ফুরিয়ে যায়নি—তখনো তিনি দেশের একজন চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু। নিজেরাই দেখতাম ওই বয়সে তাঁর দ্রুত ঋজু হেঁটে যাওয়া, টেনিস খেলা, রবীন্দ্র সংগীত গাওয়া; সব মিলে তিনি যেন ছিলেন একজন সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ মানুষ—আমাদের রেনেসাঁসের মানুষ ছিলেন তিনি; যেন অনেকটা ইতালির রেনেসাঁসের লিওনার্দোর দা ভিঞ্চির মতই সব্যসাচী।

সেই প্রথম দিনগুলোতে কার্জন হল এবং তার কাছাকাছি বিজ্ঞান ভবনগুলোতেও আমাদেরকে সীমাবদ্ধ থাকতে হতোনা। কারণ বিজ্ঞানের সব ছাত্রকে বাধ্যতামূলক ভাবে কলা অনুষদের একটি বিষয়ে পড়াশোনা করতে হতো—যেটি হলো ইতিহাস বিভাগে গিয়ে 'সভ্যতার ইতিহাস' কোর্সটি করা। একই ভাবে কলা ও অন্যান্য অনুষদের ছাত্রদেরকে কার্জন হল এলাকায় এসে করতে হতো 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি' বিষয়ে একটি কোর্স। আমার প্রিয় বিষয় ইতিহাসকে আবার খুঁজে পেয়ে খুব উপভোগ করছিলাম সভ্যতার ইতিহাস সম্পর্কে ক্লাস করতে। আরো বড় কথা এটি আমাদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই ঐতিহাসিক ভবনে যাবার সুযোগ করে দিয়েছে—মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সংলগ্ন পুরোনো কলা ভবন—যার সামনে একুশে ফেব্রুয়ারির সেই আমতলা (যদিও তখন আমগাছটির খুব দৈন্য দশা)। এই সবকিছু কিন্তু খুব বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। সে সময় সামরিক সরকার শিক্ষা সংস্কারের জন্য যে শরীফ কমিশন গঠন করেছিলো তারই রিপোর্টে'র (১৯৬২) কিছু কিছু প্রাথমিক বাস্তবায়ন হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষায় আন্ত-অনুষদ বিষয় পড়ার এই নিয়মটি চালু হয়েছিলো। কমিশনের রিপোর্টের এই সুপারিশটি আমার খুব পছন্দ হয়েছিলো; তাছাড়া স্কুলে গোড়া থেকে ইংরেজির উপর জোর দেবার সুপারিশটিও।

কিন্তু শরীফ কমিশন রিপোর্ট পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্র সমাজে তীব্র বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছিল। বিশেষ করে স্কুলে, কলেজে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে বাড়তি বিষয়ের চাপ, ভাষা শেখার চাপ, পরীক্ষা ও ভর্তির ক্ষেত্রে পাশের শর্তগুলো কঠিন করা, অনার্সের মত পাস কোর্সকেও তিন বছর করা, উচ্চতর ছাত্র বেতন, এবং সর্বোপরি ছাত্রদেরকে রাজনীতি-বিযুক্ত করার প্রয়াস—শরীফ কমিশনের এসব সুপারিশকে পূর্বপাকিস্তানের ছাত্র সমাজ দেখলো সামরিক সরকারের একটি গভীর ষড়যন্ত্র হিসেবে। তার ফলে শুরু হয় বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন—আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুরুতেই এর আবর্তে ভীষণ ভাবে জড়িয়ে গেল। আসলে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বিরোধী আন্দোলন হিসেবে দেখা দিলেও এটি ছিল মূলত সামরিক শাসন বিরোধী বৃহত্তর বিক্ষোভেরই অংশ। মাত্র কয়েক মাস আগে বাষট্টির ফেব্রুয়ারিতে ঢাকার ছাত্ররাই প্রথম ছুঁড়ে দিয়েছিলো আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম চ্যালেঞ্জ। এখন শিক্ষা আন্দোলনটি তুঙ্গে উঠলো সেপ্টম্বরে গিয়ে। শেষ পর্যন্ত ১৭ সেপ্টম্বরের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে এ আন্দোলনের আপাত সাফল্য আসে—শরীফ কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের ইচ্ছেটি পরিত্যক্ত হয়। এর একটি তাৎক্ষণিক ফলাফল হলো আমাদেরকে আর কলা ভবনে গিয়ে 'সভ্যতার ইতিহাস' পড়তে হলোনা, ওখানকার ছাত্রদের আর কার্জন হলে এসে 'বিজ্ঞানের অগ্রগতি' পড়তে হলোনা। এই দিকটি আমার মোটেই ভাল লাগলোনা। শরীফ কমিশনের একেবারে সব কিছুই যে এভাবে পরিত্যক্ত হয়েছিল বা ছাত্ররা অপছন্দ করেছিলো

তা নয়। এর মধ্যে ছিল 'ট্যালেন্ট স্কীমে' ছাত্রদেরকে বেশ ভাল অঙ্কের বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা। ফলে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে মোটামুটি যারা পরীক্ষায় ভাল করেছে তারাও নানা আকারের এই ট্যালেন্ট স্কীম বৃত্তি পেতে শুরু করেছিলো। এই বৃত্তির টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের প্রায় সবার জীবনে কিছু বাড়তি সচ্ছলতা এনে দিয়েছিলো বছরের পর বছর।

তবে শিক্ষা কমিশনকে উপলক্ষ করে যে বৃহত্তর ছাত্র আন্দোলনের শুরু হলো, ছাত্র রাজনীতিতে আগ্রহী আমিও আর এর বাইরে থাকলাম না। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রায় পুরোটাই কাটলো এই আন্দোলনের তোলপাড়ের মধ্যেই।

আলোকচিত্র



প্রথম শ্রেণীর ছাত্র লেখক (১৯৫১)।



তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র লেখক (১৯৫৩)। করাচি জাম্বুরী থেকে ইউনূস ভাইয়ের আনা টুপি মাথায়।



লেখকের স্কাউটিঙে হাতেখড়ির সময় বক্সীর হাট বাসার ছাদে পাকা স্কাউট ইউনূস ভাইয়ের সঙ্গে (১৯৫৩)। ছাদের কোনার মেঝেতে সেই সামান্য উঁচু জায়গাটি যার ওপর বসে মা গল্প শোনাতেন আরো শৈশবে।



লেখকের প্রাথমিক শিক্ষার কালে ইউনূস ভাই (১৯৫২)। এই ফটো থেকে তখনই তিনি নিজের একটি বড় আত্মপ্রতিকৃতির তৈলচিত্র এঁকেছিলেন।



কাব স্কাউট হিসেবে 'গ্র্যান্ড হাউল' দিচ্ছে লেখক(১৯৫৩)ঃ 'আ-কে-লা, উই উইল ড্রু আওয়ার বেস্ট'।



শাহীন এয়ার স্কাউটের পোষাকে ইউনুস ভাই (১৯৫৩)- তাঁর কাছে ভাইবোনরা যখন বিমান চালনার গল্প শুনতো।



চট্টগ্রামে দ্বিতীয় পাকিস্তান জাতীয় জাম্বুরীতে (১৯৫৯) চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের স্কাউট দল। লেখক পেছনের দাঁড়ানো সারিতে বাম থেকে চতুর্থ।



বিশ্ব জাম্বুরীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবার আগে নিজেদের বাসা 'নিরিবিলির' অনুষ্ঠানে (১৯৫৯)।

সামনে মেঝেতে বসা জাম্বুরীর যাত্রী ইউনূস ভাই ও লেখক। মাঝের সারিতে উপবিষ্ট বাম থেকে ১ম কাব টিচার মখলেস স্যার (টুপিতে হাত), ৩য় কাজী সাহেব, ৫ম আব্বা (তাঁর সামনে সবারছোট ভাই মইনু)। পেছনে দণ্ডায়মান বাম থেকে ২য় সেন্ট প্লাসিড স্কুলের স্কাউটার জ্যাফরি প্যারাইরা, ৩য় বড়দা সালাম ভাই। এতে বিশ্ব জাম্বুরীতে পাকিস্তান কন্টিজেন্টের সদস্যরা ছিলেন।



ফিলিপাইনে বিশ্ব জাম্বুরীতে পাকিস্তান দলের তিন জন (১৯৫৯)। বাম থেকে লেখক, ইউনূস ভাই, পাঞ্জাবের নাজির আহমেদ।

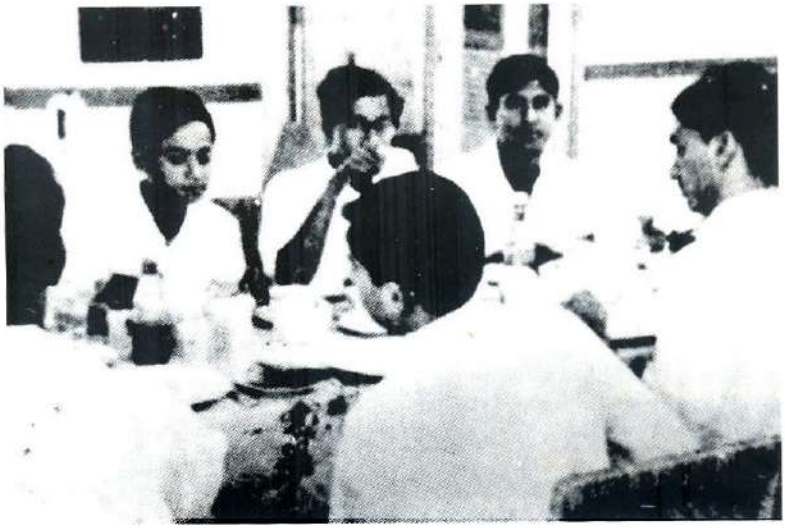

বিশ্ব জাম্বুরীতে পাকিস্তান দলের কয়েকজন। ক্যামেরার দিকে মুখ করে আছে অপেক্ষাকৃত ছোটদের তিনজন। বাম থেকে করাচির তানভীর, লেখক, পাঞ্জাবের এনাম।



ফিলিপাইনে বিশ্ব জাম্বুরীতে ভারতীয় স্কাউট হিমাংশু এবং দু'জন ফিলপিনো দর্শনার্থীর সঙ্গে লেখক (বামে)।

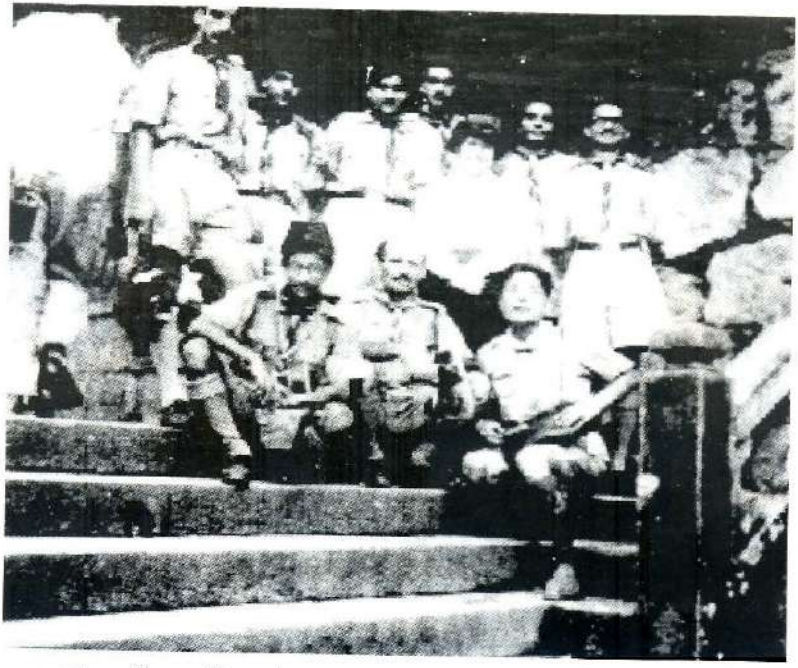

জাপানে পাকিস্তান কন্টিনজেন্টের কয়েকজন (১৯৫৯)। সামনের সারিতে বসা বাম থেকে লেখক, কন্টিনজেন্ট লীডার খান সাহেব, মিজনো সান। ঠিক পেছনে সদা হাস্যময়ী গাইড।



টোকিয়োতে রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আলী বগুড়ার (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী) বাসভবনে (১৯৫৯). তিনি সাদা স্যুটে। সামনের সারিতে উপবিষ্ট বাম থেকে তানভীর, এনাম, লেখক, ইউনুস ভাই, ছোট নাজির।



টোকিয়োর গিনজা স্ট্রিটে ক্যামেরার সমারোহের মধ্যে লেখক (১৯৫৯)।



মিজনো সানের ছেলে নূরচান- জাপানে লেখকের বন্ধু (১৯৫৯)।



জাপান থেকে ফেরার সময় ব্যাংককেঃ বাম থেকে ইউনূস ভাই, পাকিস্তান কন্টিনজেন্ট ম্যানেজার, লেখক (১৯৫৯)।



ম্যাট্রিক পরীক্ষার পর কক্সবাজারে বাউন্ডুলে ভ্রমণের সময় নিজেদের সাময়িক আশ্রয়ে (১৯৬০)। বাম থেকে কেরামত আখতার (পরে ডাক্তার), লেখক, কুতুবউদ্দীন (পরে অর্থনীতিবিদ)।



কক্সবাজারে সেই বাউন্ডুলে ভ্রমণে সমুদ্র তীরে সহপাঠী রেজাউল করিমের সঙ্গে লেখক, সে সময়ের বিস্ময় ওই ট্রানজিস্টর রেডিয়ো লেখকের গলায় ঝোলানো (১৯৬০)।



জেনারেল আজম খানের সৌজন্যে কলেজ থেকে ট্রেনে দেশ ভ্রমণের সময় ঢাকায় সদ্য গড়ে ওঠা রমনা গ্রিন পার্কে (১৯৬০)ঃ লেখক (বামে) ও ঘনিষ্ঠ বন্ধু বোরহান সিদ্দিকী (পরে আই জি পি, সচিব)

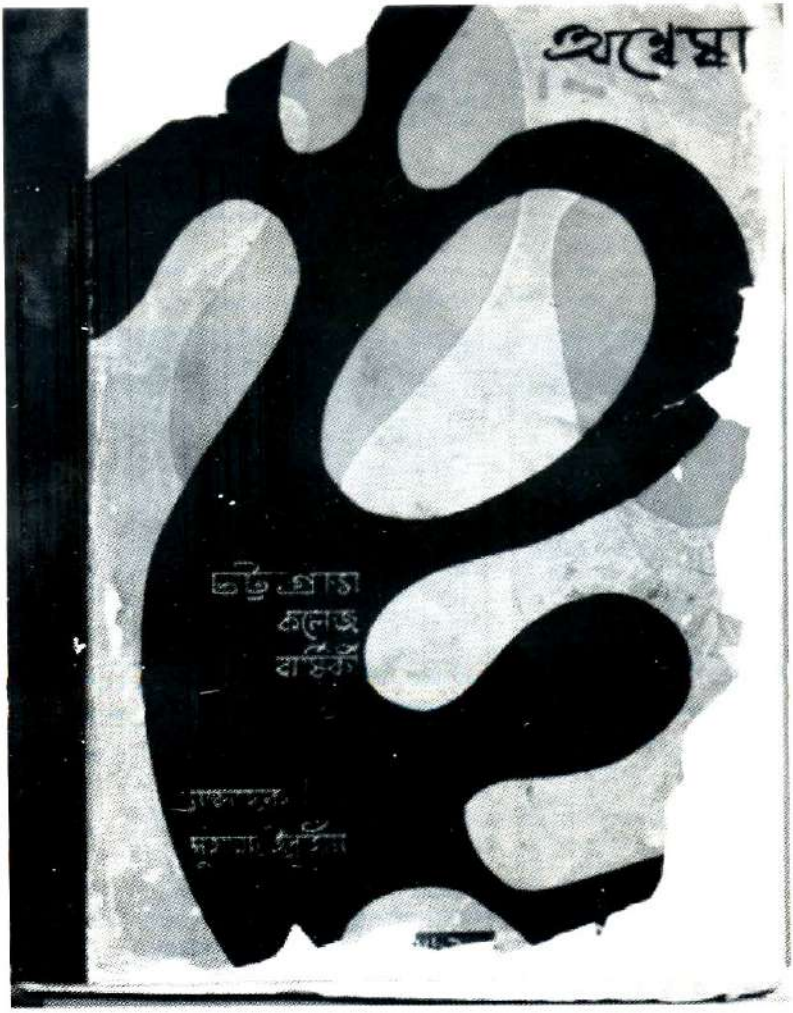

লেখক সম্পাদিত চট্টগ্রাম কলেজ বার্ষিকী 'অন্বেষার' (১৯৬১) প্রচ্ছদ।

MAGAZINE COMMITTEE—1961

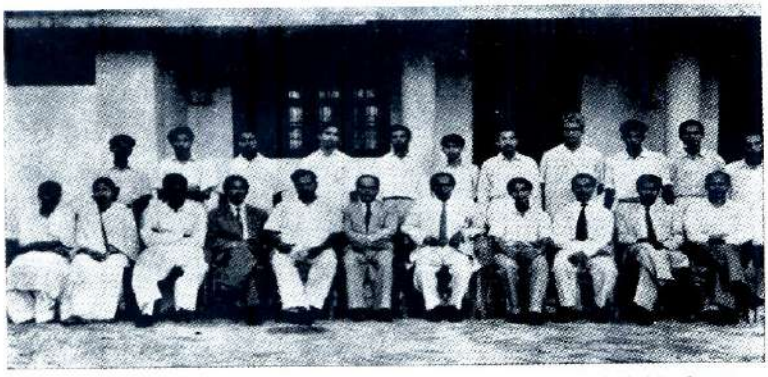

Sitting (From left) :—Gulmi Begum, Anima Bhattacharjee, Mahbubul Alam (C. S.), Prof. Abdur Rashid, Prof. Abu Sufian, (Treasurer), Prof. Md. Ismadullah, (Vice-President), Principal A. F. M. Musaffar Ahmad (President), Muhammad Ibrahim (Secretary), Dr. Hafez Ahmed, Prof. Shamsuddoha (Professor-in-charge), Prof. Ahmed Hussain (Professor-in-charge).

Standing (From left) :—Anisul Bari (Ids), E. Sayed Karim (4th), Burhanul Islam Siddiqui (5th), Farid Mahmoud Hassan (7th), S. Moosmond Hassan Rizvi (8th).

চট্টগ্রাম কলেজ বার্ষিকী 'অন্বেষার' সম্পাদনা কমিটি (১৯৬১) উপবিষ্টঃ বাম থেকে ২য় অনিমা ভট্টাচার্য, ৩য় মাহবুবুল আলম (তারা মিয়া), ৪র্থ অধ্যাপক আবদুর রশীদ, ৫ম অধ্যাপক আবু সুফিয়ান, ৬ষ্ঠ উপাধ্যক্ষ এরশাদ উল্লাহ, ৭ম অধ্যক্ষ মোজাফ্ফর আহমদ, ৮ম লেখক, ৯ম অধ্যাপক ড. হাফেজ, দশম অধ্যাপক শামসুদ্দোহা, একাদশ অধ্যাপক আহমদ হোসেন। দণ্ডায়মানঃ বাম থেকে ৪র্থ রেজাউল করিম, ৬ষ্ঠ বোরহান সিদ্দিকী ।

বিজ্ঞান সাময়িকী

সেপ্টেম্বর, ১৯৬০

যে অনন্ত ঐশ্বর্য, আমার, আমাদের অন্তর এবং দুর্বল মনের নিভৃতে লুকিয়ে আছে মানুষ তাহাকে নিশ্চিত করেন, তাঁর প্রতি নিশ্চিত শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং তাঁর নিশ্চিত প্রশংসাই আমার ধর্ম। একটা উচ্চতর বিচারশক্তি, যা অনেকটা বিশ্বে প্রকাশিত, তার অস্তিত্বে গভীর আবেগপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাসই পণ্ডিতদের সঙ্গে আমার ধারণা।

—আলবার্ট আইনষ্টাইন

। পূর্ব-পাকিস্তানী সমিতির উদ্যোগে প্রকাশিত বিজ্ঞান-পত্রিকা ।



আগামী দিনের শক্তি

। মোহাম্মদুল ইসলাম সিদ্দিকী ।

[illegible] পৃথিবীর [illegible] এবং [illegible] [illegible] [illegible]

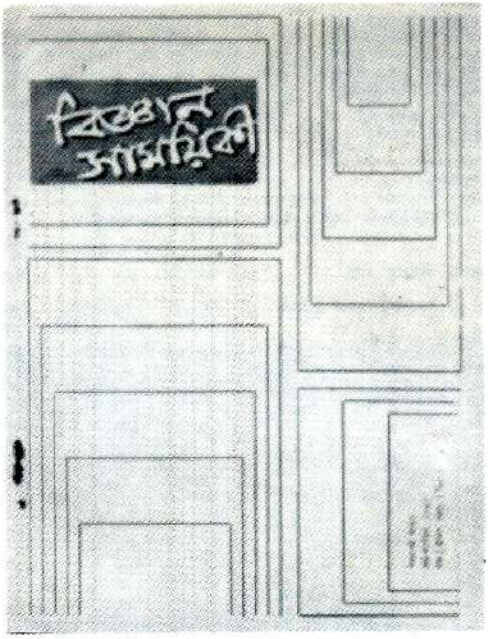

প্রথম দিককার বিজ্ঞান সাময়িকীর একটি প্রচ্ছদ (১৯৬১)।



বড়দার বিয়ের পর পর ভাই-ভাবীর সঙ্গে ছবি (১৯৬১)। বাম থেকে আইয়ুব, আজম, মইনু, ভাবী, বড়দা, জাহাঙ্গীর। ডানে পেছনে লেখক।



বিজ্ঞান-লেখক এবং বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের জন্য খ্যাতনামা ড. মুহাম্মদ ইব্রাহীম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে অবসর নিয়েছেন। তিনি চট্টগ্রামে ১৯৪৫ সালের ১ ডিসেম্বর জন্মগ্রহণ করেন এবং তাঁর স্কুলজীবন থেকেই বিজ্ঞান জনপ্রিয়করণের কাজের পদক্ষেপ নেন তাঁর একক বিজ্ঞান প্রদর্শনী করার মাধ্যমে। কলেজে পড়ার সময় তিনি দেশের প্রথম বিজ্ঞানবিষয়ক মাসিক পত্রিকা, বিজ্ঞান আন্দোলনের পথিকৃৎ 'বিজ্ঞান সাময়িকী' প্রকাশ শুরু করেন, আজ অবধি তাঁর সম্পাদনায় যার প্রকাশ অব্যাহত রয়েছে। '৬৫-৬৬ সালের জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ভিপি নির্বাচিত হন। ১৯৭৮ সালে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিজ্ঞান গণশিক্ষা কেন্দ্র (সিএমইএস) প্রতিষ্ঠা করেন যা তাঁর নেতৃত্বে দেশের একটি ব্যতিক্রমী ও মুখ্য এনজিও হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানত বিজ্ঞান বিষয়ে লেখা তাঁর রচিত পুস্তকসংখ্যা অর্ধশত; ওই বিষয়ে একজন টেলিভিশন-ব্যক্তিত্ব হিসেবেও তিনি সুপরিচিত। বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ তিনি দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তিনি বাংলাদেশ সৌর শক্তি সমিতির সভাপতি এবং বাংলাদেশ এনজিও ফেডারেশনের সভাপতি; ইউল্যাব বিশ্ববিদ্যালয়ে জেনারেল এডুকেশনে বিভাগীয় প্রধান ও অধ্যাপক।

প্রচ্ছদ : ধ্রুব এষ

ISBN : 978 984 91858 0 2
9 789849 185802